আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বাংলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের অর্ধশতবর্ষের আন্দোলন ও কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা (১৯২১-১৯৭১)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ইতিহাস বিভাগের অধীনে
'পি. এইচ. ডি.' উপাধির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ।

গবেষক ঃ **প্রবাল সেনগুপ্ত**

রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ঃ AOOHI1101216 (2016-17)
রোল নাম্বার ঃ PHD/HISTORY/16-45
F. I. No.-294/16/Arts.

গবেষণা অবেক্ষক
ড. দেবজিত দত্ত
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
২০২২

Certified that the Thesis entitled

আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বাংলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়

শিক্ষকদের অর্ধশতবর্ষের আন্দোলন ও কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা (১৯২১-১৯৭১)

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of

DR. DEBAJIT DUTTA, ASSISTANT PROFESSOR,
DEPARTMENT OF HISTORY, JADAVPUR UNIVERSITY

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Debajit Dutta

Countersigned by the
Supervisor :
Dated : 04-01-22

ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF HISTORY
JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA - 700 032

Prabal Seen Gupta

Candidate :
Dated : 04-01-2022

সূচিপত্র

ভূমিকা		[ঙ-ট]
প্রথম অধ্যায় :	প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতের শিক্ষা কাঠামো ও শিক্ষক	১-১৩
দ্বিতীয় অধ্যায় :	ইংরেজ কোম্পানির শাসনে ঔপনিবেশিক সরকারের ও বাংলার রেনেসাঁ ব্যক্তিত্বদের শিক্ষা সম্বন্ধীয় চিন্তা-ভাবনা	১৪-৫৫
তৃতীয় অধ্যায় :	১৯১৫ থেকে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ—রাজনৈতিক পরিবর্তন সমূহ ও শিক্ষকদের আন্দোলনমুখী মনোভাবের স্ফুরণ—সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলনের প্রথম পর্ব	৫৬-১১৭
চতুর্থ অধ্যায় :	স্বাধীনোত্তর কালে শিক্ষকদের গণমুখীনতা ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম—আন্দোলনে ব্যক্তির ভূমিকা	১১৮-২৪০
পঞ্চম অধ্যায় :	অর্ধশতবর্ষের পথে সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলন ঃ সমকালীন রাজনীতির প্রভাব ও সাহিত্যে প্রতিফলন	২৪১-৩১৫
ষষ্ঠ অধ্যায় :	শিক্ষক সংগঠনের স্বর্ণজয়ন্তী কাল ঃ সমকালীন রাজনীতির প্রভাব এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের নানা রূপ	৩১৬-৩৫৫
উপসংহার :	সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের তুলনামূলক আলোচনা	৩৫৬-৩৬৬
পরিশিষ্ট : (১)	সত্যপ্রিয় রায় এবং মাধ্যমিক শিক্ষক আন্দোলন	৩৬৭-৩৭৭
পরিশিষ্ট : (২)	অনিলা দেবী এবং মাধ্যমিক শিক্ষক আন্দোলন	৩৭৮-৩৮৭
গ্রন্থপঞ্জী		৩৮৮-৪০৪

গবেষকের নিবেদন

ঔপনিবেশিক যুগে সর্বপ্রথম আধুনিক বিদ্যালয় কেন্দ্রিক শিক্ষা ধারার প্রচলন হয়েছিল ভারতবর্ষে ও আমাদের বাংলায়। স্বাভাবিক ভাবেই গোষ্ঠীবদ্ধ শিক্ষক সমাজ-এর সূচনা হয়েছিল আমাদের আলোচ্য অবিভক্ত বাংলায়। পূর্ব বাংলার পাশাপাশি বাংলার পশ্চিমাংশে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল এই পাশ্চাত্য ধাঁচের 'স্কুল' শিক্ষা ব্যবস্থা—প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় বাংলার শিক্ষা কাঠামো এর আগে ছিল ব্যক্তি শিক্ষক সমন্বিত।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক এবং ঔপনিবেশিক যুগের শিক্ষকরা 'একটি মহান ব্রত' পালন করেছিলেন বলে এক সময়ে সাধারণ্যে একটি মত প্রচলিত ছিল। কিন্তু প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে, প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগ পর্যন্ত ব্যক্তি গুরুমশাই বা শিক্ষকবৃন্দ—শুধুমাত্র 'ব্রত' নয় শিক্ষকতাকে একটি 'বৃত্তি' হিসাবেও গণ্য করতেন। দ্রোণাচার্য থেকে সন্দীপণি মুনি সবাই তাদের নিয়োগ কর্তাদের কাছ থেকে আদায় করতেন গুরু দক্ষিণা। এছাড়া গুরু গৃহে অবস্থান রত, ছাত্ররা তাঁদের পঠন কালেই 'গায়ে খেটে' পরিশোধ করতেন শিক্ষা ঋণ। আরুণি থেকে সত্যকাম সব ছাত্রের জন্যই এই শ্রম ছিল বাধ্যতামূলক।

বৌদ্ধ যুগে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতীম সংস্থা গড়ে উঠলেও, সেই সব প্রতিষ্ঠানেও ব্যক্তি গুরুরাই নির্দিষ্ট ছাত্রদলকে পঠন-পাঠনে সহায়তা করতেন। মধ্যযুগে যখন শাসক গোষ্ঠীর গঠনে একটি পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছিল—তখনও ব্যক্তি শিক্ষক হিসাবে মৌলভীদের প্রাধান্য আমাদের লক্ষ্য এড়িয়ে যায় না। বাংলায় আমরা 'মঙ্গল কাব্য' এবং চৈতন্য চরিতাবলী' সমূহেও এই ব্যক্তি গুরুদের সন্ধান পাই। এরাও 'দৈনন্দিন গ্রাস ও আচ্ছাদনের' জন্য ছাত্রদের দানের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। ঔপনিবেশিক যুগের প্রাক্ মুহূর্তেও এই চিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি। সেই সময়ে শিক্ষকরা ছাত্রদের কাছ থেকে প্রাপ্য 'সিধা'-এর উপর জীবন নির্বাহের চেষ্টা করলেও, দোকানদারি, অনুপস্থিত কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেদেরকে অর্থনৈতিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতেন তাঁরা। শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন লেখায়—যেমন 'বিন্দুর ছেলে'তে আমরা পণ্ডিতদের উপশিক্ষকতা করার উদাহরণ দেখি। রবীন্দ্রনাথ তো মূলতঃ উপশিক্ষকদের দ্বারাই 'শিক্ষিত' হয়েছিলেন। ভৃত্য 'ঈশ্বর' থেকে চিকিৎসা বিদ্যার ছাত্র অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো ভিন্ন চরিত্রের মানুষেরা তাঁকে 'প্রাইভেট' পড়াতেন—এটা বলা যেতেই পারে।

এল ঔপনিবেশিক যুগ—দরজা দিয়ে শোষণ ও শাসনের বিদেশি যন্ত্রের উদ্ভব হলেও, জানলা খুলতেই পাশ্চাত্য শিক্ষার সুপবন বয়ে আসল, আমাদের হৃদয়ে। প্রাচীন শিক্ষার উর্বর পলিমাটির উপর পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্রীহি উৎপন্ন হল। এক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করলেন—মিশনারি, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও পরিশেষে কিছুটা পরিমাণে ঔপনিবেশিক সরকার। দলবদ্ধ বিষয় ভিত্তিক শিক্ষককুলের জন্ম হল। সমাজ এখন তাঁদের খাওয়াপরার দায়িত্ব নিল না, সরকারি ও কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের মুষ্টিমেয় দানে তাদের সংসার প্রতিপালিত হত। এই সময়ের প্রথম দিকের শিক্ষকদের জ্ঞানের গভীরতা নিয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে।

ইতোমধ্যে ১৯০৫-০৬-এর স্বদেশি শিক্ষা ধারার সংস্পর্শে 'স্কুল শিক্ষকেরা' একটি নির্দিষ্ট

গোষ্ঠীবদ্ধ হলেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকেই শিক্ষকতাকে 'ব্রত এবং বৃত্তি'-র সমন্বয় হিসাবে গণ্য করতে থাকলেন তারা। সমকালীন সময়েই গড়ে উঠল তাঁদের নিজেদের সংগঠন। বিভিন্ন স্তরের সংগ্রাম আন্দোলনে বিভিন্ন সময়ে রণনীতি ও রণকৌশলকে হাতিয়ার করে নিজেদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রমমুক্তির পথে তার এগিয়ে যেতে থাকলেন। এই সামগ্রিক পরিস্থিতের বর্ণনা ও বিশ্লেষণকেই আমাদের অভিসন্দর্ভে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে গবেষণা করতে আমাকে প্রথম অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন আমার শিক্ষক প্রয়াত ড. অমলেন্দু দে, তাঁকে প্রণাম জানাই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারি অধ্যাপক ড. দেবজিত দত্তের সহযোগিতা ও অবেক্ষক হিসাবে তাঁর উৎসাহ দান আমাকে কাজটি করতে উদবুদ্ধ করেছে প্রতিনিয়ত।

গবেষণা পত্রটি লেখার কাজে সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্র দিয়ে এবং 'শিক্ষা ও সাহিত্য' পত্রিকার পুরনো ফাইল দেখতে দিয়ে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক উৎপল রায় এবং শিক্ষা ও সাহিত্যের সাবেক সম্পাদক অশোক অধিকারী আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। এছাড়া গবেষণা পত্রটি রচনা করার সময় নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছেন ড. রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ড. সমীর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গ।

গবেষণার কাজে প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য পেয়েছি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, হুগলি মহসিন কলেজ গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার গ্রন্থাগার, মুজফ্ফর আহমেদ গ্রন্থাগার, বিধানসভা গ্রন্থাগার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেখ্যাগারের কাছ থেকে। এই সমস্ত সংস্থার প্রতি আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

গবেষণা কর্মটি সম্পন্নই হতো না, যদি না আমার সহধর্মিনী সুজাতা সেনগুপ্ত তাঁর কল্যাণ হস্তে সাংসারিক দীপটিকে নিবাত-নিষ্কম্প না রাখতেন। ধন্যবাদেরও যদি অধিক কোন বিশেষণ থাকে, তার অধিকারী তিনি। এছাড়া আমার আত্মজ অর্কপ্রভ আমার 'কাজ' সম্বন্ধে সব সময়ই সমালোচনামূলক বক্তব্য রেখে আমাকে উজ্জীবিত করেছে প্রতি সময়েই। তাকে জীবনে আরো 'বড় মানুষ' হবার আশিস জানাই।

প্রাক্তন শিক্ষক ও আমার পরমাত্মীয় তপন পোদ্দার আমাকে অনেক কাল ধরেই, বর্তমান বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে উৎসাহিত করেছেন, তাঁকে প্রণাম জানাই। আর আমার 'গবেষণা কোনদিনই শেষ হবে না' বলে প্রতিনিয়ত যে আমার 'অপার আলস্য' কাটিয়ে কর্মমুখী হবার প্ররোচনা দিয়েছেন, সেই বন্ধুবর সাহিত্যিক চন্দন নাথের প্রতি আমার আন্তরিক ভালোবাসা জানাই। অভিনন্দন জানাই গবেষণাপত্রের মুদ্রক সঞ্জীত ঘোষকে।

আর সবচেয়ে শেষে, বিষাদভরা মনে স্মরণ করি আমার 'বন্ধু ও ভাই' যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডিন প্রয়াত অধ্যাপক ড. শুভাশিস বিশ্বাসকে, যাঁর সহায়তা ছাড়া এই অভিসন্দর্ভ আলোর মুখই দেখত না।

(প্রবাল সেনগুপ্ত)
সহযোগী অধ্যাপক—ইতিহাস বিভাগ
হুগলি মহসিন কলেজ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সংক্ষিপ্তসার

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যমণি হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরটি। প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে এই স্তরটি। প্রাচীনকাল থেকেই মধ্যস্তরের এই শিক্ষা প্রক্রিয়া চালু থাকলেও, তা প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিল বহুলাংশে। একেবারে প্রকটরূপে, মাধ্যমিক শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল, ঔপনিবেশিক যুগে—এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তবে এই উন্মেষের প্রাথমিক পর্বে, ঔপনিবেশিক প্রশাসন নয়, সচেষ্ট হয়েছিল খ্রিস্টান মিশনারী ও নতুন মধ্যশ্রেণিভুক্ত 'নবজাগরণের উদ্‌গাতাগণ'। পরবর্তী কালে অবশ্য 'কেরাণী' তৈরির লক্ষ্যে সরকারও এ বিষয়ে কিছুটা দৃষ্টি দিয়েছিল। এর ফলে 'একক গুরুর' টোল বা পাঠশালা নয়—তৈরি হয়েছিল সমষ্টি বদ্ধ বহু শিক্ষকের সমন্বয়ে, মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। নতুন এক নিম্নবিত্তের শিক্ষক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল, যাদের যৎসামান্য সামাজিক সম্মান থাকলেও, ছেঁড়া জামা, ভাঙ্গা ছাতার' অর্থনৈতিক দুরবস্থা, সবার কাছে তাদের হেয় প্রতিপন্নই করতো শেষ বিচারে।

স্বদেশি আন্দোলনের (১৯০৫) এর যুগ পেরিয়ে নানারূপ দেশীয় ও বৈদেশিক আর্থ-রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের অভিঘাত এর ফলস্বরূপ ব্রিটিশ শক্তির স্নায়ুকেন্দ্র কলকাতায় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কতিপয় শিক্ষকের অক্লান্ত চেষ্টায় গঠিত হয়েছিল, শিক্ষকদের প্রথম আর্থ-সামাজিক অভিযোগ জ্ঞাপনের মঞ্চ, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি বা A.B.T.A.। ইউরোপ শুধু নয় আমেরিকা কিংবা চিন জাপানে, এমনকি অপেক্ষাকৃত আধুনিক রাষ্ট্রশক্তি সাবেক সোভিয়েত রাষ্ট্রে শিক্ষকদের দাবি দাওয়া, অভাব অভিযোগের ইতিবৃত্ত অনেক গবেষককে আকৃষ্ট করলেও, ঔপনিবেশিক শাসনের প্রাণকেন্দ্র অবিভক্ত বাংলার শিক্ষক আন্দোলন বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের চাওয়া-পাওয়া নিয়ে কোন গবেষণাধর্মী আলোচনা আজ পর্যন্ত হয়নি বলেই জানি। সেই জন্যই ইতিহাসের এই অনালোকিত অঞ্চল সম্বন্ধে আলোচনা করে নিজেকে ঋদ্ধ করার মানসেই এই কাজ করতে আমি প্রবৃত্ত হই। এই বিষয়ে কিছু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক আকর প্রাথমিক পর্বে আমার উৎসাহ বৃদ্ধি করে। ১৯২১ থেকে সংগঠিত ভাবে সংগ্রামে রত মাধ্যমিক শিক্ষকদের আন্দোলন কিন্তু তার যাত্রা পথে একই গতিতে চালিত হয়নি। আবেদনমূলক, প্রচারমূলক পর্যায় পেরিয়ে ১৯৪৮-এর পর তা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সাবলীল পর্বে স্বপ্রকাশিত হয়েছিল। যার চরম পরিণতিতে ১৯৫৪-এর বারো দিনের আন্দোলনে তা সংগ্রামের শীর্ষ বিন্দুতে উপনীত হয়েছিল।

শিক্ষকদের নিজস্ব এই আন্দোলন তাঁদের স্বতঃসিদ্ধ দাবি-দাওয়া ও শিক্ষা কাঠামোর সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে সততার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে, এক সময়ে তা শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র ও অন্যান্য পেশাজীবী মানুষদের স্ব-স্ব সংগঠনের সহায়তা লাভের মধ্য দিয়ে প্রথমে অবিভক্ত বঙ্গে ও পরে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে জনতার সামগ্রিক সংগ্রামে পরিণত হয়েছিল। শিক্ষক সমাজ ও সংহতি জানিয়েছিল, তাঁদের পাশে থাকা মানুষগুলোর আন্দোলনে।

এটা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে, প্রাথমিক পথ চলার প্রারম্ভে তৎকালীন মাধ্যমিক শিক্ষকদের একমাত্র সংগঠন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি দল-মত নির্বিশেষে সকল শিক্ষকের মূক মুখকে মুখর করার 'জন মঞ্চ' ছিল। একটি প্রেসার গ্রুপ বা চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবেই কাজ করতো এই সংগঠন। স্বাধীনোত্তর কালে অবশ্য আমাদের ভাঙ্গা বাংলার পশ্চিমাংশে বিভিন্ন রাজনৈতিক বাতাবরণের চাপে ক্রমশঃ ভাঙ্গনের সম্মুখীন হতে থাকে এই সংগঠনটি। যা চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে, ১৯৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে। ঘটনাচক্রে ওই বছরটি ছিল সমিতি প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ জয়ন্তী। এটা অস্বীকার করে লাভ নেই, যে মূল সমিতি সহ অন্যান্য ভগ্নাংশগুলি এরপর থেকেই তাদের স্বাধীন সত্তা বহুলাংশে হারিয়ে ফেলে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উপগ্রহে পরিণত হয়েছিল। গবেষণার মধ্যে 'শেষ কথা' বলে কিছু থাকে না। তবু শেষ বিচার একটা করতেই হয়। সেই বিচারে শিক্ষা কাঠামো ও রুটি রুজির উন্নয়নের জন্য A.B.T.A.-র সদর্থক আন্দোলনের কথা যেমন আমরা বলেছি, তেমনি ৪০' এর দশকে পৃথক মাধ্যমিক বোর্ড গঠনের প্রয়াস চলার সময়ে, তাদের নরম সাম্প্রদায়িক মনোভাবও আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। ৫৪-এর সর্বদলীয় আগুন ঝরানো আন্দোলনের পরবর্তীকালে, কোন 'আদর্শ' ব্যতীতই সমিতির গোষ্ঠী কোন্দলও আমাদের চোখে না পড়ে পারবে না। এভাবেই 'মন্দ যদি তিন চল্লিশ/ভালোর সংখ্যা সাতান্নো'র পরিপ্রেক্ষিতেই মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির কার্যকলাপের বিবরণ আমরা লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি, বক্ষ্যমাণ গবেষণা নিবন্ধে।

ভূমিকা

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা বৃক্ষের কাণ্ড স্বরূপ। প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষা কিশলয় উদ্‌ভিন্ন হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সেই বৃক্ষের কাণ্ড হিসাবে গণ্য হয় তাই। আর উচ্চতর শিক্ষায় তা হয় ফুলে ফলে সমৃদ্ধ। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা বুঝতে পারছি, যে এই মাধ্যমিক শিক্ষা কাণ্ডই, প্রাথমিক শিক্ষার কিশলয় ও উচ্চশিক্ষার সম্পূর্ণতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। শিক্ষা পিরামিডের মধ্যবর্তী স্তম্ভ স্বরূপ এই পর্যায়ের শিক্ষা।

আমরা জানি, প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশে এক সমৃদ্ধিশালী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। সাধারণ ভাবে আমাদের একটি ধারণা আছে, যে বশিষ্ট থেকে বুনোরামনাথের সময় পর্যন্ত অর্থাৎ প্রাচীন থেকে প্রাক্-আধুনিক কাল অবধি শিক্ষকতাকে একটি 'ব্রত' হিসাবেই ধরা হত। সেখানে বৃত্তিগত চাহিদা ছিল গৌণ, কিন্তু আমরা যদি একটু খুঁটিয়ে খুঁজি তবে দেখতে পাব, যে প্রাচীন যুগ থেকেই বৃত্তি হিসাবেও এই পেশাটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আজকের মতো সরাসরি বেতন তখন হয়তো শিক্ষক 'গুরু'রা গ্রহণ করতেন না। তবু দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য শাসক শক্তি বা রাজা মহারাজদের কাছ থেকে তারা 'বৃত্তি' গ্রহণ করতেন। এছাড়া ছাত্রদের কাছ থেকে শিক্ষা সমাপন হলে, 'গুরুদক্ষিণা' ও প্রাপ্য ছিল তাদের।

বৌদ্ধ যুগে যখন শিক্ষা কিছুটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তখন নানা শিক্ষা কেন্দ্র বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতীম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শাসক শক্তির সাহায্য পেত। উদাহরণস্বরূপ আমরা আমাদের ঘরের কাছের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করতে পারি। যেখানে হর্ষবর্ধন থেকে শুরু করে বিভিন্ন 'পাল' রাজারা উর্বর ভূমিদান করে, বা দ্রব্য সম্ভার দান করে, শিক্ষকদের প্রতিপালন সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহে সহায়তা করতেন। ভারতে মধ্যযুগেও এই ধারার খুব একটা ব্যতিক্রম হয়নি। সুলতানি যুগে বিশেষ করে ফিরোজ তুঘলকের সময় কালে, শিক্ষা বিস্তারের উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছিল। আমাদের বাংলায় বিশেষ করে হুসেন শাহ বা নসরৎ শাহের মতো শাসকবৃন্দ, শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিস্তারে যথেষ্ট সহায়ক ছিলেন। এই আমলের একদম প্রথম যুগে আমরা বাবর বাদশাহকে যেমন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে দেখি যদিও আকবরের আমল থেকেই মক্তব এবং মাদ্রাসা কিংবা পাঠশালা এবং টোল বা উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান অনেকটাই ব্যক্তিগত উদ্যোগেই গড়ে উঠেছিল। এছাড়া সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য 'সদর-উস-সাদরা' নামে একটি মন্ত্রী পদের সৃষ্টি হয়েছিল এই সময়ে। সেই সময়ে শিক্ষকদের জীবন নির্বাহের জন্য জায়গীর দেওয়া হত।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক কালে, আমাদের অবিভক্ত বাংলায় মূলতঃ পাঠশালা কেন্দ্রীক শিক্ষা ব্যবস্থাই চালু ছিল। হাতে খড়ি বা বিসমিল্লাহ সংস্কারের সময়, শিক্ষকদের সিধে দিতে হত। একেবারে সেই 'চৈতন্য যুগ' থেকেই এই প্রথা বর্তমান ছিল। এর পরবর্তীকালে, শিক্ষকেরা

যেমন কলাটা-মুলোটা-র বিনিময়ে শিক্ষা ধারার প্রসারকে বহমান রেখেছিলেন, তেমনি উপজীবিকা হিসাবে অন্য কাজও করতেন অনেক শিক্ষকেরা। আমরা কেউ কি ভুলে যেতে পারি সেই অমোঘ কাব্যপংক্তি, 'পাঠাশালাটি দোকান ঘরে/গুরু মশাই দোকান করে।'

ইংরেজরা ভারতে যখন বণিকের মানদণ্ড ত্যাগ করে রাজদণ্ড হাতে নিল, তখন অন্ততঃ প্রাথমিক পর্বে তারা ভারতের তথা আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে বাংলায় শিক্ষা বিস্তারের কোন চেষ্টা করেনি। সর্বপ্রথম খ্রিস্টান মিশনারীদের দ্বারাই আধুনিক 'স্কুল' কেন্দ্রীক শিক্ষা চালু হয় দেশে। এর পরে 'হিন্দু কলেজ' স্থাপনের মধ্য দিয়ে এই বিদ্যালয় কেন্দ্রিক শিক্ষা ধারা ক্রমশঃ শতজল ঝর্ণার মতো বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৩৫-এর মেকলে মিনিটের দ্বারা ইংরেজী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের একটা জোয়ার আসে। ক্রমশঃ কোলকাতার গণ্ডী ছাড়িয়ে মফঃস্বলে, অর্থাৎ হুগলী, মেদিনীপুর বা ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় অ্যাংলো- বেঙ্গলী হাইস্কুলসমূহ। এই প্রথম সংঘবদ্ধ হবার সুযোগ পান শিক্ষকেরা। রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে 'কলে ছাঁটা বিদ্যার' কেন্দ্রস্থল বললেও, এই শিক্ষা ধারা প্রসারিত না হলে বাংলার তথাকথিত 'নবজাগরণ' সম্ভাবিত হত কিনা—তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

বিশেষ করে স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থায়, ব্যক্তি গুরুর পরিমণ্ডল পরিত্যাগ করে, শিক্ষকরা একটি সমষ্টিগত সত্তায় পরিণত হয়েছিলেন, এ বিষয়ে কোন দ্বি-মতের অবকাশ নেই। ইংরেজ আমলেই প্রথম 'দক্ষিণা-জায়গীর-দ্রব্যার্থ' দানের প্রথা রদ করে শিক্ষকদের তাদের কাজের বিনিময়ে 'বেতন' পাওয়া অন্ততঃ তাত্ত্বিক ভাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল।

তার পরে স্বদেশি যুগের সোপান এ পদক্ষেপ করে, জাতীয় শিক্ষার আলোকে সংগঠিত শিক্ষক সত্তার আরেকটি নতুনতর প্রকাশ ঘটলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব, গান্ধীজীর আন্দোলন, সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণির দাবি আদায়ের হাতিয়ার হিসাবে নিজস্ব সংঘ গড়ে ওঠা, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আমাদের দারিদ্র্য দুঃখ লাঞ্ছিত গুরুকুল অনুধাবন করতে সক্ষম হল যে 'একতাই শক্তি' বা Unity is strength। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল বাংলা জোড়া শিক্ষক সংঘ, 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি'। সাধারণের কাছে A.B.T.A. হিসাবেই বহুল পরিচিত এই সমিতি।

এই সমিতির গতিপথের সুলুক সন্ধান করবার আগে, শিক্ষক আন্দোলনের যে গতি প্রকৃতি আমরা ঔপনিবেশিক এবং ঔপনিবেশিকোত্তর যুগে পরিলক্ষিত করেছি, তার প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের সিংহাবলোকন করার কিছুটা প্রয়োজন আমরা অনুভব করছি।

শিক্ষক আন্দোলন আধুনিক শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সাধারণ ভাবে বিভিন্ন গবেষকরা শিক্ষা সংক্রান্ত এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটিকে অবহেলা করে থাকে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে শিক্ষকদের কার্যকলাপ তথা বিভিন্নমুখী আন্দোলনের আলোচনা ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারে না।

এই আন্দোলন শিক্ষকদের দৈনন্দিন রুটি রুজির আন্দোলনের সীমা ছাড়িয়ে অরো বহুদূর

বিস্তৃত। শিক্ষাকাঠামো কি রকম হওয়া উচিৎ, ছাত্রদের কিভাবে আরো উন্নততর শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে,এই সব বিষয়ও শিক্ষক আন্দোলনের আলোচনায় আসতে পারে। অবশ্যই প্রাথমিক ভাবে এই আন্দোলন চাওয়া পাওয়ার ক্ষুদ্র বেষ্টনীতে আবদ্ধ থাকতে পারে, তবে অবশ্যই তা আন্দোলনের কোন একটি বাঁকে বৃহত্তর গণআন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এটা ঠিকই শিক্ষকেরা কখনই নিজেদের একটি শ্রেণি হিসাবে চিহ্নিত করতে পারে না, তাসত্ত্বেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে তারা সব সময়ই একটি 'প্রেসার গ্রুপ' হিসাবে কাজ করে। স্বভাবতই কোন একটি নির্দিষ্ট দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী হিসাবে কাজ করতে সক্ষম হন। নিজেদের আর্থ-সামাজিক দাবি দাওয়া ও অন্যান্য ক্ষেত্রে শিক্ষকদের একটা সমষ্টিগত মতামত থাকে। শুধুমাত্র আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর উন্নত, উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত সব খানেই শিক্ষক আন্দোলনের অস্তিত্ব আছে। তবে উন্নত দেশ সমূহে এই আন্দোলন অনেকটাই 'অ্যাকাডেমিক', বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সেগুলি 'পলিটিক্যাল' আন্দোলন নয়।

ভারতের যত উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষক আন্দোলন শুধুমাত্র নিজ গোষ্ঠীর সামগ্রিক উন্নতির প্রতি দায়বদ্ধ নয়। তার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের বিভিন্নমুখী আন্দোলনের সঙ্গে তা ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। স্বভাবতই ভারত বা আমাদের আলোচ্য বাংলার ক্ষেত্রে শিক্ষক আন্দোলন অনেক সময়ই বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

শিক্ষকদের এই আন্দোলনকে আমরা রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক এবং মানসিক প্রেক্ষিতে বিচার করতে পারি। আন্দোলনের এই বিভিন্ন দিকগুলি 'কন্‌টেন্ট'-এর দিক থেকে পৃথক না হলেও 'ফ্রম্'-এর দিক থেকে পৃথক। অর্থাৎ উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলির আলাদা অস্তিত্ব থাকলেও, একটি অপরটির সঙ্গে এতটাই সম্পৃক্ত, যে অনেক সময় তাদের পৃথক অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না।

ঔপনিবেশিক এবং ঔপনিবেশিক-উত্তর যুগে যে সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে শিক্ষক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে সেগুলিকে আমরা কয়েকটি পৃথক ভাগে অবশ্যই আলোচনা করার চেষ্টা করতে পারি। এগুলি হল সামাজিক প্রেক্ষাপট, শিক্ষা কাঠামোর ত্রুটি বিচ্যুতি, এই ক্ষেত্রে সরকারি নীতিসমূহ, জীবিকা হিসাবে শিক্ষা ক্ষেত্রের অবস্থান ইত্যাদি।

শিক্ষক আন্দোলনের আরেকটি বিশেষ দিক হল, তার মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিকতা। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত গোষ্ঠীটি একদিকে নিজেদের বিশেষ পেশার কারণে গৌরবান্বিত এবং সেই জন্য সমাজের অন্যান্য খেটে খাওয়া মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত। অন্যদিকে শোষিত শ্রেণির মানুষকে নেতৃত্ব দেবার জন্য তাদের আদর্শগত একটা চেষ্টা একই সঙ্গে দেখা যায়।

মার্কসীয় শ্রেণি তত্ত্ব অনুযায়ী শিল্পবিপ্লব পরবর্তীকালে সমাজ, বুর্জোয়া এবং প্রোলেটারিয়েট এই দুই অংশে বিবক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই ধারণা পরবর্তীকালে পুরোপুরি সঠিক বলে প্রতিপন্ন

হয়নি। মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীটি এই দুই শ্রেণির মধ্যে আলাদা অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। অনেক সময় শাসক শ্রেণি অল্প দামে তাদের পরিচালনগত দক্ষতা ক্রয় করেছে। আবার এই গোষ্ঠীটি অনেক সময় 'মেধাশ্রমিক' হিসাবে তাদের শোষণ করা হয় বলে অন্যান্য শ্রেণির আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই মধ্যবিত্ত সমাজের শিরোমণি স্বরূপ শিক্ষক সমাজও বারে বারে এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছেন। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ আছে।

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম পর্যায়েই ভারতের ঐতিহ্যগত পাঠশালা—মক্তব কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে, বাংলার প্রথম প্রজন্মের পাশ্চাত্য জ্ঞানদীপ্ত অংশ আশা করেছিলেন যে এই শূন্যতা পূরণের জন্য 'জ্ঞানদীপ্ত' ইংরাজ সরকার সচেষ্ট হবেন, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। অন্যদিকে আধা সামন্ততান্ত্রিক পরিকাঠামোর সীমিত ভাবে হলেও চিকিৎসাবিদ, প্রযুক্তিবিদ, আইনজীবীরা তাঁদের পেশায় একটি যুগোপযোগী, আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন করলেও, শিক্ষকতা 'ব্রত'-র সঙ্গে আর্থিক সচ্ছলতার সম্পর্ক ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় শিক্ষকেরাও সামাজিক সম্মান নষ্ট হওয়ার ভয়ে অর্থকরী দাবি দাওয়া তুলতে চেষ্টা করতেন না, একদিকে বাস্তবের প্রয়োজন অন্যদিকে 'মহান ব্রতধারীর' তকমা বজায় রাখার টানাপোড়েনে তারা জর্জরিত হতেন। শিক্ষক মানসিকতার এই দ্বৈততা নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে।

অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষক সমাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে ঔপনিবেশিক সরকার কিংবা বিদ্যালয়গুলির আধা সামন্ততান্ত্রিক পরিচালন কমিটি তাঁদের গ্রাসাচ্ছদনের ন্যূনতম দাবীগুলিও পূরণ করবে না। তাই যেন অনেকটা বাধ্য হয়েই তারা ফিরে তাকালেন দেশের সাধারণ মানুষের দিকে। একদিকে একটি চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবে জনতার আন্দোলনে সামিল হয়ে নিজেদের পেশাগত দাবি দাওয়া নিয়ে সংঘবদ্ধ হবার চেষ্টা শুরু করলেন তারা, অন্যদিকে নিজেদের পেশাগত দাবি দাওয়ার সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে, মধ্যবিত্তদের অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির মতো জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে থাকলেন তারা। জনগণের সাহায্য নিয়ে এবং একই সঙ্গে জনগণকে নেতৃত্ব দিয়ে শিক্ষক সমাজ একই সঙ্গে নিজেদের সীমাবদ্ধ স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সামগ্রিক স্বার্থের যে মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন তা, বিশদ বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

এই অবস্থা অবশ্য একদিনে হয়নি। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি ১৯১৭-এর সোভিয়েত বিপ্লব, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের গান্ধীজীর আন্দোলনের প্রভাব শিক্ষক সমাজকে আলোড়িত করেছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন বিচ্ছিন্ন একক ভাবে নয় শিক্ষকতা বৃত্তিকে আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজন সংগঠিত আন্দোলন। ১৯২০ তে এ.আই.টি.ইউ.সি. গঠনের পর সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী পেশাগত সুযোগ সুবিধা নেওয়ার জন্য সমিতিতে সংঘবদ্ধ হচ্ছিলেন। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে শিক্ষকেরাও কিছু আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে তোলার পর্বকে ছাড়িয়ে, বাংলা জোড়া একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। যার নাম হয় নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি বা এ.বি.টি.এ.।

প্রথমে সরাসরি অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া তুলতে শিক্ষকেরা তখনও অস্বাছন্দ্য বোধ করতেন। অবশ্য সংগঠনটির প্রথম সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই এই সংকোচ তাদের কেটে যায়। ছাত্র মঙ্গলের বিভিন্ন দাবি দাওয়ার পাশাপাশি তাঁরা নিজেদের আর্থিক বেতন বৃদ্ধি, চাকরির স্থায়িত্ব

প্রভৃতি নিয়ে অন্ততঃ নিয়মতান্ত্রিক পথে দাবি দাওয়া করতে থাকেন। সাধারণভাবে অনেক ঐতিহাসিক যে কোন রকম 'নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে সোচ্চার প্রতিবাদী আন্দোলনের তুলনায় কম প্রগতিশীল বলে মনে করেন। কিন্তু এরকমটা মনে করার কোন কারণই নেই। প্রত্যেকটি আন্দোলনের মতোই শিক্ষকদের প্রথম পর্যায়ের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে তাই সেই যুগের নিরিখেই বিচার করতে হবে। এই আন্দোলনের নঞর্থক দিকটির পাশাপাশি আমাদের আলোচনা করতে হবে এর সদর্থক দিকটিকেও।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অবশ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণআন্দোলনের ঢেউ শিক্ষক সমাজের উপরও প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই সময়েই শিক্ষক আন্দোলনে একটি নতুন যুগের সূচনা হতে শুরু করেছিল। নানা ঘাত প্রতিঘাত পেরিয়ে সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্বে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারি শিক্ষকেরা 'স্বদেশী' কংগ্রেস সরকারের শিক্ষা ও শিক্ষক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল। এই প্রথম শিক্ষক আন্দোলনকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত এবং কবি সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানীক ও সঙ্গীতকাররা। সাহিত্য ও কবিতা সৃষ্টি হয়েছিল তাদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, শিল্পীরা এঁকেছিলেন ছবি। সঙ্গীতকারের সংগ্রামী গীতধারায় স্নাত হয়েছিল সংগ্রামের মঞ্চ। কোন রসায়নে 'নিজস্ব একাকিত্ব' ভেঙ্গে বুদ্ধিজীবীরা তাঁদেরই অন্যতম গোষ্ঠী শিক্ষকদের আন্দোলনে সৃজনশীল হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাও গভীরভাবে ভাববার বিষয়। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষাকে আন্দোলনেও আমরা অনুরূপ ছবি দেখতে পাই।

এই সময়েই কংগ্রেস বিরোধী সমস্ত বিরোধী দল যার মধ্যে দক্ষিণ, মধ্য ও বামপন্থী প্রায় সব দলই ছিল, শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রতি সহমর্মীতা জ্ঞাপন করেছিলেন। সেটাকে তাদের নিজস্ব স্বার্থ পূরণের তাগিদ বলে চিহ্নিত করা হলেও, তা ইতিহাসের সত্য হয় না। আসলে সমিতির নেতৃত্বই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে নিজেদের দাবিদাওয়ার পরিপূরণের জন্য অন্যান্য গণসংগঠনের সঙ্গে এক হয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলটিকেই শাসন ক্ষমতার থেকে সরিয়ে দিতে হবে। আনতে হবে বিকল্প নীতিযুক্ত দলের সরকার। সেই সরকারের উপর 'প্রেসার গ্রুপ' হিসাবে শিক্ষকেরা যেমন চাপ সৃষ্টি করতে পারবেন, তেমনই সেই সরকারও জাতির বিবেকস্বরূপ শিক্ষকদের সমর্থন পেয়ে নিজেদের অবস্থানকে আরো শক্ত করে তুলতে সক্ষম হবেন। আসলে বিকল্প দলের সরকারের শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই এই পারস্পরিক সমর্থন বাস্তবায়িত হয়ে উঠতে পারবে, যা সেই শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গীর কারণেই কংগ্রেস সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই ভাবেই শিক্ষক আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা হয়েছিল, যা বিশদ বিশ্লেষণের যোগ্য।

এরপরেই গঠিত হয়েছিল প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্ত ফ্রন্ট সরকার। সেই সরকারদ্বয় যে শিক্ষকদের বিভিন্ন একাডেমিক ও অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া মিটাবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন তাই নয়, তার পাশাপাশি শিক্ষক ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলির বিশদ পর্যালোচনার প্রয়োজনে জ্যোতি ভট্টাচার্য এবং সত্যপ্রিয় রায়ের মতো বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা শিক্ষক আন্দোলনের প্রথম সারির নেতাদের

শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেছিল। সরকারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে শিক্ষক সমাজের যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছিল এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাশাপাশি এই সম্মান বৃদ্ধির পিছনে শিক্ষক সমাজ ও বিকল্প সরকারের ভূমিকা গভীরভাবে ভাববার বিষয়।

১৯৭০-এর দশকে শিক্ষকদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়াকে পিছনে ফেলে তাঁদের চাকুরির নিরাপত্তা এমনকি জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছিল। শ্রেণি দৃষ্টিগত পার্থক্যের জন্য তৎকালীন সরকার এমনকি শিক্ষক আন্দোলনে ভাঙ্গন সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়েছিল। কেন শিক্ষকেরা এমনকি প্রেসার গ্রুপ হিসাবে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি, তাও গভীর আলোচনা সাপেক্ষ। সেই সময়েই বাইরের দলীয় রাজনীতির চাপে, সর্বদলীয় স্বাধীন সংগঠন হিসাবে A.B.T.A.-র অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। সমাপ্ত হয়েছিল ঐক্যবদ্ধ শিক্ষক আন্দোলনের। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর শ্রেণি মিত্র সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিল শিক্ষকেরা, তবু এই সাহায্য কি আন্দোলনে ভাঁটার সৃষ্টি করেছিল পরোক্ষভাবে? তা অন্য প্রসঙ্গ।

মাধ্যমিক শিক্ষক আন্দোলন বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণিকেন্দ্রিক আন্দোলনগুলির মধ্যে অন্যতম আন্দোলন। মধ্য শ্রেণির অন্যান্য আন্দোলনের মতোই এই আন্দোলনে যেমন একটি ধারাবাহিকতা আছে, তেমনি রূপান্তরও আছে। কখনও নিয়মতান্ত্রিক কখনও বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু বাংলার শিক্ষক আন্দোলন সম্বন্ধে অ্যাকাডেমিক আলোচনা প্রায় হয়নি বললেই চলে, তাই বিষয়টির বিশ্লেষণ করতে আগ্রহান্বিত হয়েছি।

এটা আমরা জানি যে, বাস্তবিকপক্ষে শ্রমজীবী আন্দোলনের পরিধিতে শিক্ষক সংগ্রাম অন্তভুক্ত হতে পারে না। শিক্ষকতাকে অনেকেই একটি ব্রত বলে মনে করতেন. তা সত্ত্বেও মজুর শ্রেণির আন্দোলনের সঙ্গে শিক্ষকেরা কেন সহমর্মী হয়েছিলেন সে বিষয়টি আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের আকর্ষিত করেছে।

পূর্বে এই সম্বন্ধে অ্যাকাডেমিক গবেষণা প্রায় হয়নি। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন এই সম্বন্ধে তাদের পত্র-পত্রিকায় এবং দলিলপত্রে অনেক আকর তথ্য পেশ করলেও, তা কখনই সুবিন্যস্তভাবে আলোচনা হয়নি। বিশেষ করে আন্দোলনের পেশাগত ও রাজনৈতিক দিকটির কিছু কিছু আলোচনা হলেও ব্রত বা মিশন শিক্ষা আন্দোলনকে কতটা প্রভাবিত করেছে, আর্থ-সামাজিক ভাবে তো বটেই এমনকি মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এই আন্দোলন কতটা মধ্য শ্রেণির অন্যান্য আন্দোলনের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছিল, তা জানবার ইচ্ছা আমাদের এই গবেষণা কার্যে রত হওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ যুগিয়েছে। আন্দোলনের একটি পর্বে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনের সঙ্গে অন্ততঃ তত্ত্বগত ভাবে এই আন্দোলনের একটি সংযোগ ঘটেছিল। তা কি শুধুই তাত্ত্বিক না তার কিছু বাস্তব ভিত্তি ছিল, তা জানবার জন্যও উৎসাহিত হয়েছি আমরা। আধুনিক বাংলার মাদ্রাসা মক্তব বা পাঠশালা টোলকেন্দ্রিক ব্যক্তিগত উদ্যোগে গঠিত শিক্ষকতার কাজ কীভাবে ঔপনিবেশিক যুগে প্রথমে বেসরকারি ও পরে সরকারি ভাবে সংগঠিত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সংগঠিত শিক্ষক সত্তার জন্ম দিয়েছিল,—এই প্রথম এই পেশায় ব্রত ও

জীবিকার মধ্যে একটি সাযুজ্য স্থাপন করতে চেষ্টা করা হয়েছিল, তার আলোচনা শিক্ষক আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণে আমাদের প্ররোচিত করেছে।

আন্দোলনের একটি পর্বে মেহনতী মানুষ, ছাত্র এবং মধ্যবিত্তদের আন্দোলনের সঙ্গে অন্ততঃ তত্ত্বগতভাবে এই আন্দোলনের একটি সংযোগ ঘটেছিল। তা কি শুধুই তাত্ত্বিক, না তার কিছু বাস্তব ভিত্তি ছিল, তা জানার জন্য উৎসাহিত হয়েছি আমরা। আধুনিক বাংলার মাদ্রাসা বা পাঠশালা টোল- কেন্দ্রিক ব্যক্তিগত উদ্যোগে গঠিত শিক্ষকতার কাজ উপনিবেশিক যুগে প্রথমে বেসরকারি ও পরে সরকারিভাবে সংগঠিত শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয়েছিল। পরিবর্তিত এই শিক্ষাব্যবস্থায় কীভাবে সংগঠিত শিক্ষকসত্তার জন্ম দিয়েছিল, এই প্রথম কেমন ভাবে এই পেশায় ব্রত ও জীবিকার মধ্যে একটি সাযুজ্য স্থাপন করতে চেষ্টা হয়েছিল তার আলোচনায়, শিক্ষক আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণে আমাদের উৎসাহিত করেছে।

আমরা অনুসন্ধান করব স্বাধীনতা পূর্ব এবং স্বাধীনোত্তর বাংলায় কোন্ উপাদানগুলো শিক্ষক আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছিল। দেখা হবে বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যেই কেন শিক্ষক সমাজ আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানের সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলার শিক্ষক সমাজের কী ভূমিকা ছিল। দেখতে হবে শিক্ষক মনস্তত্ত্ব কীভাবে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বেড়াজাল ভেঙে সক্রিয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল। দেশভাগের পরে ওপার বাংলা থেকে আগত শিক্ষকেরা শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষক আন্দোলনে কি ভূমিকা নিয়েছিলেন? পরিশেষে আমরা দেখার চেষ্টা করব যুক্তফ্রন্ট ও বামফ্রন্টের আমলে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কতটা পরিবর্তন হয়েছিল। ৭০-এর দশকের প্রথম দিকে কীভাবে সব শিক্ষকের সংগ্রামের সাধারণ মঞ্চ, রাজনীতির কুম্ভিপাকে, শতধা বিভক্ত হল, অবসান ঘটলো একটি পর্যায়ের তাও আমাদের আলোচনায় আসবে।

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতের শিক্ষা কাঠামো ও শিক্ষক

প্রাচীন ভারত ঃ বৈদিক যুগের শিক্ষা

ভারতবর্ষের শিক্ষা বিস্তারের আনুপূর্বিক ইতিহাস এর একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা না জানা থাকলে, ঔপনিবেশিক যুগের শিক্ষা কাঠামোর হাল হকিকৎ সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়—তাই প্রথমেই প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগের সরণী বেয়ে কীভাবে আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার ধারা বয়ে গেছিল, তার একটি আলোচনা করা যেতেই পারে।

হরপ্পা যুগের শিক্ষার ইতিহাস আমাদের অজানা থাকলেও, সে যুগের 'Seal' গুলি দেখে, এটা আমরা বুঝতে পারি—যে তারা সাক্ষর ছিলেন। আর যে সভ্যতার মানুষ লিখতে পারে, তাদের মধ্যে কোন না কোন ভাবে, যে শিক্ষাধারা বর্তমান ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে উপযুক্ত সূত্র (sourcess) হারিয়ে যাবার ফলে, এ বিষয়ে বিশদ মন্তব্য করা সম্ভব নয়।

ভারতে শিক্ষা বিস্তারের আনুপূর্বিক ইতিহাস মোটামুটি ভাবে বৈদিক যুগ থেকেই জানতে পারা যায়। বৈদিক যুগে শিক্ষার উপর রাষ্ট্রিক কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না—সামাজিক প্রথা অনুযায়ী শিক্ষাক্রম চলত—ব্যক্তিগত উদ্যোগই সেখানে একটি বড় ভূমিকা গ্রহণ করত। একেবারে প্রাথমিক পর্বে এই যুগে পারিবারিক পরিমণ্ডলে বয়োঃজেষ্ঠ্যদের কাছ থেকেই বেদের শিক্ষা লাভ করত পড়ুয়ারা। পরবর্তী কালে সামাজিক পরিবেশ জটিল হয়ে পড়লে, এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষাদানের কাজ পরিচালনা করতেন। এগুলি সাধারণতঃ ছাত্রদের ব্রহ্মচর্য চলাকালনীন শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। সেই যুগে শিক্ষা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ছিল, উচ্চ ভাবাদর্শ সংরক্ষণ, চরিত্র গঠন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো। শিক্ষার্থীরা সেখানে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় দায় দায়িত্ব সম্বন্ধে শিখন লাভ করত।[১]

বাস্তবোচিত এই শিক্ষাক্রমের পাশাপাশি পরম ব্রহ্ম, পরম সত্তাকে উপলব্ধিকেও শিক্ষার চরম লক্ষ্য বলে মনে করা হত। সমাজের উচ্চ তিন বর্ণে উপনয়নের পর তার 'দ্বিতীয় জন্ম' হল বলে বিশ্বাস করা হত এবং এই পর্বে শিক্ষার্থীকে গুরুগৃহে শিক্ষালাভের জন্য যেতে হত। এই ভাবে শিক্ষার্থীরা পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় প্রকার শিক্ষায় শিক্ষিত হত।

বৈদিক যুগের একদম প্রাথমিক পর্বে প্রত্যেক পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ পুরুষ তাদের পুত্র/পৌত্রাদিকে বৈদিক ধাঁচের শিক্ষা দিতেন—এটা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। পরবর্তীকালে শিক্ষায় অগ্রবর্তী ঋষিরা শিক্ষাদানের এই দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। তারা স্ব-গৃহে সমাজের তথাকথিত তিন উচ্চবর্ণের সন্তানদের 'শিক্ষা' দিতেন। শিক্ষকই ছিলেন এই

শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রমণি। 'Bi-polar' শিক্ষা ধারা অর্থাৎ শিক্ষক- ছাত্রদের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের কোন প্রথা, সেইকালে ছিল না। গুরু মুখ নিঃসৃত 'বাণী' আয়ত্তীকরণ ও মুখস্থকরণই শিক্ষার্থীর একমাত্র কাজ। অজ্ঞান তিমির অশিক্ষার অন্তরাল থেকে জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়, ছাত্রদের অজ্ঞান মনকে মুক্ত করাই শিক্ষকের মূল কাজ ছিল, একজন শিক্ষা গবেষকের কথায় 'The teacher and the pupil were united by a common aim of preserving and propagating the saered learning and showing its worth in their life and conduct.'[২]

এত গেল 'বিদ্যা' সম্প্রদানের কথা, এখন প্রশ্ন হল, শিক্ষকের ব্রত এর পাশাপাশি তার জীবিকা নির্বাহ কি করে হত? আসলে ব্রহ্মচারী ছাত্রদের বাধ্যতামূলক শ্রমদান, গুরুর পার্থিব জীবন চালানোর অন্যতম আয়ুধ ছিল। শিক্ষার্থীরা গৃহস্থদের কাছ থেকে নিয়মিত ভিক্ষা সংগ্রহ করত। গুরুর শস্যক্ষেত্রে, চাষের কাজে, কাষ্ঠ সংগ্রহ করে, গুরুর দৈনন্দিন জীবিকার প্রয়োজন মিটাতো তারা। এছাড়া শিক্ষা সমাপ্ত করে, গুরু বা শিক্ষকের 'দাবি' মতো শিক্ষার্থীরা 'গুরু দক্ষিণা' দিতে বাধ্য থাকত। কোন নিয়মিত আয় ব্যতিরেকেই এই ব্যবস্থায় মসৃণ ভাবেই চলত শিক্ষকদের—অল্পে সন্তুষ্ট গুরুরাও 'Plain living and high thinking'-এর আদর্শে জীবন অতিবাহিত করত। অনেক সময়ই রাজনৈতিক সমাজের মধ্যমণি, রাজা বা অন্যান্য ধনাঢ্য ব্যক্তিরা বিভিন্ন গুরুর আশ্রম (যাকে আমরা আধুনিক বিদ্যালয় ব্যবস্থার পূর্বসূরি বলতে পারি) সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য অর্থ ও অন্যান্য সম্পদ দান করতেন। প্রসঙ্গত সেই সময় সীমিতভাবে হলেও, নারী শিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। এমনকি গুরুর বা শিক্ষকের পদও মহিলারা গ্রহণ করতেন। এই মহিলা শিক্ষকদের ঋষিকা বা ব্রহ্মবাদিন বলা হত।[৩]

পরবর্তী বৈদিক যুগে (1000 BC–600 BC) প্রচলিত শিক্ষাধারার মধ্যে মূলগত ভাবে না হলেও, বাহ্যিক ভাবে কিছু পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি। তখন পার্থিব জ্ঞান লাভের তুলনায়—পারমার্থিক জ্ঞান লাভের উপরই মূলতঃ গুরুত্ব আরোপ করা হত। সেই সময় শিক্ষকোচিত 'গুণ' হিসাবে 'গুরু'র বিদ্যাবত্তা, দূরদৃষ্টি ও বৌদ্ধিক মান-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। সেই সব ছাত্রই গুরুর আশ্রমে বিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রবেশ অধিকারী ছিল, যাদের প্রাথমিক স্তরে একটা ন্যূনতম 'শিক্ষা' থাকত। তারা আগের মতোই বিদ্যা শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষকের দৈনন্দিন জীবিকা সংক্রান্ত কার্যাবলীতে সহায়কের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য থাকত।

পরবর্তী বৈদিক যুগে শিক্ষক বা গুরুর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য একটি প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা যেতেই পারে। সেটি হল সেই সময়ে শিক্ষক গুরুরা শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশে বাধা নিষেধ উঠিয়ে যত বেশি পারা যায় ছাত্র সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এই বিষয়ে গুরুদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও বর্তমান ছিল বলে তৈত্তরীয় উপনিষদে উল্লেখ আছে।[৪]

প্রাথমিক বৈদিক যুগের মতো এই যুগেও ছাত্রদের দৈনিক গ্রাসাচ্ছাদনের কাজে গুরুকে তার জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে হতো। পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের গুরু প্রদত্ত কাজ হিসাবে গোপালন, চারণ, যজ্ঞের সমিধ রূপ কাষ্ঠ সংগ্রহ প্রভৃতি করতে হতো। প্রাথমিক

বৈদিক যুগের মতো গুরু কর্তৃক প্রদত্ত 'বেদবাণী' সমূহ শ্রবণ করা ও ক্রমশঃ তা মুখস্থ করানোর কাজেই শিক্ষকরা ব্রতী হতেন।

সাধারণভাবে 'বিদ্যা বিক্রয় যোগ্য নয়' বলা হলেও পরোক্ষ ভাবে শিক্ষাদানের বিনিময়ে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করতেন গুরু বা শিক্ষকেরা। গুরু গৃহেই ছিল তখনকার যুগে 'বিদ্যালয়' যা সাধারণ ভাবে 'গুরুকুল' বলে পরিচিত ছিল। পরবর্তী আর্য যুগে বিশিষ্ট গুরু-শিক্ষকেরা অনেক সময়ই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তর্ক সভা আহ্বান করতেন। সেখানে যেমন একদিকে বিভিন্ন জটিল তত্ত্বের সামগ্রিক বিশ্লেষণ করা হতো তেমনি তুলনামূলক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ হবার বাসনায় পারস্পরিক মতভেদ জনিত বিষয় নিয়ে তর্কযুদ্ধ সংগঠিত হত। স্বাভাবিক ভাবেই এই বিষয়ে যে শিক্ষকের যুক্তি শেষ পর্যন্ত গৃহীত হতো—তার খ্যাতির সৌরভ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। পরোক্ষে এর ফলে তাদের আশ্রমে 'ছাত্র' বা শিষ্যদের ভীড় বৃদ্ধি পেত এবং এর ফলস্বরূপ অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নও হতো গুরুদের। ছান্দোগ্য উপনিষদে এবং শতপথ ব্রাহ্মণে এই ধরনের তর্ক সমাবেশের উল্লেখ আছে।[৫] এইসব সভায় উপস্থিত থেকেও গুরু শিক্ষকেরা রাজা কর্তৃক প্রদত্ত ধনসম্পত্তির অধিকারী হতেন। যা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিরই সূচক ছিল।

এই সময়কালেই সূত্র সাহিত্যের জন্ম, চার বেদের জটিলতা পূর্ণ বাক্যবন্ধ অতিক্রম করে, যুগের প্রয়োজনে ব্রাহ্মণ্যবাদী পণ্ডিতেরা এই সাহিত্যের জন্ম দিয়েছিলেন। ধর্মকে কিছু নীতির পরিবাহক বলেই শাস্ত্রবিদ গুরুরা প্রচার কার্যে লিপ্ত হয়েছিলেন। শিক্ষকদের দৈনন্দিন জীবন জীবিকা নির্বাহে সক্রিয় থাকা এই ধরনের শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী অংশ ছিল। যে সমস্ত ছাত্ররা গুরুদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রতি তাচ্ছিল্য ও জীবন জীবিকার সহায়ক হত না, এবং স্ব-স্বার্থে মাঝে মাঝেই শিক্ষক পরিবর্তন করত, সেই সময় এই সমস্ত ছাত্রদের তীর্থকাক বলে তিরস্কৃত হতে হতো। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে সূত্র যুগেও শিক্ষকগুরুরা নিজেদের আধুনিক ও আর্থ-সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই বলে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক সেই সময়ে স্বার্থের বন্ধনেই বাঁধা ছিল একথা মনে করলে ভুল বলা হবে। তাঁরা নিজ গৃহে যত্নের সঙ্গে ছাত্র-শিষ্যদের শিক্ষাদান করতেন। তাদের ব্যবহারিক কাজে গুরুরা ছাত্রদের সাহায্য নিলেও, পাঠাভ্যাসের নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রদের পাঠে কোন বিঘ্ন ঘটতে দিতেন না তারা। আগের মতোই অবশ্য শিক্ষককে গুরু দক্ষিণা দেওয়ার রেওয়াজ বহাল ছিল। নির্দিষ্ট অর্থ সম্পদ বা সুযোগ সুবিধার জন্য যেসব শিক্ষক ছাত্রদের বিদ্যা দান করতেন সমাজ তাদের নিন্দার চোখে দেখত—তাদের 'উপৎকিন বা বৃত্তিকা' বলে নিন্দিত হতে হতো। সেই সময়ে শিক্ষকদের সাধারণ ভাবে তিন ভাগে বিভক্ত করার প্রথা প্রচলিত ছিল। এঁদের মধ্যে যজুঃজ্ঞানসটিকারা ছিলেন সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত—বহুদূর দূর প্রান্ত থেকে ছাত্ররা তাঁদের পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসত। উপাধ্যায় শ্রেণির শিক্ষকেরা শিক্ষাকে আধুনিক যুগের মতো একটি বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করতেন। তারা ছাত্রদের কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট অর্থে বিনিময়ে শিক্ষাদান করতেন। আবার 'আচার্য' শ্রেণির শিক্ষকেরা বিনা পারিশ্রমিকে সেবাব্রত হিসাবে ছাত্রদের শিক্ষাদান কার্যে নিরত থাকতেন।

অবশ্য ছাত্ররা শিক্ষান্তে গুরু দক্ষিণা হিসেবে স্বপ্রবৃত্ত হয়ে জমি, গবাদি পশু, অলঙ্কার, বস্ত্রাদি প্রদান করতেন।[৬]

এই সময়েই কিন্তু 'অক্ষর মালার' উদ্ভাবন হওয়ার ফলে, শ্রুতি নির্ভর পাঠদানের বদলে সত্যিকারের 'লেখাপড়ার' প্রচলন হয়েছিল। বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষকতা, প্রশাসন, বিচার, রাজসভার কার্যে এই অক্ষর পরিচয় সম্পন্ন ছাত্রদের যথেষ্ট কদর ছিল। সেই দিক থেকে এই যুগের শিক্ষা আর্থিক ও পারমার্থিক দুই দিক থেকেই লাভদায়ক ছিল শিক্ষক ও ছাত্র উভয় পক্ষেই।

শিক্ষা—মহাকাব্যের যুগ ও বৌদ্ধযুগ

রামায়ণ ও মহাভারতের কালে অর্থাৎ পৌরাণিক যুগের শিক্ষা-শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্বন্ধে অনেক কথাই আমরা জানতে পারি। ওই যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রিজাতির জন্য ত্রিবিধ প্রকার শিক্ষা বা শিক্ষার বিশেষীকরণের অনেক প্রমাণ আমরা পাই। এই সময় ছাত্ররা গুরু বা শিক্ষকের আজ্ঞানুবর্তী হয়ে তাত্ত্বিক বিদ্যা শিক্ষা বা অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত হত—আধার অনুযায়ী। সেই সময়ে 'পরিষদ' নামে এক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথাও আমরা জানি। যেখানে আধুনিক বিদ্যালয় ব্যবস্থার মতো, বিভিন্ন শিক্ষক দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা ছিল।[৭] বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় প্রতীম প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সেই সময়ে লক্ষ্য করা যায়।

এই বিদ্যালয়গুলি পৌরাণিক যুগে 'আশ্রম' নামে অভিহিত হত।[৮] বিশেষ বিশেষ বিদ্যা যথা অপরাবিদ্যা কিংবা শিল্প শিক্ষার বিশেষ আশ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়। পৌরাণিক আশ্রমগুলির মধ্যে ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম এবং ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের আশ্রমের কথা আমরা পৌরাণিক সাহিত্য থেকে জানতে পারি। তবে সেই সময়কার সবচেয়ে বিখ্যাত বিদ্যালয় প্রতীম 'আশ্রম' ছিল নৈমিষারণ্যে অবস্থিত 'নৈমিষ' আশ্রম—যার প্রধান ছিলেন শৌণক মুনি। এখানে প্রায় দশ হাজার ছাত্র এবং বহু বিখ্যাত শিক্ষক একত্রে জ্ঞানের চর্চায় নিরত থাকতেন। এ প্রসঙ্গে কুরুক্ষেত্রে অবস্থিত একটি আশ্রমের কথা উল্লেখ করতে পারি। এখানে শিক্ষার্থিনী হিসাবে দুইজন মহিলা পঠন পাঠনে নিয়োজিত ছিলেন।[৯] এই ধরনের আশ্রমগুলির পাশাপাশি সামরিক ও Public School-এর অস্তিত্বও তখন ছিল। এছাড়া বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সন্তানদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ও সেই সময় পরিলক্ষিত হয়।[১০]

এর পরবর্তী বৌদ্ধ যুগের শিক্ষা ভারতের শিক্ষা ইতিহাসে স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল ছিল। বুদ্ধদেবের জীবন সংক্রান্ত জাতকের কাহিনিগুলি থেকে সেই যুগের শিক্ষার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। বৌদ্ধ যুগে মূলতঃ বৌদ্ধমঠ ও বিহারগুলি ছিল বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র। বাস্তবিক পক্ষে এই যুগেই শিক্ষাধারা ব্যক্তিগত শিক্ষালয় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। বৈদিক যুগের উপনয়নের সমতুল্য প্রবজ্জা'র মধ্য দিয়ে এই যুগে শিক্ষালাভ এর সূচনা হত। আর উপসম্পদার মধ্য দিয়ে পাঠ্যক্রমের বৃত্ত পরিসমাপ্তি। ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার ঠিক বিপরীতক্রমে, জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বৌদ্ধ শিক্ষাপীঠ সব ছাত্রদের কাছেই উন্মুক্ত থাকত।

বৌদ্ধ শিক্ষাধারায় দুই শ্রেণির শিক্ষকের অস্তিত্ব আমরা লক্ষ্য করি—উপাধ্যায় এবং আচার্য। উপাধ্যায়রা মূলতঃ তরুণ 'ভিক্ষুদের' বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত 'জ্ঞান' বিতরণ করতেন। আচার্যরা উপাধ্যায়দের তুলনায় প্রাথমিক স্তরের ধর্ম ও দর্শন শিক্ষা দিতেন।[১১]

দুই ধরনের শিক্ষকদেরই কঠোর পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক পদে নির্বাচিত করা হত। বৌদ্ধ ভিক্ষুক শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র শুকনো বিদ্যাচর্চায় সময় অতিবাহিত করতেন—এমন নয়। প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হবার পর, স্নান সমাপ্তির পর শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই মাধুকরিতে লিপ্ত হতেন। গ্রাসাচ্ছাদনের ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন সাবলম্বী। শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক সেই যুগে এতটাই ঘনিষ্ঠ ছিল যে পাঠদানের পাশাপাশি শিক্ষকরা অসুস্থ ছাত্রদের সেবা ও পরিচর্যা করতেন। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেমন বৌদ্ধ শাস্ত্ররাশির অধ্যয়ন অধ্যাপনার কাজ চলত, তেমনি তার পাশাপাশি ছাত্রদের আধ্যাত্মিক চেতনা অর্জনের সঙ্গে আগামী দিনে তার জীবিকা নির্ধারণের জন্য পার্থিব বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। বৌদ্ধ ধর্ম ও শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে ক্রমশঃ গড়ে উঠেছিল নালন্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমশীলার মতো মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয় তুল্য প্রতিষ্ঠানসমূহ। প্রসঙ্গত এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ছিল তৎকালীন বৃহৎ বঙ্গের মধ্যেই।

এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ হিসাবে আমরা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবস্থান ও অবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতেই পারি। কেননা বৃহত্তর বঙ্গের এই প্রতিষ্ঠানটির খ্যাতির সৌরভ একদিন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। একটি হিসাব অনুযায়ী নালন্দা বিহারে স্থায়ী বসবাসকারি ১,৫১০ জন শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১০,০০০-এ।[১২] এই বিহারের বিখ্যাত শিক্ষক গুরুদের অন্যতমরা ছিলেন আর্যদেব, ধর্মপাল, শীলভদ্র, চন্দ্রকীর্তি পদ্মসম্ভব, বুদ্ধকীর্তি প্রমুখ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মতে শিক্ষকদের কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে দিনাতিপাত করতে হত। প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কোন গুরুতর পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হত গণতান্ত্রিক ভাবে—সমবেত গুরুকুলের উপস্থিতিতে। এছাড়া বাংলার বিক্রমশীলা মহাবিহারে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়টিও গুণে মানে ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়টির ছয়টি বিভাগ ছিল। প্রতি বিভাগে প্রায় ১০৮ জন অধ্যাপক-শিক্ষক পাঠদানে নিরত থাকতেন। 'দ্বার পণ্ডিত' নামে খ্যাত শিক্ষকদের একটি গোষ্ঠী নবাগত তরুণ শিক্ষার্থীদের মেধা পরীক্ষা করে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের যোগ্য বিবেচনা করলেই একমাত্র প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থী হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া যেত।[১৩]

এই দুই স্বনাম খ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও পূর্ব ভারতের ওদন্তপুরি, মিথিলা এবং বিশেষ করে বাংলার নবদ্বীপ অঞ্চলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিদ্যাবত্তার কারণে বর্ধমান সামাজিক সম্মান সম্বন্ধে দেশবাসী যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন ছিল। নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসাবে প্রথম উদ্ভাসিত হয়েছিল পালযুগে, এবং সেনযুগে তার সমৃদ্ধির সৌরভ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং এই খ্যাতির পিছনে ছিল সেখানকার শিক্ষক সমাজের বিদ্যাবত্তার বিতরণের খ্যাতি।

সাধারণতঃ 'ব্রহ্মসত্য/জগৎ মিথ্যার দেশে', আমাদের গুরুকুলকে প্রাক্ ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক যুগের প্রারম্ভে শিক্ষকতা একটি সেবাব্রত—শুধুমাত্র এই আংশিক ধারণা ছড়িয়ে

দিয়ে জীবন ও জীবিকার অর্জনের ক্ষেত্রে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছিল—কিন্তু প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-শিক্ষক-শিক্ষার্থী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ সম্বন্ধে আলোচনান্তে, আমরা দেখতে পাই—একদিকে যেমন তৎকালীন শিক্ষকেরা শিক্ষকতাকে অবশ্যই 'সেবা' বলে মনে করতেন। কিন্তু তার পাশাপাশি নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের জন্য একটি জীবিকা হিসাবেই গণ্য করতেন। এ প্রসঙ্গে তাই বলা যেতেই পারে, আমাদের দেশে, বিশেষ করে এই বাংলায় জীবন জীবিকার স্বার্থে যে শিক্ষক আন্দোলন ঔপনিবেশিক যুগে শুরু হয়েছিল, তার মূল ছিল অনেক গভীরে। প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলেই আমরা দেখতে পাবো সংগঠিতভাবে শিক্ষকরা জীবিকা সম্বন্ধে সচেতন না থাকলেও (সে যুগে তা সম্ভবও ছিল না) ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক শিক্ষক গুরুই তাঁর সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। মুখি জাতক অনুযায়ী 'যে ছাত্র বেতন দিতে পারে, সে ছেলের মতো থাকে গুরুগৃহে, আর যে তা পারে না সে চাকরের মতো থাকে।'[১৪]

এবার কেন্দ্র ঃ বাংলা

নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) থেকে আমরা, চিনা পর্যটক ইৎসিং-এর একটি বিবরণ পাই, সেখানে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

পাল আমলে প্রচুর পণ্ডিত শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। এরকম কয়েকজন শিক্ষকদের মধ্যে আমরা দর্ভ পাল, কেদার মিশ্র, গুরু মিশ্রের অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা জানতে পারি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নিজ গৃহে বা মন্দিরে চতুঃষ্পাঠী স্থাপন করে, শিক্ষা দান করতেন।[১৫] বিদ্যালাভ ও দানের উদ্দেশ্যে বাঙালিরা নানা দূরস্থানে যেতেন—যেমন কাশ্মীর। বৌদ্ধদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথা তো আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। নালন্দা সহ প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই নিজস্ব 'কৃষিজমি' থাকত। তাতেই শিক্ষালয়ের দৈনন্দিন ব্যয় ও শিক্ষকদের গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করা হত। চৈনিক পর্যটক ইৎসিং অবশ্য লিখে গিয়েছেন, 'বুদ্ধ, ভিক্ষুদের পক্ষে চাষবাসের কাজ নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই জন্য তাহারা বিহার বা ভিক্ষুসংঘের কৃষিভূমি বিনা করে অন্যকে চাষবাস করিতে দিতেন এবং পরিবর্তে উৎপাদিত শস্যের অংশমাত্র গ্রহণ করিতেন। তাহার ফলে তাহারা সাংসারিক চিন্তা হইতে মুক্ত থাকিতেন। গৃহীভক্ত ও উপাসকের নিকট হইতে তাহারা নানা প্রকারের দানও গ্রহণ করিতেন। আহার্য গ্রহণেও কাহারও কোন আপত্তি ছিল না।"[১৬]

পরবর্তীকালের সেন যুগেও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা—ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। বল্লাল সেন নিজে একজন পণ্ডিত হবার ফলে, তিনি যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষক-পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ব্যাকরণ, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ও স্মৃতি শাস্ত্রের বহুল চর্চা হতো সেই সময়ে বৃহত্তর বঙ্গে। শিক্ষকদের জীবন নির্বাহের জন্য ভূমি দানের প্রথা প্রচলিত ছিল। দশম শতাব্দীর প্রাচীন বাংলার একটি 'পট্টোলী' দ্বারা, শিক্ষকদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ভূমিদানের কথা উল্লেখ আছে। তথ্য থেকে জ্ঞাত হওয়া যায়, 'পুণ্ড্রবর্ধন—বঙ্গ সমতটাধিপতি....মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র দেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে পট্টীকৃত একটি ভূমিদান পট্টোলী'

থেকে। পট্টোলীটি পাওয়া গেছে শ্রীহট্ট জেলার পশ্চিম ভাগ গ্রাম থেকে। সেজন্য পট্টোলীটি পশ্চিম ভাগ পট্টোলী নামে খ্যাত হয়েছে।[১৭] এই ভূমিদান থেকে আমরা জানতে পারি চার বেদের বিভিন্ন শাখার ছাত্র ও অধ্যাপকদের ব্যয় নির্বাহের জন্যই এই ভূমিদান করা হয়েছিল। এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসে, যে অনেক পরের 'বুনোরামনাথ'-এর মতো জীবন জীবিকা বিষয় আশয় নিয়ে সকল পণ্ডিত বা শিক্ষক নিস্পৃহ ছিলেন, তা নয়—আর তথাকথিত এই নিস্পৃহতা কাম্যও ছিল না—অন্যান্য জীবিকার মানুষদের মতো ব্যক্তি এবং পরিবারের সদস্য হিসাবে, শিক্ষকদেরও অর্থোপার্জনের প্রয়োজন হত। প্রাচীন বাংলায়ও তার ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। তখনও বিদ্যাবত্তার প্রতি নিবেদিত প্রাণ শিক্ষকেরাও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে তৎপর ছিলেন। আমরা আমাদের বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের ভিতরে যখন আরো প্রবেশ করবো, তখন দেখবো, আধুনিক যুগের শিক্ষকদের মতো, প্রাচীন বা আদি মধ্যযুগেও শিক্ষকেরা তাঁদের বৃত্তিগত জীবিকা অর্জনের জন্য যথেষ্ট তৎপর ছিলেন।

মধ্যযুগ ঃ শিক্ষা

আরবীদের হাত ধরে তুর্কীরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করলে এবং শাসন ক্ষমতা তাঁদের কুক্ষিগত হলে, ভারতের তথা বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি ভাঙা-গড়ার পর্বের সূচনা হয়। পুরনো ঐতিহ্যের টোল পাঠশালার মহতি বিনষ্টি না হলেও, নতুন ধরনের 'ঐস্লামিক শিক্ষা ব্যবস্থা'র প্রচলন হয় আমাদের দেশে।

ইসলাম ধর্ম প্রাথমিক ভাবে মানুষের, জ্ঞান অর্জনকে অর্থাৎ শিক্ষাধারার প্রসারসাধনকে গুরুত্ব দেয়। কোরাণ অনুযায়ী জ্ঞানী মানুষের স্থান ঠিক মহান 'আল্লাহ' এর নিচে। ইসলাম ধর্মের প্রবক্তা হজরত মহম্মদ মনে করতেন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলমানেরই জ্ঞান সঞ্চয় করাা আবশ্যিক কর্তব্য—এই জ্ঞান অর্জনের জন্য দরকার মতো চিনের মতো দূর দেশে যাওয়া যেতে পারে বলে হজরত মহম্মদ মনে করতেন।[১৮] ব্যবহারিক দিক থেকে তাত্ত্বিক জ্ঞানকে ব্যবহার করার দিকেও ইসলাম ধর্মের নজর ছিল। এইসব কারণেই অন্যান্য দেশের মতো ভারতের নতুন ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসকেরাও মনে করতেন শিক্ষক যারা, তারাই সমাজের সর্ব উচ্চ থাকের মানুষ। তাই ভারতের মধ্যযুগের ইসলামীয় সমাজে শিক্ষকদের সামাজিক সম্মান যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান ছিল। এটা ঠিকই ভারতের প্রাচীন যুগের মতো অতটা সচ্ছল হয়তো মধ্যযুগের শিক্ষকেরা ছিলেন না—তবুও অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি অন্তত প্রাথমিক পর্বে মসজিদ সংলগ্ন হওয়ায়, সেখানে আগত পুণ্যার্থীদের দানে তৎকালীন শিক্ষকদের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন অভাব থাকত না। শাসক শক্তিও অনেক সময় এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করতেন। এরা জাকাতের অংশও পেতেন বহুলাংশে। ঐস্লামিক শিক্ষা প্রাথমিক ভাবে কোরাণ বা হাদিস নির্ভর হলেও ক্রমশ অন্যান্য পার্থিব শিক্ষার ধারাও মধ্যযুগে স্থাপিত মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্র বা মাদ্রাসা/মক্তবে স্থান পেয়েছিল। বিশেষ করে ব্যাকরণ ও গণিত শিক্ষার প্রতি মধ্যযুগের ভারতে এই সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্র জোর দিত। সুফি সন্তদের খানকাগুলিও শিক্ষা প্রসারে যথেষ্ট সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কখনো কখনো ধনাঢ্য ব্যক্তিরা স্ব-গৃহেই বেতনের বিনিময়ে মৌলভী বা শিক্ষক নিয়োগ করে শিক্ষা বিতরণের ব্যবস্থা করতেন।[১৯]

শুধুমাত্র ধর্মশিক্ষা নয়, ব্যবহারিক কাজের বিশেষ করে সরকারি কর্মে নিয়োজিত হবার প্রস্তুতি হিসাবে সেই সময়ে সাহিত্য, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস, জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চাও হতো এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এটা অস্বীকার করা ঠিক হবে না যে প্রাচীন যুগে শিক্ষা মূলতঃ সমাজের উচ্চবর্গের মানুষেরই আয়ত্তাধীন ছিল। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরাও মূলতঃ আসত এই উচ্চবর্গীয় গোষ্ঠীগুলি থেকে। একলব্য বা সত্যকাম ব্যতিক্রম ছিল মাত্র। বেদপাঠরত শূদ্র শম্বুকের পরিণতির কথাও আমরা সবাই জানি। মধ্যযুগে কিন্তু এর বিপরীতক্রমে মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষালয়গুলিতে সমাজের তথাকথিত অন্তজ শ্রেণির শিক্ষার্থীরাও শিক্ষা লাভের সুযোগ পেত। প্রাচীন যুগের মতো জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণদের শিক্ষাক্রমে নিয়োজনের পরিবর্তে মধ্যযুগে জন্মসূত্রে চামার, জোলা, কসাই, গোচারণকারী প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষদেরও শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত হবার উদাহরণও পাওয়া যায়।[২০]

ক্রমশঃ বিভিন্ন সময় পর্বে ব্যক্তিগত পরিসর ছেড়ে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে দেশের সর্বত্র ঐস্লামিক শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে দিল্লী, জৌনপুর, মাণ্ডু, আহমদাবাদ, বীজাপুর, হায়দ্রাবাদে মাদ্রাসাসমূহ স্থাপিত হয়। বাংলার গৌড় এবং পাণ্ডুয়াতে ও ত্রিবেণীতে সমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে সুলতানি যুগে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক যথেষ্ট পরিমাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। শুধুমাত্র বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন নয়—এর পাশাপাশি বছরে প্রায় ছত্রিশ লক্ষ তঙ্কা তিনি শিক্ষা প্রসারে ও শিক্ষকদের বেতন ইত্যাদিতে ব্যয় করতেন।[২১] তাঁর আমলে প্রায় ত্রিশটি কলেজ স্থাপিত হয়েছিল।

সুলতানি সাম্রাজ্যের ভগ্নপ্রায় শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে যখন মুঘল শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হল—তখনও কিন্তু ভারতের চিরাচরিত শিক্ষা ব্যবস্থা তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। শিক্ষক কুলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্মান বজার রাখার স্বার্থে মুঘল বাদশাহেরা ব্যক্তিগত ভাবে ধনসম্পদ তো দান করতেনই, এর পাশাপাশি শিক্ষকদের জায়গীর দানেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।[২২] প্রাথমিক মুঘল শাসকদের প্রায় সকলেই অর্থাৎ বাবর, হুমায়ুন প্রভৃতি শাসকেরা এক বা একাধিক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আকবর শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এক অগ্রদূতের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিলেন এমন নয়—এর পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বস্তুগত ও ব্যবহারিক শিক্ষা যথা গণিত, ভূগোল, নীতিশাস্ত্র, গৃহবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি পঠন পাঠন চালু করতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি হিন্দু নিয়ন্ত্রিত সংস্কৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিও তার প্রেরণায় ব্যাকরণ, ন্যায় এবং পতঞ্জলির আয়ুঃবিজ্ঞান পঠন-পাঠন শুরু হয়েছিল। তার সময়েই মুসলিম নিয়ন্ত্রিত মাদ্রাসা ও মক্তবে হিন্দু ছাত্ররা প্রবেশাধিকার পায়—এর ফলে রাজভাষা ফার্সী শিখে, তাদের পক্ষে মুঘল প্রশাসনে উচ্চ পদ লাভ করা সহজসাধ্য হয়। অনেক মুসলিম শিক্ষার্থীও এই সময় সংস্কৃত ভাষার চর্চা শুরু করে। এর ফলে সংস্কৃত ভাষার আকর গ্রন্থগুলি ফারসি ভাষায় অনুবাদ-এর কাজ অনেক গতিশীল হয়। সেই সময়ে দিল্লী, আগ্রা, লখনৌ, মুসলিম ধাঁচের শিক্ষা ব্যবস্থা ও বারানসী, মিথিলা বা আমাদের বাংলা হিন্দু ধাঁচের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণ কেন্দ্র ছিল।

বাংলায় পরবর্তী মধ্যযুগের শিক্ষা ও শিক্ষক

এবার 'সাধারণ' ভারতবর্ষের অলোচনা করে আমাদের 'বাংলার' বিশেষ শিক্ষা এবং তার কর্ণধার তুল্য শিক্ষকদের কথায় আসি। বাংলায় সুলতানি শাসন শুরু হবার পূর্ববর্তী পর্বে বাংলার শিক্ষাদীক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে আমরা খুব কমই জানি। দশম-দ্বাদশ শতকের চর্যাপদ এবং তেরো-চৌদ্দ শতকের বড়ুচণ্ডী দাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ছাড়া এ সময়কার সাহিত্যে প্রতিফলিত 'শিক্ষাধারার কায়া স্বরূপ' জ্ঞাত হওয়া যথেষ্ট শক্ত। তবে পরবর্তী পর্বের মঙ্গলকাব্য বা চৈতন্য সাহিত্য থেকে, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর সাধারণ মানুষের জীবনধারা সম্পৃক্ত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষকদের অবস্থান সম্পর্কে কিছুটা স্পষ্ট ধারা আমরা পেয়ে থাকি।[২৩]

বাংলায় আদি মধ্যযুগে হাতেখড়ির উল্লেখ আছে। যে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হবু ছাত্রকে প্রথম লেখনী হাতে ধরিয়ে শিক্ষালাভ এর সূচনা ঘটাতেন—তারা নিশ্চিত ভাবে টাকা পয়সা বা চালটা কলাটা দক্ষিণা হিসাবে পেতেন—যাকে বলা হত 'সিধা'। জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল কাব্য থেকে আমরা জানতে পারি যে চৈতন্য যুগে বাংলায় এই হাতে খড়ি বা বিদ্যারম্ভের আনুষ্ঠানিক প্রথাটির প্রধান উদ্‌গাতাই ছিলেন গুরু বা শিক্ষকরা। এর পরবর্তী শতকে বাংলায় মুসলিম জনসংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল—হিন্দু প্রতিবেশীদের প্রভাবে মুসলিম শিশুদের চার, বৎসর, চারমাস, চারদিন বয়ঃক্রম হলে, বিসমিল্লা সংস্কার অনুষ্ঠিত হত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত থেকে আমরা জ্ঞাত হই, যে 'গঙ্গাদাস-পণ্ডিত স্থানে পড়ে ব্যাকরণ/শ্রবণমাত্র কণ্ঠে কইল সূত্রবৃত্তি গণ।'[২৪]

এই বর্ণনা থেকে সহজেই বোঝা যায়, সেই সময় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিদ্যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা টোলের অস্তিত্ব ছিল, তবে যে সব শিক্ষক বেতনের বিনিময়ে পড়াতেন—সমাজ কিছুটা নিচু চোখেই তাঁদের দেখত—এই ধরনের পণ্ডিতদের বলা হতো উপাধ্যায়—আচার্য নামে এক শ্রেণির পণ্ডিতদের কথা আমরা আলোচ্য যুগে পাই, যাঁরা বিনা বেতনে ছাত্র পড়াতেন—অবশ্য পঠন সমাপনান্তে তাদের গুরুদক্ষিণা দিতে হত ছাত্র-পড়ুয়াদের। আধুনিক দৃষ্টিতে অবশ্যই এই দুই শ্রেণিভুক্ত শিক্ষকেরাই জীবিকা অর্জনের জন্য ছাত্রদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন—তাদের শ্রমের মূল্য তারা দুই ভিন্ন ভাবে সংগ্রহ করতেন, এই মাত্র।[২৫]

বাংলার মধ্যযুগে কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ ও কাশিরাম দাসের মহাভারত থেকে আমরা বাংলা দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও তৎসংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অবস্থা সম্বন্ধে জানতে পারি। রামায়ণে রামচন্দ্রের বিদ্যাভ্যাস প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, 'পঞ্চবর্ষ গত হয় হাতে দিল খড়ি/পড়িতে পাঠাল রাজা বশিষ্ঠের বাড়ী'। এর থেকে আমরা অনুধাবন করি যে, সেই সময়েই ব্যক্তি পণ্ডিতের স্বনিয়ন্ত্রিত পাঠশালাগুলিই বাংলার শিক্ষা ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করত। সংগঠিত কোন বিদ্যা প্রতিষ্ঠানের কথা তেমন নেই। ফলে শিক্ষকদের সংগঠিত হবার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। সমাজের তথাকথিত উচ্চতব বর্ণের বিদ্যা শিক্ষার বিক্ষিপ্ত বিবরণ, চৈতন্য সাহিত্য ও রামায়ণ, মহাভারতে থাকলেও, সর্ব সাধারণের শিক্ষাকাঠামোর একটি রূপরেখা আমরা মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল বা ধর্মমঙ্গলের মতো মঙ্গলকাব্যসমূহ থেকেই প্রাপ্ত হই। মনসামঙ্গলে চাঁদ বণিকের পুত্র লখিন্দরের বিদ্যাশিক্ষা

বর্ণনা করা হয়েছে—'পঞ্চ বৎসরে বালা কর্ণ বেধ করে/পঢ়িবারে ছিল বালা গুরু বিদ্যমানে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে অব্রাহ্মণ ছাত্রদের গুরুমশাই নিয়ন্ত্রিত পাঠাশালায় পড়বার বন্দোবস্ত সেযুগে ছিল।[২৬] মনসামঙ্গলের বিভিন্ন সংকলনেও আমরা পাঠশালার উল্লেখ পাই—'রাজপুত্র মুণিপুত্র পড়ে পাঠশালে'—এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, যে তৎকালীন পাঠশালায় বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই পঠন-পাঠনের অধিকারী ছিল। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম-এর চণ্ডীমঙ্গলে, বলা হয়েছে, শ্রীমন্ত অর্থাৎ কাব্যের নায়ক 'গুরু বাক্যে দিয়া কর্ণ/চিনিল অনেক বর্ণ/পড়িল শুনিল সুলক্ষণ।'[২৭]

পরবর্তীকালে মুসলিম সভ্যতা বঙ্গদেশে তার প্রভাব ছড়িয়ে দেবার ঊষাকালে মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদ্মাবতীর শিক্ষার বর্ণনা আছে—এই বর্ণনা পঞ্চদশ শতকের। তবে দেশীয় বংশ উদ্ভূত মুসলিম বালকেরা পাঠশালায় প্রবেশের অধিকারী হত। বাহরাম খাঁ রচিত লায়লা মজনু কাব্য থেকে আমরা ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরও পাঠশালা শিক্ষার একটি সুন্দর চিত্র পাই,—'সেই উদ্যানে গিয়া কত্রস সুমতি/গুরুপদ ভজিয়া পড়এ প্রতিনিধি/....সেই পাঠাশালাতে পড়ত্র কত বালা/সুচরিতা সুললিতা নির্ম্মলা উজ্জ্বলা।[২৮]

'চিঠিপত্র সমাজ চিত্র' নামক গ্রন্থে পঞ্চানন মণ্ডল লিখেছেন, সেখ কালাচাঁদ নামে জনৈক ব্যক্তি তার দুই পুত্রকে সনাতন সরকার নামক এক শিক্ষকের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন—যা অনুযায়ী আট আনা মাসিক বেতন ও খোরপোষ সহ মোট দক্ষিণা টাকার বদলে 'পাটহরফ খাতাসোহী ও হিসাব নিকাশী কর্ম্মে তৈয়ার করিআ...' দিতে শিক্ষক অঙ্গীকার করেন। শিক্ষক-এর জবানিতে '...আমার একবার ত্বক মাহীনে লৈইব কিম্বে এই কর্মে আমার গাফিলি তবে আমি এই চুক্তীর টাকায় বাদ দীব।[২৯]

আমরা এই অভিভাবক শিক্ষক চুক্তি পর্যালোচনা করে বলতেই পারি যে ক্রমশঃ শিক্ষা, ব্রতের ঘেরাটোপ মুক্ত হয়ে দেওয়া নেওয়ার জীবিকায় পরিণত হচ্ছিল। পাঠশালা শিক্ষায় এই মত খোলাখুলি না হলেও, বেতন বা 'সিধে' উপরই উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা জীবিকা অর্জন করত—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ধরনের পাঠশালা বা মাদ্রাসা/মক্তবে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কেমন ছিল। স্বাভাবিকভাবেই আধুনিক 'Bi-polar' শিক্ষার অস্তিত্ব তখন ছিল না প্রাচীন যুগের মতোই শিক্ষক-গুরুই ছিল এই ব্যবস্থার কেন্দ্রমণি। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন গল্পে সেই সময়কার এই ধরনের শিক্ষা প্রাঙ্গণের চিত্র সুস্পষ্ট রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এবার ভারতে ইংরেজদের বণিকের মানদণ্ড যখন ক্রমশঃ রাজদণ্ডে পরিণত হচ্ছিল, সেই সময়কার শিক্ষা ও শিক্ষকদের সম্বন্ধে আমরা নাতিদীর্ঘ আলোচনা করব। রঘুনন্দ গোস্বামীর 'রাম রসায়ণ' পুস্তকে রামচন্দ্রের বিদ্যা শিক্ষার বর্ণনার মধ্য দিয়ে আমরা সেই আমলের শিক্ষার একটি পরিচয় পাই। রঘুনন্দন লিখছেন—'অকারাদি বর্ণ বোলাইলা রামে পড়ি/লেখাইল তিনবার ধরাইয়া খড়ী/এই রূপ আর তিনজনে আরম্ভিলা/দশরথ দক্ষিণাতে দ্বিজের তুষিলা'। অর্থাৎ রামের বিদ্যালাভের মধ্য দিয়ে সেই সময়কার শিক্ষা ব্যবস্থার হাল হকিকৎ আমরা আন্দাজ করতে পারি।[৩০]

ঔপনিবেশিক যুগের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে—এই রকমই শিক্ষাধারা প্রচলিত ছিল। যেখানে পণ্ডিতেরা বিনালাভে অর্থাৎ 'দক্ষিণা' না নিয়ে পড়াতেন না। ঊনবিংশ শতকে গ্রামীণ পাঠশালায় পড়া রেভারেন্ড লালবিহারীদের বর্ণনায়ও আমরা অনুরূপ পাঠাভ্যাসের পরিচয় পাই। গোষ্ঠীবদ্ধ শিক্ষার প্রসার অর্থাৎ স্কুল শিক্ষা তখন কোলকাতা সহ বাংলার কিছু শহরে উপস্থাপিত হলে, গ্রামাঞ্চলে কিন্তু 'পাঠশালা কেন্দ্রিক পড়াশোনা তখনও বর্তমান ছিল। গুরুমশাইরা এই সব অঞ্চলে লেখা, পড়া, গণিত শিখন, অর্থাৎ 3R (রিডিং, রাইটিং ও (অ্যা) রেথমেটিক শিক্ষা সমপনান্তে এক ধাপেই মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রবিষ্ট হত। পাঠশালা পর্যায়ে পড়ুয়ারা সামর্থ্য অনুসারে কেউ এক আনা, কেউ দু' আনা বেতন দিত, আবার গরিব পড়ুয়ারা সামান্য সিধা দিয়েই শিক্ষা বৈতরণী পার হতে গুরুর কৃপা প্রার্থী হত। লালবিহারী দে তাঁর লেখায় এই বিষয়ে অনেকটাই আলোকপাত করেছেন।[৩১]

উইলিয়ম অ্যাডাম এই পাঠশালাকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ক্ষেত্র সমীক্ষা করে তিনটি রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। তার মতে সারা বাংলায় এরকম এক লক্ষ দেশজ পাঠশালা ছিল। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের হান্টার কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী সেই সময় এরকম পঞ্চাশ হাজার পাঠশালাকে শিক্ষা বিভাগের আওতায় আনা হয়েছিল। অর্থাৎ সেগুলি আধুনিক শিক্ষা ধারার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী 'স্কুল' বা বিদ্যালয়ে পরিণত হবার পথে পদপাত করেছিল।[৩২] তবে তখন প্রাচীন কালে যে প্রথা ছিল, অর্থাৎ গুরুমশাইরা একচেটিয়া ভাবে ব্রাহ্মণ বংশের সম্ভূত হবে, তা বহুলাংশে বিলুপ্ত হয়েছিল। অ্যাডামের রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পারি, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এসব তথাকথিত উচ্চবর্ণের শিক্ষক ছাড়াও, কৈবর্ত, বাগদী, যুগী থেকে কামার, ময়রা, ধোপা জাতিভুক্ত মানুষেরা, শিক্ষকতা কাজে নিয়োজিত হতেন।[৩৩] কিন্তু ধীরে ধীরে ইউরোপীয় জ্ঞান দীপ্তির প্রভাবে এই সব পাঠশালাগুলির চরিত্রে একটি মূলগত পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়।

ইংরেজরা ভারতে আসবার পরেও রাজভাষা হিসাবে প্রথম দিকে পূর্ববৎ 'ফারসি' ভাষাই ব্যবহৃত হত। তাই হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে মাদ্রাসায় এই ভাষা শিক্ষার একটি প্রবণতা ছিল। অর্থকরি ভাষা হিসাবে ফারসি এতটাই কার্যকরী ছিল যে বাংলার মেয়ে বউদের মুখে একটি প্রবাদেরই জন্ম হয়েছিল, 'আরশি, আরশি, আরশি/আমার স্বামী পড়ুক ফার্সি। এ প্রসঙ্গে রামমোহন রায়ের একটি উক্তি বিশেষ ভাবে প্রণিধান সাপেক্ষ, তাঁর লেখনিতে '....পিতার বিশেষ ইচ্ছাক্রমে আমি পারস্য ও আরবীয় বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, যেহেতুক মুসলমানের আদালতে কর্ম্মাকাংক্ষিরদের এই দুই ভাষায় বিদ্যার অত্যাবশ্যক।'[৩৪] কিন্তু ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ক্রমশঃ ইংরাজি রাজভাষার মর্যাদা পাওয়ার পর ফারসির সেই প্রভাব প্রতিপত্তি অস্তাচলে চলে গেল। ধর্মীয় ভাষা হিসাবে সংস্কৃত তার অস্তিত্ব বজায় রাখলেও, বাংলা পাঠশালা আর্থ-সামাজিক কারণেই ক্রমশঃ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ল। হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করে সূচনা হল ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান চর্চার। পরমেশ আচার্য সঠিকভাবেই বলেছেন, 'ব্রিটিশ আমলের প্রাথমিক স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল, আর কলেজের ক্রমসম্পর্কিত গোটা ব্যবস্থা আগের আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়া ধরে টান মারল।'[৩৫] নতুন এই যুগে স্কুল/কলেজ ব্যবস্থার

সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে গোষ্ঠীবদ্ধ শিক্ষকদের সৃজন হল। একক গুরুর পাঠশালা/মক্তব হয়ে পড়ল হীনবল। তবে এই গোষ্ঠাবদ্ধতাই ধীরে ধীরে শিক্ষকদের একত্রিত হয়ে নিজেদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হবার ভ্রূণ হিসাবে কাজ করেছিল—এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

সূত্র নির্দেশ

১. Altekar, A. S. : Education in Ancient India. p. 337 উদ্ধৃত-B. N. Luniya—Life and Culture in Ancient India, Agra, 1978, p. 556
২. Luniya B. N., Life and Culture in Ancient India. Agra, 1978, p. 558
৩. তদেব, p. 562
৪. তদেব, p. 563
৫. তদেব, p. 566
৬. তদেব, p. 571
৭. Mukherjee, R. K.—Ancient Indian Education, p. 122, উদ্ধৃত Luniya, p. 574
৮. Luniya, p. 575
৯. তদেব, p. 576
১০. Mukherjee, R. K.—Ancient Indian Education, p. 122, উদ্ধৃত Luniya, p. 574
১১. Luniya, p. 585
১২. তদেব, p. 598
১৩. Ghosh, A. Nalanda, New Delhi, 1959, p. 07
১৪. আচার্য, পরমেশ—বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা, কলকাতা, ২০০৯ পৃঃ ২৩
১৫. রায়, নীহার রঞ্জন—বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব, কলকাতা, ফাল্গুন-১৪১৬ (৭ম সংস্করণ), পৃঃ ৫৭৫
১৬. তদেব, p. 604
১৭. তদেব, p. 630
১৮. আচার্য, পরমেশ—বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬
১৯. দেশাই, জিয়াউদ্দিন—ভারত মে ইসলামি শিক্ষা কে কেন্দ্র (হিন্দি) নতুন দিল্লী, ১৯৮৪ পৃঃ ০৪
২০. তদেব, পৃঃ ০৫
২১. চৌধুরী, তেসলিম—ভারতের ইতিহাস (৬০০-১৫৫৬), কলকাতা ২০১৩, পৃঃ ৪৩৬
২২. শর্মা, এল. পি.—মধ্যকালীন ভারত (হিন্দি) আগরা, ২০১৪-১৫, পৃঃ ৩৩৬

২৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিত কুমার—বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলকাতা, ২০০৯-১০, পৃঃ ৫৫
২৪. আচার্য, পরমেশ, বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭
২৫. তদেব, পৃঃ ৫৮
২৬. তদেব, পৃঃ ৬৬
২৭. তদেব, পৃঃ ৬৮
২৮. তদেব, পৃঃ ৭৬
২৯. তদেব, পৃঃ ৭৭
৩০. তদেব, পৃঃ ৮২
৩১. Gupta, Atul Chandra (Ed.), Studies in the Bengal Renaissance, Kol, 1977. Lal Behari Dey, Devipada Bhattacharye, pp. 587-588
৩২. আচার্য, পরমেশ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩
৩৩. তদেব, পৃঃ ৮৩
৩৪. তদেব, উদ্ধৃতি, পৃঃ ৮৪
৩৫. তদেব, পৃঃ ৮৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইংরেজ কোম্পানির শাসনে ঔপনিবেশিক সরকারের ও বাংলার রেনেসাঁ ব্যক্তিত্বদের শিক্ষা সম্বন্ধীয় চিন্তা-ভাবনা

নতুন জমিদারতন্ত্র ও শিক্ষা

১৭৫৭-৬৪-এর মধ্যে আমাদের আলোচ্য বাংলায় ইংরেজরা ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। ছলে-বলে-কৌশলে ইংরেজ বণিকদের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হয়ে পড়ছিল। প্রথম দিকে অবশ্য ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেশীয় শাসক শক্তিকে প্রভাবিত করে নিজেদের অর্থনৈতিক মুনাফা বৃদ্ধির জন্যই সচেষ্ট ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ তারা দেখতে পেল, ভারতের বিভিন্ন অংশের শাসকেরা মূলতঃ পরস্পর বৈরিতাপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ। তাদের না আছে ঐক্য না দেশপ্রেম। ইংরেজদের 'ভাগ করো ও শাসন করো' নীতির প্রয়োগে কিছুটা নিজেদের অজ্ঞতাতেই দেশি শাসকেরা ইংরেজদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিল। বিশেষ ভাবে সুবা বাংলাকে তাদের শিল্প বিপ্লব জাত তৈরি মালের বাজার এবং কাঁচা মালের যোগানদার রূপে তারা পরিণত করেছিল।[১]

ইংরাজ ধীরে ধীরে ভারতের নানা অংশের 'তখৎ ও তাজ' গ্রহণ করল। তারা ক্ষমতা দখল করল—কিন্তু সুষ্ঠুভাবে দেশ চালানোর দায়িত্ব গ্রহণ করল না—ভারতের তথা আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে বাংলার 'শিক্ষা' ধারার নবরূপায়ণেও তাদের অনীহা প্রকাশ পেল। দেশে প্রচলিত পাঠশালা/টোল বা মাদ্রাসা/মক্তকেন্দ্রিক শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা যেমন তারা করেনি তেমনি প্রতিকূলতাও দেখায়নি।

আমরা জানি, ভারতবর্ষে শিক্ষা সেই পুরাতন কাল থেকেই ব্যক্তিগত এবং সমাজের দান নির্ভর—বিশেষ করে সমাজের মাথা রাজা/মহারাজা, বিশেষ করে আঞ্চলিক জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতাই ইংরেজ পূর্ব যুগে শিক্ষাকাঠামোর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অন্নজান হিসাবে কাজ করত। কিন্তু ইংরেজদের নতুন ভূমিব্যবস্থা বিশেষ করে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে, পাঠশালাকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক 'পুরনো' জমিদার শ্রেণির অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন হল। নতুন 'অনুপস্থিত জমিদার তন্ত্র' শিক্ষার দায়দায়িত্ব নিল না শিক্ষা ধারা হল সম্পূর্ণই বিপর্যস্ত। সেই সময়, 'গুরু মহাশয়গণ বর্তমান স্কুল সমূহের শিক্ষকগণের ন্যায় কোনও কমিটি বা কোনও ব্যক্তির নিকট নির্দিষ্ট বেতন পাইতেন না। প্রত্যেক গৃহস্থ....গুরু মহাশয়ের সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতেন। এই রূপে মাসে সামান্য ১০/১২ টাকা আয় হইত।'[২] শিক্ষা পরিবেশও ছিল কলুষিত। যে বালক গুরু মশাইকে লুকিয়ে কিছু উপঢৌকন দিত, তার সাতখুন মাপ, না হলে লাড়ু গোপাল, ত্রিভঙ্গ প্রভৃতি শাস্তি তাদের কপালে জুটত। সর্বোপরি গুরুমশাই-এর বেত তো ছিলই।

নতুন 'অনুপস্থিত জমিদার তন্ত্র' ও ঐতিহ্যবাহী পুরনো ধাঁচের শিক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখবার প্রায় কোন প্রচেষ্টাই করেনি। শুধু 'বাঈজি তোষণ ও বিড়ালের বিয়ে নিয়েই তারা ব্যস্ত রইল। হুতুম স্কুল মাস্টারদের চরিত্র এর যে চিত্র তিনি এঁকেছেন তাও খুব আদর্শ স্থানীয় নয়—তার অনুকরণীয় ভাষায়, 'সমর ভেকেসনে কালেজ বন্ধ হয়েছে—স্কুল মাষ্টারেরা লোকের বাগানে বাগানে মাচ্ ধরে ও বাজার করে ব্যাড়াচ্ছে, পণ্ডিতেরা দেশে গিয়ে লাঙ্গল ধরে চাস্‌বাস্ আরম্ভ করেছেন (ইংরাজি স্কুলের পণ্ডিত প্রায় ঐ গোছেরি দেখা যায়)।[৩] মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

ক্রমশঃ ইংরেজের রাজ্যপাট শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে থাকল। শাসকের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করবার জন্য 'ইংরেজী শিক্ষার' মাহাত্ম্য অনুধাবন করল, ইংরেজের শাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র বাংলার হিন্দু বাঙালি, 'বাবুরা'। নতুন আর্থ-সামাজিক অবস্থায়, বাস্তব 'কম্‌প্রাডর'-এর কাজ করতে গিয়ে ইংরাজি শিখতে চেষ্টা করল। রাজনারায়ণ বসুর লেখায় প্রথম যুগের সেই ইংরাজি শিক্ষালাভের চেষ্টার এক হাস্যোদ্রেককারী অথচ করুণ চিত্র আমরা দেখতে পাই। তখনও পর্যন্ত ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস শিখনের মাধ্যমে রেনেসাঁ প্রসূত চিন্তা চেতনার প্রভাব বাঙালির উপর পড়েনি। 'হাতুড়ে' শিক্ষকের কাছে 'হাতুড়ে' ইংরেজি শিখে, ইংরেজের কম্প্রাদর হওয়াই মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালির একমাত্র লক্ষ্য ছিল। 'যখন বঙ্গসমাজ এইরূপে চলিতেছিল, তখন ইহা পরিবর্তন করিতে এক ব্যক্তি বিশেষ চেষ্টান্বিত ছিলেন। তিনি কে, না, স্কুল মাষ্টার। প্রথমে তাঁহার বেশভূষা অদ্ভুত, ইংরাজী উচ্চারণ কদাকার, শিক্ষাপ্রণালী অপকৃষ্ট ছিল।'[৪] পম্‌কিন, লাউকুমড়ো, ককোম্বর শশা 'ঘোষি'এ বাঙালির, ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ ও শেষ হত। সাহেব মালিক রুষ্ট হলে, তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি বলতো 'ইফ্ মাস্টর ডাই, দেন আই ডাই, মাই কো ডাই, মাই ব্লাকস্টোন ডাই, মাই ফোরটিন জেনারেশন ডাই'—যদ্যপি মনিব মরেন, তবে আমি মরিব, আমার কো অর্থাৎ গরু মরিবে, আমার ব্লাক স্টোন অর্থাৎ বাড়ীর শালগ্রাম ঠাকুর মরিবেন, আমার ফোরটিন জেনারেশন অর্থাৎ চোদ্দ পুরুষ মরিবে।'[৫] শিক্ষক ও ছাত্রের বেশভূষা, আচার আচরণ বক্তব্যেই পরিস্ফুট তখনকার শিক্ষার করুণ অবস্থা। এই পরিবর্তমান সময়ে আমরা আমাদের পুরনো শিক্ষার পরিকাঠামো যেমন হারিয়েছিলাম তেমনি ইউরোপীয় উদার যুক্তিবাদী শিক্ষার ধারা, আমাদের কাছে এসে পৌঁছতে পারেনি। শিক্ষক সমাজও ছিন্নমূল ও চন্দ্রাহত তুল্য ছিলেন।

শিক্ষা ঃ মিশনারীদের অবদান

ঊনবিংশ শতক ছিল ইউরোপের বন্ধন মুক্তির যুগ। একদিকে এই যুগ যেমন ধনতন্ত্রের যুগ, অন্ধ জাতীয়তাবাদের যুগ। অন্যদিকে একই সঙ্গে তা পরিবর্তনের যুগ, যুক্তিবাদ, আশাবাদের যুগ। শিল্প বিপ্লব এই যুগ কৃষি প্রধান ইউরোপকে শিল্পে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহকে ব্যবহার করে এই যুগেই মানুষ প্রকৃতিকে বহুলাংশে বশ করতে সক্ষম হয়েছিল। চিন্তার ক্ষেত্রে এই যুগে বিপ্লব ঘটেছিল। রুশো, ভলতেয়ার, মন্তেস্কুর নব সমাগমে উদ্‌বেলিত হয়েছিল সমগ্র ইউরোপ। ইউরোপ, বিশেষ করে আমাদের দেশের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড ভারতকে তাদের বিক্রয় বাজার-এর খরিদ্দার ও কাঁচামালের যোগানদার হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। এই যোগাযোগ অবশ্য শুধু মাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয়।[৬] ক্রমশঃ

ইউরোপের যুক্তিবাদ, আশাবাদ, দেশের প্রতি ভালোবাসা বা পেট্রিয়াটিজম চুইয়ে চুইয়ে এলেও, আমাদের দেশে প্রভাব ফেলেছিল। ইউরোপীয় সভ্যতার হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে প্রথমে এদেশের মানুষের চোখ ঝলসে গেলেও, ইউরোপীয় শিক্ষার মর্মবস্তুকে আয়ত্ত করে, তারা স্বদেশের দিকে ক্রমশঃ ফিরে তাকাছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতরাই প্রথমে দেশীয় প্রভাবশালীদের কাছে আমাদের অতীত গৌরব—অতীত চিন্তা চেতনার ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছিল। ক্রমশঃ দেখা যাচ্ছিল যে পাশ্চাত্য শিক্ষাধারা বিশেষ করে বাঙালিকে শুধু 'কেরাণী' হবার শিক্ষা প্রদান করেনি। এর পাশাপাশি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফ্রান্সের বিপ্লব, জার্মানীর ঐক্য সন্ধানের কথা ও কাহিনী তাদের গোচরে এসেছে। ইউরোপীয় মনীষী টমাস পেইন, কান্ট, হেগেল, বেন্থামের রচনাদি জীবন সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন করেছে। তাদের মধ্যে মুকুলিত হয়েছে দেশাত্মবোধ, প্রতীতি জন্মেছে প্রকৃত শিক্ষাধারাই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে প্রগতির দিকে।[৭]

উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, ভারতবর্ষে প্রথম পাশ্চাত্য ধাঁচের শিক্ষাধারা চালু করার পিছনে বিদেশি খ্রিশ্চান মিশনারীদের অবদানের কথা আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। সেই সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা—যুগের দাবিতেই ছিলেন ফিলানথ্রোপিস্ট। গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা থাকলেই হল—বেতনের ব্যাপারে তারা সেরকম মাথা ঘামাতেন না—তবে পূর্বে শিক্ষকরা বিশেষ করে বিকৃত সামন্ততন্ত্র থেকে বৃটিশ শাসনের সংযোগকালে, যে অমর্যাদা ও অশ্রদ্ধ অবস্থায় বিরাজ করতেন—মিশনারীদের শিক্ষায় শিক্ষকতা সম্বন্ধে সেই মনোভাব সমাজ থেকে অনেকটাই দূর হয়—তারা সেবা ব্রতের মূর্ত প্রতীকে পরিণত হন। মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত ক্যালকাটা চ্যারিটি স্কুলকেই (১৭৪৯) আমরা দেশের প্রথম ইউরোপীয় ধাঁচের স্কুল বলে চিহ্নিত করতে পারি। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রি স্কুল সোস্যাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কোলকাতার বাইরে চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুরেও এই ধরনের বিদ্যালয় স্থাপনের কথা আমরা জানি। মিশনারীরা যখন প্রথম এদেশে আসেন, তখন এ দেশের ভাষা, ধর্ম, জীবনযাপন সবই অজানা ছিল তাদের কাছে। সুইডেনবাসি মিশনারী কারনেন্‌দার-এর উৎসাহে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে আরো একটি বৃহৎ মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

এটা ঠিক্ খ্রিস্টান মিশনারীদের এই শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের নিজ ধর্মকে ভারত তথা বাংলার মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। তবে তাদের জনকল্যাণমুখী মনোভাবকে এক্ষেত্রে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া উচিত হবেনা। বিশেষ করে উইলিয়ম কেরীও তার শ্রীরামপুর মিশনের শিক্ষা সংস্কার আমাদের সমাজ প্রগতিতে যে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মিশনারীরা প্রথমেই স্থানীয় বাংলা ভাষা শিখে, সেই ভাষার মাধ্যমেই তাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহে 'শিক্ষা' দিতে সচেষ্ট হন।[৮] ফোর্ট উইলিয়ম খ্যাত রামরাম বসুর কাছে বাংলা শেখেন কেরী—সেই পাঠাভ্যাসের সুবিধার জন্য তার উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত বাংলা শব্দকোষ এবং ব্যাকরণ প্রণীত হয়। ইতোমধ্যেই (১৭৭৮) অবশ্য একজন ইংরেজ রাজকর্মচারী ন্যাথানিয়াল ব্রাসি হালহেড ইংরাজি ভাষায় হলেও একটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা

করেছিলেন। এদিকে স্যার চার্লস উইলকিনসের প্রচেষ্টায় ও পঞ্চানন কর্মকার নামে এক ব্যক্তির সহায়তায় মুদ্রাযন্ত্রের উপযোগী বাংলা অক্ষর তৈরি হলে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এক বিপ্লবের সূচনা হয়। এর পরে কেরী সহযোগিরূপে উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জশুয়া মার্শমান নামে দুই ধর্মযাজক শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন—এই বিখ্যাত ত্রয়ীর মিলন বঙ্গদেশে উনিশ শতকের শিক্ষার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। এদের উদ্যোগেই শ্রীরামপুরে গড়ে উঠল স্কুল। এই সময়ে দেশে যোগ্য শিক্ষক বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিক্ষা দেবার যোগ্য মানুষ খুবই কম ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' গ্রন্থে আমরা সেই সময়ের অপগুরুদের একটি বর্ণনা পাই। তিনি লিখেছেন, 'সচরাচর বর্ধমান জেলা হইতে কায়স্থ জাতীয় গুরুগণ আসিতেন।.... প্রাতে ও অপরাহ্ণে পাঠশালা বসিত। একমাত্র শিক্ষক গুরু মহাশয় বেত্র হস্তে মধ্যস্থলে একটি খুঁটি ঠেলান দিয়া বসিয়া থাকিতেন। সর্দার পড়ুয়ারা অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণির বালকেরা সময়ে সময়ে শিক্ষকতা কার্য্যে তাহার সহায়তা করিত'—তৎকালে পাঠ্য গ্রন্থ বা পড়িবার রীতি ছিল না।'[৯]

অন্যদিকে মিশনারীদের স্কুলে বর্ণমালা, ঈশপের গল্প, ইউরোপীয় পদ্ধতিতে গণিত প্রভৃতি পাঠ্য ছিল। শ্রীরামপুর মিশন মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে শুধুমাত্র বাইবেলের অনুবাদ নয়—কিছু কিছু পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ হত। এমনকি কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ তারাই প্রথম মুদ্রিত করেছিল। আসলে মিশনারীগণ অনুভব করেছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন—পাঠ্যপুস্তক রচনা, বিদ্যালয় সমূহের উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ও অর্থ। আর যেটি বিশেষ ভাবে দরকার ছিল, সেটি হচ্ছে উপযুক্ত হবু শিক্ষকদের শিক্ষা দান। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরের পার্শ্ববর্তী নবাবগঞ্জে মিশনারীদের চেষ্টায় শিক্ষক শিক্ষণের জন্য প্রথম 'নর্মাল স্কুল' স্থাপিত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানে হবু শিক্ষকদের প্রথমে বাংলা ভাষা শুদ্ধভাবে ও কীভাবে লিখতে পড়তে হয় তার শিক্ষা দেওয়া হত। এছাড়া পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, ভূগোল, প্রকৃতি বিজ্ঞান, জলবায়ু, উত্তাপ এবং আলোক সম্বন্ধীয় সাধারণ বিজ্ঞান, ইতিহাস ও নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধেও শিক্ষকদের ওয়াকিবহাল করা হত। ভাবা হয়েছিল এই শিখন প্রাপ্ত শিক্ষকেরা বাংলার গ্রামে গ্রামে 'ইংরেজী পাঠশালা' স্থাপন করে, বাংলায় আধুনিক ও যুক্তিবাদী শিক্ষায় গোড়াপত্তন করবেন।[১০]

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্টে যে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা শিক্ষা প্রসারের জন্য ব্যয় করার সিদ্ধান্ত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিয়েছিল তা ১৮৩৫-এর আগে বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু তার বহু পূর্বেই ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের স্কুল ও কলেজ মিশনারীরা প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে মার্শম্যান 'Hints relative to the native schools' নামক পুস্তকে বঙ্গদেশের শিক্ষার অবস্থা, শিক্ষার মাধ্যম, পাঠ্যপুস্তক রচনা ও মুদ্রণ, বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যয় নির্বাহ সম্বন্ধে আলোচনার পাশাপাশি শিক্ষকরা কীভাবে পুস্তকাদির সাহায্যে ও সর্দার পড়ুয়া বা মনিটরদের সহায়তায় শিক্ষাদান করবেন সে সম্বন্ধে দিক নির্দেশ করেছিল। ইতোমধ্যে শ্রীরামপুর ছাড়াও চুঁচুড়া, কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে আঞ্চলিক ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় প্রায় একশত বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল।

বাংলার নবজাগ্রত শ্রেণি ঃ শিক্ষা

জনৈক আধুনিক শিক্ষাবিদের ভাষায় লেখাপড়া সেই সময় শুধু কর্মলাভের সোপান রইল না, 'শহুরে ভদ্রলোকের জীবনের সঙ্গে খাপ খায় এমন লেখা পড়াই হল আদর্শ। ইংরেজি 'লিবারেল এডুকেশনের' ধারায় মনের স্ফুর্তির ভাষা ও সাহিত্য চর্চার উপর জোর পড়ল। বলা যেতে পারে বাংলার নবজাগরণের ভ্রুণ প্রস্তুত হল এই ব্যবস্থায়।[১১] এতদিনকার 'সিধা' প্রথার বদলে, শিক্ষকদের বেতন দানের ব্যবস্থা হল। সরকারি সাহায্যের তোয়াক্কা না করে এই সব বিদ্যালয়ে ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নেওয়া হত। সেই প্রাপ্ত বেতন থেকে যৎসামান্য হলেও শিক্ষকদের মাইনে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। ইউরোপীয়দের কম্প্রাদর শ্রেণি হিসাবে যে উচ্চবিত্ত বাঙালির আবির্ভাব ঘটেছিল, তাদের উত্তরপুরুষরা ইউরোপীয় উদারনৈতিক দর্শন বিজ্ঞানের সংস্পর্শে নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করছিল ক্রমশঃ। যুগ যুগ লালিত কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে চেয়ে প্রথম প্রজন্মের এই পাশ্চাত্য শিক্ষিত মানুষেরা ভাবগত দিক থেকে স্বদেশে এক নতুন চেতনা ও সংস্কৃতির বিস্তারের জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং এই কাজে নতুন ধরনের শিক্ষা ছিল তাদের অন্যতম হাতিয়ার।

তবে শুধুমাত্র ভাবগত আদর্শই এই ধরনের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছিল এমন নয়—এই নতুন শিক্ষার বিস্তার সেই সময়কার অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলেও একটি বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইংরেজ ভারতে যত দিন না তার শাসন ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল, ততদিন পর্যন্ত তাদের ব্যবসার 'এজেণ্ট' হিসাবে 'অল্প ইংরাজি জ্ঞান'-এর পুঁজি নিয়েই ভারতীয় উচ্চবর্গ নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থ চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু ১৭৯৩ এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জাত নব্য জমিদার শ্রেণির বৈষয়িক প্রয়োজনে এবং নব উদ্ভূত অল্প ইংরাজি জানা মানুষদের প্রশাসনে তথাকথিত উচ্চপদ লাভের মোহ পরিপূরণের লক্ষ্যে আরো ভালো ভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের চিন্তা বাংলার বিশেষ করে হিন্দু উচ্চবিত্তদের কাছে কাঙ্খিত হয়ে পড়েছিল।[১২] উপরোক্ত এই ভাবগত ও বস্তুগত প্রয়োজনে পাশ্চাত্য ধাঁচের স্কুল/কলেজ শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল হিন্দু উচ্চবর্ণের মানুষেরা, যারা অর্থনৈতিকভাবেও সমাজকে নেতৃত্ব দিত।

প্রথম দিকে ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন ইউরোপীয় শিক্ষকদের কাছে এই শ্রেণির এগিয়ে থাকা অংশ পাশ্চাত্য শিক্ষা বিশেষ করে ইংরেজি শিখতে অগ্রসর হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আমরা স্বনামখ্যাত ডিরোজিওর শিক্ষাগুরু ডেভিড ড্রামন্ড-এর নাম উল্লেখ করতে পারি। তিনি যে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ছিলেন, তার নাম ছিল 'ধর্মতলা একাডেমি'। শুধু শিক্ষক নন, স্কুলের প্রশাসক ও সহযোগী মালিক হয়ে ড্রামন্ড স্কুলের পাঠ্যক্রম, পাঠদান পদ্ধতি, পরীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠান ঢেলে সাজিয়ে ছিলেন। তাঁর যোগদানের বছর খানেকের মধ্যে ধর্মতলা একাডেমি হয়ে উঠল কলকাতার অন্যতম সেরা স্কুল।'[১৩] ড্রামন্ডের মতো নব্যবঙ্গের স্কুল শিক্ষকেরা তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যদি শুধুমাত্র কেরানি ও মুৎসুদ্দি তৈরির কারখানা হিসাবে গড়ে তুলতেন তাহলে বঙ্গদেশের শিক্ষা ও শিক্ষকদের ইতিহাসে, ছোট্ট একটি ফুটনোটের মধ্যেই তাদের কথা সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু ড্রামন্ড

প্রমুখেরা শিক্ষক হিসাবে শুধু কেরানি তৈরির কাজে লিপ্ত ছিলেন না। ছাত্রদের একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষে সমস্ত কিছু বিষয় সম্বন্ধেই প্রশ্নহীনতাকে দূরে ঠেলে সরিয়ে, তাদের প্রমাণ করার অধিকারের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এরফলেই, যুক্তিবাদ মানবতাবাদ আশাবাদের উপর ভিত্তি করেই বাংলার নবজাগরণের সূচনা করেছিলেন এই প্রথমযুগের পাশ্চাত্য ধাঁচের শিক্ষাধারার শিক্ষার্থীরা।[১৪]

নবজাগরণ কালের সমাজের অন্য অনেক দিকের মতোই শিক্ষা ক্ষেত্রে রামমোহন রায়ের চিন্তাকেই আমরা নতুন যুগের চিন্তার সূচনা হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। ইংরেজ শাসকদের অনেকেই সেই সময় পুরনো টোল চতুষ্পাঠী বা মাদ্রাসা মক্তবের শিক্ষা ধারা চালু রাখার পক্ষপাতী হলেও, রামমোহন কিন্তু দেশের মানুষের উন্নতির স্বার্থেই বিশ্বমানব প্রগতির সংযোগ বর্ধিত হোক এমনটাই চেয়েছিলেন। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট অনুযায়ী শিক্ষা বিস্তারের জন্যে বাৎসরিক যে এক লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ হয়েছিল, সেই টাকা পাশ্চাত্য স্কুল/কলেজকেন্দ্রিক শিক্ষায় ব্যয় হোক—এই ছিল তাঁর অভিলাষ। নিজে সংস্কৃতজ্ঞ হয়েও দেশের স্বার্থেই প্রাচ্য ধাঁচের শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধিতা করে তিনি বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে একটি পত্রে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন '....as the inprovement of the native population is the object of the Government, it will cousequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy with other useful sciences'.[১৫]

বাস্তবতঃ রামমোহন স্কুল কলেজ কেন্দ্রীক পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে আলোচ্য হিন্দু বিদ্যালয় বা হিন্দু কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ব্রাহ্ম ধর্মের কারণে তখন তিনি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজপতিদের শত্রু। আবার এই রক্ষণশীলদের অনেকেই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রামমোহন জড়িত থাকুন এমনটা চাননি। এই পরিস্থিতিতে রামমোহন নিঃশব্দে কলেজ স্থাপনের প্রস্তুতি কমিটি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্যারিচাঁদ মিত্র লিখেছিলেন, 'Thre was no difficulty in getting Rammohan Roy to renounce his connection, as he valued the education of his country men more than the empty flourish of his name as committee man'.[১৬]

আমরা দেখতে পাই রেনেসাঁ যুগের কোন ব্যক্তিত্বই শুধুমাত্র তাত্ত্বিক স্তরে শিক্ষা সম্পর্কীয় আলোচনাতে থেমে থাকেননি। বাস্তবে হাতে কলমেও তাঁরা আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন—রামমোহনও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন না। হিন্দু কলেজ স্থাপনের আগেই তিনি স্বপ্রচেষ্টায় ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে শুড়িপাড়া অঞ্চলে একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন। মিস্টার মোরক্রফন্ট নামক জনৈক ইংরেজকে তিনি বেতনের বিনিময়ে এই স্কুলের শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেন। এছাড়া ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর উদ্যোগেই স্থাপিত হয় পাশ্চাত্য শিক্ষাকেন্দ্রিক অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল। এই বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করতেন। উইলিয়াম অ্যাডাম ছিলেন এই স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক। আধুনিক শিক্ষা ধারা অনুযায়ী এই বিদ্যালয়ে চারটি 'শ্রেণি' গড়ে তোলা হয়েছিল নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে। শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণের আধুনিক

পন্থা এখানে রামমোহন চালু করেছিলেন। ইউরোপীয় আদর্শে এখানে নির্দিষ্ট শ্রেণি পাঠের শেষে বাৎসরিক পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হত। রামমোহন পুত্র রমাপ্রসাদ ও রামমোহন মিত্র, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। পরবর্তী কালে এই স্কুলের ছাত্ররা বাংলার নবজাগরণের সেনা হিসেবে সর্বতত্ত্বদীপিকা সভার মতো সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে দেশে শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হন।

রামমোহনের পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেনের মতো বাংলার গর্বরা দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বা স্কুল শিক্ষার বিস্তার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তবে তাদের কথা পরে। বর্তমানে আমরা আর দুজন ব্যক্তি যাঁরা বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের কথা ও প্রাতিষ্ঠানিক পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের যে কেন্দ্র বঙ্গদেশে গড়ে উঠেছিল, সেই প্রতিষ্ঠানের কথা আলোচনা করব। ব্যক্তিদ্বয়ের নাম হল স্বনামখ্যাত ডেভিড হেয়ার ও রাধাকান্ত দেব আর প্রতিষ্ঠানটির নাম হিন্দু কলেজ (১৮১৭)।

প্রথমে ডেভিড হেয়ার প্রসঙ্গে আসি, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় ঘড়ির ব্যবসার্থে আসলেও এবং এই ব্যবসায়ে প্রচুর লাভবান হলেও দেশীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মেলামেশার সূত্রে, ভারতবাসীদের আপন করেছিলেন হেয়ার সাহেব। তিনি বুঝেছিলেন যে এদেশের মানসিক অন্ধকারকে দূর করার একমাত্র অস্ত্র তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী ও ইউটিলিটিরিয়ান শিক্ষার প্রসার। তাই জন্য ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ঘড়ির ব্যবসার ভার অন্য ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করে, 'একলা শিক্ষক' হেয়ার বাংলার মানুষদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারকেই তাঁর জীবনের ব্রত করে নিয়েছিলেন। হিন্দু কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রেও ডেভিড হেয়ারের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। তাঁর নেতৃত্বে ক্যালকাটা স্কুল সোস্যাইটি নামক একটি প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজের যোগদানে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক জ্ঞান লাভের জন্য কয়েকটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এই কাজে তাঁর সহযোগী রাধাকান্ত দেবের পরামর্শে হেয়ার এই সব পাঠশালায় কয়েকজন শিক্ষককে নিয়োগ করেন। এবং উপরোক্ত সোস্যাইটির সিদ্ধান্ত ক্রমে চারজন শিক্ষকের মাসিক বেতন একত্রে পঞ্চাশ টাকা ধার্য করেন।[১৭]

স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ভাবে শিক্ষকদের নির্দিষ্ট বেতনদানের উপর গুরুত্ব দিয়ে, তাদের 'ব্রত' ও 'বৃত্তির' মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়াস যারা সেই সময়ে করেছিলেন, তাদের মধ্যে হেয়ার ছিলেন অন্যতম।

পরবর্তীকালে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হবার জন্য 'পটলডাঙা স্কুল' ছাড়া অন্য পাঠশালাগুলি বন্ধ করতে হেয়ার সাহেব বাধ্য হন। তবে হেয়ারের পটলডাঙা স্কুলটির জনপ্রিয়তা এতটাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, যে নির্ধারিত ছাত্র সংখ্যা পেরিয়ে গেলেও, ছাত্ররা হেয়ার সাহেবের পাল্কির পিছনে দৌড়ে দৌড়েও তার স্কুলে ভর্তি হবার জন্য আবেদন করত। শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখায় হেয়ার সাহেবের শিক্ষক হিসাবে জনপ্রিয়তার একটি সুন্দর বিবরণ আমরা পাই। 'প্রতিদিন প্রাতে আহার করিয়া, একখানি পাল্কীতে আরোহণ পূর্বক.....প্রথমে তাঁহার নিজের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা ও স্কুলগুলি পরিদর্শন করিতেন, তৎপরে যে সকল দরিদ্র বালকের পীড়ার সংবাদ পাইতেন.... তাহাদিগের ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতেন। অবশেষে হিন্দু কলেজে গিয়া

উপস্থিত হইতেন। সেখানে প্রত্যেক শ্রেণীর, বলিতে কি প্রত্যেক বালকের, কার্য পরিদর্শন করিতেন।'[১৮] তাই হেয়ার সাহেব বলতেই একজন আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষকের ছবি সহজেই আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। ডেভিড হেয়ার ইউরোপের নতুন 'Bipolar' শিক্ষাধারা সম্বন্ধেও যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। তাই গুরুমুখী শিক্ষাধারাকে সম্পূর্ণ বাতিল করে ছাত্র-শিক্ষকের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞান লাভকেই তিনি শ্রেয় মনে করতেন। এছাড়া সহপাঠ্যক্রমিক শিক্ষা ও খেলাধুলার শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বের কথাও তাঁর জানা ছিল। আমরা দেখতে পাই এই জন্যে একদিকে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানতৃষ্ণা বৃদ্ধির জন্য তিনি পটলডাঙ্গার স্কুলে একটি ছোট গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন। অন্যদিকে ছাত্রদের পাঠাভ্যাসের পাশাপাশি শারীরিক ব্যায়াম ও ক্রিকেট, স্কিপিং প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষারও ব্যবস্থা করেছিলেন।

শুধুমাত্র দেশীয় ছাত্রদের উপযুক্ত স্কুল গড়েই হেয়ার ক্ষান্ত হননি—ক্যালকাটা স্কুল বুক সোস্যাইটির মাধ্যমে ছাত্রদের উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নেও তিনি যত্নবান ছিলেন। বাঙালির শিক্ষা চিন্তার ইতিহাসে তাই তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। অনেক পড়ে ছন্দের যাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'ডেভিড হেয়ার' শীর্ষক কবিতায় বলেছিলেন, 'অর্থ দানে মুক্ত পাণি/বিদ্যাদানে অতন্দ্র নিয়ত/আর্ত্তের ছাত্রের বন্ধু/ছিলে পটু মানুষ গড়িতে/স্নেহবিত্ত চিত্ত দানে/নব্য বঙ্গে বিকল ঘড়িতে/বিনি মূলে কল-বল/নিত্য তুমি জোগায়েছ কত।'[১৯] বাংলায় স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রবর্তক ডেভিড হেয়ারের নাম আমাদের শিক্ষার ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি ভারতে প্রাতিষ্ঠানিক পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের প্রাণকেন্দ্র হিন্দু প্রেসিডেন্সী কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের কথা ছাড়া ভারতীয় বিশেষ করে বাংলার শিক্ষা চিত্র সম্পূর্ণ হয় না। সে প্রসঙ্গে আমরা আসবো। তার আগে হেয়ারের মতো আরেকজন শিক্ষাপ্রেমী মানুষের কথাা আমাদের আলোচনা করতে হবে। সাধারণ ভাবে 'রক্ষণশীল' বলে পরিচিত সেই মানুষটির নাম রাধাকান্ত দেব। হিন্দু কলেজ সূত্রে তার নাম আমাদের পরেও নিতে হবে। 'সতীদাহ' প্রথার সমর্থক হিসাবে তার এক নঞর্থক ছবি ইতিহাসের ছাত্রদের জানা থাকলেও ভারতে স্কুল/কলেজ শিক্ষা বিস্তারের কাজে তার অবদান আমাদের অনেকেরই অজানা। হিন্দু কলেজ স্থাপনে তার ভূমিকা ছাড়াও রাধাকান্ত হিন্দু পাঠশালা (আড়পুলি এবং পটলডাঙ্গা স্কুল), ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলার স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করতে যথেষ্ট উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছিলেন। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কৃষি বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষার উপরও সেই যুগেই তিনি জোর দিতে চেয়েছিলেন। ইংরাজির পাশাপাশি মাতৃভাষা শিক্ষার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অজ্ঞাতনামা লেখকের 'The history of native female Education in Calcutta, Cal-1856 (?) pp. 1, 6-7 থেকে আমরা জানতে পারি 'In those days Kali Krishna Bahadur and Radhakanta Dev stood foremost in the rank of enlightened, Hindus, and patronized popular education through the medium both of English and Bengali'.[২০]

আমাদের দেশের অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে তার ঔৎসুক্য ছিল। তাই তিনি একদিকে যেমন ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন, তেমনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। তাই একই সঙ্গে বাংলা, ইংরাজি ও সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারে মনোযোগী হন..... 'মনে রাখা দরকার রক্ষণশীল রাধাকান্ত শিক্ষা প্রণালী ও পাঠ্যপুস্তক সমূহকে সম্পূর্ণ রূপে ধর্ম বিষয় মুক্ত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন।'[২১] সে যুগের নিরিখে বিদ্যাসাগর ছাড়া এই বিষয়টিতে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে তৎকালীন কোন শিক্ষা প্রসারকই সক্ষম হননি।

হিন্দু কলেজ ও শিক্ষার নতুন ধারা

এবার আমরা আসব বাংলার স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠবার অন্যতম 'মাইলস্টোন' হিন্দু কলেজ এর প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে। নামে কলেজ হলেও একেবারে প্রারম্ভিক পর্বে এখানে মূলতঃ স্কুল পর্যায়েই শিক্ষা দেওয়া হতো। ইংরেজদের মধ্যে ভারতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য মূলতঃ যারা চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ডেভিড হেয়ার ও জন এলিয়াট বেথুনের নাম ভারতবাসীর মনে চিরকালীন ছাপ রেখে গিয়েছে। মূলতঃ সদ্য পাশ্চাত্য শিক্ষার পরশ পাওয়া বাঙালি উচ্চবর্ণের তথাকথিত সমাজপতিরা নিজেদের বৈষয়িক ও মানসিক অভীপ্সা পূরণের লক্ষ্যে এই কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলেও উপরোক্ত দুই ভারতপ্রেমী বৃটিশের উদ্যোগ ছাড়া বাংলার প্রথম ব্যক্তি বিশেষের প্রাইভেট স্কুলের পরিবর্তে প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দু কলেজের স্থাপনা সম্ভব হতো না। সম্ভব হতো না 'মাসিক বেতনের' ভিত্তিতে সমষ্টিগত শিক্ষক নিয়োগের প্রথা।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিলাত আগত সিভিলিয়ান সাহেবদের জন্য প্রথাবদ্ধ শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। এছাড়া স্থাপিত হয়েছিল প্রধানত মুসলিম ছাত্রদের জন্য কোলকাতা মাদ্রাসা—এই দুই কলেজ সম্পর্কে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে ঔপনিবেশিক সরকারের প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করব। এখন হিন্দু কলেজের কথা। মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তিগত পাশ্চাত্য শিক্ষা দানের স্কুলে, বাংলা রেনেসাঁসের প্রথম দিকের কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যেমন রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকমল সেন প্রভৃতিরা প্রাথমিক ভাবে পাশ্চাত্য 'স্কুল' এর ধরনের শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই প্রগতিপন্থী বাঙালি বিদ্বৎজন এই পাশ্চাত্য শিক্ষাই বাঙালির আর্থিক ও মানসিক উন্নতির সহায়ক হবে মনে করে, কোলকাতায় এই ধরনের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এদের এই কাজের ক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন স্বনামখ্যাত ডেভিড হেয়ার এবং কোলকাতা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এডওয়ার্ড হাইডইস্ট।[২২] রাজা রামমোহনের গৃহেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গঠনের পদক্ষেপ হিসাবে প্রাথমিক প্রস্তুতি সভাটি আহূত হয়—সেখানে ডেভিড হেয়ার পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষার সমতুল্য ইংরাজি সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি পঠন পাঠনের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন।

এরপরে ১৮১৬-এর ১৪ মে বিচারপতি হাইড ইস্টের গৃহে ইউরোপীয় ভারত বন্ধু কয়েকজন সাহেব এবং সম্ভ্রান্ত হিন্দু সমাজপতিদের এক সভায় হিন্দুদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়—অনতি ভবিষ্যতে যা কলেজে রূপান্তরিত হবে এই আশাও ব্যক্ত

করা হয় সেখানে। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম হয় হিন্দু কলেজ। একটি 'জেনারেল কমিটির' হাতে কলেজের পরিচালন ভার তুলে দেবার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। হিন্দু সমাজের তৎকালীন শিরোমণিরা সোৎসাহে এই কলেজ স্থাপনের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ দান করতে থাকেন--এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর এবং পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর। সমষ্টিগতভাবে শিক্ষক নিয়োগের প্রচেষ্টাও শুরু হল। চন্দননগরের শিক্ষাবিদ আইজাক দ্য আসেমকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হল মাসিক দুইশো টাকা বেতনে। জনৈক ফ্রাস্টিসকে মাসিক তিনশো টাকা বেতনে সুপারিনটেন্ডেন্ট-এর পদে নিয়োগ করা হয়, অথচ ভারতীয় সুপারিটেনডেন্ট বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের বেতন ধার্য হল মাসিক একশো টাকা। সমমর্যাদার একজন ইউরোপীয় এবং একজন ভারতীয় পদাধিকারীর বেতনের এই বৈষম্য আমাদের চোখে না পরে পড়েনা।[২৩] প্রথমে ফার্স্ট ক্লাস বা এখনকার দশম শ্রেণি ও ফোর্থ ক্লাস বা এখনকার সপ্তম শ্রেণির দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন যথাক্রমে জনৈক হ্যালিফ্যাক্স ও পাস্কেল। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির জন্য ইংরেজি সাহিত্য এবং ইতিহাসের শিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত হলেন, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। শুধু হিন্দু কলেজ নয়—ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি নবযুগের সূচনা হল, তাঁর নিয়োগের মধ্য দিয়ে।

মাত্র ১৭ বছরের যুবক শিক্ষক ডিরোজিও, ডেভিড ড্রামন্ডের ধর্মতলা একাডেমির প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। ড্রামন্ডের কাছ থেকেই যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের শিক্ষা পেয়েছিলেন তিনি। ইংরেজি সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব ও মেন্টাল ফিলজফিতে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ডিরোজিওর পক্ষে ছাত্রদের মন জয় করা অতি সহজ ছিল। তার সান্নিধ্যে আসা ছাত্রদের তিনি নিঃসংকোচে সব বিষয় আলোচনায় উৎসাহ দিতেন। তার যুক্তিবাদী মানসিকতার সংস্পর্শে, ছাত্রদের মনে স্বদেশের, ধর্ম ও সমাজের অনেক কুসংস্কার সম্বন্ধেই প্রশ্ন জাগ্রত হয়েছিল। ডিরোজিওর উদ্যোগে কলেজের ছাত্ররা গড়ে তুলল অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নামে বিতর্ক সভা—তারই অনুপ্রেরণায় প্রকাশিত হল পার্থেনন নামে পত্রিকা। ক্রমে ডিরোজিওপন্থী ছাত্ররা 'Young Bengel Group' নামে পরিচিতি লাভ করল।[২৪]

কিন্তু এদের ক্রিয়াকলাপ ও জনপ্রিয়তা হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল অংশকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। তাদের মতে ডিরোজিও তার শিষ্যরা তাদের কার্যাদির মাধ্যমে সরাসরি হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে আঘাত করে চলেছে। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে হিন্দু কলেজ পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ও তৎকালীন রক্ষণশীল নেতাদের অন্যতম রামকমল সেন অভিযোগ পেশ করলেন যে, ডিরোজিওর নীতি বিগর্হিত শিক্ষাদান-এর ফলে হিন্দু কলেজের অনেক হিন্দুছাত্র যেমন বিগড়ে যাচ্ছে, ঠিক তেমনি, অনেক অভিভাবকই 'ডিরোজিওর ভয়ে' কলেজ থেকে নিজ সন্তানদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত ডিরোজিওর বিরুদ্ধে ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস, পিতামাতার প্রতি অশ্রদ্ধা এবং ভ্রাতাভগ্নীর মধ্যে বিবাহ এর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের অভিযোগ আনা হল।[২৫] ডিরোজিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে যথাযথ উত্তর দিলেন। ডিরোজিওকে শিক্ষক পদে বহাল রাখার জন্য হেয়ার সাহেবের সবিশেষ উদ্যোগ সত্ত্বেও রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব

প্রমুখ রক্ষণশীল কলেজ পরিচালক সমিতির সদস্যদের চাপে ডিরোজিও শিক্ষকতা থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যু হলেও, তাঁর যে আদর্শ তিনি ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তা অমরত্ব পেয়েছিল। বঙ্গদেশের শিক্ষক স্কুলের জীবন জীবিকার উপর আজ পর্যন্ত ডিরোজিওর যুক্তিবাদ, সংশয়বাদ এর প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি। মনে রাখতে হবে ডিরোজিও প্রমাণ করে দিয়েছিল, একজন শিক্ষক বেতন নিয়ে কীভাবে 'বৃত্তি' কে 'ব্রত'-এর পর্যায়ে উন্নত করেন।[২৬]

বিদ্যাসাগরের অবদান

আমরা আগেই বলেছি খ্রিস্টান মিশনারী, বাঙালি 'ভদ্র'লোক গোষ্ঠীর চেষ্টা ছাড়াও, কিছু বিলম্বে হলেও পাশ্চাত্য স্কুলকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সরকারেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তবে সে প্রসঙ্গে যাবার আগে, আমাদের আরেকজন সিংহ সদৃশ্য পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে অবদানের কথা আলোচনা করতে হবে। বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার মূলক কাজের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে এই আদ্যন্ত মাস্টারমশাই শিক্ষা প্রসারের কাজেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তবে রামমোহন বা রাধাকান্ত দেবের মতো একক চেষ্টায় নয়—যতদূর পাওয়া যায় সরকারি সাহায্য নিয়ে তিনি এই শিক্ষা বিস্তারকে প্রাতিষ্ঠানিক আন্দোলনে পরিণত করে ছিলেন। অজ বীরসিংহ গ্রাম থেকে কোলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে ছাত্র হিসাবে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। সেখানে সংস্কৃত শাস্ত্রের সঙ্গে ইংরেজিও পড়েছিলেন তিনি। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে এই কলেজ থেকেই বিদ্যাসাগর উপাধি প্রাপ্ত হন তিনি। প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়।[২৭] পরে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য শ্রেণির অধ্যাপকের পদে যোগ দেন তিনি। সংস্কৃত কলেজের হাল অবস্থা তখন খুব একটা ভালো নয়—তাই এর পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে, বিদ্যাসাগরকেই শেষাবধি এই কলেজের অধ্যক্ষপদে নিয়োগ করল সরকার। প্রথমেই পাশ্চাত্যের স্কুল ব্যবস্থার ছাঁচে সংস্কৃত কলেজে একটানা ক্লাসের পরিবর্তে কিছু ক্লাসের পর ছাত্রদের বিশ্রামের ঘণ্টা নির্দিষ্ট হল। প্রতিপদ বা অষ্টমী তিথিতে কলেজ বন্ধ রাখার রীতি পরিবর্তন করে রবিবার দিনটিকেই একমাত্র কলেজ ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করা হল। শিক্ষকদের জন্যও নতুন নিয়ম তৈরি হল—তাদের যেমন ইচ্ছা কলেজে আসবার রীতি পালটে নির্দিষ্ট সময়ে কলেজে প্রবেশ ও প্রস্থানের ব্যবস্থা করলেন বিদ্যাসাগর। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সম্প্রদায়ের সন্তানরা ছাড়া সেই সময়ে অন্য হিন্দু সন্তানরা সংস্কৃত কলেজে পড়বার অধিকারী ছিলেন না। বিদ্যাসাগর এই প্রথা রদ করতে চেয়ে, শিক্ষার তৎকালীন নিয়ামক সংস্থা কাউন্সিল অব্ এডুকেশনের কাছে আর্জি প্রেরণ করে লিখলেন, '...The time has arrived for opening the Sanskrit College for all respectable classes of Hindoos।'[২৮] অচিরেই হিন্দু তথাকথিত উচ্চবর্ণের কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেল কলেজের দ্বার। সংস্কৃত ব্যাকরণ দর্শনের পণ্ডিত হয়েও এদেশীয় মানুষের জীবিকা সংস্থান ও মানসিক উন্নয়নের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিল। তাই সংস্কৃত কলেজে ভালোভাবেই ইংরেজি শেখাবার বন্দোবস্ত করা হল—বৈদিক গণিতের স্থান নিল—ইংরেজি সংস্করণের গণিত। হার্ডিঞ্জ প্ল্যান

সহ (পরে আলোচ্য) বিভিন্ন সরকারি শিক্ষা প্রকল্পে ও বিদ্যাসাগর সোৎসাহে সহায়তা করেছিলেন।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সরকার শিক্ষা বিভাগে পরিচালক হিসাবে কাউন্সিল অব এডুকেশনের অবলুপ্তি ঘটিয়ে, একজন ডিরেকটর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের পরিচালনাধীন করলেন শিক্ষা বিভাগকে। এই সঙ্গে সরকার দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয়গুলির জন্য বিদ্যাসাগরকে সরকারি পরিদর্শক হিসাবে নিযুক্ত করলেন। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন পুরনো ধাঁচের শিক্ষকেরা নতুনধারার শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে খুব একটা সফল হবেন না। তাই সংস্কৃত কলেজে শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। প্রথম বছরে একাত্তর জন শিক্ষক এই স্কুলে ভর্তি হলেন। এদের মধ্যে ষাট জনকে মাসিক পাঁচ টাকা করে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হল। হার্ডিঞ্জ প্ল্যান অনুযায়ী আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয়ে তাদের শিক্ষকতা করার জন্য নিযুক্ত করা হল। মাসিক মোট পাঁচশ টাকা বরাদ্দ করল সরকার।

স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যাসাগরের অবদানের কথা আমরা সবাই জানি। আমাদের বর্তমান আলোচনায় যদিও আমরা ব্যাপকার্থে শিক্ষা ও শিক্ষক প্রসঙ্গ নিয়েই চর্চা করেছি—তাই এই বিষয়টি এখানে কিছুটা প্রক্ষিপ্ত হবে। তবে মেয়েদের জন্য বেথুন স্কুল স্থাপনে তাঁর অবদান ভুলবার নয়। এই কাজে তার সহায়ক হলেন কাউন্সিল অব এডুকেশনের সাবেক সভাপতি বেথুন সাহেব, রাম গোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার। বিদ্যাসাগরের পরামর্শ অনুযায়ী সরকার ছাত্রীদের বৃত্তি দানের ও বালিকা বিদ্যালয়ের পরিদর্শিকা নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিলেন। নদীয়া, বর্ধমান, মেদিনীপুরে স্থাপিত হল বালিকা বিদ্যালয়, বিদ্যাসাগরেরই উৎসাহে। সরকার কিন্তু কথার খেলাপ করে কিছুদিনের মধ্যেই এই সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন দিতে অস্বীকার করলেন। উপায়ন্তর না দেখে এই খাতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকার দায় বিদ্যাসাগর নিজে গ্রহণ করলেন।[২৯] সরকারের মনোভাবে ক্ষুব্ধ বিদ্যাসাগর সরকারি পদ পরিত্যাগ করলেন। এর পরেই আদর্শ বিদ্যালয় হিসাবে নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করলেন মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন। সেখানে এফ-এ ক্লাস খোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অনুমতি চেয়ে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর লিখলেন 'I can not earnestly impress upon your mind that we strongly feel the necessity of converting our institution into a High School.'[৩০] হিন্দু বা প্রেসিডেন্সী কলেজ তখনো তথাকথিত উচ্চবর্ণের ও ধনী পুত্রদের কুক্ষিগত ছিল—সাধারণ মধ্যবিত্ত মেধাবী ছাত্ররা যাতে বিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষালাভ করতে পারে, সেই জন্যই বিদ্যাসাগর গঠন করেছিলেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও, ঈশ্বরচন্দ্র বুঝেছিলেন যে উনিশ শতকের পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিখন পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় গুরুবাদী শিক্ষা দেশের শিক্ষার চালচিত্রের ক্ষতিই করবে। তার শিক্ষা চেতনায় তাই আমরা দেখতে পাই—সংস্কৃত, মাতৃভাষা ও ইংরেজির এক সুষ্ঠু মেলবন্ধন। তার 'Notes on Sanskrit College'-এ তিনি সংস্কৃত কলেজের উন্নতির জন্য প্রস্তাব রেখে রেখেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের জন্য এই সুপারিশ করা হলেও তা ছিল সমসাময়িক অবস্থার নিরিখে সারা বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রযোজ্য।

শুধুমাত্র শিক্ষক ও ছাত্রের গুণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলার বিদ্যালয়গুলির সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব হবে না এটা বুঝেই তিনি যুগোপযোগী পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে ব্রতী হয়েছিলেন তিনি। শিক্ষার জগতে শিশুর প্রথম পদক্ষেপের সোপান হিসাবে রচিত হল বর্ণ পরিচয়—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। ক্রমশঃ 'কথামালা', 'বোধোদয়', চরিতাবলী, আখ্যান মঞ্জরীর মতো বই পুস্তক প্রণয়নের মধ্য দিয়ে 'নতুন' বাংলার বিদ্যালয় শিক্ষকদের হাতে, নবতর শিক্ষাধারা পরিচালনার আয়ুধ তুলে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। ছাত্র ও শিক্ষকের পারস্পরিক সম্পর্কের মাধুর্যের কথা বিদ্যাসাগর বারে বারে শিক্ষা মহলে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আধুনিক যুগে শিক্ষকরা বেতন ব্যতীত পাঠদান করতে পারবেন না—কিন্তু 'বৃত্তি' কে ছাপিয়ে শিক্ষকতা সম্পৃক্ত 'ব্রত'ই তাদের জীবনাদর্শ হওয়া উচিত বলে বিদ্যাসাগর মনে করতেন। তার 'গুরুভক্তি' শীর্ষক রচনায় শিক্ষক ছাত্রের পারস্পরিক পবিত্র সম্পর্কের কথা বিদ্যাসাগর তুলে ধরেছেন। গল্পের পটভূমি বাংলা নয়—তবুও শাশ্বত গল্পে শিক্ষকের মৃত্যুর পর, তার পরিবারের অর্থকষ্টে ক্লিষ্ট এক ছবি তুলে ধরা হয়েছে। উপরোক্ত শিক্ষকের এক ছাত্র তাঁদের দুর্দশা লাঘবের জন্য দেশের রাজার কাছে আবেদন জানায়—সহৃদয় রাজাও ছাত্রটির আবেদনকে মর্যাদা দিয়ে, প্রতিশ্রুতি প্রদান করে বলেছেন, ''যাহাতে তোমার শিক্ষকের পরিবার ক্লেশ না পায়, তাহা আমি অবশ্য করিব, তুমি সেইজন্য উদ্বিগ্ন হইও না।[৩১] বিদ্যাসাগর এই ভাবে শিক্ষকদের আর্থিক দুর্দশার প্রতি যেমন আপামর বঙ্গবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন তেমনি তাদের দুরবস্থা দূরীকরণের জন্য সমাজের কর্তব্য কি হওয়া উচিত তার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখের শিক্ষা ভাবনা

রামমোহন, রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছাড়াও বাংলার নবজাগরণকালিন প্রায় সকল ব্যক্তিত্ব আমাদের প্রদেশে স্কুল কিংবা কলেজ শিক্ষার প্রসারে তাত্ত্বিক/প্রায়োগিক ভাবে সচেষ্ট ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, কেশব চন্দ্র সেন প্রমুখের নাম এই প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতেই পারি।

স্বনাম খ্যাত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, হিন্দু কলেজের প্রথম দিককার ছাত্র হলেও, একমাত্র স্বদেশহিতৈষণা ছাড়া তিনি ডিরোজিও পন্থীদের দ্বারা খুব একটা প্রভাবিত হননি। তিনি দেশের শুভ ঐতিহ্যের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করে দেবেন্দ্রনাথ 'জাতীয় ভাষা, ধর্ম ও শিক্ষার' পুষ্টি সাধনে তৎপর হয়ে উঠেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে প্রকাশিত হতে থাকা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-সম্পাদনার দায়িত্ব বর্তায় অক্ষয়কুমার দত্তের উপর। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন, 'তত্ত্ববোধিনী বঙ্গীয় পাঠকগণকে গম্ভীর জ্ঞানের বিষয় সকলের আলোচনাতে প্রবৃত্ত করে এবং তত্তদ্বারা বঙ্গসমাজে এক মহৎ পরিবর্তন আনয়ন করে।'[৩২]

খ্রিস্টান মিশনারীদের স্কুল/কলেজ বাঙালির জাতীয় ঐতিহ্য নষ্ট করছে মনে করে দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে দেশীয় স্কুল স্থাপনের এক উদ্যোগ নেওয়া হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার

(আষাঢ়, ১৭৬৭ শক—সংবাদ প্রকাশিত হয়।.....'গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ (২৫শে মে) রবিবারে শিমুলিয়াতে এক প্রকাশ্য সভা হইয়াছিল। তাহাতে প্রায় সহস্র ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন। এই সভাতে নিশ্চিত হইল, যে হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় নামে এক পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইবেক এবং তাহার কর্ম সম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব সভাপতি হইলেন। শ্রীযুক্তবাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলেন।'[৩৩]

পাশ্চাত্য ধাঁচের শিক্ষা পদ্ধতি নতুন পরিস্থিতিতে অবশ্যম্ভাবী এটা দেবেন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন। কিন্তু সেই শিক্ষা ইংরেজি মাধ্যমে নয়—বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রবাহিত হবে, এই ছিল তাঁর একান্ত ইচ্ছা। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে উপরোক্ত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করার সময় থেকেই স্বনামধন্য অক্ষয়কুমার দত্ত এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতেন। দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছাক্রমে তাঁর উদ্যোগে বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য ধাঁচের শিক্ষার উপযোগী ভূগোল, গণিত এবং পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত পুস্তক বাংলা ভাষায় প্রণিত হল। বালকদের জন্য লিখিত তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'চারু পাঠের' নাম এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে সরকারি চাকুরি করতে হলে ইংরেজি জানা আবশ্যক করে, ঔপনিবেশিক প্রশাসন ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে এক অধ্যাদেশ জারি করলে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায়—এই লুপ্ত হওয়ার পিছনে আর্থিক দুর্বলতাও একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিক্ষাপ্রেমী দেবেন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্বন্ধে যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন, তা ঠাকুর পরিবারের চেতনায় স্থায়ী আসন লাভ করেছিল। পরে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে, আমরা দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্বন্ধীয় চেতনার একটা ছাপ লক্ষ্য না করে পারিনা।[৩৪]

ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্তর মতো বাংলার নবজাগরণের অনেক সন্তানই ঊনবিংশ শতকে কমবেশি শিক্ষা বিস্তারে সহযোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাদের সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করতে গেলে, পূর্ণাঙ্গ এক একটি বই লিখবার সম্ভাবনা আছে—তাই নবজাগরণের প্রতিনিধি স্থানীয় বাংলার কয়েকজন সুসন্তানের নামই সেই সময়কার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা বিস্তারের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হল। তবে আরেকজন শিক্ষাপ্রেমীর কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ না দিলে, এই অধ্যায়টি অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে। সেই ব্যক্তিটির নাম কেশবচন্দ্র সেন। আমরা সাধারণভাবে ধর্মনেতা হিসাবেই তাকে চিনি। কিন্তু বাংলায় স্কুল শিক্ষা বিস্তারেও যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন তিনি। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৩ অক্টোবর ব্রাহ্ম সমাজের প্রাণপুরুষ কেশবচন্দ্র বাংলায় স্কুল শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে তৎকালীন বড়লাট লর্ড নর্থব্রুককে লেখা একটি পত্রে বলেন, এই শিক্ষা ব্যবস্থা পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে গঠন করা উচিত। যথা—(ক) সাধারণ লোকের শিক্ষা, (খ) উচ্চশ্রেণির উন্নততর শিক্ষা, (গ) নীতি শিক্ষা, (ঘ) শিল্প ও পারিভাষিক শিক্ষা এবং (ঙ) স্ত্রী শিক্ষা।[৩৫] রেনেসাঁ পুরুষদের মধ্যে তিনিই একমাত্র শুধুমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সন্তানদের জন্য নয়—সমাজের সকল অংশের মধ্যে শিক্ষাধারা ছড়িয়ে পড়ুক এরকমটা চেয়েছিলেন। এটা আমাদের শ্লাঘার বিষয়।

কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টায় ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় একটি বিদ্যা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এর পরে ইংল্যান্ডে গিয়ে তিনি 'বড় ইংরেজদের' কাছে বাংলা তথা ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা

বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। 'Englands duties to India' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে ভারতবর্ষে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি বা সুরক্ষিত দুর্গ গঠন অপেক্ষা ঔপনিবেশিক সরকারের প্রচুর বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষা বিস্তার করাই প্রাথমিক কাজ বলে তিনি মতামত দেন। দেশে ফিরে তিনি সমাজের 'অর্ধেক আকাশ নারীদের, শিক্ষা বিস্তারের দিকেও দৃষ্টি দেন এবং প্রথমে 'মেট্রোপলিটান ফিমেল স্কুল' এবং পরিশেষে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে মেয়েদের জন্য ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপন করেন।

বাংলার নবজাগরণকালীন শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের একটি বড় ত্রুটি ছিল এটাই যে, সেই সময় আমাদের স্বদেশি বিদ্বজ্জনেরা যে শিক্ষাকাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তা ছিল মূলতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক শিক্ষা—সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সেই সময় একটা উদাসীনতার পরিমণ্ডল আমরা লক্ষ্য না করে পারি না। এ ক্ষেত্রেও উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। তিনি নিজে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে আমাদের দেশের খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য 'শিল্পী ও শ্রমজীবীদের বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে শ্রমজীবীদের বৃত্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে 'সূত্রধরের কাজ, সূচীকার্য, ঘড়ি মেরামত, মুদ্রাঙ্কণ, লিথোগ্রাফ ও এনগ্রেভিং প্রভৃতি বৃত্তি কেন্দ্রিক শিখনের পাশাপাশি ভাষা, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নীতি শিক্ষা প্রভৃতি সাধারণ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত।[৩৬]

ইংরেজ সরকার ও আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ঃ বাঙালির স্বদেশি শিক্ষা ধারার প্রসার

এবার আমরা পাশ্চাত্য ধাঁচের স্কুল শিক্ষা বিস্তার এবং সেই সময়ের শিক্ষকবৃন্দের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের মনোভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করব। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রায় একশো বছর ধরে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত শাসন করলেও তারা ভারতকে তৈরি পণ্যাদির খরিদ্দার ও তাদের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগানদার হিসাবেই দেখত। তাই এদেশের শিক্ষা সহ কোন পরিকাঠামো নির্মাণেই প্রাথমিক ভাবে তারা আগ্রহ দেখায়নি।[৩৭]

কিন্তু ক্রমশঃ ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হতে শুরু করলে দৈনন্দিন ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে এদেশি লোকদের নিয়োগ করা লাভজনক হবে বলে তারা মনে করেছিল। এর জন্য সীমিতভাবে হলেও 'Native' দের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের একটা চিন্তা তাদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। প্রথমে অবশ্য পাশ্চাত্য ধাঁচের স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতে বা তার তৎকালীন শাসনতান্ত্রিক স্নায়ুকেন্দ্র বাংলায় প্রচলন করার কোন চেষ্টা তারা করেনি। বরঞ্চ পূর্বতন বাদশা/নবাবদের আমলে রাজভাষা হিসাবে চালু ফার্সি বা হিন্দু আইন পরিচালনার ভাষা সংস্কৃত এর সাহায্যে তারা প্রশাসন কার্য চালাতে শুরু করেছিল। কিছু ক্ষেত্রে এমনকি দেশীয় ভাষা ব্যবহার করতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি এবং সেই জন্য আমরা দেখি বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সময়ে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে মূলতঃ মুসলমানদের প্রাচ্য ধাঁচের শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসন কলকাতা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা করেছিল। প্রথম অধ্যক্ষ হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন মৌলবী মইজউদ্দীন। এই কলেজের

খ্যাতি সমসাময়িকালে এতটাই ছড়িয়ে পড়েছিল যে, শুধুমাত্র বাংলা নয়, কাশ্মীর, গুজরাট বা কর্ণাটক থেকেও এখানে পড়তে ইচ্ছুক ছাত্রদের আগমন ঘটত। কোলকাতা মাদ্রাসার উপর একটি গবেষণা পত্র থেকে আমরা তা' জানতে পারি।[৩৮] আরবি, ফারসি শিক্ষাক্রম চালু হলে, প্রশাসনের যোগ্য এদেশীয় রাজকর্মচারীদের অভাব হবে না এবং ইসলাম ধর্মী শাসকদের উচ্ছেদ করে কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য মুসলিম জনতার মনে সাধারণ ভাবে যে ক্ষোভ জমা হয়েছিল, তা দূরীকরণ করার ইচ্ছাও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পিছনে অনুঘটকের কাজ করেছিল। মাদ্রাসাতে প্রথমে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা একমাত্র পড়ুয়া হতে পারত। এছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির ছাত্ররা অনেকেই পাঁচ, আট এবং দশ টাকা হিসাবে মাসিক বৃত্তি পেত। এখানে আরবি ও ফার্সি সাহিত্য দর্শন আইন প্রভৃতি বিষয়ে পাঠদান করা হত। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবার পর, এখানে ইংরাজি ভাষা চর্চারও বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পিছনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলি। ব্রিটিশ শাসনের মূল কেন্দ্র বাংলায় আগত ইংরেজ প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত সিভিলিয়ানরা যাতে প্রশাসন চালানোর ক্ষেত্রে ভারতীয় হিন্দু আইন ও মুসলিম আইনের সাহায্যে যথার্থ ভাবে কাজ চালাতে পারে সেই সংক্রান্ত 'Training' দেওয়ার চেষ্টাই ছিল এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার পিছনের মূল প্রেষণা। এছাড়া স্থানীয় ভাষা অর্থাৎ বাংলা হিন্দি ইত্যাদি না জানলে যে প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে চালনা করা যাবে না—এই বাস্তব ইংরাজ কর্তৃপক্ষ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই কোম্পানির বিলাতি কর্মচারীদের জন্য দেশি ভাষা ও দেশি আইনকানুন শিখনের প্রয়োজনেই সৃষ্ট হয়েছিল এই কলেজ।

বাংলায় পাশ্চাত্য ধাঁচের স্কুল শিক্ষার বিস্তার ও বিকাশের ক্ষেত্রে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রত্যক্ষ অবদান হয়তো তেমন ছিল না। তবে পরোক্ষভাবে বাংলায় বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা গঠনে ফোর্ট উইলিয়মের একটি উজ্জ্বল ভূমিকা অবশ্যই ছিল। আসলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে যে স্বনামধন্য পণ্ডিতেরা শিক্ষকতা করতেন তারা শুধুমাত্র নিছক বিদ্যা বিতরণের মধ্যেই নিজেদের কাজকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। বরঞ্চ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামনাথ বাচস্পতি, শ্রীপতি রায়, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, রামরাম বসু এবং কিছু সময়ের জন্য এমনকি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই প্রতিষ্ঠানে পড়াবার পাশাপাশি নানা ধরনের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে আগ্রহ দেখিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে এই সমস্ত বই পুস্তক, ফোর্ট উইলিয়মে পাঠরত ইংরেজ সিভিলিয়ানদের জন্য লিখিত হলেও, কেরির বাংলা ব্যাকরণ, রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত', চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের 'বত্রিশ সিংহাসন ও রাজাবলী' ও বিদ্যাসাগর মশাই-এর প্রথম জীবনের লেখনীর ফসল 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' পরবর্তীকালের স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্য পুস্তকের অভাবকে বহুলাংশে প্রশমিত করেছিল। সেই দিক থেকে বাংলার বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতিতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অবদান অনস্বীকার্য।[৩৯]

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নতির ক্ষেত্রে একটি জলবিভাজিকা হিসাবে গণ্য হতে পারে—এতদিনের উদাসীনতা মুক্ত হয়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কমিটির পরিচালক সমিতি বার্ষিক এক লক্ষ টাকা। ভারতবর্ষে শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের জন্য বায় করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৪০] ভারতবর্ষে বা প্রকৃতার্থে বাংলায় শিক্ষাবিস্তারের জন্য ঔপনিবেশিক সংস্কারের দায়িত্ব আংশিক ভাবে হলেও স্বীকৃতিদানকে আমরা ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে একটি বিশেষ ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। এই সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক সরকারের শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রথম সোপান হিসাবে গণ্য হতে পারে। তবে সেই সময় প্রাচ্য বিদ্যার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ ও গ্রাম্য পাঠশালার উন্নতি বিধানের উপরই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রশাসন জোর দিয়েছিল। স্কুল শিক্ষার প্রসারে কোম্পানির কোন উৎসাহমূলক প্রচেষ্টা তখনও লক্ষিত হয়নি।

আমরা আগেই বলেছি, ভারতবর্ষে ইংরেজ কোম্পানির শাসন শুরুর প্রথম দিকে সরকার ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশের দিকে কোনোরকম নজর দেয় নি। ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনের জন্য ভারতীয়রাই বিশেষত বাংলার অধিবাসীরা পাশ্চাত্য তথা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের জন্য সচেষ্ট হয়। প্রথম প্রথম এক্ষত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা কাঠামোই বর্তমান ছিল। পামকিন্ চাল কুমড়ো/কুকুম্বার শশা/ব্রিঞ্জল বার্তাকু/প্লাউমেন চাষা' এর মধ্যেই সীমিত ছিল শিক্ষার পরিধি। ক্রমে ক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠিত পাশ্চাত্য শিক্ষা কাঠামোর প্রয়োজন বাংলার মানুষেরা অনুভব করল। নবজাগরণের কিরণ স্পর্শে আলোড়িত হয়ে উঠল বাংলা। ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করলেন। তিনি বুঝেছিলেন ভারতবর্ষের মানুষকে যদি যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল হতে হয় তবে তাদের পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গেই তিনি বলেছেন—'As the improvement of the native population in the object of the Govt. it will consequently promote a more liberal and enlightened system of Education'।[৪১]

অন্যদিকে তার ঠিক বিপরীত মতের রাধাকান্ত দেবের মতো মানুষেরাও বুঝেছিলেন যে ইংরেজ রাজত্বে মানুষের ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ অত্যাবশ্যক। এরই ফলস্বরূপ ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিখ্যাত হিন্দু কলেজ। হিন্দু কলেজ প্রথম শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি সংগঠিত রূপ দান করেছিল। আমরা বিখ্যাত হিন্দু কলেজের ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করলে জানতে পারি যে—'Anybody who is somebody in Bengal must have had some connection with Presidency (Hindu) College।[৪২] স্কুল শিক্ষার পথিকৃত এই প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে এই উক্তি যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত p. 9) প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত।) এ প্রসঙ্গে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

ইতিমধ্যে তথাকথিত বেঙ্গল রেনেসাঁর প্রভাব অন্ততঃ সমাজের উচ্চস্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। রামমোহনের উদারনৈতিক চিন্তা ভাবনা। ডিরোজিওর প্রথাভাঙা চিন্তাচেতনা থেকে উত্তরণ ঘটেছিল বিদ্যাসাগরের সুচিন্তিত শিক্ষা পরিকল্পনা। ইতিমধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের সুবিধার জন্য মিশনারীরাও

ভারতে তথা তার প্রাণকেন্দ্র বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। আলেকজান্ডার ডাফ, মার্সম্যান প্রমুখের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে, খ্রিস্টান মিশনারীদের পরিচালনায় স্থাপিত হয়েছিল শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট কলেজ। শিক্ষকেরাও তখন পর্যন্ত কিন্তু সংগঠিত হতে সক্ষম হয় নি। এর মধ্যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল যে ভারতবর্ষে শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাদেরও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। শুধুমাত্র প্রজাহিতৈষণার তাগিদে তারা এমনটা ভেবেছিল, এটা বললে সত্যের অপলাপ হবে। গ্রামশি কথিত শাসনের পাশাপাশি আদর্শগত ভাবেও জনগণকে ইংরেজ শাসনের অনুগত করে তুলবার প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করেছিল।[৪৩] এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে তারা একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। এছাড়া প্রশাসনিক প্রয়োজনে কেরানি তৈরির শিক্ষা প্রসারের তাগিদও তাদের ছিল।

১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম জন অ্যাডাম নামক একজন ইংরেজ কর্মচারী ভারতবর্ষে শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে সমীক্ষা করতে শুরু করেন। তাঁর সমীক্ষায় তিনি দেখিয়েছিলেন যে কোম্পানি পূর্ব শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত থাকলেও তারা ছিল পরস্পর সম্পর্কহীন। শিক্ষকদের অবস্থা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এ প্রসঙ্গেই একজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ বলেছেন 'Of the teachers, the majority were brahmins who are attached to the profession more by the respectability which tradition gave to it rather than by cosiderations of actual gains in cash or kind।[৪৪] স্বাভাবিক ভাবে তখনও মধ্যযুগের ব্রতকেন্দ্রিক শিক্ষাকাঠামো থেকে শিক্ষকেরা বের হয়ে যেতে পারেন নি।

অ্যাডামের দ্বিতীয় রিপোর্টে আমরা দেখতে পাই যে সেই সময় মাধ্যমিক পর্যায়ে মুর্শিদাবাদে ১২৪৮০৪ জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ৭৫৯ জন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করত। অন্যদিকে দৌলত বাজারে ৬২০৩৭ জনসংখ্যার মধ্যে ৩০৫ জন এবং খুলনায় ১১৬৪২৫ জনসংখ্যার মধ্যে ২২৪৩ জন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করত। সেই সময় বিভিন্ন শিক্ষালয়গুলির শ্রেণিবিভাগ ছিল নিম্নরূপ—

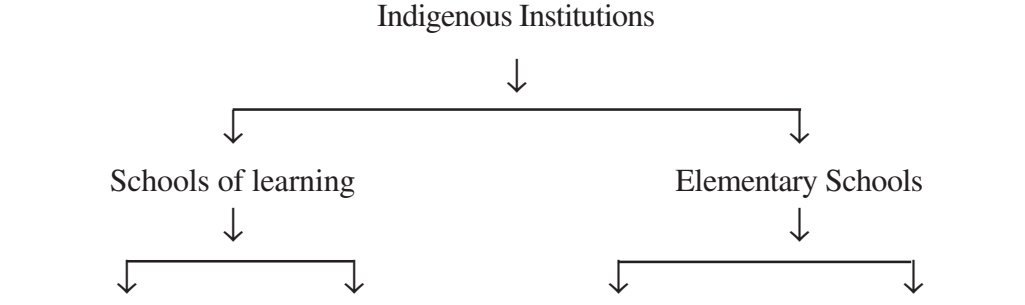
[৪৫]

ইতিমধ্যে ১৮১৩ খিস্টাব্দে চার্টার অ্যাক্ট অনুযায়ী কোম্পানি ভারতবর্ষে শিক্ষার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছিল। কিন্তু এই টাকা কীভাবে এবং কোন খাতে ব্যয় করা হবে সে বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে কোম্পানি ব্যর্থ হয়েছিল। ১৮২৩ সালের ১৭ জুলাই

অ্যাডামের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় প্রজার শিক্ষা ও নৈতিক উন্নতি নির্ধারণের জন্য একটি সাধারণ শিক্ষা সমিতি বা The General Committee of Public Instruction স্থাপিত হয়েছিল। এই সমিতির ১০ জন সদস্যের মধ্যে জে. এইচ. হ্যারিংটন, ডব্লিউ. বি. মার্টিন, হোল্ট ম্যাকেঞ্জি, হেনরি প্রিসেপ, জে. সি. সি. মাদার ল্যান্ড, এইচ. এইচ. উইলসন প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য। উচ্চ শিক্ষা-সমিতির সেক্রেটারি এবং সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেন উইলসন এবং হ্যারিংটন। এই শিক্ষা সমিতির হাতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে অর্থ তুলে দেওয়া হয়েছিল তার পরিমাপ ছিল—

(১) ১৮২১-২২ খ্রিঃ থেকে ১৮২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ২৬৬৪০০ টাকা
(২) ১৮২৪-২৫ খ্রিঃ ১০৬০০০ টাকা
(৩) ১৮২৫-২৬ খ্রিঃ ১০৬০০০ টাকা অর্থাৎ মোট ৪৭৮৪০০ টাকা।[৪৬]

সাধারণভাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয় সমূহের ব্যয় নির্বাহের জন্য এই টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। সমিতির সেক্রেটারি হোরেস. এ ম্যান. উইলসন একটি পত্রে বাংলার প্রত্যেক জেলার প্রধান কর্মচারী এবং অন্যান্য স্বনামধন্য ব্যক্তিদের প্রচলিত শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান করে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য প্রেরণের অনুরোধ করলেন। এই অনুসন্ধান পত্রে শিক্ষাসমিতি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে চাইলেন। তার মধ্যে বিদ্যালয়ের বিবরণ, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, পাঠ্যপুস্তকের তালিকা, শিক্ষায় ভাষা মাধ্যম সরকারি সাহায্যের পরিমাণ ও ছাত্র সংখ্যার পাশাপাশি শিক্ষকদের জাতি, মাসিক ও বার্ষিক বেতনের পরিমাণ এবং তা সংগ্রহের উপায় সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। এই প্রথম সংগঠিতভাবে শিক্ষকদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে সরকার নজর দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।[৪৭] শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার জন্য সমিতি কিছু নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। ঠিক হল যে বছরের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং অবকাশ কালে শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি উৎসুক জনসাধারণের জন্য বিশেষ করে বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ে 'জনপ্রিয় বক্তৃতামালা' প্রদান করবেন এবং এর জন্য শ্রোতাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হবে এবং তা শিক্ষকদের প্রাপ্য হবে।

এই সময় ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইংরেজ কোম্পানির প্রশাসন কিছুটা চেষ্টা করছিল, তার আভাস আমরা দিয়েছি। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জুলাই গর্ভনর জেনারেল, জন অ্যাডামের প্রস্তাব অনুযায়ী, সামগ্রিক ভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় একরূপতা আনয়নের জন্য একটি শিক্ষা সমিতি গঠনের প্রস্তাব করলেন। এরই ফলশ্রুতি স্বরূপই গঠিত হল 'জেনারেল কমিটি অব্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন'। শিক্ষা সমিতিতে দশ জন সদস্যকে মনোনীত করা হল। এরা হলেন, হ্যারিংটন, লারকিন্স, বেলী, মার্টিন, সেক্সপীয়র, ম্যাকেঞ্জী, প্রিন্সেপ, সাদারল্যান্ড, স্টারলিং এবং উইলসন।[৪৮] দেশীয় অথবা ইউরোপীয় বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যে সমস্ত অর্থ দান করা হতো, তা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিল এই জেনারেল কমিটি। মনে রাখতে হবে যে এই সমিতির বেশির ভাগ সভ্যই 'প্রাচ্য বিদ্যা' বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। সভ্যদের মধ্যে প্রিন্সেপ এবং উইলসন ছিলেন সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। এঁদের উৎসাহে সেই সময়, অনেক আরবি ও সংস্কৃত পুস্তকের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।[৪৯]

রামমোহন রায়ের মতো বাঙালি বুদ্ধিজীবিরা 'প্রাচীন শিক্ষার মধ্যযুগীয় পরিসর থেকে মুক্তি কামনায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন।' শুধুমাত্র 'রাজভাষা' শিক্ষার মাধ্যমে অর্থনৈতিক লাভালাভের জন্য নয়—পাশ্চাত্যের জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য স্পৃহার প্রতি তারা আকর্ষিত হয়ে তারা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের তাগিদ অনুভব করছিলেন সেই সময়। রামমোহন রায় সেই সময়কার বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে এই মতামত ব্যক্ত করে একটি 'পত্র' অবধি প্রেরণ করেছিলেন।[৫০] তা সত্ত্বেও ১৮৩৩ এর 'চার্টার অ্যাক্ট' প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত অবস্থার সেরকম কোন পরিবর্তন সংগঠিত হয়নি। জেনারেল কমিটি অবশ্য এই সময়ে একটি শিক্ষা সংক্রান্ত অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে ছিলেন। একটি সমীক্ষা করে তাঁরা অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি 'শিক্ষকদের জাতি, মাসিক ও বার্ষিক বেতনের পরিমাণ এবং উহা সংগ্রহের উপায়' সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে যত্নবান হয়েছিলেন।[৫১] যাইহোক, এই সময় কালেই, ইংরেজ কোম্পানি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল যে ইংরেজ শাসনের হাত ধরে যে অভিজাত 'হিন্দু ভদ্রলোকের উদ্ভব' বিশেষ করে বাংলাদেশে ঘটেছিল, তাঁদের অভীপ্সা পূরণের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করা অতীব প্রয়োজনীয়।

সেই সময়েই, ১৮১৩-এর চার্টার অ্যাক্টে শিক্ষা সংক্রান্ত বরাদ্দকৃত টাকা, কোন ধরনের শিক্ষা প্রসারে ব্যবহৃত হবে তা নিয়ে সরকারি মহলেই একটি বিতর্কের সূত্রপাত হয়। প্রথম দলে ছিলেন, প্রিন্সেপ, উইলসন প্রভৃতি প্রাচ্য বিদ্যা প্রসারের পক্ষপাতি 'রাজপুরুষ' গণ। এরা ঐতিহ্য সম্পন্ন ভাষা হিসাবে সংস্কৃত ও আরবি ভাষা চর্চার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের মত ছিল, 'পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ভারতবর্ষে প্রচারিত হইলেও তাহার মাধ্যম হইবে সংস্কৃত ও আরবি ভাষা।'[৫২]

দ্বিতীয় দলভুক্ত বিশিষ্ট নেতারা ছিলেন কলভিল, ট্রিভেলিয়ন প্রমুখ। তাঁরা তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ভারতীয়রা মূলতঃ শিক্ষার মাধ্যমে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। এবং নতুন শাসকদের ভাষা আয়ত্ত করতে পারলেই, এক্ষেত্রে দ্রুততার সঙ্গে সফলতা আসবে বলেই তাঁরা মত প্রকাশ করেন।

আর তৃতীয় দলের মাথা ছিলেন, মন্‌রো, এলফিন স্টোন প্রমুখ রাজকর্মচারীরা। তাঁর 'উচ্চশ্রেণির' ভাষা সংস্কৃত ও আরবি সাধারণ জনতার কোন উপকারে আসবে না বলে যেমন মনে করতেন, তেমনি বিদেশি এবং দুরূপ ভাষা ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা চালু করবারও বিরোধী ছিলেন। তাঁদের মত ছিল শিক্ষার মাধ্যম হবে নেটিভদের মাতৃভাষা অর্থাৎ মুখের ভাষাসমূহ। এবং এই প্রচলিত ভাষাগুলির মাধ্যমেই 'ইউরোপীয়' শিক্ষা গ্রহণই ভারত তথা বাংলার কল্যাণ বহন করে আনবে।

এই রকম পরিস্থিতিতে এই সমস্যা ও মতবিরোধের একটি আশু সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন অনুভব করছিলেন, কোম্পানির কার্যকর্তারা। এই মতবিরোধ চলার চরম পর্যায়ে গর্ভনর জেনারেল বেন্টিঙ্ক-এর সময়ে টমাস ব্যাবিংটন মেকলে, ভারত সরকারের সচিব হিসাবে এই

দেশে আসেন। এবং তিনি জেনারেল কমিটির সভাপতি হিসাবে মনোনীত হন। তিনি এসেই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, 'ইংরেজি একটি শ্রেষ্ঠ ভাষা—ভারতের রাজভাষা। এই দেশের লোক ইংরেজি শিখিতে উৎসুক....প্রাচ্য বিদ্যা শিক্ষার জন্য তাহাদের বৃত্তি দিয়া প্রলুব্ধ করিতে হয়। কিন্তু তাহারা ইংরেজি শিখিতে অর্থ ব্যয় করে।'[৫৩] তিনি শুধুমাত্র 'প্রাচ্যপন্থী'দের বিরূপ আলোচনা করেই ক্ষান্ত হননি, এদেশের শিক্ষা ধারাকেও তিনি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলে মনে করতেন। তাঁর মত ছিল 'A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia.'[৫৪] এর আগেই সংস্কৃত কলেজের কতিপয় ছাত্র 'পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থন' করে জানিয়েছিলেন যে ওই কলেজে দশ/বারো বছর পড়বার পর, যে প্রশংসা পত্র পেয়েছেন, তাতে জীবিকা নির্বাহের উপযুক্ত কোন 'বৃত্তি' তারা পাচ্ছেন না। স্বভাবতঃই এই বিবৃতি মেকলের হাতকেই শক্ত করেছিল।[৫৫]

পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রচারে যাতে ইংরেজ শাসক শক্তির সমর্থন পায়, এই জন্য মেকলে এই শিক্ষা ইংরেজ শাসক শক্তির ভারত তথা বাংলার মানুষের মধ্যে প্রভাব দৃঢ়মূল হবার সম্ভাবনা আছে বলে মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতো এই পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে তৈরী হবে এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা 'A class of persons–Indian in blood and colour but English in tastes, in opinions, in morals and intellect'। যারা স্বভাবতঃই ব্রিটিশ শক্তির অনুরাগী হবে বলে মেকলের মত ছিল।[৫৬]

আপামর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এর কোন চিন্তা মেকলের ছিল না। এক্ষেত্রে তিনি মনে করতেন, সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণির মানুষের মাধ্যমেই সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষ শিক্ষার আলো পাবেন। এই অভিসেচন প্রক্রিয়া বা 'Filtralion Theory' পরবর্তী কালে অবশ্যই ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। সেটা অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ।

মেকলের বাক্যজালে অভিভূত তৎকালীন ভারতের গর্ভনর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মার্চ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ সরকারি অর্থ শুধু মাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের কাজে ব্যবহৃত হবে—এরকম আদেশনামা জারি করেছিলেন।[৫৭] হিন্দু কলেজে যে মূলতঃ দেশীয় লোকদের চেষ্টায় পাশ্চাত্য স্কুল শিক্ষার (হিন্দু কলেজ তখন নামেই কলেজ—আসলে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ই ছিল) বিস্তারের যে চেষ্টা হয়েছিল তা চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করল এই ভাবে। অত্যল্প সময়েই আধুনিক স্কুল/কলেজীয় শিক্ষার কাঠামোকে সুদৃঢ় করার জন্য, মেকলের পৃষ্ঠপোষকতায়, হুগলী, কৃষ্ণনগর কিংবা ঢাকার মতো বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে গড়ে উঠল অনেকগুলি ইউরোপীয় ধাঁচার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে মূলতঃ অল্প সংখ্যক ভারত প্রেমিক পাশ্চাত্যভাষীও বৃহৎ সংখ্যায় দেশীয় ধনাঢ্যদের পৃষ্ঠপোষকতায়, ইউরোপীয় ধাঁচে যে স্কুল ব্যবস্থা গড়ে উঠবার সূচনা হয়েছিল, তারই আংশিক রূপায়ণ ঘটলো উপরোক্ত ঘটনাক্রমের দ্বারা। আর ব্যক্তি 'গুরুর' পাঠশালা বা মক্তব নয়—পাশ্চাত্য ধাঁচে এক-একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রগণের জ্ঞানের বিকাশের জন্য শিক্ষকবৃন্দের নিয়োগ শুরু হল। নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে তাঁরা শিক্ষা দান কার্যে নিরত হলেন। জন্ম নিল আধুনিক 'মাস্টারমশাই' শ্রেণিটির।

১৮৪৪ খ্রিঃ বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ দেশীয় ভাষার মাধ্যমে কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করলেন। এগুলোকে আমরা আধুনিক সরকার নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয় ব্যবস্থার ভ্রূণ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এই বিদ্যালয়গুলো অধিকাংশই ছাত্র বেতনের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই প্রথম সরকার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট বেতনের বন্দোবস্ত করেন। ঠিক হয় যে

(১) মাসিক ২৫ টাকা বেতনে ২০ জন শিক্ষক।

(২) মাসিক ২০ টাকা বেতনে ৩০ জন শিক্ষক

(৩) মাসিক ১৫ টাকা বেতনে ৫১ জন শিক্ষক নিযুক্ত হবেন।

এই বিদ্যালয়গুলিতে বাংলা, পাটীগণিত, ভূগোল এবং ভারতবর্ষ ও ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়ানো হত। কিন্তু উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে এই বিদ্যালয়গুলো অধিকাংশই পরবর্তীকালে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।[৫৮]

হার্ডিঞ্জের বিদ্যালয়গুলোর পরিচালনার সময়ে সরকার অনুভব করেছিলেন যে উপযুক্ত শিক্ষকদেরই উপযুক্ত বেতন দেওয়া উচিত। শিক্ষকদের শিক্ষাকার্যে উপযুক্ত করার জন্য ১৮৪৩-৪৪ খ্রিঃ জেনারেল কমিটি কলকাতায় একটি নর্মাল স্কুল, অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করলেন এবং এই প্রস্তাব অনুযায়ী মিষ্টার নাইটন নামে জনৈক ইংরেজ অধ্যক্ষের অধীনে আরো নর্মাল স্কুল স্থাপনের চেষ্টা করা হল। Selections from education reads vol. II p. 103 থেকে জানতে পারি যে—

'The Governor General in Council is strongly with the necessity for establishing Normal Schools for the training of Vernacular teachers, and he desires me (The Secretary to Government) to request the Lieutenant Governor's anxions attention may be given to this point in connection with the general scheme.'[৫৯]

এর পরবর্তীকালে ১৮৫৪ খ্রিঃ প্রকাশিত হয় উডের ডেসপ্যাচ। কোম্পানির বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড-এর প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতে উন্নতমানের ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্যচর্চার কথা বলা হয়। কীভাবে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় জ্ঞান অনুবাদ করা যায়, সে বিষয়েও ভাববার কথা বলা হয়েছিল এই ডেসপ্যাচ-এ। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষার ভিত্তির উপরে অ্যাংলো-ভার্নাকুলার ও ভার্নাকুলার স্কুলগুলোকে একই পরিকাঠামোর মধ্যে এনে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করে গড়ে তোলার কথাও এই ডেসপ্যাচে বলা হয়েছিল। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ, ইংরেজি ভাষায় দেশীয় ভাবধারার অনুবাদ, দেশীয় ভাষায় ইংরেজি ভাষা-সাহিত্য ও দর্শন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। এই ডেসপ্যাচে বলা হয়েছিল, ''In any general system of education, English language should be taught where there is a demand for it, but such instruction should always be combined with a careful attention to the study of the vernacular language of the district and with such general instruction as can be conveyed through that language.''[৬০]

উডের ডেসপ্যাচ-এর সুপারিশকে মর্যাদা দিয়ে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে সারা ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক ছাতায় নিয়ে আসবার প্রয়োজনে, সরকার কোলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তখন, 'Teaching University' ছিল না। শুধু মাত্র যে কোন পর্যায়ের চূড়ান্ত পরীক্ষা নেওয়ার দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিল। আমাদের আলোচ্য, অখণ্ড বঙ্গের শিক্ষা পরিচালনা ও ডিগ্রি দেবার অধিকার ছিল একমাত্র কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়ভারও তাদের উপরই বর্তেছিল। মাধ্যমিক শিক্ষা ও শিক্ষকদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করব। এছাড়া সারা দেশ জুড়ে 'graded' স্কুল স্থাপনের কথা বলা হয়েছিল। শিক্ষাবিভাগের পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের পরেই হাইস্কুল স্থাপনের কথা বলা হয়েছিল। যে স্কুলগুলোতে ইংরেজি অথবা কোনো আধুনিক ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছিল। স্বভাবতই শিক্ষাব্যবস্থার সর্বনিম্ন ধাপ ছিল প্রাথমিক স্কুলগুলো। ডেসপ্যাচে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল—"We include these anglo-vernacular and vernacular schools in same class, because we are unwilling to maintain the broad line of separetion which at present exists between schools in which the media for imparting instruction differ"। এই সমস্ত স্কুলের ব্যয় নির্বাহের জন্য Grant in aid প্রথার বন্দোবস্তের মধ্যে দিয়ে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।[৬১] তাছাড়া শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষণের মাধ্যমে তাদের উপযুক্ত শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলার কথাও এই ডেসপ্যাচে বলা হয়েছিল। কীভাবে শিক্ষাধারার মধ্যে দিয়ে বেকার সমস্যা দূরীভূত করা যায়, সে বিষয়েও এই ডেসপ্যাচে আলোচনা করা হয়েছিল। এর পরবর্তী শিক্ষা সংস্কারের নিদর্শন হিসেবে আমরা ১৮৮৩ সালের 'ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিশন'কে চিহ্নিত করতে পারি। ১৮৫৪ খ্রিঃ যে শিক্ষার ধারার প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছিল তা কতটা সাফল্য অর্জন করেছে সে বিষয়ে বিশ্লেষণ করাই মূলতঃ এই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল। সেই সময় দেখা গিয়েছিল যে শিক্ষকদের যে বেতন দেওয়া হয় তা যথেষ্ট নয়। নুরুল্যা এবং নায়েক এ বিষয়ে সঠিকভাবেই বলেছেন—'The emoluments offered and conditions of service were not generally very attractive'। ১৮৮৩-৮৪ খ্রিঃ 'Grant in aid' যুক্ত স্কুল এবং সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন স্কুলের বেতন কাঠামোর যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হত।[৬২]

১৮৫৪-১৮৮২ খ্রিঃ হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে সেই সময় দ্রুত গতিতে মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটেছিল। 'Indian Education Commission'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী যেখানে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন মাধ্যমিক স্কুলে সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ।

		প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		ছাত্রসংখ্যা[৬৩]
1855	→	169	→	18,335
1882	→	1363	→	44605

১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছিল ও উৎসাহ দিয়েছিল। Indian Education Commision-এর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে এর ফলে ১৮৮১-৮২ খ্রিঃ ৩৯১৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০১-২ খ্রিঃ দাঁড়িয়েছিল ৫১২৪টি এবং ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ২,১৪,২৭৭ জন থেকে ৫,৯০,১২৯ জন।[৬৪] সেই সময় উপযুক্ত শিক্ষক গঠন করার তাগিদে পুরোনো শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থাৎ মাদ্রাজ এবং লাহোরের প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি আরো শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা ভাবা হয়েছিল।

এর পরবর্তীতে ১৯০৪ সালের 'Indian University Commession' উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপরও নজর দিয়েছিল। সেখানে সরকারি ব্যয় ছাড়াও Central Grants to education-এর মাধ্যমে সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে আরও অধিকতর হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছিল। ১৯০১-০২ সালের একটি হিসেবে দেখা যায় যে সেই সময় দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল ৮৪৯৩টি এবং মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬,২২,৭৬৮টি।[৬৫] Indian University Commession-এর সুপারিশ অনুযায়ী ১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণীত হয়। ১৮৮২ থেকে ১৯০২ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল। এক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগেও প্রচুর বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু সেগুলোর শিক্ষার মান সব সময় উন্নত ছিল না। সেই নিরিখে লর্ড কার্জন যে নীতি নিয়েছিলেন, সেই '....new policy in secondary education had too important aspects control and improvement.[৬৬] প্রথমটির দ্বারা ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্কুলগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করে সরকার এবং 'grant in aid' প্রথার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করার পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণাধীন করে তোলে। এই সময় ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভও বাধ্যতামূলক করা হয়। অবশ্য সরকারি নীতির মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলোর স্বাধিকার সরকার নষ্ট করছেন বলে কোনো কোনো মহল থেকে অভিযোগ তোলা হয়। এ সত্ত্বেও আমাদের স্বীকার করতে হবে যে লর্ড কার্জন একদিকে যেমন সরকারি স্কুলগুলোর পাশাপাশি 'grant in aid'-এর মাধ্যমে বেসরকারি স্কুলগুলোর উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। এর পাশাপাশি শিক্ষকদের শিক্ষাকার্যের উপযুক্ত করবার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষক শিক্ষণ দানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এছাড়া মাধ্যমিক পর্যায়ে মাতৃভাষাকেই যাতে শিক্ষার মাধ্যম করা হয় এ সম্বন্ধীয় সুপারিশ এ সময় করা হয়েছিল।[৬৭]

জাতীয় শিক্ষা ঃ (১৯০৫)

ইতোমধ্যে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে জাতীয় শিক্ষার একটি ধারা সারা বাংলাকে প্রভাবিত করে তুলেছিল এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সংগঠিত রাজনৈতিক সচেতনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। তখনও শিক্ষকদের সংগঠিত ভাবে অর্থনৈতিক দাবি না তুলতে দেখা গেলেও রাজনৈতিকভাবে এই জোটবদ্ধতা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

কুখ্যাত কার্লাইল সার্কুলারের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের স্বদেশি আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ করলে স্বদেশি নেতারা বিকল্প জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন। অবশ্য ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ভগবত চতুষ্পাঠী স্থাপনের মাধ্যমে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বদেশি শিক্ষার ভ্রূণ প্রথম প্রোথিত করেছিলেন।[৬৮] স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে বিশ্বাসী সতীশচন্দ্র ঘোষণা করেছিলেন, 'This alien system of education did not teach our students to be self reliant self sacrificing and patriotic'।[৬৯] ইতিমধ্যে ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্বদেশি শিক্ষার ক্ষেত্রে আরেকটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ দেশীয় ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে প্রাচীনকালের গুরুগৃহে বসবাস সদৃশভাবে এবং সংগীত নৃত্যে ও দৃশ্যকলার সংমিশ্রণে একটি আনন্দময় শিক্ষা পরিবেশ তৈরি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে তিনি বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, যা সে যুগে প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে একটি সাহসী পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে লর্ড কার্জনের শিক্ষানীতির সদর্থক দিকটি জাতীয় নেতাদের নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। পরিবর্তে Bengalee, The Indian Mirror, The Amritabazar Patrika' প্রভৃতিতে শিক্ষা ব্যবস্থায় অতিরিক্ত সরকারি নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করা হয়েছিল। স্বনির্ভতার লক্ষ্যে বিদেশি 'বয়কট' এবং 'স্বদেশি' প্রচারের পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষা প্রসারের দিকেও জাতীয় নেতারা সজাগ দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

ডন সোসাইটির পথ বেয়েই ১৯০৫ খ্রিঃ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁর 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলেন এবং সেই সময়কার জাতীয় নেতারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'গোলদীঘির গোলামখানা' বলে চিহ্নিত করেন। যাইহোক আন্দোলনের পথ বেয়ে ১৯০৬ খ্রিঃ 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' গঠিত হয় এবং সেই শিক্ষা পরিষদের মাধ্যমে বাংলায় ছড়িয়ে থাকা জাতীয় বিদ্যালয়গুলোকে একটি ছাতার তলায় আনা হয়।[৭০] তবে এখানেও শিক্ষকদের স্বেচ্ছাশ্রমের উপরই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। যদিও অরবিন্দ ঘোষকে ৭৫ টাকা মাসিক বেতনে নিয়োগ করার মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় শিক্ষকদের গ্রাসাচ্ছানের বন্দোবস্ত করার দিকেও জাতীয় শিক্ষা পরিষদ নজর দিয়েছিল। মূল জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে আমরা অরবিন্দ ঘোষ এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছাড়াও বিনয় সরকার, গিরীন্দ্রলাল মুখার্জী এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্তের কথা উল্লেখ করতে পারি। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার হিসেব করলে দেখা যায় যে ১৯০৬ খ্রিঃ মাত্র ১৭৯ জন ছাত্র প্রথাগত ভাবে এখানে ভর্তি হয়েছিল। ডঃ অমিতাভ মুখার্জী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—'The small number of students did not, however, dampen the enthusiasm of the teacher who took up their task in all seriousness.'[৭১] এক্ষেত্রে কিন্তু শিক্ষকদের উৎসাহের উল্লেখ থাকলেও তাদের বেতন সম্বন্ধে খুব একটা কিছু জানা যায় না। রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক এবং ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি বা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরি যে বিপুল অর্থ জাতীয় পরিষদকে দিয়েছিলেন, তা অবশ্যই কলেজের গবেষণাগার, গ্রন্থাগার প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যয় করা হত। তবে একটি হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯১৮ সাল নাগাদ জাতীয় শিক্ষা পরিষদে ছাত্রদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত 'Extension lectares'-এর বন্দোবস্ত করা

হত, তাতে ১২-১৫ হাজার টাকা বাৎসরিক ব্যয় হত।[৭২] অবশ্য 'National Council'-এর memorandum of association-এ (aa) ধারায় বলা হয়েছিল যে, 'To provide a superannution fund for the professors, lecturers, officers and servants of the Association or otherwise assist them, their widows and children.'[৭৩] এর থেকে বোঝা যায় যে শিক্ষক ও কর্মচারীদের গ্রাসাচ্ছদন সম্পর্কে পরিষদ একেবারেই উদাসীন ছিল তা নয়। তবে তখনও শিক্ষকদের বেতন সম্বন্ধে আগ্রহকে অর্থগৃধ্নুতার প্রকাশ বলেই মনে করা হত। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত এই শিক্ষাক্রমের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতেই পারে। অন্ধকার প্রকোষ্ঠের একধারে নির্জন সাধনার ধারা হিসাবে যে শিক্ষা ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক যুগে গড়ে উঠেছিল। তার ব্যতিক্রম হিসাবে, ১৯০৫-এর দশকে শুরু হওয়া বঙ্গভঙ্গ জনিত কারণে সৃষ্টি হওয়া জাতীয় শিক্ষার এই ধারাই রাষ্ট্র গুরু সুরেন্দ্রনাথের ভাষায় ছাত্রও শিক্ষকদের শিখিয়েছিল, 'Agitate, Educate and organise' হবার কথা।[৭৪] দেশের এক সংকট মুহূর্তে রাজনীতি, সামাজিক পরিবেশ এবং শিক্ষা ভাবনা কীভাবে পরস্পর সংমিশ্রিত হয়-—হতেই হয়, তা বাংলার শিক্ষক-ছাত্রদের প্রথম শিখিয়েছিল এই জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা। বঙ্গভঙ্গ—স্বদেশি এবং বয়কট আন্দোলন—এবং স্বদেশি শিক্ষা ব্যবস্থা শুধুমাত্র পরস্পরের পরিপূরক মাত্র ছিল না, তার উপরেও ছিল পরস্পর সংমিশ্রিত। উপরে উল্লিখিত 'Agitate, Educate and Organise' এই তিন মন্ত্রে দীক্ষিত তৎকালীন 'স্বদেশি' শিক্ষকেরা, স্বদেশি সময়ের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এক পণ্ডিতের কথায় 'These slogans or magic mntrax singularly defined the three needs that impelled the formtion of National Council of Education : the need to 'Agitate' against an anti-national move (the Partition of Bengal), the need to 'Educate' our students on national lines and the need to 'Organize' the National Council of Education'.[৭৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক, ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, তারকনাথ পালিত, নীলরতন সরকারের মতো সে যুগের মনিষীরা জাতীয় শিক্ষাধারাকে বজায় রাখতে তাদের অর্থ সামর্থ্যকে উজাড় করে ঢেলে দিলেও, তা যেন অনেকটাই ছিল আলঙ্কারিক। এমনকি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে, এই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হিসাবে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ কাজ করতে শুরু করলেও, তাও যেন ছিল কিছুটা আলঙ্কারিক। আসলে এই প্রতিষ্ঠানটিকে ধরে রেখেছিলেন 'ডন সোসাইটি' এবং ডন সোসাইটি খ্যাত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—আদ্যন্ত স্বদেশি এই মানুষটি সদর্পে বলতেন, 'Foreign education has failed to produce original men amongst us. Must then the same system be still persisted in? Foreign education has not enabled us to be self reliant, self dependent, self saerificing, patriotic.'[৭৬] তাই আমরা বলতেই পারি, পরবর্তীকালে, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে যে সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলনের কথা এবং তার সঙ্গে জড়িত রাজনীতির কথা বারে বারে আসবে, তার সূচনা হয়েছিল স্বদেশি যুগেই আচার্য সতীশচন্দ্রের হাত দিয়ে। জাতীয় শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত এমন একজনও শিক্ষক ও ছাত্রকে আমরা ইতিহাসের আলোকে খুঁজে পাবো না, যারা শুধুমাত্র গ্রন্থকীটের মতো মুখস্থ বিদ্যার ঠেলা গাড়ী ঠেলে, 'কেরিয়ার' গোছা—নার সোপান স্বরূপ লেখাপড়াকে ব্যবহার করেছেন। এই শিক্ষা ব্যবস্থার যারা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ থেকে সতীশচন্দ্র, তাঁদের সবাই ছিলেন, সমাজ সচেতন—রাজনীতি

সচেতন পূর্ণাঙ্গ মানুষ। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের তালিকায় যারা ছিলেন, তাদের মধ্যে আমরা ইংরেজি সাহিত্যের দিক্‌পাল রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, সমাজতাত্ত্বিক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ইতিহাসের শিক্ষক স্বনামধন্য সখারাম গণেশ দেউস্কর, সংস্কৃত পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ ছাড়াও গণিতের মহেন্দ্রনাথ দে, পদার্থবিদ্যায় জগদীন্দু রায়, রসায়নের মনীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, জীববিজ্ঞানের বিপিনবিহারী চক্রবর্তীর কথা উল্লেখ করতে পারি।[৭৭] এছাড়া তৎকালীন বিখ্যাত প্রকৌশলী বি. বি. রানাডের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তি বিদ্যা বিভাগটিও সুগঠিত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে সবার কথা বলতে গেলে, বর্তমান গবেষণা পত্রটি নামাবলীতে পরিণত হবে। তাই সেই প্রচেষ্টায় ইতি টেনে আমরা কোলকাতাকেন্দ্রিক উচ্চশিক্ষায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অবদানের বাইরে, সারা বাংলা জুড়ে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা বিস্তারে 'পরিষদের' কার্যাবলীর কিয়দংশ উল্লেখ করব। আমরা জানি 'লায়ন সার্কুলার' বা কার্লাইল সার্কুলাকে কাজে লাগিয়ে ছাত্রদের ঔপনিবেশিক সাহায্যাধীন বিদ্যালয়গুলি থেকে বিতাড়ন করা শুরু হলে, একটি বিকল্প মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামো গড়বার ক্ষেত্রেও জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। রঙপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, চাঁদপুর, ময়মনসিং, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, বগুড়া এবং খুলনার জাতীয় বিদ্যালয়গুলিকে সহায়তা দান ও 'পরিষদ' কর্তৃক স্বীকৃতি দানের কথা আমরা জানতে পারি। অমিতাভ মুখার্জীর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, 'It is interesting to note that most of these schools were initially organized with promises of local financial support. In the case of the Rangpur National Institution many of the school committee members subscribed Rs. 100/- per month each for maintaining the school.'[৭৮] আন্দোলনরত ছাত্রদের সরকার আদেশ অনুযায়ী শাস্তি না দেওয়ায় রঙপুর জেলা স্কুলের বহিস্কৃত প্রধান শিক্ষক কালিপ্রসন্ন দাশগুপ্তের নেতৃত্বে প্রথম স্বদেশি স্কুল রঙপুরেই স্থাপিত হয়েছিল।[৭৯] তবে এই টাকায় এইসব স্বদেশি স্কুলের আর্থিক প্রয়োজন সম্পূর্ণরূপে মিটতো না। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশীয় জমিদারদের কাছ থেকে দান সংগ্রহ করে জাতীয় শিক্ষাপরিষদ এইসব বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন ব্যায় ও শিক্ষক বেতনের জন্য ভর্তুকি প্রদান করতে প্রথম থেকেই সচেষ্ট ছিল। আমরা দেখতে পাই যে এই সমস্ত বিদ্যালয়কে 'Grant in aid' দেবার জন্য পরিষদ একটি উপসমিতিও গঠন করেছিলেন। যে উপসমিতির সদস্য ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ও মনমোহন ভট্টাচার্যের মতো স্বদেশ হিতৈষীরা।[৮০] উদাহরণ হিসাবে আমরা রঙপুর এবং ঢাকার জাতীয় বিদ্যালয়কে প্রদত্ত যথাক্রমে মাসিক ১২৫ এবং ১০০ টাকা অনুদানের কথা উল্লেখ করতেই পারি। আরো বহুসংখ্যক বিদ্যালয়কেই এরকম অনুদান দেওয়া হত। সবগুলির নামোল্লেখ করা আমাদের গবেষণা নিবন্ধের মূল সুরের ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজনীয় নয় বলেই মনে করি।

স্বাভাবিকভাবেই স্বদেশি পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত, স্বদেশি ভাবাপন্ন বিদ্যালয়ের দাতাসমূহ, স্বদেশি ছাত্রদের পরিবেষ্টনে এই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা, সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলনের পূর্বসূরি হিসাবে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকেই ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সঙ্গীতের অর্গল মুক্ত হয়ে মুক্ত রাজনৈতিক চিন্তায় সুস্নাত হতে পেরেছিলেন। যার প্রভাব পরবর্তীকালের শিক্ষক আন্দোলনের

আর্থ-রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অবশ্যই পড়েছিল। অনেকেই ছাত্রানাম্ অধ্যনয়ং তপঃ তত্ত্বের পাশাপাশি শিক্ষকদের সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানকে শিক্ষা ক্ষেত্রে অসমীচিন বলে মনে করেন। কিন্তু বিখ্যাত ঐতিহাসিকদ্বয় হরিদাস মুখার্জী ও উমা মুখার্জী সঠিক ভাবেই বলেছেন, 'The fundamental object of the N.C.E.'s scheme of studies was the ''quickening of the national life of the people for the realisation of the national destiny''.[৮১] এর মধ্য দিয়েই আমরা বুঝতে পারি, বুনোরামনাথরা সেই সময় থেকেই অতীতের যাদুঘরে স্থান লাভ করেছেন—এগিয়ে আসছেন সেই শিক্ষককুল যাঁরা শুধুমাত্র তাদের ছাত্রদের 'বন্ধু দার্শনিক ও পথপ্রদর্শক নয়—এর পাশাপাশি দেশের আর্থ-রাজনৈতিক জীবনেরও নিয়ন্ত্রক। এরই ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই ১৯০৬-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কোলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে, 'National Education was accepted as an integral point in the congress programme.'[৮২]

আমরা বিংশ শতকের প্রথম পাদে, অনেক শিক্ষককেই ব্যক্তিগত ভাবে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিতে দেখি। এপ্রসঙ্গে 'মাস্টার মশাই' জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ বা 'মাস্টারদা' সূর্য সেনের নাম উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা যেতেই পারে। 'মাস্টার মশাইদের এই 'স্বাধীনতা স্পৃহার ব্যাপক ভাবে সূচনা হয়েছিল কিন্তু ১৯০৫ থেকে সংগঠিত জাতীয় শিক্ষার মধ্য দিয়েই। 'জাতীয় শিক্ষার' সঙ্গে যুক্ত অরবিন্দ ঘোষ বা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতো শিক্ষকেরা তো বটেই বিনয় কুমার সরকারের মতো জাতীয় শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এককালীন ছাত্রও পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিবিধ পর্বে সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বিনয় কুমার সরকার পরবর্তীকালে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ঘনিষ্ঠ হয়ে ছিলেন। তাঁর লেখা সমিতির মুখপত্র শিক্ষাও সাহিত্যেও প্রকাশিত হতো। এরকম একটি লেখার বিনয় সরকার লিখেছিলেন 'আমরা স্কুল মাষ্টার। ছেলে পিটানো আমাদের পেশা। আমাদিগকে গরু বিবেচনা করা হইতেছে, দেশের লোকের রেওয়াজ। আজকাল কিন্তু গরুর সেবা করিবার জন্য সর্বত্র খেয়াল দেখা যাইতেছে।....অথচ মাষ্টারগুলোর উন্নতি বা জীবন বৃদ্ধির চর্চা বেশি হয় না। গরুর সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টারদের সেবা করিবার আন্দোলনও বাংলা দেশে প্রবল হইতেছে না কেন?'[৮৩] এই বক্তব্যের মধ্যে লুক্কায়িত শ্লেষের বিশ্লেষণ অপ্রয়োজনীয়।

এই প্রসঙ্গে ১৯০৬ থেকে ৫৬ অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রাথমিক উন্মেষ থেকে, স্বাধীনোত্তর কালে তারই ভ্রূণ থেকে জন্মানো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস এর একটি সংকলনে 'Ex-student' ছদ্মনামে এক লেখক মন্তব্য করেছেন, 'The teachers and students of the different institutions under the National Council of Education, Bengal have played a very active part in all phases of the revolutionary movement,....Indeed it will not an exaggeration to say that in the various early institution under the council there were not many teachers and students who were not either closely or indirectly connected with some or other revolutionary party or one or other revolutionary activity.'[৮৪] শুধুমাত্র বিপ্লবী আন্দোলনে নয়—গান্ধীজী পরিচালিত অহিংস অসহযোগ অথবা আইন অমান্য আন্দোলনে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বিশেষ করে জাতীয়

শিক্ষা পরিষদের গর্ভজাত কলেজ অভ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির (অধুনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) শিক্ষকরা বহুল সংখ্যায় যোগ দিয়েছিলেন। উপরোক্ত লেখক এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'The students and teachers of this period were predominantly nationally minded and joined each and every spurt of National Movement, each and every one of its phases–some pluging into the moevement headlong'.[৮৫] বর্তমান প্রসঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার কোন জায়গা নেই। শুধু এইটুকুই আমাদের মনে রাখতে হবে, পরবর্তীকালে শিক্ষকেরা যখন ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা বা স্বাধীনোত্তর ভারতে বা বিশেষ করে বাংলায় তৎকালীন সরকারের বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের বিরুদ্ধে 'শান্ত' বা 'অশান্ত' লড়াই চালিয়েছিলেন, তখন তাদের মনে পূর্বজদের এই সংগঠিত রাজনৈতিক লড়াইয়ের স্মৃতি অবশ্যই জাগ্রত ছিল। এই কথাটা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা সত্যপ্রিয় রায় যখন চট্টগ্রাম কানুনগো পাড়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তখন তাঁর মধ্যেও স্বদেশ চেতনার স্ফুলিঙ্গ দেখা দিয়েছিল। স্বাধীনতাপ্রেমী ছাত্রদের উপর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অত্যাচাররত ব্রিটিশ সৈন্যদের তিনি প্রায় একার উদ্যোগে স্কুল পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন।[৮৬] পরবর্তীকালের সংগঠিত শিক্ষকদের নানা পর্যায়ের নেতা কর্মীদের মধ্যেও আমরা এরকম উদাহরণ খুঁজে পাব। এই সংগঠিত সংগ্রামের চেতনা পরবর্তীকালে, শিক্ষকদের শিক্ষা সংক্রান্ত আন্দোলনে অবশ্যই পড়েছিল—এ বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ নেই।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের শিক্ষা আন্দোলন অবশ্য ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই মন্দীভূত হয়েছিল এবং স্যার আশুতোষের নেতৃত্বে উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে মাধ্যমিক শিক্ষাও পরিকাঠামোগত ভাবে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়েছিল।

আশুতোষ ও অন্যদের শিক্ষা ভাবনার ফলিত রূপ

'স্বদেশি' পরবর্তী পর্যায়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষা সংস্কার বিশেষতঃ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিল। ১৯০৬-১৯১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ের উপাচার্য হিসেবে তিনি যে সমস্ত সমাবর্তন ভাষণ দিয়েছিলেন সেগুলোতেই তাঁর শিক্ষাসংস্কারের মূল সুর ধ্বনিত হয়েছিল। তিনি স্কুল, কলেজ, ও বিশ্ববিদ্যালয়কে পরস্পর নির্ভরশীল এবং সম্পর্কযুক্ত প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতেন। আশুতোষের শিক্ষাচিন্তার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল যে মাধ্যমিক পর্যায়ে মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। তিনি বলেছিলেন, 'I shall presume the existence of a net work of well organised schools, training pupils for real university education, which is a development, an amplifkation and in many respect, a complement of school education.'[৮৭]

এটা ঠিকই যে, আশুতোষ ক্রমনিম্নপরিশ্রুতি মতবাদে বিশ্বাস করতেন এবং সেইজন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উপরেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯০৪ খ্রিস্টাদের আইনে মাধ্যমিক স্কুলগুলো পরিচালনার দায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল সে সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। সেই সময় সংযুক্তবঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় ছয়শোটি স্কুল ছিল। এই স্কুলগুলোর অবস্থা খুব একটা সন্তোষজনক ছিল না। তাঁর মতে,

....'মৃত্তিকার তলদেশ থেকে প্রাণরসটি আহরণ ভিন্ন যেমন গাছের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায় না, ...তেমনি স্কুল....গুলি যদি সুগঠিত ও সুপরিচালিত না হয়, যদি সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিহীনভাবে না গড়ে ওঠে এবং ছাত্রদের মানসিক ও শারীরিক উৎকর্ষ বিধানে গোড়া থেকে মনোযোগ না দেওয়া যায়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রাণরস আহরণ করবে কোথা থেকে?'[৮৮]

সেই সময় প্রথম দিকে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে স্বদেশি শিক্ষা আন্দোলনের ফলে সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ছাত্রদের আস্থা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং তারা বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলদীঘির গোলামখানা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিকরণের বিরোধী ছিলেন। ১৯০৮ খ্রিঃ তাঁর দ্বিতীয় সমাবর্তন ভাষণে তাই তিনি বলেছিলেন, 'বিদ্যার্থীগণ! শিক্ষাক্ষেত্রের বাইরের লোকদের দ্বারা তোমাদের জ্ঞানার্জনের পথ বিঘ্নিত হতে দিও না। ভুলে যেও না, ছাত্রাবস্থায় ছাত্রদের স্বাভাবিক কর্তব্য রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি নয়, কিম্বা রাজনীতি ক্ষেত্রে আনাগোনা করা নয়।'[৮৯] ছাত্রদের মতো শিক্ষকদেরও সক্রিয় রাজনীতি করবার বিরোধী ছিলেন আশুতোষ। তাঁর মতে ছাত্রদের পথপ্রদর্শক হলেন শিক্ষক, তাই তাদেরও জ্ঞান তপস্বী হিসেবে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা উচিত। আশুতোষের রাজনৈতিক এই মতবাদ সম্পর্কে অবশ্যই বিতর্কের অবকাশ আছে। যেহেতু দেশে রাজনীতির সঙ্গে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত আছে, তাই ছাত্ররা রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণভাবে বিযুক্ত থাকবে এটা হতে পারে না।

স্কুলস্তরের পাঠ্যক্রম সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ করে প্রবেশিকা স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে প্রকাশ শক্তি, যুক্তিশক্তি এবং দর্শনশক্তির উন্নয়নের দিকে নজর দিয়েছিলেন। যুক্তি শিক্ষার জন্য গণিত ও জ্যামিতি এবং দর্শন শিক্ষার জন্য পদার্থবিদ্যা ও কলাবিদ্যার অনুশীলন করা দরকার বলে আশুতোষ মনে করতেন।[৯০] এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন সম্বন্ধে আশুতোষ সচেতন হলেও মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের বেতন সম্বন্ধে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে কোনো পরিকল্পনা করেন নি। তবে দেশীয় ভাষায় প্রবেশিকা পরীক্ষার বন্দোবস্ত করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন[৯১] মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজির ওপর গুরুত্ব দেওয়া ফলে ছাত্রদের অকৃতকার্যতার সংখ্যা তাঁকে ভাবিত করেছিল। একটি হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে যে,

Entrance Exam of	No. of Candidated appeared	No. of Candidateds passed	No. of Candidates failed in			
			English	2nd Language	History & Geography	Mathematics[৯২]
1869	1730	817	577	257	334	631
1870	1905	1099	543	302	237	421
1871	1902	767	736	377	667	669
1872	2144	938	865	321	722	534
1873	2544	848	1095	404	931	1232

অর্থাৎ বিদেশি ভাষা ইংরেজির মতো বাংলায়ও অনেক দুর্বলতা থেকে যাচ্ছে ছাত্রদের।

এই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই আশুতোষ অন্ততঃ মাধ্যমিক পর্যায়ে মাতৃভাষা শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় পর্যায়ের উপাচার্য থাকাকালীন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ৯০০ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকদের স্কুলগুলোর উন্নয়ন কীভাবে করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য আহ্বান করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন রেজিস্টার জে. পি. ঘোষের স্বাক্ষরে ১৯২১ খ্রিঃ ১১ এপ্রিল তারিখ সমন্বিত চিঠিতে বলা হয়েছিল—'Dear Sir, The Hon'ble Vice-Chancellor and Syndicate have decided to call an informal conference of Head Masters of Recognised Schools to consider what steps may be taken up by the University to facilitate the introduction of scientific and vocational education in our School.'[৯৩]

এছাড়া তিনি স্কুল ম্যানেজিং কমিটির প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলনে আহ্বান করেছিলেন। সেখানেও মূলতঃ স্কুলগুলির পরিচালন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হলেও শিক্ষকদের স্বল্প বেতনের কারণে অসহনীয় জীবনযাত্রার উন্নয়নের দিকে যেরকম কোনো নজর দেওয়া হয় নি।[৯৪] আসলে তখনও পর্যন্ত দেশের দেশের শিক্ষা শাস্ত্রীদের মধ্যে শিক্ষকদের দারিদ্র্যের মধ্যে ব্রতরক্ষাকারী হিসেবে একটি কাল্পনিক চরিত্র হিসেবে মনে করা হত। সমাজের অন্যান্য পেশার মানুষদের মতো তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যা সম্পর্কে অনেকেই উদাসীন ছিলেন। অন্ততঃ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের সম্পর্কে আশুতোষের মনোভাব তার ব্যতিক্রম ছিল না।

আশুতোষ মূলগত ভাবে শিক্ষক ও ছাত্রদের রাজনীতি করা পছন্দ না করলেও, শিক্ষকদের শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জোহুজুর কর্মচারী' হিসাবে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোয় শিক্ষকদের যুক্ত করতে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। 'ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন' ১৯০৪ বিধিবদ্ধ হবার পূর্বে, তিনি বলেছিলেন, 'Are our teachers through out the country qualified to be trusted with the principle of election? If they are not, let us say so in unmistakble terms and I add without hesitation if that be our decision and if our teachers really deserve this want of confidence, the sooner we throw this Bill into the waste paper basket the better for everybody concerned'.[৯৫] নির্বাচনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালক মণ্ডলীতে সর্বস্তরের শিক্ষক প্রতিনিধিদের আনয়নের এই চেষ্টা তখনকার মতো ব্যর্থ হলেও পরবর্তীকালে শিক্ষকদের এই দাবি আংশিকভাবে হলেও পরিপূরিত হয়েছিল। শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় নয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় ও পরে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নীতি নির্ধারক কমিটিগুলিতে অত্যল্প হলেও, শিক্ষকেরা প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, অনেক আন্দোলন সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসাবে। আর পরবর্তীকালের এই আন্দোলন সংগ্রামের পরোক্ষভাবে হলেও প্রেরণা ছিলেন স্যার আশুতোষ। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।[৯৬] স্কুলের ছাত্রদের 'অধ্যয়নং তপঃ' নীতিতে বিশ্বাসী হয়েও, স্কুলগুলি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল বলে.....ছাত্রদের থাকার জায়গা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে আশুতোষ....স্কুলগুলিকে সচেতন থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে ছাত্রদের তো ইংরেজি ও অঙ্ক জানতে হবেই। পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বাড়াতে বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা

ও অজৈব রসায়নের কিছু পরীক্ষা পাঠক্রমে থাকতে হবে।[৯৭] তিনি জানতেন বেশির ভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই ধরনের কাজ চালাবার পরিকাঠামো নেই। সেই পরিকাঠামো গড়ে তোলবার জন্য সাধ্যমতো সচেষ্ট হয়েছিলেন আশুতোষ।

আশুতোষের সমকালীন বিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের শিক্ষা চিন্তা নিয়ে আলোচনা না করলে, বাংলায় নবজাগরণ জাত শিক্ষা চিন্তার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। জীবনের বেশির ভাগ সময়টাই বিহার প্রদেশে শিক্ষাদানের কাজে লিপ্ত থাকলেও, বাংলার শিক্ষা জগতের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য তিনি যথেষ্ট পরিমাণে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এটা ঠিকই স্যার আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তৎকালে, সেই প্রতিষ্ঠানটির অধীনস্থ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তার বদলে সরকার যদুনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করলেও, 'আশুতোষ পন্থী' সেনেট/সিন্ডিকেট এর সদস্যরা যদুনাথের বিভিন্ন শিক্ষা সংস্কারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।[৯৮] উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত এই সব বিরোধ পরোক্ষে সামগ্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়েরই ক্ষতি সাধন করেছিল। অবশ্য বর্তমান নিবন্ধের প্রেক্ষিতে তা আমাদের আলোচ্য নয়। আজকে আমরা মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে যদুনাথের চিন্তার অতি সংক্ষিপ্ত একটি রূপরেখা অঙ্কন করতে চেষ্টা করবো মাত্র।

তার মতানুযায়ী, 'আমাদের মধ্যে অনেক দক্ষ শিক্ষক দেখা দেন, নিজ জীবনে তাহারা চূড়ান্ত সফলতা লাভ করেন; কিন্তু তাহা তাহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পায়,.....কারণ আমাদের কর্মীদের মধ্যে ভাবের বিনিময় নাই, সমবেত চেষ্টা নাই; শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন নূতন আবিষ্কার, মত (theory) আদর্শ বা পরীক্ষার ফল (experiment) আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী আলোচনা করেন না, জানিবার চেষ্টাও করেন না।[৯৯] শিক্ষকদের পারস্পরিক মতামত বিনিময় ও শিক্ষকতা বৃত্তিকে মহনীয় করার উদ্দেশ্যে 'শিক্ষক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হলে, উপরোক্ত সংযোগের অভাব বহুল পরিমাণে দূরীভূত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন। তার আক্ষেপোক্তি, 'কালাপানীর ওপার হইতে এই শিক্ষা তরঙ্গের অতি প্রতিধ্বনিও বঙ্গে আমাদের শিক্ষক সম্প্রদায়ের কর্ণে পৌঁছিয়া তাহাদের তন্দ্রার ব্যাঘাত করিতেছে না—কারণ তাঁহাদের জানাইবার লোক নাই, কাগজ নাই, চেষ্টা নাই।'[১০০] তাই আমাদের শিক্ষকদের সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সমষ্টিগতভাবে শিক্ষা ও শিক্ষক সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের মতে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কার্যধারা, যদুনাথের স্বপ্ন পূরণের একটি সোপান শ্রেণি হিসাবে অবশ্যই কাজ করেছিল।

যদুনাথ শুধুমাত্র শিক্ষকদের 'আদর্শ গুরু' হিসাবে দেখেননি। তাদের দিনাতিপাত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণেরও পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তার জবানীতে 'বর্তমানে দৈনন্দিন জীবন যাত্রা নির্বাহের ব্যয় অতিরিক্ত মাত্রায়, বৃদ্ধি পাওয়ায়, শিক্ষকদের পূর্বতন হারে প্রদত্ত বেতন দ্বারা সংসার প্রতিপালন করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যালয় সংক্রান্ত সকল খরচাই এখন অত্যন্ত বেশি হইয়াছে। এখন সকলেই বিশেষ করিয়া শিক্ষক সম্প্রদায় অর্থকষ্টে পড়িয়াছেন।'[১০১] শুধুমাত্র সমস্যার কথা বলেই যদুনাথ তাঁর বক্তব্যে 'দাঁড়ি' টানেন নি, ছাত্রদের

চরিত্র গঠন কাজে নিয়োজিত শিক্ষকদের অর্থনৈতিক সমাধানের পথ বাতলাতেই তার নিজের মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উচিত, শিক্ষক সম্প্রদায় যাহাতে সর্বদা দারিদ্র্য-পীড়িত না হইয়া, যথোপযুক্ত বিশ্রামাবকাশ পাইয়া ও আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রসন্ন চিত্তে তাহাদের মহৎ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, সেদিকে দৃষ্টি রাখা, নতুবা বিদ্যালয়ের অতি অল্প বেতনে দৈনিক চার পাঁচ ঘণ্টা পড়াইয়াও অন্ন সংস্থানের জন্য প্রাতঃসন্ধ্যা সব অবসর সময়ে গৃহ শিক্ষকের কাজে ব্যয় করিলে, ৺রামতনু লাহিড়ী, ৺রাজনারায়ণ বসু, ৺প্যারীচরণ সরকার অথবা ৺শিবচন্দ্র সোমের ন্যায় শিক্ষক হওয়ার কল্পনা করা বৃথা।'[১০২]

যদুনাথের শিক্ষা সংক্রান্ত এই বিশ্লেষণ আমাদের মুগ্ধ না করে পারে না। এর আগে 'বাংলার নবজাগরণ প্রসূত' শিক্ষা শাস্ত্রীরা আভাসে ইঙ্গিতে বললেও, শিক্ষকদের 'ব্রত' ও 'বৃত্তির' সম্পর্কটি যদুনাথ তাঁর বক্তব্যের মধ্যে সুন্দর করে তুলে ধরেছেন। যা পরবর্তীকালের শিক্ষক বৃন্দের অর্থনৈতিক সংগ্রামে অবশ্যই একটি আলোক বর্তিকার কাজ করেছে।

আশুতোষের প্রায় সমসাময়িক, যদিও অনেক আগেই অকাল প্রয়াত স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা ও শিক্ষক সম্পর্ক ও ভাবনা সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। একদিকে, 'স্বদেশি ভাবনার শিক্ষা' এবং অন্যদিকে 'ইউরোপীয় মডেলের শিক্ষা' কোনোটিকেই পুরোপুরি গ্রহণ না করে, এর বিপ্রতীপে বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তা প্রবাহিত হয়েছে। তাঁর মতে, 'বিদ্যা শিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া? —না নানাবিধ জ্ঞানার্জন? —তাও নয়। যে শিক্ষা দ্বারা (মানুষের) ইচ্ছাশক্তির বেড়া ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা।'[১০৩] শিক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি এমন মানুষ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, যারা হবে 'Iron nerves with a well intelligent brain and the whole world is at your feet'।[১০৪] স্বাভাবিক ভাবেই মানুষ তৈরি করার কারিগর হিসাবেই শিক্ষকদের চিহ্নিত করেছিলেন তিনি। মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীকে, জ্ঞানার্জনের দ্বারা প্রকাশিত হতে সাহায্য করাই—প্রকৃত শিক্ষকের কাজ এটাই বিবেকানন্দের বিশ্বাস ছিল। ভাববাদী বিবেকানন্দ প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহে বসবাস করে, যে শিক্ষা ধারা প্রচলিত ছিল স্বপক্ষে সওয়াল করলেও, বর্তমান কালে তার সীমাবদ্ধতা নিয়ে সচেতন ছিলেন। শুধুমাত্র শাসন নয়, তার মতে 'তিনি প্রকৃত আচার্য, যিনি শিষ্যের প্রবণতা অনুযায়ী নিজের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করতে পারেন। প্রকৃত সহানুভূতি ব্যতীত আমরা কখনই ঠিক ঠিক শিক্ষা দিতে পারি না।'[১০৫] শিক্ষকের শিক্ষাদানের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্তির ইচ্ছাকে নিন্দা করেছেন বিবেকানন্দ। শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তাই তিনি বলেছেন, 'তোমরা কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না। কেবল সেবা করিতে পার।.....যদি প্রভুর অনুগ্রহে তাহার কোন সন্তানের সেবা করিতে পারো, তবে ধন্য হইবে।'[১০৬] তবে আমাদের মনে রাখতে হবে—শিক্ষক গুরু যে অত্যন্ত সম্মানীয় এক ব্যক্তি একথা বিবেকানন্দই আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন বার বার—তার গুরুত্বও যুগের নিরিখে বড় কম নয়।

রবীন্দ্রনাথ

রেনেসাঁ যুগের শেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন 'কবি সার্বভৌম' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শুধুমাত্র গান-গল্প-কাব্যের সৃষ্টিশীল উজ্জীবনের মধ্যে তাঁর কাজ সীমাবদ্ধ ছিল না। যে জীবন

দর্শন দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেই দার্শনিক চিন্তাকে বাস্তবের মাটিতে হাতে কলমে পরীক্ষণ করা তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ ছিল সমবায় ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা সর্বত্রই তার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে, তিনি সেই সব ক্ষেত্রে কর্মে নিযুক্ত করতেন নিজেকে।

শিক্ষাকে তিনি শুধুমাত্র তাত্ত্বিক স্তরে আবদ্ধ রাখেন নি। ছোটবেলা থেকেই নিজের জীবনে তিনি প্রথমে ভৃত্যরাজতন্ত্রের হাতে শিক্ষাদানের পারিবারিক প্রথার কুফল সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। পরবর্তীকালে ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল এবং পরপর নর্মাল স্কুল ও সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে তাঁর পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করেন তাঁর অভিভাবককূল। ঔপনিবেশিক 'দশটা-পাঁচটার কলে ছাঁটা বিদ্যা গ্রহণ প্রথম থেকেই স্পর্শকাতর রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হয়নি। রবীন্দ্রনাথের জবানীতেই আমরা জানতে পারি—'শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিতেন যে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোন প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না। সংবৎসর তাঁহার ক্লাসে আমি সকল ছাত্রের শেষে নীরবে বসিয়া থাকিতাম।'[১০৭]

বাধ্য হয়েই অভিভাবকেরা ছোট রবিকে বাড়িতে পড়ানোর বন্দোবস্ত করেছিলেন। সকাল বেলায় 'কানা পালোয়ান'-এর কাছে শরীর চর্চা থেকে আরম্ভ করে, যদুভট্টের কাছে গান শেখা দিয়ে তাঁর শিক্ষা শুরু হত। তা শেষ হত সন্ধের অন্ধকারে জনৈক অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ইংরাজি শিখনের মধ্য দিয়ে।

যাইহোক বাড়িতে হলেও, চিরকালই রুটিন বাধা শিক্ষণের প্রতি বিরুপতা ছিল তার। অথচ পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছে 'হিমালয় ভ্রমণ' কালীন সময়েই স্বাধীন পাঠের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন—এমন নয়, এর পাশাপাশি ইতিহাস ও জ্যোর্তিবিদ্যায়ও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি হয়েছিল তাঁর। সেই সোনা ঝড়ানো দিনগুলির প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, বাড়িতে আমি নগণ্য বালক ছিলাম এখানে আমার পরে এই সকল গুরুতর কাজের ভার পড়াতে তাহার গৌরবটা খুব করিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম।'[১০৮]

রবীন্দ্রনাথকে বহু পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি শুধুমাত্র উপনিষদীয় ভাববাদী শিক্ষা দর্শনের প্রবক্ত বলে চিহ্নিত করেছেন। হ্যাঁ জীবন দেবতা সংশ্লিষ্ট 'পরাবিদ্যা' তার জীবনে প্রভাব ফেলেছিল—এটা ঠিক। কিন্তু অপরা বিদ্যার গুরুত্ব তিনি কোনদিনও বিস্মৃত হননি। শুধুমাত্র ১৯০৫-০৬-এর জাতীয় বিদ্যালয়ের অন্যতম কর্ণধার হিসাবে নয়—শান্তিনিকেতন পর্বেও রবীন্দ্রনাথ শুধু 'গুরুদেব'-এর ভূমিকা পালন করেননি। এর সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবার জন্য যে টাকা-আনা-পয়সার হিসাব রাখতে হয়—বজায় রাখতে হয়, শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে শৃংখলা সে দিকেও যত্নশীল দৃষ্টি দিয়েছেন।[১০৯]

রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধিই ইংরাজ রাজত্বের 'কেরাণী' তৈরির শিক্ষার বিপরীতে স্বদেশী ভাবধারার শিক্ষার পক্ষপাতী। তাই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ারে যে 'স্বদেশী শিক্ষাধারা' গড়ে উঠেছিল, তখন তাকে তিনি স্বাগত জানাননি শুধু—প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন সেই শিক্ষা আন্দোলনে। ১৯০৬-এর ১৪ই আগস্ট জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসের বক্তৃতায়

তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের বঙ্গমাতার সূতিকাগৃহে আজ সজীব মঙ্গল জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সমস্ত দেশের প্রাঙ্গণে আজে যেন আনন্দ শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে, আজ যেন উপঢৌকন প্রস্তুত থাকে, আজ আমরা যেন কৃপণতা না করি।'[১১০]

তাঁর মতে মুখস্থকেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিপরীতে জাতীয় শিক্ষা হবে স্বাধীন, আত্মশক্তি নির্ভর ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। শুধু আনুষ্ঠানিক বক্তব্য রাখা নয়, স্বদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপনা থেকে পরীক্ষা ব্যবস্থা সব কিছুতেই রবীন্দ্রনাথের কল্যাণ হস্তের স্পর্শে এই প্রতিষ্ঠান ঋদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু কিছু পরেই স্বদেশি শিক্ষা পরিচালকদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং ছাত্রদের একাংশের 'উৎকট উত্তেজনা' তাকে স্বদেশি শিক্ষার প্রাঙ্গণ থেকে দূরে ঠেলে দেয়, এই সময়ে 'শিক্ষক আন্দোলনের ভূমিকা' প্রবন্ধে তাঁর অকপট উক্তি, 'আজ যাঁহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিতেছেন, আমাদের এখনই আস্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয় চাই। কালই সেখানে পরীক্ষা দিতে যাইব, তাহাদিগকে দেশীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্থায়ী সহায় বলিয়া মনে করিতে সাহস হয় না।'[১১১]

এর পরে আমরা আসবো তার 'শান্তিনিকেতন' পর্বের শিক্ষা চিন্তায়। ইতোমধ্যেই সেখানে প্রায় নিজের একক চেষ্টায় 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন তিনি (১৯০১)। বিলাতের 'স্কুল শিক্ষার নজির' আমাদের দেশের পক্ষে অসুবিধাজনক মনে করে। তপোবনকেন্দ্রিক শিক্ষা, গুরু শিক্ষকের একই প্রঙ্গণে অবস্থান জনিত সামীপ্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ধারারই সমর্থক ছিলেন তিনি। তার মতে, 'সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না। তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে। এতদিন আমরা ইস্কুল-কলেজে যে শিক্ষা লাভ করিতেছিলাম, তাহাতে আমাদিগকে পরাস্থ করিয়াছে। আমরা তাহা মুখস্থ করিয়াছি, আবৃত্তি করিয়াছি.....নিঃসংশয়ে চূড়ান্ত সত্য বলিয়া প্রচার করিতেছি। যে ইতিহাস ইংরেজি কেতাবে পড়িয়াছি, তাহাই আমাদের একমাত্র ইতিহাসের বিদ্যা। আমরা কেবল ভয়ে ভয়ে যাই/ভয়ে ভয়ে চাই/ভয়ে ভয়ে শুধু/পুঁথি আওড়াই।'[১১২] তাই 'ভূমৈব সুখম্/নাল্পে সুখমস্তি'র আদর্শে গঠিত হল তাঁর সাধের শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, খোলা আকাশ, খোলা বাতাস, অরণ্যানির নিবিড় সান্নিধ্যে মানব শিশুর শরীর ও মনের সুপরিণতির লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করা। ইংরাজি মতের শৃংখলার বিপরীতে গুরুগৃহে বাস করে স্বভাবজাত পরিমিতিবোধ ও আত্মসংযম অর্জন করাই শিক্ষার অন্যতম কাম্য বলে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল।

তাঁর কথায়, 'আমরা যাঁহাকে ইস্কুলের শিক্ষক করি, তাঁহাকে এমন ব্যবহার করি, যাহাতে তাঁহার হৃদয় মনের অতি অল্প অংশই কাজে খাটে—ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকটা পরিমাণ মগজ জুড়িয়া দিলেই ইস্কুলের শিক্ষক তৈরি করা যাইতে পারে।'[১১৩] তাই প্রচলিত কারাতুল্য বিদ্যালয়ের চরম বিরোধী রবীন্দ্রনাথ, এমন শিক্ষকদের শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় কর্মে নিযুক্ত করতে চাইতেন, যাঁর মধ্যে শিশু সুলভ চাপল্যে ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হবার ক্ষমতা যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে বিদ্যার ভাণ্ডারী হবার যোগ্যতা। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন 'গুরুর অন্তরের ছেলেমানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় তা হলে তিনি

ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন। শুধু সামীপ্য নয়—উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই। নইলে দেনা পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না।'[১১৪]

তবে তপোবনকেন্দ্রিক যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা রবীন্দ্রনাথ চিন্তা করেছেন, তৎকালীন ঔপনিবেশিক শাসনে তো নয়ই, আজকের যুগেও কতটা বাস্তবায়িত হবে, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। আদর্শগত ভাবে হয়তো তার চিন্তায় কোন ফাঁক ছিল না। কিন্তু সেই আদর্শ চিন্তাকে বাস্তবায়িত করবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ছিল অনেকটাই।

আশ্রম স্থাপনের প্রথম যুগে ব্রহ্মবান্ধব উপধ্যায়-এর মতো আদর্শ শিক্ষকের সাহচর্য পেলেও, পরবর্তীকালে তার আদর্শের প্রতিমূর্তি স্বরূপ শিক্ষক তিনি কমই পেয়েছেন, শিক্ষকের ব্রতকার্যের সহায়ক মনে করলেও, তাদের জীবন চর্চার জন্য যে 'বৃত্তি' জাত বেতনেরও প্রয়োজন আছে, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কতটুকু সচেতনতা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

আশ্রমে ব্রতধারী শিক্ষক হিসাবে রবীন্দ্রনাথও কম মানুষকেই পেয়েছেন—যাঁদের পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সতীশচন্দ্র রায়। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'তাঁর পরনে ছিল না জামা, একটা চাদর ছিল গায়ে.....। যে ভাব রাজ্যে তিনি সঞ্চরণ করতেন, সেখানে তাঁর জীবন পূর্ণ হত প্রতিক্ষণে প্রকৃতির রসভাণ্ডার থেকে। আত্মভোলা মানুষ—যখন তখন ঘুরে বেড়াতেন যেখানে সেখানে। প্রায় তার সঙ্গে থাকত ছেলেরা। চলতে চলতে তাঁর সাহিত্য সম্ভোগের আস্বাদন পেত তারাও।'[১১৫]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় গোড়া থেকেই নানা অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়েছিল। জমিদারী ও অন্যান্য কাজে তিনি যখন শান্তিনিকেতনে উপস্থিত থাকতেন না—তখন অনেক সময়ই বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা 'বামন গেল ঘর/লাঙ্গল তুলে ধর' নীতির পক্ষপাতি হয়ে পড়তেন। শান্তিনিকেতনের কৃচ্ছ্রতাময় জীবনে অসন্তুষ্ট শিক্ষকেরা শিক্ষা ব্রতের কথা ভুলে যেতেন তখন। এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা ছিল না মোটেই। মানুষ শুধু মোটা চাল মোটা কাপড় আর খড়ের ঘরে ব্যবহার করে সন্তুষ্ট থাকে না—ইংরেজিতে যাকে বলে 'লাক্সারী' তার প্রতিও তাদের মানবিক স্পৃহা থাকবেই। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় মানুষের এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে অস্বীকার করার ঝোঁকই আমরা দেখি। এর ফলে শেষ বিচারে ক্ষতিগ্রস্ত হত ছাত্ররাই। কবিপুত্র ও শান্তিনিকেতনের মেধাবী ছাত্র শমীন্দ্রনাথ ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে তার 'বাবামশাই'কে এক চিঠিতে লিখছেন, 'ইংরাজি কোন বই পড়া হয় না। আমাদের অঙ্ক শেখানো হয় না, ভূগোল ইতিহাসও পড়া হয়না। বাংলাও পড়া হয় না।'[১১৬] শিক্ষার সঙ্গে ডিগ্রির কোন সম্পর্ক থাকবে না—এই নীতিতে আস্থাশীল কবিকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষক ও অভিভাবকদের চাপে, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ম্যাট্রিক' পরীক্ষায় ছাত্রদের বসবার অনুমতি দিতে বাধ্য হলে, শান্তিনিকেতন ভাবনার কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতা হয়ে যায়।[১১৭]

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্বন্ধীয় তাত্বিক দর্শন অনুযায়ী ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় হবে, উপনিষদের কালের গুরুগৃহে বসবাস করে 'পরা বিদ্যা' শিক্ষার কেন্দ্র। কিন্তু এই আদর্শে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ

নিজে '.....প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে/প্রথম সামরব তব তপোবনে/প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে/জ্ঞান ধর্ম কত কাব্য কাহিনী' এর আদর্শে বিশ্বাসী হলেও, বেশির ভাগ শিক্ষকের মধ্যে তা সঞ্চারিত করতে ব্যর্থই হয়েছিলেন এটা ইতিহাসের সত্য। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যাদের আদর্শ শিক্ষক হিসাবে গণ্য করতেন তাদের মধ্যে অন্যতম অজিত কুমার চক্রবর্তী। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ধারার এই মহতি বিনষ্টি দেখে দুঃখভরা কলমে লিখেছিলেন, 'দুঃখ হয়, যাঁহারা বিদ্যালয়ে মানুষ হইয়াছেন, তাহাদেরও মধ্যে আদর্শের বিশুদ্ধতাটা দেখি না—কোথায় সৌন্দর্য উপভোগ, কোথায় কাব্যকলা, কোথায় রস, কোথায় প্রাণ, কোথায় জ্ঞান তপস্যা, কোথায় মাধুর্যময় সংযমের সাধনা—কেবল পড়াশোনা, আর ছাত্রদের লইয়া দিনরাত খিটিমিটি।'[১১৮]

এখানে একটি কথা সবিনয়ে আমরা বলতে চাই যে শান্তিনিকেতন সংক্রান্ত উপরোক্ত কিছু বিরূপ করা মানেই কিন্তু এই নয় যে কবিবরের 'শিক্ষাভাবনা সম্পূর্ণ ভুল ছিল। আসলে দেশের শিক্ষা কাঠামোয় গলদ কোথায় রবীন্দ্রনাথ তা সম্পূর্ণ রূপেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তা থেকে মুক্ত হবার যে বিকল্প পথ তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন, তা সময় ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যুগোউপযোগী ছিল না বহুলাংশে। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যে অসচেতন ছিলেন না, বন্ধুবর আচার্য জগদীশচন্দ্রকে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীনকালের গুরুগৃহ বাসের মতো সমস্ত নিয়ম.....বিলাসিতার নামগন্ধ থাকিবে না। ধনী, দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হইতে হইবে...' এর পরেই অবশ্য খেদের সঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'উপযুক্ত শিক্ষক কোন মতেই খুঁজে পাইতেছি না—এখনকার কালের বিদ্যা আর তখনকার কালের প্রকৃতি একত্রে পাওয়া যায় না।'[১১৯]

এই প্রসঙ্গে যতি টানবো বিখ্যাত শিক্ষাবিজ্ঞানী পরমেশ আচার্যের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধ 'যত না বিশ্লেষণাত্মক (analytical) তার চেয়ে বেশি রূপক, উপমা ও অলঙ্কার শোভিত (metaphoric) ফলে, মস্তিষ্কের চেয়ে হৃদয় ও কানের কাছে এর আবেদন অনেক প্রবল।'[১২০] আর আমরা সবাই জানি যে শিক্ষার মতো একটি সাংগঠনিক কর্মে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হৃদয়ের থেকে মস্তিষ্ক অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ।

সূত্র নির্দেশ

১. সরকার, সুমিত—আধুনিক ভারত, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃঃ ২৯
২. শাস্ত্রী, শিবনাথ—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, কলকাতা, ২০০৭, পৃঃ ২০-২১
৩. নাগ, অরুণ (সং) হুতোম প্যাঁচার নকশা, কলকাতা, ১৩৯৮ (বাং), পৃঃ ৯৯
৪. বসু, রাজনারায়ণ—সে কাল আর এ কাল (সং) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোঃ এবং সজনীকান্ত দাস, কলকাতা, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৭
৫. তদেব, পৃঃ ২১

৬. চন্দ্র, বিপান—ভারতের জাতীয় আন্দোলন ঃ দীর্ঘমেয়াদী গতিসূত্র, কলকাতা, ১৯৯০, পৃঃ ০৪
৭. তদেব, পৃঃ ১২
৮. চক্রবর্তী, নমিতা—বঙ্গদেশে শিক্ষা প্রসার—কলকাতা, ১৯৮০, পৃঃ ৭৩
৯. শাস্ত্রী, শিবনাথ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪
১০. চক্রবর্তী, নমিতা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮১
১১. আচার্য, পরমেশ—বাঙালির শিক্ষা চিন্তা, কলকাতা, ২০১১, পৃঃ ২৩
১২. Gupta, Atulchandra (Ed.) Studies in the Bengal Renaissance—Kolkata, 1977, Economic back ground of the century, N. K. Sinha, p. 07
১৩. সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর—প্রসঙ্গ শিক্ষা ঃ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, কলকাতা-২০১৩, পৃঃ ০৭
১৪. তদেব, পৃঃ ০৮
১৫. গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্র মোহন—বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা (প্রথম খণ্ড) কলকাতা, ১৯৯১, পৃঃ ৩৫
১৬. ভৌমিক, তাপস (সং) কোরক সাহিত্য পত্রিকা, রামমোহন রায় সংখ্যা, কলকাতা, শারদ ১৪১৯ (বাং), পৃঃ ১৭৭
১৭. রায়, বিজয় ভূষণ (সং), প্রসঙ্গ ডেভিড হেয়ার, কলকাতা, ২০১২, পৃঃ ২১
১৮. চক্রবর্তী, নমিতা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৮
১৯. রায়, বিজয় ভূষণ (সং) প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬২
২০. দে, অমলেন্দু—বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, কলকাতা, ১৯৯১, পৃঃ ২২
২১. তদেব, পৃঃ ২৩
২২. দাস, বিশ্বনাথ—প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত, কলকাতা, ২০১১, পৃঃ ১২
২৩. তদেব, পৃঃ ১৮-১৯
২৪. Gupta, Atul Chandra (Ed.)—Studies in the Bengal Renaissance (প্রাগুক্ত) Derozio and Young Bengal, Susobhan Chandra Sarkar, p. 17
২৫. দাস, বিশ্বনাথ—প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬
২৬. চক্রবর্তী, মনোতোষ—হিন্দু কলেজ ও উনিশ শতকের বাংলার সমাজ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃঃ ৪৭
২৭. ভৌমিক, তাপস (সং)—'কোরক' শিক্ষা-শিক্ষক-শিক্ষকতা সংখ্যা, কলকাতা, ১৪১৯ (বঙ্গাব্দ), প্রবন্ধ ঃ 'শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর'—রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, পৃঃ ৯৬
২৮. তদেব, পৃঃ ৯৭
২৯. মণ্ডল, অজিত ও চট্টোপাধ্যায় কৌশিক (সং) সমকালের ভাবনায় বিদ্যাসাগর, কলকাতা, ২০২১, প্রবন্ধ ঃ শিক্ষা সংস্কারে শিক্ষক বিদ্যাসাগর, তৃষ্ণা গোস্বামী, পৃঃ ২০৯

৩০. ভৌমিক, তাপস (সং) প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর, রমেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, পৃঃ ১০১-১০২
৩১. রামচরণ ভট্টাচার্য (সং), আচার্য কাহিনী, কলকাতা, ১৪১১, পৃঃ ১-২
৩২. বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ (সং) শারদীয় কালান্তর, কল, ২০১৯, প্রবন্ধ ঃ দ্বি-শতবর্ষে অক্ষয় কুমার দত্ত—প্রবাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ২৩০
৩৩. চক্রবর্তী, নমিতা—বঙ্গদেশে শিক্ষার প্রসার, কলকাতা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৬
৩৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ (সং) 'এবং এই সময়'—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা ১৪১৯ (বঙ্গাব্দ), প্রবন্ধ ঃ 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—পুত্রের চোখে পিতা' অনিল কুমার রায়, পৃঃ ৮৬
৩৫. বাগচি, মণি, কেশব চন্দ্র, কলকাতা, ১৩৬৬ (বং), পৃঃ ১২৮
৩৬. তদেব, পৃঃ ১২৩
৩৭. মল্লিক, সমর কুমার—আধুনিক ভারতের দেড়শো বছর (১৭০৭-১৮৫৭), কলকাতা ২০১৫, পৃঃ ৩৮৯
৩৮. আলি, ড. সেখরজব—ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮০-১৮৮২), কলকাতা, ২০১৩, পৃঃ ১০৫-০৬
৩৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলকাতা, ২০০৯-১০, পৃঃ ২৫২-৫৩
৪০. Extract of letter in the public dept from the court of directors to the Governor General in Council of Bengal, 6th Sept. 1813, Part-7, উদ্ধৃত চক্রবর্তী নমিতা (প্রাগুক্ত), p. 63
৪১. গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫
৪২. তদেব, পৃঃ ৩৫
৪৩. চৌধুরী, ফকরুল (সং), গ্রামসি পরিচয় ও তৎপরতা, ঢাকা ২০১২, পৃঃ ৫৯
৪৪. Nurullah Syed & Naik J. P.—A student history of education in India 1800-1965, Kolkata, 1964, p. 09
৪৫. তদেব, পৃঃ ২১
৪৬. চক্রবর্তী, নমিতা—'বঙ্গদেশে শিক্ষা প্রসার', প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৫
৪৭. তদেব, পৃঃ ১০৯
৪৮. তদেব, পৃঃ ১০৪
৪৯. তদেব, পৃঃ ১০৮
৫০. তদেব, পৃঃ-১০৭
৫১. তদেব, পৃঃ ১০৮
৫২. তদেব, পৃঃ ২০৫

৫৩. তদেব, পৃঃ ২০৯

৫৪. তদেব, পৃঃ ২০৮

৫৫. তদেব, পৃঃ ২০৯

৫৬. তদেব, উল্লিখিত Minute by T. B. Macauly, 'বঙ্গদেশে শিক্ষা প্রসার'—নমিতা চক্রবর্তী, p. 210, 2nd Feb, 1835, p. 210

৫৭. তদেব, উল্লিখিত Selection from Educational Records—Vol-I, p. 211

৫৮. তদেব, পৃঃ ২৪৫-৪৬

৫৯. Selection from Educational Records—Vol-I, p. 103, উদ্ধৃত, Syed Nurullah & J. P. Naik, Nurullah & Naik

৬০. Nurullah, Syed & Naik, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৭

৬১. তদেব, পৃঃ ১১৯

৬২. গোস্বামী ড. হরিদাস, পৃঃ ১

৬৩. Nurullah & Naik, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৭

৬৪. তদেব, পৃঃ ১৭৯

৬৫. তদেব, পৃঃ ২১৩

৬৬. তদেব, পৃঃ ২২৬

৬৭. তদেব, পৃঃ ২৩০

৬৮. Mukherjee, Dr. Amitava, Fifty years of National Education, Kolkata, 1992, পৃঃ ২৪

৬৯. তদেব, পৃঃ ২৪

৭০. তদেব, পৃঃ ৩০

৭১. তদেব, পৃঃ ৮৫

৭২. তদেব, পৃঃ ১২৭

৭৩. তদেব, Appendix-'A' পৃঃ ১৮৭

৭৪. দে, রমাপ্রসাদ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎস সন্ধানে, কলকাতা ২০১৮, পৃঃ ১৭

৭৫. তদেব, পৃঃ ১৭

৭৬. তদেব, পৃঃ ১৯

৭৭. Mukherjee, Dr. Amitava, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬

৭৮. তদেব, পৃঃ ৬২-৬৩

৭৯. তদেব, পৃঃ ৬১

৮০. তদেব, পৃঃ ৬২

৮১. Gupta, Atul Chandra, Studies in the Bengal Renaissance, প্রাগুক্ত, Uma Mukherjee & Haridas Mukherjee, Attempts at national education (1905-1906), p. 419

৮২. তদেব, পৃঃ ৪২১

৮৩. বাগ, অজিত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জুবিলী সংখ্যা, কলকাতা ১৯৯৬, প্রবন্ধ ঃ 'নয়া বাংলার স্কুল মাষ্টার'—বিনয় কুমার সরকার, পৃষ্ঠা ৪৮৭

৮৪. Golden Jubilee (1906-56) Number. The National Council of Education Bengal (1906-56), (Editor-এর নাম নেই), প্রবন্ধ Role of teachers and students in the freedom struggle—by An Ex-student, Kolkata, p. 87

৮৫. তদেব, পৃঃ ৮৭

৮৬. মঙ্গল, বিকাশ (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, সত্যপ্রিয় রায় জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা, মার্চ ২০০৭, প্রবন্ধ ঃ 'নেতৃত্বের শিকড় সন্ধান'—লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, পৃঃ ৩২৭

৮৭. সিংহ, ড. দীনেশ চন্দ্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষা চিন্তা, কলকাতা ১৯৯২, পৃঃ ৫২

৮৮. তদেব, পৃঃ ৫৭

৮৯. তদেব, পৃঃ ৭৩

৯০. তদেব, পৃঃ ৯৩

৯১. তদেব, পৃঃ ১৫৮

৯২. তদেব, পৃঃ ২০৪

৯৩. সিংহ, ড. দীনেশ চন্দ্র—প্রসঙ্গ ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ২০০৭, পৃঃ ৪৫৯

৯৪. তদেব, পৃঃ ১৬১

৯৫. চক্রবর্তী, শ্যামল—শিক্ষার শীর্ষ স্থপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আগরতলা, ২০১৪, পৃঃ ৮০

৯৬. তদেব, পৃঃ ৮২-৮৩

৯৭. তদেব, পৃঃ ৯৩

৯৮. বাগচি, মণি—আচার্য যদুনাথ—জীবন ও সাধনা, কলকাতা ১৩৬৬ (বঙ্গাব্দ), পৃঃ ৫৯-৬০

৯৯. সরকার, যদুনাথ—যদুনাথ সরকার রচনা সম্ভার, নিখিলেশ গুহ, রাজনারায়ণ পাল (সং), প্রবন্ধ ঃ 'শিক্ষার আলোচনা কেন আবশ্যক', কলকাতা ২০১১, পৃঃ ৬৪৭

১০০. তদেব, পৃঃ ৬৪৮

১০১. তদেব, প্রবন্ধ 'স্কুল শিক্ষা ও জাতি গঠন', পৃঃ ৬৪৯

১০২. তদেব, পৃঃ ৬৫১

১০৩. বিবেকানন্দ, স্বামী—শিক্ষা প্রসঙ্গ, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ০৫

১০৪. তদেব, পৃঃ ৩৯

১০৫. তদেব, পৃঃ ৭৪

১০৬. তদেব, পৃঃ ৭৮

১০৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—'জীবন স্মৃতি', কলকাতা, সাধারণ সংস্করণ, আষাঢ় ১৪২১, পৃঃ ২৬

১০৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ (সং) 'এবং এই সময়'—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, ১৪১৯ (বং), প্রবন্ধ ঃ 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পুত্র রবীন্দ্রনাথের চোখে পিতা দেবেন্দ্রনাথ—অনিল কুমার রায়, পৃঃ ৮৪-৮৫
১০৯. ঘোষ, স্বাতী ও সরকার, অশোক—কবির পাঠশালা, পাঠভবন ও শিক্ষা সত্রের ইতিহাস—কলকাতা, ২০১৫, পৃঃ ২২
১১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষা', কলকাতা, ১৪১৭ (বং), প্রবন্ধ ঃ জাতীয় বিদ্যালয়, পৃঃ ৫৭-৫৮
১১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'শিক্ষা চিন্তা'—শিক্ষার আন্দোলনের ভূমিকা, কলকাতা, ২০১২, পৃঃ ৯০
১১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষা', প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ—জাতীয় বিদ্যালয়, পৃঃ ৬৩
১১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষা', প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ—'শিক্ষা সমস্যা', পৃঃ ৪৯
১১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষা চিন্তা', প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ—'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ', পৃঃ ৩৭২
১১৫. তদেব, প্রবন্ধ ঃ 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ', পৃঃ ৩৭৭
১১৬. ঘোষ স্বাতী/অশোক সরকার—'কবির পাঠশালা', প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২
১১৭. তদেব, পৃঃ ৯০
১১৮. তদেব, পৃঃ ৫৮
১১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা চিন্তা, প্রাগুক্ত, জগদীশচন্দ্র বসুকে 'কবি' লিখিত পত্র, আগষ্ট ১৯০১, পৃঃ ৪৭
১২০. আচার্য, পরমেশ—বাঙালির শিক্ষা চিন্তা, কলকাতা, ২০১১, পৃঃ ৭৯

তৃতীয় অধ্যায়

১৯১৫ থেকে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ—রাজনৈতিক পরিবর্তন সমূহ ও শিক্ষকদের আন্দোলনমুখী মনোভাবের স্ফুরণ—সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলনের প্রথম পর্ব

শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্হিবিশ্ব পরিস্থিতির প্রভাব

শিক্ষক আন্দোলন আধুনিক শিক্ষাব্যব্যস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাস্তবে শিক্ষাদান শিক্ষা আন্দোলনের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাই তাঁদের কার্যকলাপ শিক্ষাক্ষেত্রে যে কোনো আলোচনার অপরিহার্য। শুধুমাত্র শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিকরণ নয়, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের জীবন জীবিকার নানা সমস্যা সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে বহুলাংশে প্রাচীন ভারতে গুরুবাদী শিক্ষকবৃন্দ এবং মধ্যযুগের ভারতে ওস্তাদ ও শিক্ষকদের তত্ত্বগতভাবে কোনো অর্থকরী দাবিদাওয়া ছিল না। তবু সামগ্রিকভাবে সমাজ এদের জীবিকা সংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করত। ঔপনিবেশিক যুগে প্রথম অবস্থায় এই ব্যবস্থা কিছুটা পরিমাণে বর্তমান ছিল। আমরা শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজে' জমিদার রমেশ কর্তৃক পাঠশালার ব্যয় ভার নির্বাহের গল্পের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। আমাদের দেশের নবজাগরণের সময়কালে সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নে শিক্ষকরা মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্যান্য অংশের মতোই প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করলেও তারা তথাকথিত সামাজিক সম্মান নষ্ট হওয়ার ভয়ে আর্থিক সচ্ছলতার দাবি তুলতে লজ্জাবোধও করতেন। এরপর উপনিবেশিক যুগে পাঠশালা—টোল কিম্বা মাদ্রাসা মক্তবকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। ঔপনিবেশিক যুগের প্রাথমিক পর্বে অন্যান্য পেশাজীবীগোষ্ঠী যেমন চিকিৎসক বা আইনজীবীরা তাদের কাজের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করতেন। কিন্তু গ্রামশির তত্ত্ব অনুসারে আমরা বলতে পারি শিক্ষকদের কাজকে একটি ব্রত হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের মগজ ধোলাই করা হল এবং এরফলে তাদের জীবিকার সচ্ছলতা নষ্ট হয়ে গেল।[১]

আগের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশি আন্দোলনের ধারা বেয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগে 'শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ব্রত' তাদের 'সমষ্টিগত ব্রত'তে পরিণত হন। এক্ষেত্রেও সরাসরি আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের দাবি না উঠলেও সংগঠিত শিক্ষক সমাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল, যা পরবর্তীকালের শিক্ষক আন্দোলনের পূর্বাভাস বয়ে এনেছিল।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল সোভিয়েত ইউনিয়ন। সেখানে কাজের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার—ইত্যাদি মৌলিক অধিকার স্বীকৃতি পেল। বিশ্বজন চিত্তে এর প্রভাব পড়ল অপরিসীম। আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম ছিল না। সেই সময় সর্বস্ব তৈরি হল নতুন

নতুন সংগঠন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠন বা 'AITUC' তৈরি হয়। ১৯২০-র ১৭ অক্টোবর তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত হল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি।[২]

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির উদ্ভবের সময়ে আমাদের এই নীল গ্রহে এবং ভারতবর্ষে তো বটেই বহুলাংশে রাজনৈতিক চিত্র এবং আর্থ-সামাজিক চালচিত্রের অনেকটাই পরিবর্তন ঘটেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে একটি সর্বভারতীয় স্বাধীনতা বিপ্লবের আশু বিনষ্টি হলেও, তার প্রভাবে সাধারণ মানুষের মনে জাতীয় গর্ব ও দেশপ্রেমের একটি ছোঁয়াচ লেগেছিল।[৩] ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও, তার রাশ ছিল সমাজের উচ্চবিত্ত এবং সফল পেশাজীবীদের হাতে। বৎসরান্তের অধিবেশনে, 'তিনদিনের তামাশা' ছাড়া এই সংগঠন বাস্তবে জাতীয় দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে কোন বড় পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়নি। গত শতকের বিশের দশকে এল পরিবর্তন। গান্ধীজী এলেন ভারতীয় রাজনীতিতে। অল্প দিনেই তাঁর নতুন পন্থায় জনমুখী অহিংস সংগ্রামের অভিনব মতাদর্শে আপ্লুত হলেন ভারতের সাধারণ জনতা। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে প্রথম ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রামের ঝাঁপিয়ে পড়ল ভারতীয় জনতা। শুধু উচ্চবিত্ত কিংবা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নয়। কৃষি প্রধান আমাদের দেশের কৃষকরা সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল এই আন্দোলনে। সরকারি ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে। সরকারের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করল তারা।[৩] শ্রমিকরাও দলে দলে যোগ দিল এই আন্দোলনে ১৯১৯-২০ খ্রিস্টাব্দে কানপুরের উলেন মিলর্স-এ ১৭০০০ হাজার শ্রমিক এবং জামাল পুরে রেল শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে। ১৯২০ সালে কোলকাতার শ্রমিকেরা ধর্মঘটে উত্তাল হয়। বোম্বাই, রেঙ্গুন সর্বত্র এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। মুখে শুধু তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক দাবি দাওয়া ছিল না—ছিল জাতীয় মুক্তির ডাক। মধ্যবিত্তরাও এই পরিস্থিতিতে চুপ করে থাকতে পারল না—বস্তুগত অনেক কিছু হারাবার ভয়কে জয় করে, ঔপনিবেশিক বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিল। সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে এর আগে মধ্যবিত্ত শ্রেণির কিছু যুবক যোগ দান করল। রক্তপাতভীত মধ্যবিত্ত সমাজে সেই আন্দোলন বেশি প্রভাব বিস্তার করেনি।[৪]

১ম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪) কাল থেকেই ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সরকার এই মহাযুদ্ধে জড়িয়ে নিয়েছিল। এই যুদ্ধ খরচের ফলে দেশে অর্থনৈতিক সংকট ঘনিয়ে এসেছিল। দ্রব্যমূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর আঁচ সবচেয়ে বেশি পড়েছিল মধ্যবিত্ত সমাজের উপর। মনে রাখতে হবে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকেরা এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিরই একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ছিল। একদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি অন্য দিকে অনিশ্চিত ও অনিয়মিত বেতন তাদের ধৈর্যের শেষ সীমায় নামিয়েছিল। এ ছাড়া শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির মধ্যে নিজেদের আর্থ-সামাজিক স্বার্থ ছাড়াও আদর্শগত ভাবেও ঔপনিবেশিক সরকারের অস্তিত্ব ছিল দুঃসহ। এটা আমাদের স্মরণে রাখা উচিত। শিক্ষাগত আদর্শ বোধের কারণেই মধ্যশ্রেণির নেতৃত্বেই আমাদের দেশে গড়ে উঠেছিল শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন।[৫]

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের সোভিয়েত নভেম্বর বিপ্লবের ছাপ ভারতে মধ্যশ্রেণির উপর পড়ছিল। সমস্ত মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই নতুন দেশের সরকার কাজ করতে শুরু করেছিল এবং শুধু দেশীয় স্বার্থ নয়, ভারত সহ বিশ্বজোড়া ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটানোর কাজেও এই দেশ জানিয়েছিল নৈতিক সমর্থন। ভারত সহ ঔপনিবেশিক দেশ সমূহে শ্রেণি নির্বিশেষে একটি মঞ্চ গড়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালানোর ডাক দিয়েছিলেন নভেম্বর বিপ্লবের ঋত্বিক ভ্লাদিমির লেনিন।[৬]

এই 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন' বাংলার মাটিতেও অচিরেই প্রভাব ফেলেছিল। আমরা যদি সেই সময়কার বাংলার পত্র পত্রিকার দিকে তাকাই, তাহলেই বুঝতে পারবো, এই বিপ্লব কতখানি বাঙালি মানসে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। আমরা সবাই জানি মোট তিনটি স্তরে রুশ বিপ্লবের অগ্রগতি হয়েছিল, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে ভূমি ও স্বাধীনতার দাবিতে প্রথম বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই বিপ্লবের দ্বিতীয় স্তরটি ছিল ১৯১৭-এর ফেব্রুয়ারি থেকে ওই সালেরই অক্টোবর বিপ্লব, আর রুশ বিপ্লবের তৃতীয় বা শেষ স্তর, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর (বা নভেম্বর) মাসে পূর্ণতা লাভ করে। সফল সমাজতান্ত্রিক সুসংহত সোভিয়েত গঠন করা এই বিপ্লব স্বাভাবিক ভাবেই সারা বিশ্বে আলোড়ন তোলে। বাংলাও এর ব্যতিক্রম নয়। ১৯১৪-এর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসাদ কাটিয়ে, ১৯১৭-এর এই মহাবিপ্লব, বাঙালির জীবনে অবশ্যই নতুন আশাবাদের জন্ম দিয়েছিল। 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় বীরবল বা প্রমথ চৌধুরি, সগর্বে সেই সময় লিখেছিলেন সভ্যতার মূলমন্ত্র হলো মানব সমাজের স্বাধীনতা প্রাপ্তি, আর সেই সভ্যতার জয় একদিন না একদিন হবেই, রাশিয়ার জার শক্তির পরাজয় এবং মানবের মুক্তিলাভ সে কথাই প্রমাণ করে।[৭] সোভিয়েত বিপ্লবের নায়ক ভ্লাদিমির লেনিন সম্বন্ধে এই সময়ই সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী 'নব শক্তি' কাগজে লিখেছিলেন, 'বুদ্ধ থেকে অরবিন্দ পর্যন্ত প্রত্যেক মহাত্মাই মানুষকে আত্মার মুক্তি দিতে ব্যর্থকাম হয়েছেন। কিন্তু লেনিন এই জন্যই কৃতার্থ যে তিনি জেনেছিলেন ও জিনিস কারও হাতে তুলে দেওয়া যায় না। যেহেতু ও সবার হাতেই রয়েছে। তিনি করে গেছেন ভাতের ব্যবস্থা।'[৮] এ বিষয়ে আর বিশেষ উদ্ধৃতি দানের প্রয়োজন আমরা বোধ করছি না—আমাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শুধু সেই সময়কার কিছু সংবাদ/সাময়িক পত্রে প্রকাশিত 'খবর' বা আলোচনার কথা উল্লেখ করছি মাত্র। এটা ঠিকই সন্দিহান বাঙালি সত্তা প্রথমেই দু'হাত তুলে ১৯১৭-এর রুশ বিপ্লবকে সমর্থন করেছিল এমন নয়—কারণ আমাদের দেশের সাম্রাজ্যবাদী শাসক কুল এই 'বিপ্লব' সম্বন্ধীয় ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য, ১৯১৭-এর ১২ নভেম্বর বিখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকা লিখল, 'The Military Revolutionary Committee of the council of workmen's and soldiers' delegates has issued a proclamation to the effect that Petrograd is in its hands thanks to the assistance of the garrisson, which enabled a 'coupd' etal' to be brought about with out blood shed.....The Committee declares that the new Government will propose an immediate and just peace and will hand over land to peasants and summon the constituent assembly')।[৯]

এর কয়েক মাস পরে, বেঙ্গলী পত্রিকায় রাশিয়ার সাম্যবাদী সরকারের প্রবল প্রশংসা করে খবর বের হল, 'কিছু সংখ্যক ধনী ব্যক্তির উপর লক্ষ লক্ষ শ্রমিক শ্রেণি ক্ষমতা লাভের অন্য নাম হলো বলশেভিজম। এতদিন ধরে সাদা চামড়ার লোকেরা দরিদ্র্য শ্রেণিকে শোষণ করে ধন সম্পদ সঞ্চয় করে এসেছে, এখন সময় এসেছে প্রায়শ্চিত্তের। আর প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেবে বলশেভিকরা।'[১০] আরেকটি সাময়িক পত্র এবং তার বিখ্যাত সম্পাদকের সোভিয়েত বিপ্লব সম্বন্ধে যে অনুভব, তার অনুরণন আমাদের করতেই হবে। পত্রিকাটির নাম ছিল 'প্রবাসী'—আর এর বিখ্যাত সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কলমেই সোভিয়েত বিপ্লব সম্বন্ধে কি লেখা হয়েছিল, তার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'রুশীয় রাষ্ট্র বিপ্লবের মত এত বড় একটা পরিবর্তন কখনও কোনো দেশে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত অল্প রক্তপাতে সাধিত হয় নাই।.....বাস্তবিক রুশিয়ায় নেতৃবর্গ পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া ইহার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতে ছিলেন।' তার মতে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের হাত ধরে সোভিয়েত রাশিয়ার পঞ্চান্নটি জাতির মানুষ স্বাধীনতা পেয়েছে বলে, তিনি আরো লেখেন, 'এতগুলি জাতির লোকের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রভাব জগতে নিশ্চয় অনুভূত হইবে।'[১১] ভারতে এই বিপ্লবের প্রভাব অবশ্যই পড়বে বলে তিনি মনে করেন। তার মতে, 'সারা এশিয়াতেই আর্থ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচক এই 'বিপ্লব'। তার ভাষাতেই বলতে হয়, 'কোনো দেশের মানুষের মনের মধ্যে যখন উচ্চাকাঙ্ক্ষাজনিত ভূকম্প হয়, তখন তাহার কাঁপুনি, তাহার ধাক্কা সেই দেশের সীমায় আসিয়া থামিয়া যায় না। সমস্ত পৃথিবীতে অল্পাধিক পরিমাণে অনুভূত হয়.....ভারতবর্ষ যে পৃথিবীর অন্তর্গত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।.....অন্য সব দেশের চিন্তাভাব, আকাঙ্খা ও কৃতিত্বের উল্লাসের তরঙ্গ এখানেও আসিয়া পৌঁছেছে। আমাদের ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্খা পূর্ণ হওয়া দরকার।'[১২] এটা ঠিকই তৎকালে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি গঠিত হয়নি। তাই সরাসরি এই বিপ্লবের পক্ষে বা বিপক্ষে তাদের তাৎক্ষণিক মতবাদ আমরা সেইভাবে স্বাভাবিক ভাবেই জানতে পারি না—কিন্তু পরবর্তী কালের শিক্ষক সমিতির সক্রিয় সদস্য কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিক সোভিয়েত বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়ে, তার কবিতায় লিখেছিলেন, 'পতিতের যারা পরম বন্ধু/যারা কল্যাণকৃৎ/হয়েছে এবং হবে/তাহাদের জিৎ/রক্তের নয় তাহাদের লাল/লাল গোলাপের দান/তাহাদের প্রতি প্রীত হোন/ভগবান।'[১৩]

সেই সময়কার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা এমনকি 'রাশিয়ার চিঠি' লেখার বহু আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব বসু, সৌমিত্র মোহন মুখোপাধ্যায়, সুনির্মল বসু, যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত, শওকত ওসমান, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখ অনেক অনেক লেখক শিল্পী সোভিয়েতের সফল বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।[১৪] আর কাজী নজরুল ইসলাম তো সোভিয়েত বিপ্লবের প্রভাবেও বিখ্যাত সাম্যবাদী নেতা মুজফ্ফর আহমেদের অনুপ্রেরণায়, বিখ্যাত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্গীত 'ইন্টার ন্যাশনালের বাংলা অনুবাদ পর্যন্ত করেছিলেন, স্বাভাবিক ভাবেই বুদ্ধিজীবী সমাজেরই অংশ ভুক্ত আমাদের শিক্ষকদের চিন্তা ও চেতনায় এই বিপ্লবের অভিঘাত অবশ্যই পড়েছিল, এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এমনকি ভারতে যাঁরা

প্রথম শ্রমজীবী আন্দোলনের কথা বলেন, তারাও মূলতঃ ছিলেন শিক্ষাব্রতী। এঁদের মধ্যে শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবনাথ শাস্ত্রীর কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। স্বভাবতই এই বামপন্থী প্রভাব শিক্ষকদের মধ্যে পড়েছিল—একথা বলা যেতেই পারে।[১৫]

আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তন ও শিক্ষা

ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়েছিল। একে তো অর্থনৈতিক ভাবে শিক্ষকেরা ছিলেন পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী। বিশের দশকের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাংলায় মাধ্যমিক শিক্ষকদের গড় মাসিক বেতন ছিল ২৫ থেকে ২৯ টাকা। সরকার বা তৎকালীন বিদ্যালয়সমূহের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয় সেই খরচটুকুর বন্দোবস্ত করতেও কার্পণ্য করত। বিদ্যালয় সমূহের খরচ খরচার বেশির ভাগটাই আসত ছাত্র বেতন থেকে। সংখ্যা স্বল্পতার জন্য ছাত্র বেতন যোগাড় না করতে পারলে, বিশ্ববিদ্যালয় যে কোনো বিদ্যালয়ের অনুমোদন কেড়ে নিতে পারত। স্বভাবতই ওইরকম পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের চাকুরীর স্থায়িত্ব ছিল অনিশ্চিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ওই সময়ের শিক্ষকদের কাজে যোগদানের সময় নিয়োগপত্র দেবার কোনো বাধ্যবাধকতা থাকত না। ফলত প্রভাবশালী ম্যানেজিং কমিটির হাতেই শিক্ষকদের কাজে নিয়োগ বা বরখাস্ত করার ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

আমরা সবাই জানি ১৯২১ থেকে পরবর্তী দশ বছর ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাওলাট আইন বিরোধী আন্দোলন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিক্ষোভ বাংলার মধ্যবিত্তসহ শিক্ষকদেরও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। বিশের দশকে এই বিক্ষোভের হাত ধরেই শুরু হল অসহযোগ আন্দোলন থেকে আইন অমান্য আন্দোলন। সুমিত সরকার। এ প্রসঙ্গে সঠিক ভাবেই একটি সরকারি নথির উল্লেখ করে বলেছেন বাংলায় 'আন্দোলন নেতাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে সব রকম কর্তৃত্বের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব আছে, জনসাধারণের মধ্যে।'[১৬]

বহির্বিশ্বের সোভিয়েৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সমসাময়িক কালে ভারতের রাজনীতিও ছিল ঘটনার ঘনঘটায় আবৃত। একদিকে রাওলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড আপামর জনতা সহ ভারতের বুদ্ধিজীবীকুলকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ভারতের মানুষ চাইছিল, তাঁদের মূক মুখকে মুখর করে তোলার মতো একটি আন্দোলন, একজন নেতা—সেই অভাব পূরণ করতেই যেন ভারতের রাজনীতিতে আবির্ভাব ঘটলো গান্ধিজীর—এই প্রথম এমন একজন মানুষ ভারতের রাজনীতিতে এলেন যাঁর ডাকে ভারতীয় সমাজের সব অংশের মানুষ সাড়া দিল—ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কুশাসনের অভিযোগ সামনে এনে, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে একদিকে যেমন দেশের মধ্যে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ভারতবর্ষে। তেমনি ছাত্ররা, মহিলারা, কৃষকরাও নিজেদের অধিকার বুঝে নেবার জন্য কমবেশি তাদের নিজস্ব সংগ্রামে শামিল হয়েছিলেন—আর বিরোধী এবং কংগ্রেসপন্থী সবাই এর কাছে ঐতিহাসিক কারণেই গান্ধীজী হয়ে পড়েছিলেন, ভারতের মুক্তি আন্দোলনের 'Icon'। সারা ভারতের প্রেক্ষাপটে এই আন্দোলন সমূহের আলোচনা, আমাদের আলোচ্য বিষয় বস্তুর মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, তাই আমরা শুধু

সেই সময়কার বাংলার কথাই এই প্রসঙ্গে আলোচনা করব। স্বাভাবিক ভাবেই বাংলার শিক্ষক আন্দোলনেও, এই জনজোয়ারের প্রভাব কমবেশি পড়েছিল। এটা আমরা ধরে নিতেই পারি।

বাংলায় মহাত্মাজীর আদর্শে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, তার মুখ্য কাণ্ডারী ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। সেই সময় তাঁর আহ্বানে ব্রিটিশ প্রভুদের অফিস আদালত বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে স্কুল কলেজ বর্জনেরও ডাক দেওয়া হয়েছিল। ছাত্র শিক্ষকদের সাড়াও মিলেছিল তাতে।[১৭] শুধুমাত্র বিদেশি শিক্ষা বর্জন করলেই হবে না, তার বিপরীতে স্বদেশী শিক্ষার একটি কাঠামোও গঠন করতে হবে, এ বিশ্বাস চিত্তরঞ্জনের ছিল। অহিংস অসহযোগ শুরু হবার পূর্ববর্তী কালেই তাঁর বিখ্যাত ভবানীপুর বক্তৃতায় তিনি এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছিলেন। এক্ষেত্রে 'স্বদেশী যুগের' শিক্ষক আন্দোলনের প্রভার তাঁর চিন্তা ধারার উপর পড়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। 'দেশের কথা' শীর্ষক রচনায়, তৎকালীন বাংলার এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা বলেছিলেন, '.....আমাদের সকল আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শও হীন হইয়া পড়িয়াছে এবং আমরা সেই একই কারণে সহজ সরল উপায় ছাড়িয়া দিয়া, শিক্ষা-দীক্ষাকে জটিল ও দুরূহ করিয়া তুলিয়াছি।.....আমাদের হাব ভাব, আচার ব্যবহার সবই এত ইংরাজি নবীশ হইয়াছে যে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, শিক্ষিত বাঙ্গালীর সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের কোন যোগ নাই। এই শিক্ষার ফলে আমরা বস্তুর সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়া তাহার প্রাণের কাছে গিয়া তাহাকে ছুঁইতে পারি নাই, কেবল উপর হইতেই দেখিয়াছি, আর কতকগুলো ইংরাজি শব্দ মুখস্থ করিয়াছি। আমরা মানুষ হইয়া উঠি নাই, একটু বেশি চালাক হইয়াছি মাত্র।'[১৮] শুধুমাত্র আমাদের ভুয়ো শিক্ষা দর্শনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেই চিত্তরঞ্জন ক্ষান্ত হননি, ইংরেজ অনুকরণে, আমাদের বড় দালান, চেয়ার বেঞ্চি শোভিত, বিদ্যালয় কাঠামোরও তিনি সমালোচনা করেছেন। ফিরে যেতে চেয়েছেন আমাদের পাঠশালাকেন্দ্রিক অনাড়ম্বর শিক্ষা কাঠামোয়। তৎকালীন বৈদেশিক প্রভাবিত শিক্ষা কাঠামোর তীব্র নিন্দা করে তিনি বলেছিলেন, '.....দেশে টাকা নাই—ছেলেরা বই কিনিতে পারে না, বই কিনিবার জন্য ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তবু যেখানে একখানা বই হইলে চলে, সেখানে পাঁচখানা বইয়ের ব্যবস্থা।....এখন বৃহৎ প্রাসাদ না হইলে শিক্ষা হইতে পারে না। আমরাই শিশুকালে বালির কাগজে অঙ্ক করিতাম,.....এখন স্কুলের নিম্ন শ্রেণি হইতে রুল করা ভাল কাগজের বাঁধান খাতা না হইলে না কি লেখা পড়া হয় না।'[১৯] শুধুমাত্র দেশের আর্থ-রাজনৈতিক পরিকাঠামোর উৎপাটনের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশের মনোহর মূর্তির চালচিত্র তৈরি হয় না। তাঁর জন্য আমাদের শিক্ষা কাঠামোর পরিবর্তনের প্রয়োজন একথা, গত শতকের বিশের দশকের বাংলার অবিসংবাদিত নেতা চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস করতেন। এ বিষয়ে তাঁর সময় থেকে এক দশক পিছনে, গোপালকৃষ্ণ গোখলে বা মহাত্মা গান্ধীর জীবন ব্যাপী শিক্ষা চিন্তার একটা মিলও আমরা খুঁজে পাই। আমাদের আলোচনা যেহেতু শুধু বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষককেন্দ্রিক, তাই সর্বভারতীয় নেতাদের শিক্ষা চিন্তা নিয়ে আমরা বিশদে আলোচনা করিনি। বাংলার নেতা চিত্তরঞ্জনের শিক্ষা চিন্তার প্রতিবিম্ব দর্শন করেই আমরা এই পর্বটি শেষ করবো। তারই একটি বক্তৃতার অংশ উদ্ধৃত করে। সেখানে তিনি বলছেন, 'আমি আজ বাংলার মহাসভায় সাহস করিয়া বলিতেছি যে এই শিক্ষা

দীক্ষার প্রণালী সমূলে পরিবর্তিত না করিলে, ইহার মুখ ফিরাইয়া না দিতে পারিলে.....ও এই শিক্ষাকে সাধারণের সহজ সাধ্য করিয়া না তুলিতে পারিলে, আমাদের ঘোর বিপদের কথা।'[২০]

এটা ঠিকই ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক স্থানের মতোই, ১৯২১ মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিও টালমাটাল হয়ে পড়েছিল। একদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালীন অর্থনৈতিক দুর্দশা বাঙালির জীবনকে আবিল করে তুলেছিল। এক বিখ্যাত ঐতিহাসিকের কথায়, '.....যে সব দিক দিয়ে যুদ্ধ ভারতীয় জনজীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল সেগুলো হলো ঃ বিশাল মাত্রায় সৈন্য সংগ্রহ, করের বোঝা ও যুদ্ধ ঋণ, আর তীব্র মূল্যবৃদ্ধি।'[২১] এই অর্থনৈতিক দুরবস্থা ভারতের অন্যান্য স্থানের মতো আমাদের বাংলায়ও পড়েছিল। চারদিকে শ্রমিক অশান্তি, কিংবা নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বা (AITUC)-এর জন্মকে আমরা এই নিরিখেই বিচার করতে পারি।

রাজনৈতিক ভাবেও উত্তাল তখন ভারত তথা বাংলা, জন বিরোধী আইনসমূহ, জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা ভারতবাসীকে স্তম্ভিত করে তুলেছিল। পেশাদার রাজনৈতিক নেতাদের আগেই এর প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—প্রতিবাদে 'নাইট হুড' উপাধী ত্যাগ করেছিলেন তিনি। তৎকালে 'প্রিন্স অব ওয়েলস্'-এর ভারত সফরের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল সারা দেশ—বাংলাও তার ব্যতিক্রম ছিল না—বহুশ্রুত এই রাজনৈতিক ডামাডোলের চুম্বক তাই উপস্থিত করা হল এই লেখায়। বিপান চন্দ্রের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের জেরে 'প্রথমে যাদের গ্রেপ্তার করা হল, তাদের মধ্যে ছিলেন সি. আর. দাশ। পরে গ্রেপ্তার করা হল তার স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে। বাসন্তী দেবীকে গ্রেপ্তারের ঘটনা প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি করল বাংলার যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে.....।'[২২] স্বভাবতঃই শিক্ষকেরাও এই সামগ্রিক পরিস্থিতিতে আপ্লুত হয়েছিলেন। নতুনতর শিক্ষা ধারায় যে নান্দীমুখ, চিত্তরঞ্জন পূর্বেই করে ছিলেন, এই অশান্তময় আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, তা একটি ভিন্ন মাত্রা ধারণ করেছিল। প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও, পরোক্ষ ভাবে অবশ্যই তা সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

এই পর্বের জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব হয়তো সরাসরি গোষ্ঠী হিসাবে শিক্ষকদের উপর পড়েনি। 'Pro-British' ম্যানেজিং কমিটি এবং স্কুলগুলির প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ জমিদার জোতদারদের আন্দোলন বিরোধিতার প্রভাব, কাজ হারানোর ভয়ে ভীত শিক্ষক সমাজের উপর পড়েছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবু ব্যক্তিগত ভাবে, জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলনে যেমন, তেমনি গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনেও বাংলার শিক্ষকরা যথেষ্ট সংখ্যায় যোগ দিয়ে ছিলেন। বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ঢাকা ময়মনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় অন্য অনেক মধ্যবিত্ত যুব সম্প্রদায়ের মতো তরুণ শিক্ষকদের অনেকেই এই আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[২৩]

শুধুমাত্র বাঙালির বাইরের আর্থ-রাজনৈতিক জীবনেও ১৯২০-এর দশকে একটা পরিবর্তন ঘটেছিল তাই নয়, এর পাশাপাশি মধ্যবিত্ত বাঙালির অন্তর্জগতেও একটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত

হয়েছিল। জাতীয় ভাবনার পাশাপাশি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, যাঁদের একটা বড় অংশ বিদ্যালয় শিক্ষক ছিলেন। তাঁরা ক্রমশঃ চারপাশের ঘটনা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছিলেন। এই প্রান্তিক সচেতনতার ফলে 'রাজনীতির বাঙালিয়ানা' সংগঠিত হতে শুরু করেছিল। এই দশকেই 'কলকাতার বিদ্যাজীবী শ্রেণির একটি বড় অংশ জেলাগুলি থেকে অভিপ্রয়ান করে কোলকাতামুখীন হচ্ছেন। যখন কোলকাতার পুরনো মানুষেরা কংগ্রেসের 'তিন দিনের তামাশায়' মগ্ন—মগ্ন ইউরোপীয় কেতায়, তখন গ্রামবাংলার সজীব মন ও মানসিকতা নিয়ে এই 'বাঙালরা' কোলকাতা তথা বাংলার পশ্চিম অংশে একটি পরিবর্তন এনেছিলেন। শিক্ষক সমিতির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আমরা যদি একটু হিসাব করি, যে বাইশ জন প্রধান শিক্ষক সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ঈশানচন্দ্র ঘোষ, হেমদাকান্ত চৌধুরী-এর মতো অনেকেই ছিলেন পূর্ববঙ্গাগত, এ বিষয়টি আলোচনার আলোকে নিয়ে এসে, ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্য মত প্রকাশ করেছেন, '.....জাতীয়তাবাদের পুরনো ধারণা এবং নতুন ''বাঙালি স্বদেশ প্রেম''-এর আন্তঃক্রিয়া; একদিকে রাজনীতি পুরোনো পাশ্চাত্যশৈলী, অন্যদিকে নতুন দেশীয় সংস্কৃতির রাজনীতি....একদিকে পুরনো কলকাতার শহুরে উচ্চ বর্গীয় সম্প্রদায়, অন্যদিকে মফস্বলের ''বহিরাগত''।[২৪] এই দুই গোষ্ঠীর রাজনীতির মধ্যে একটা পৃথক ভাবধারার জন্ম দিয়েছিল। আমরা দেখতে পাই নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি প্রথম থেকেই কোলকাতাই রাজনীতির অভিজাততান্ত্রিকতার ফাঁদে পা না দিয়ে, এই নিম্ন মধ্যবিত্ত হাটুরে রাজনীতিরই পক্ষপাতী ছিলেন।

আবার বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই মহিলাদের সম্বন্ধে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। আমরা জানি যে বাংলার বিতর্কিত নবজাগরণ কালে, ধীরে ধীরে শিক্ষিত নারীদের একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। ১৯২১ থেকে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনার ভিত্তিতে তৈরি প্রতিবেদনে দেখা যায় উচ্চবর্গীয় নারীরা আস্তে আস্তে কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবেশ করছিলেন। উচ্চবর্গ ও বর্ণের নারীদের মধ্যে বৈদ্য সম্প্রদায়ের নারীরাই শিক্ষায় সবচেয়ে অগ্রবর্তী ছিলেন তাদের মধ্যে প্রায় ৩৮.৩৪ শতাংশ শিক্ষিত ছিলেন। সেখানে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ নারীদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৭.৫৩ এবং ১৬.৯৬।[২৫] ১৯২০-এর দশক থেকেই এই সমস্ত শিক্ষিত মহিলাদের একাংশ গান্ধীবাদী আন্দোলন ও চরমপন্থী আন্দোলনে যোগ দিতে শুরু করে। এছাড়া শিক্ষাকে শুধু গাত্রালঙ্কার হিসাবে না দেখে, তাঁদের একাংশের মধ্যে সেই শিক্ষাকে কাজে লাগানোর একটা চিন্তাও তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করে এই সময়েই। তারা সীমিত সংখ্যায় হলেও, বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত হতে সচেষ্ট হয়। আর মহিলাদের পেশা হিসাবে শিক্ষকতাই ছিল প্রথম পছন্দ। যার অনুরণন-এর একটি ঝলক আমরা দেখতে পাই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'হেডমিস্ট্রেস' গল্পে। এই গল্পে মহিলা প্রধান শিক্ষয়ত্রী পুজোর আগে ম্যানেজিং কমিটি প্রদত্ত প্রায় সব অর্থ অন্য শিক্ষিকাদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। তাঁর নিজের হাতে রইল পাঁচ টাকা মাত্র। শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষিকারাও সেই সময় যে অশেষ অর্থনৈতিক দুর্দশায় পড়তেন, তার বর্ণনা আছে। তাই অন্যান্য পেশার থেকে চেতনায় অগ্রবর্তী শিক্ষিকারা তো শিক্ষকদের পাশে দাঁড়াবেনই।[২৬]

এই দিক থেকে আমরা বলতে পারি, অন্য অনেক পেশায় নারীদের প্রবেশ ঘটবার আগেই শিক্ষকতা কার্যে তাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন ও তার ফলে প্রাথমিক পর্বে প্রথম সারির নেতা হিসাবে এবং কর্মীদের মধ্যেও, শিক্ষক সমিতিতে আমরা নারীদের প্রতিনিধিত্ব দেখতে পাই। বিশের দশকে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক সমিতিতে তাই আমরা পরবর্তীকালে, সুধা রায় বা অনিলা দেবীর দেখাই পেয়েছি তাই নয়—মায়া চক্রবর্তী বা মীরা চট্টোপাধ্যায়ের মতো মহিলা কর্মীদেরও দেখা পাই।[২৭]

তবে মনে রাখতে হবে মধ্য শ্রেণিভুক্ত উচ্চবর্ণের শিক্ষিত হিন্দু/ব্রাহ্ম মহিলারাই এই আন্দোলনে বেশির ভাগ সময়ে অংশ নিয়েছিল। তথাকথিত অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত দলিত ও মুসলিম নারীদের বৃহদংশের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে না পড়বার ফলে, তাদের উপস্থিতি অন্ততঃ প্রাথমিক পর্বে শিক্ষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রায় ছিল না বললেই চলে। একটু খুঁটিয়ে দেখলে বলা যায়, আজো সেই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। অবশ্য তা বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়।

শিক্ষা ও শিক্ষকবৃন্দের সংঘবদ্ধ হবার প্রচেষ্টা

এই objective condition-এর পরিপেক্ষিতে ১৯১৫ খ্রিঃ থেকেই শিক্ষক আন্দোলনে একটি 'Subjective Condition'-এর সূচনা হল। সোভিয়েত বিপ্লব, অসহযোগ আন্দোলন এবং সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা শিক্ষকদের চিন্তায়-চেতনায় করাঘাত করল ; অবশ্যই শ্রেণি হিসেবে নয় একটি মধ্যবিত্তকেন্দ্রিক চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে শিক্ষকরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য সচেষ্ট হলেন। প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে প্রাথমিক পর্বে সারা বাংলা জোড়া একটি সংগঠন শিক্ষকেরা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন এমন নয়। ১৯১৬ খ্রিঃ চট্টগ্রামের শিক্ষকেরা প্রথম আঞ্চলিকভাবে একটি শিক্ষক সংগঠন গড়ে তোলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল 'শিক্ষকদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন' ও স্বাস্থ্যকর সমাজজীবন লাভ।' চট্টগ্রামের ডিভিশনাল স্কুল ইনস্‌পেক্টর, ড. এম. পি. ওয়েস্ট, ওই অঞ্চলের শিক্ষকদের এই সংগঠিত হবার প্রয়াসের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।[২৮] তখনও পর্যন্ত নিজেদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া তুলতে শিক্ষকদের মধ্যে একটি বাধা কাজ করছিল, এটা বলা যেতে পারেই। এরপরে ১৯২০ খ্রিঃ বিশিষ্ট জননেতা নির্মল চন্দ্র চন্দ্রের আহ্বানে কলকাতায় শিক্ষকদের একটি সভা ডাকা হয়। সেখানে বলা হয় যে, সমাজের অন্যান্য পেশাজীবীরা যখন সবাই রুজিরোজগারের জন্যে সংগ্রাম করছে তখন সেই পথে শিক্ষকদের হাঁটতে হবে। নির্মলচন্দ্র চন্দ এই সভায় বলেন, 'গ্র্যাজুয়েটরা নিতান্ত নিম্ন সামাজিক পর্যায়ে রয়েছেন। এদের সকাল-বিকাল প্রাইভেট পড়িয়ে জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। অথচ একজন মুটে মাসে রোজগার করছে ৪০ থেকে ৫০ টাকা। গ্র্যাজুয়েটদের অবস্থা পরিবর্তনের বিশেষতঃ শিক্ষকদের আয় বাড়ানোর ক্ষীণতম ভরসা নেই।'[২৯]

সেইসময় ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা দত্ত হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হেমদাকান্ত চৌধুরী, শিক্ষক সমিতি তৈরির প্রেরণায় অস্থির হয়ে এই উদ্দেশ্য সফল করতে কলকাতায় চলে আসেন। ১৯১৯ খ্রিঃ থেকে সনাতন ধর্ম স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি সমিতি গড়বার জন্য বিশিষ্ট শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকেন। একটি পত্রিকা প্রকাশ করে সমিতিকে শক্তিশালী

করা তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সেইসময় শিক্ষকদের বেতন যৎসামান্য তো ছিলই তার পাশাপাশি তা ছিল, জমিদার শাসিত ম্যানেজিং কমিটির ইচ্ছাধীন। শিক্ষকেরা জীবনযাত্রা ও বেতনক্রমের নিম্ন পর্যায়ের জন্য বেসামাল ছিলেন। আমরা জানি যে অসহযোগ আন্দোলনে, বিদেশি শিক্ষা বয়কটের ডাক দেওয়ার ফলে স্কুলগুলি উঠে যাচ্ছিল। তার ফলেও শিক্ষকদের জীবিকার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল। এদিকে ১৯২১ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে কংগ্রেসের অধিবেশন থেকে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। এর ফলে বাংলার শিক্ষকেরাও শেষ পর্যন্ত নিজেদের একটি পেশাজীবী সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। এক্ষেত্রে অগ্রনীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সিটি কলেজিয়েট স্কুলের গোপাল চক্রবর্তী, খেলাৎচন্দ্র ইনস্টিটিউশনের সতীশচন্দ্র বসু, মহম্মদ লায়েক ইনস্টিটিউশনের আল্লা নেওয়াজ, বৌবাজার হাইস্কুলের রাজেন্দ্রনাথ বোস, জোড়াসাঁকো হাইস্কুলের পঞ্চানন পাল, শ্রী সনাতন ধর্ম ইস্কুলের সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, রানী ভবানী স্কুলের বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সেন্টমেরি স্কুলের মণিমোহন চক্রবর্তী, বিশপ কলেজিয়েট স্কুলের সতীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। ১৯২১ খ্রিঃ ৬ মার্চ ২২ জন প্রধান শিক্ষকের উপস্থিতিতে গঠিত হয় নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি।[৩০] একদিকে তৎকালীন অর্থনৈতিক সংকট এবং অন্যদিকে শিক্ষালয়গুলোতে সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃপক্ষের অত্যাচার-এর বিরুদ্ধেই গড়ে উঠেছিল সংগঠনটি। হেয়ার স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রায়সাহেব ঈশান চন্দ্র ঘোষ সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হলেন। শুরু থেকে সমিতির সরাসরি নেতৃত্বে বত্রিশ বছর যুক্ত ছিলেন, ক্রাইস্ট চার্চ কলিজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি সমিতির ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পত্রিকাটির সম্পাদক হলেন রায়বাহাদুর ঈশান চন্দ্র ঘোষ এবং যুগ্ম সম্পাদক হেমদাকান্ত চৌধুরী। 'শিক্ষা ও সাহিত্য' নামে সংগঠনের একটি মুখপত্রের প্রকাশ ঘটল, সেই বছরেই, অর্থাৎ ১৯২১-এ। পত্রিকার লক্ষ্য ছিল 'Agitation with constitutional bounds for the grivaness and combination for the shake of forming such useful organisation as may tend to the material improvement of the tender will be freely advocated।'[৩১]

সংগঠনের লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয় যে সমিতির কাজ হবে 'শিক্ষকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসারণ ঘটানো ও শিক্ষকতা বৃত্তিকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা।' 'শিক্ষা ও সাহিত্যের', প্রথম সংখ্যার 'শিক্ষকদের আর্থিক উন্নতির উপায় কি'—শীর্ষক প্রসঙ্গে বলা হল যে, 'আজকাল সর্ব্বব্যাপী দুর্মূল্যতায় শিক্ষকগণ বিশেষভাবে প্রপীড়িত। সমাজ যদি আমাদের নিকট উচ্চস্তরের কাজ চাহেন, সমাজ আমাদিগকে অবশ্যই অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত রাখিবেন।'[৩২] ১৯২১ সালে মার্চ মাসে রংপুর জেলার গাইবান্ধা শহরে সমিতির প্রথম অধিবেশন হল। সংগঠন সমিতি ইত্যাদি গড়বার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক যুগে বাংলা অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও আমাদের মনে রাখতে হবে বাংলার বুকে শিক্ষকদের সমিতি গঠনের প্রায় দুই দশক আগেই সেদিনের মাদ্রাজ অথবা আজকের চেন্নাইতে শিক্ষক সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত এই সংগঠনটি প্রাথমিকভাবে শিক্ষিকারাই সংগঠিত করেছিলেন—নাম ছিল উইমেন টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন। অবশ্য পরবর্তীকালে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষকেরাও এই সংগঠনে

যুক্ত হবার সুযোগ পান—সংস্থাটির নামও পরিবর্তিত হয়—মাদ্রাজ টিচার্স গিল্ড।[৩৩] সমসাময়িক কালেই অল বেঙ্গল হাই স্কুল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি পৃথক শিক্ষক সমিতিও গঠিত হয়েছিল। তার ফলে শিক্ষক সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে দুইটি ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। দুই সমিতির নেতারা একই উদ্দেশ্যে দুইটি সমিতি স্থাপন নিরর্থক মনে করেছিলেন। ফলে এক বছরের মধ্যেই দুইটি সমিতি এক দেহে লীন হয়ে গেল। দুই সমিতি নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পতাকাতলে একত্রে কাজ করতে থাকলে

প্রথম সম্মেলন (১৯২১) শিক্ষক সমিতির পথ চলা শুরু

'গাইবান্ধা ছিল গ্রামীণ শহর। ১৯২০-২১ খ্রিঃ এখানে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে পৃথক স্বাধীন থানা এবং খিলাফৎ কমিটি গঠিত হয়েছিল। উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং স্বাদেশিকতার আবহাওয়ায় ইসলামিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রমেশ ভট্টাচার্য তাঁর বিদ্যালয়ে সংগঠনের সম্মেলনের জন্য স্থান ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাংলার বিভিন্ন স্কুল থেকে একশজন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। সমিতির প্রথম সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেছিলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। তিনি তাঁর বক্তৃতায় আশাপ্রকাশ করেছিলেন যে, 'এই সমিতির সদস্যসংখ্যা যখন পঁচিশ হাজার হবে, তখন কোনো বিরুদ্ধ শক্তি এর গতিবেগে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।'[৩৪] ঔপনিবেশিক যুগে শিক্ষকদের আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চাহিদাকে অস্বীকার করার যে প্রথা প্রচলিত ছিল, এভাবেই তাতে প্রথম শক্ত আঘাত হানল এই সমিতি। সুদূর উত্তরের জলপাইগুড়ি থেকে বর্ধমান, হুগলি, বাঁকুড়া—প্রায় সমস্ত জেলায় বিস্তৃত হল শিক্ষক আন্দোলনের ঢেউ।

প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভূমিকা

এই প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের সঙ্গে শিক্ষক সমিতির দীর্ঘ সম্পর্ক্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে একটু আলোকপাত করবার প্রয়োজন আমরা উপলব্ধি করছি। আচার্য রায় কোন সময়েই বীক্ষণাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে নিজের কর্মদক্ষতাকে লুক্কায়িত রাখেন নি। বাঙ্গালির জীবিকা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষকদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে তিনি সবসময় সচেতন ছিলেন। কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অধ্যাপক হিসাবে কাজ করলেও এবং সেই সুবাদে গতশতকের দ্বিতীয় দশকে গড়ে ওঠা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করবার পাশাপাশি, তিনি শিক্ষা ব্যবস্থার আরো দুইটি প্রধান স্তর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা ও শিক্ষকদের লড়াইয়ে সবসময় শামিল হতেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম সম্মেলন রঙপুরের গাইবান্ধায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সাগ্রহে এই সম্মেলনের সভাপতির দায়িত্বে ব্রতী হয়েছিলেন তিনি। শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক নয়—মাধ্যমিক শিক্ষকদের সংগঠন সম্বন্ধে অনুপুঙ্খ খবর রাখতেন প্রফুল্ল চন্দ্র—তাঁর ভাষায়, 'আমি সর্বদাই আগ্রহের সহিত আপনাদের এই সঙ্ঘের সংবাদ রাখি, আপনাদের পত্রিকার আমি নিয়মিত পাঠক। আপনারা ... সমস্ত বাংলাদেশের শিক্ষক দিগের ''শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে'' আশা জাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং বাংলার বিশ হাজার শিক্ষককে এক আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা ও সৌভ্রাতৃত্বের

শৃঙ্খলে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা যথাযথই আনন্দের ও আশার বিষয়। ... আমি আপনাদের দুঃখ দুর্দশার কথা ভাল করিয়াই জানি। আপনাদের দারিদ্র্য যে কি ভীষণ, কি দারুণ উপেক্ষা যে আপনাদের অহরহঃ সহিতে হয়। তাহা আমার অবিদিত নয়। আপনারা সঙ্ঘবদ্ধ হউন ... আপনাদের সঙ্ঘকে বাঁচাইয়া রাখুন, কায়মনোবাক্যে ইহার পুষ্টি ও বিস্তৃতির জন্য চেষ্টা করুন। ক্ষুদ্র স্বার্থ, মতভেদ প্রভৃতি ভুলিয়া আপনার বাংলার চিরযুগের অভিশাপ 'দলাদলি' ও গৃহ বিচ্ছেদের হাত হইতে ইহাকে সর্বতোভাবে মুক্ত রাখুন।[৩৫] বক্তৃতা প্রসঙ্গে আচার্য রায় বিদেশীয় ও স্বদেশীয় শিক্ষাদর্শের মহৎ দিকগুলিকে শিখনের সময় ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করেন। সুস্থ সবল ও কর্মমুখী শিক্ষায় ছাত্রদের অভিষিক্ত করে তাঁদের প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার ব্রতও শিক্ষকদেরই নিতে হবে এই ছিল তাঁর মত। পরিশেষে রুজির সংগ্রামের পাশাপাশি আদর্শ শিক্ষক হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের গুরু মহাশয়দের উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন "Teaching must be made calling of dignity stability utility and sanctity"।[৩৬] শিক্ষকতাকে একটি 'ব্রত' ও বৃত্তির সংমিশ্রণ হিসাবে নির্মল করার জন্য, সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়েই আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় আহ্বানে জানিয়েছিলেন You are the trainers of the Youth of this country, upon the future progress, inteleetual, industrial, political moral and religious.'[৩৭] পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাব—সমিতি আচার্য রায়ের দেখানো পথেই পা পা করে পদপাত করছে—সাংগঠনিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে।

শিক্ষা ও সাহিত্য পত্রিকার ভূমিকা

সমিতির মুখ পত্র শিক্ষা ও সাহিত্য (Teacher's journal)-এর প্রাথমিক বিকাশ সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনার দরকার আছে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষক সংগঠনের সূচনার বছরেই, সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই পত্রিকা প্রকাশ হয়। তবে এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে, যে সমিতির পত্রিকা প্রকাশিত হবার বেশ কিছু সময় আগে থেকেই শিক্ষা সংক্রান্ত কিছু কিছু সাময়িক পত্র বাংলায় প্রকাশিত হতে শুরু করে। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'শিক্ষা পরিচয়' পত্রিকার কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়। সারা পৃথিবীর আদর্শ শিক্ষক ও শিক্ষা বিজ্ঞানের রূপকারদের কথা এখানে বাংলা অনুবাদে প্রকাশিত হত। তবে শিক্ষক বা শিক্ষার নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে এই পত্রিকা উদাসীন ছিল।[৩৮] ঢাকা থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে 'শিক্ষক সুহৃদ'। এই পত্রিকা সম্বন্ধে অবশ্য বিস্তারিতভাবে কিছু জানা যায় না।

শুধুমাত্র শিক্ষা ও শিক্ষক বিষয়ক সাময়িক পত্র হিসাবে প্রকাশিত না হলেও ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে এবং বিংশ শতকের প্রথমার্ধে, পত্রপত্রিকায় অনেক শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। এমনকি শিক্ষকরা সংগঠিত হবার পূর্বেই 'শিক্ষকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা' নিয়েও এইসব পত্র পত্রিকায় নিবন্ধ লেখা হত। উদাহরণ হিসাবে আমরা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবাসী পত্রিকায় ১৬শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড ৫ম সংখ্যায় (ফাল্গুন—১৩২৩) প্রকাশিত একটি সংবাদ নিবন্ধের কথা উল্লেখ করিতে পারি। সেই সময় বাংলা শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের একটি সার্কুলার

অনুযায়ী গভর্নমেন্টের স্কুলে কোন এম.এ. বা আই. এসসি পাস, বি.এ বা বি.এস.সি., কোন আই-এ বা আই.এসসি শিক্ষক যথাক্রমে ৫০, ৩৫, ২৫ টাকার বেশি বেতন পাবেন না এমনটা স্থির করে। স্বাভাবিক ভাবেই তৎকালীন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়, বিখ্যাত দেশনেতা অম্বিকা চরণ মজুমদার এই সিদ্ধান্তের সমালোচক করে বলেন যে, 'ইহা কি সত্য নয় যে বিদ্যালয়কে শিক্ষকদের বেতন ও উন্নতির আশা এইরূপ যে তাহাতে যোগ্য লোকেরা শিক্ষকতার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে না?'[৩৯] অথচ সেই বছরেই তৎকালীন বড়লাট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভেনশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শিক্ষাদানকে একটি মহৎ কাজ বলে চিহ্নিত করে তাদের বেতন বৃদ্ধির কথা বলেছিলেন। এই দ্বৈতমানসিকতার সমালোচনা করে প্রবাসী লেখে, 'শাসন ও বিচার বিভাগে দেশের যে সব শিক্ষিত লোক কাজ করেন, তাঁহাদের মধ্যে ও শিক্ষকদের মধ্যে মোটের উপর বিদ্যাবুদ্ধির কোনই পার্থক্য নাই। ... লোক স্থিতির ও উন্নতির জন্য হাকিমদের চেয়ে শিক্ষকদের কাজের প্রয়োজনে কম নয়, বরং বেশি। হাকিমরা মানুষকে জেলে পাঠাইয়া সমাজকে নিষ্কন্টক করিতে চেষ্টা করেন, শিক্ষকেরা চেষ্টা করেন যাহাতে মানুষ জেলে যাইবার মত কাজই না করে।'[৪০] সেই সময় সরকারি স্কুল বা কলেজের শিক্ষকদের তুলনায় বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকেরা, খুব কম বেতন পাওয়ার প্রসঙ্গে 'প্রবাসী' আরো লেখে, 'সরকারি ও বেসরকারি উভয়বিধ শিক্ষালয়েই অধ্যাপক ও শিক্ষকদের বেতনের যে রূপ প্রভেদ দেখা যায়, তাহাও অযৌক্তিক। এম.এ পরীক্ষায় কিছু নম্বর বেশি বা কম পাইলে তাহাতে বুদ্ধি বিদ্যায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ বুঝায় না। অথচ দেখা যায়, একজন শিক্ষক এম.এ. তাঁহারই সমান যোগ্য ও সমবয়স্ক একজন অধ্যাপক এম.এ.-এর অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশে, সিকি, বা তদপেক্ষাও কম বেতন পাইতেছেন। ... স্কুলের বালকদিগকে সুশিক্ষা দেওয়া কলেজের যুবকদিগকে সুশিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা কম দায়িত্ব বা যোগ্যতার কাজ নয়।'[৪১]

আরেকটি সাময়িক পত্রের কথা এই প্রসঙ্গে উঠতে পারে। যে কাগজটি সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলন গড়ে উঠবার প্রাক মুহূর্তে, 'শিক্ষকের বেতন' শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল। সাময়িক পত্রটির নাম ছিল 'শিক্ষক'। খানসাহেব কাজী ইমদাদুল হকের সম্পাদনায় প্রকাশিত এই পত্রিকায়, বিখ্যাত লেখক কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক এই নিবন্ধের রচনাকার ছিলেন। (১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২৭)। তিনি লিখেছেন '...সাধারণ শিক্ষকমণ্ডলীর পক্ষে যে অল্প আয়ে সংসার অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা সত্য ... শিক্ষকগণ, বিশেষত নিম্ন শিক্ষকগণ যে বেতন পান, তাহাতে অনাহার নিবারণ হয় না, একজন ভদ্রলোকের তাহাতে একেবারেই চলে না। ... সাধারণ নিম্ন শিক্ষকের বেতন ১০/১৫ টাকা, একজন সাধারণ মজুর তাহা অপেক্ষা অধিক রোজগার করে। ... এরূপ অবস্থায় এসকল শিক্ষকের অন্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা স্বাভাবিক। প্রাইভেট পড়াইয়া তাহাকে মাহিনার দ্বিগুণ আয় করিতে হয়। জামাইকার ইক্ষু ক্ষেত্রের কুলীর ন্যায় তিনি দিবারাত্র খাটিয়া স্কুলে আসিয়া কিরূপভাবে কার্য্য করেন, তাহা অনুমান করা অতি সহজ। ... একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও তাহাদের ক্ষীণ আয় তাঁহাদিগকে উত্তম শিক্ষক হইতে দেয় না।'[৪২]

অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির মুখপত্র 'শিক্ষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হবার পূর্বেই শিক্ষক সমাজের অর্থনৈতিক দুরবস্থা নিয়ে, বিক্ষিপ্তভাবে হলেও, অনেক সংবাদ সাময়িকীই সচেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছিল। সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলনের পথ চলা শুরু হবার আগে অন্ততঃ একজন নেতা, 'শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করেছেন। তিনি হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। চিত্তরঞ্জন ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের বিখ্যাত ভবানীপুর বক্তৃতায় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কীভাবে চলবে, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমাদের মতো গরিব দেশে কীভাবে ন্যূনতম ব্যয়ে শিক্ষা প্রণালী চালু থাকে তা নিয়ে বলতে গিয়ে বলেন, 'আমাদের হাবভাব, আচার-ব্যবহার সবই ইংরাজ নবীশ হইয়াছে যে, এই শিক্ষার ফলে আমরা বস্তুর সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়া তাঁহার প্রাণের কাছে গিয়া তাহাকে ছুঁইতে পারি নাই। কেবল উপর হইতে দেখিয়াছি, আর কতকগুলো ইংরাজী শব্দ মুখস্থ করিয়াছি। আমরা মানুষ হইয়া উঠি নাই, একটু বেশি চালাক হইয়াছি মাত্র।'[৪৩] একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

তিনি আরো বলেছিলেন, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিগত শিক্ষার সংমিশ্রণ চাই। 'তাহার জন্য অনেকগুলো স্কুলের দরকার নাই। অনেকগুলো মাষ্টারের দরকার হইবে না।'[৪৪] গ্রামের বিশেষ ধরনের পঞ্চায়েৎগুলি সহজ সামগ্রী যেমন 'বালির কাগজ, খড়িমাটি প্রভৃতির সাহায্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবে এই ছিল তার মত। যদিও ১৯১৭-এর এই বক্তব্যে শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক দৈন্য দূর করবার কোন নির্দিষ্ট উপায় চিত্তরঞ্জনের কলম নিঃসৃত হয়নি। তবু তাঁর মতো নেতার শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তা, সেই সময়ে জনচিত্তে যথেষ্ট ঢেউ তুলেছিল ও শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শিক্ষক সমিতির প্রথম যুগের নেতা হেমদাকান্ত রায় চৌধুরী প্রথম থেকেই সমিতির মুখপত্র হিসাবে একটি পত্রিকা প্রকাশ করার পক্ষপাতী ছিলেন। মোটের উপর তারই প্রচেষ্টার ফলে ১৯২১ অর্থাৎ সমিতির প্রতিষ্ঠা বর্ষেই, সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষক সংগঠনের মুখপত্র হিসাবে ধারাবহিকভাবে বাংলা ও ইংরেজি দ্বিভাষিক শিক্ষা ও সাহিত্য—Teacher's Journal প্রকাশিত হতে শুরু করে। আনুষ্ঠানিকভাবে পত্রিকার সম্পাদক হলেন রায়বাহাদুর ঈশান চন্দ্র ঘোষ এবং যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে কাজ করতে থাকলেন বীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী। অবশ্য এঁদের অন্তরালে থেকে পত্রিকা প্রকাশনার গুরু দায়িত্ব পালন করতে হেমদা কান্ত বাবু। প্রথম দিকেই পত্রিকার গ্রাহক হয়েছিল তিনশোটি হাই স্কুল ও মিডল স্কুল। পত্রিকাটির লক্ষ্য ছিল 'Agitation within constitutional bounds for the grievances and combination for the sake of forming such useful organisation as may tend to the material imporvement of the teachers will be freely advocated'.[৪৫]

সমিতির প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যাটির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতেই হয়। প্রথমেই 'প্রস্তাবনা' হিসাবে বলা হয়, 'শিক্ষা ও সাহিত্য প্রকাশিত হইল। দেশের চারিদিকে একটা প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হইতেছে, সকলেই নিজ নিজ উন্নতি বিধানের জন্য চেষ্টিত, বঙ্গীয় শিক্ষক

সমাজেও সে ভাবের প্রভাব পরিস্ফুট, তাহারই প্রকাশ 'শিক্ষা ও সাহিত্যের' একটি উদ্দেশ্য। শিক্ষক ও শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা, শিক্ষার উৎকর্ষ ও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকগণের সর্ববিধ উন্নতির উপায় অবধারণ, তৎ সম্বন্ধে ভাবের আদানপ্রদান, বিভিন্ন মতের সমাবেশ ও আলোচনা সাহিত্যের দিক দিয়া দেশের সহিত পরিচয় স্থাপনের চেষ্টা, আধুনিক পাঠক পাঠিকা সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন, 'শিক্ষা ও সাহিত্য' সানন্দে নিজ কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে। পরস্পর সদ্ভাব ও প্রীতি বর্দ্ধন 'শিক্ষা ও সাহিত্যের মূলমন্ত্র হইবে। তবে সত্যের অনুরোধে সকল সময় 'হিতং মনোহারি চ দুর্লভ বচঃ' এ কথাও মনে রাখিবে।[৪৬]

আমরা সবাই জানি সমিতি গঠনের সমসাময়িক কালে, দেশে সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নসমূহ গঠন ও তৎসংশ্লিষ্ট আন্দোলন সংগ্রামে দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য নানা ক্ষেত্রে ধর্মঘটে শামিল হচ্ছিলেন। এর প্রভাব ও পড়েছিল সমিতির মুখপত্রের পাতায় তাই নিরন্ন 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণির প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও, অন্তত তাত্ত্বিক স্তরে শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায়, 'শিক্ষকগণের আর্থিক উন্নতির উপায় কি? শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধের সন্ধান ও আমরা পাই। সেই রচনায় বলা হয়েছিল 'আজকাল সমাজের প্রতি দাবি আদায় করিবার যে চরম পন্থা প্রতীচ্য জগতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার আভাস এদেশেও দেখা যাইতেছে। সে উপায় ধর্মঘট। খনির কুলিরা, কলের মজুরগণ ধর্মঘট করে। ফলে বিপন্ন সত্বাধিকারীগণকে বাধ্য হইয়া বেতন বৃদ্ধি করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন—হাস্যচ্ছলে কিনা জানি না যে, শিক্ষকগণ সংঘবদ্ধ হইলে এমন একদিন আসিতে পারে যখন তাঁহারা সমবেতভাবে ধর্মঘট করিয়া বলিতে পারিবেন, আমরা যদি বর্ধিত হারে বেতন না পাই, নতুবা কার্য করিব না।'[৪৭] এ প্রশ্নের উত্তর পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যাতেই দেখেছি।

এ প্রশ্নের উত্তরটি ছিল, 'সে উপায় ধর্মঘট'। অবশ্যই সেই সময়ে এই তাত্ত্বিক ঘোষণার বাস্তবায়ন অন্ততঃ শিক্ষক সমিতির মতো মধ্যবিত্ত পেশাজীবী মানুষদের পক্ষে সম্ভব ছিল না—তার জন্য প্রায় দু'দশক অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাঁদের। সমিতির পরবর্তী কালের নেতা গোলকপতি রায় স্মৃতিচারণাময় একটি লেখায় লিখেছেন, 'সেই যুগে শিক্ষা ও শিক্ষকের দাবিদাওয়া সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য মনোবিজ্ঞান পাঠন রীতি ইত্যাদি বিষয়ে বাংলা দেশের বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের রচনা দ্বারা পত্রিকা সমৃদ্ধ হয়েছিল, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও ড. মেঘনাদ সাহা প্রমুখ মনীষীবৃন্দ এই পত্রিকার লেখকদের অন্যতম ছিলেন।'[৪৮] এ ছাড়া অন্যান্য খ্যাতিমান ও বিশিষ্ট লেখকদের রচনা এই পত্রিকার পাতাকে সমৃদ্ধ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ এর শিক্ষা সম্পকীয় লেখা এমনকি মহাত্মা গান্ধীর বিবৃতিও 'শিক্ষা ও সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মহাত্মা গান্ধী পত্রিকার পাতায় লিখেছিলেন, '.... যদি আমাদের স্বরাজ বহুলাংশে আমাদের প্রচেষ্টায় সম্ভবপর হয়, তাহলে শিক্ষকদের উন্নতিও তাঁদের নিজেদের চেষ্টায় সম্ভব।' [৪৯] বাস্তবিক পক্ষে শিক্ষা ও সাহিত্য ছিল শিক্ষক সমিতির প্রাণ স্বরূপ—সেই টেলিফোন/মোবাইল বিহীন সময়ে সমিতির বার্তা সদস্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার হাতিয়ার ছিল পত্রিকাটি।

প্রথম যুগে সমিতির এই পত্রিকায় যে সমস্ত প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশিত হত, তার একটি ক্ষুদ্র তালিকা উল্লেখ করলেই আমরা বুঝতে পারবো যে শিক্ষা ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কত

ধরনের মূল্যবান লেখাই না সেখানে প্রকাশিত হত। যেমন ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের মে-জুন সংখ্যায় বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. জেনকিনসের 'Education in Bengal'। বা ঐ একই সংখ্যায় প্রকাশিত গোপাল চন্দ্র মুখার্জীর 'The Disease and the remedy'র কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। ১৯২৮ জুলাই সংখ্যায় শিক্ষক আন্দোলনের তৎকালীন গতি প্রকৃতি নিয়ে রায় বাহাদুর যতীন্দ্র নাথ ঘোষের 'বর্তমান শিক্ষক আন্দোলন' শীর্ষক একটি নিবন্ধ পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছিল। আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনায় দেখব যে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বিল নিয়ে সমিতির সঙ্গে সরকারের বারে বারেই মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে—এই প্রস্তাবিত 'Education bill' নিয়ে সমিতির মুখপত্রের পাতায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে জ্ঞানেশ চন্দ্র রায় লিখিত 'এডুকেশন বিল' নামক লেখাটি এই দ্বন্দ্বের প্রাথমিক পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য দলিল হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। আবার ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সমিতির সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও পরবর্তী কালে পশ্চিমবঙ্গের সাবেক রাজ্যপাল ও ড. হরেন্দ্র নাথ মুখার্জীর অভিভাষণ শিক্ষা ও সাহিত্য বা টিচার্স জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।[৫০] এই লেখাতে হরেন্দ্র নাথ শিক্ষকদের সঙ্গে ম্যানেজিং কমিটিগুলি যে ভাবে অধঃস্তন কর্মচারীর মতো ব্যবহার করে, তার তীব্র নিন্দা করেছিলেন। প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও মেঘনাদ সাহার মতো বাংলার কৃতবিদ্য যে সমস্ত মানুষ—তাদের বক্তৃতা বা লেখনীর দ্বারা সংগঠন ও সাংগঠনিক সভাগুলিতে অংশ নিয়েছিলেন, তাদের কথা প্রসঙ্গ ক্রমে অবশ্যই আসবে—তবে স্বাধীনতা পূর্ব যুগে 'শিক্ষা ও সাহিত্য' যারা লিখেছিলেন, তাদের লেখার কিছু অংশ উদ্ধৃত না করলে, বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের অঙ্গহানি ঘটবে বলেই আমরা মনে করি।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে সমিতির উদ্যোগে 'শিক্ষা সপ্তাহ' পালিত হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তারই লিখন ললাটে ধারণ করেছিল শিক্ষক সমিতির পত্রিকাটি। তৎকালীন ঔপনিবেশিক শিক্ষার সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, 'দেশের চিত্তের সঙ্গে দেশের শিক্ষার এই দূরত্ব এবং সেই শিক্ষার অপমানজনক স্বল্পতা দীর্ঘকাল আমাকে বেদনা দিয়েছে ; কেননা নিশ্চিত জানি সকল পরাশ্রয়তার চেয়ে ভয়াবহ শিক্ষায় পরধর্ম'।[৫১]

বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক বিনয় কুমার সরকারের একটি মূল্যবান লেখাও ১৯২৭ খ্রিঃতে শিক্ষা ও সাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৭ সালে লিখিত এই প্রবন্ধ পড়া হয়েছিল, ওই বছরের এপ্রিল মাসে হাওড়া জেলা শিক্ষক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে। তার মতে 'ইস্কুল মাস্টারদের দল, বাংলা দেশের এক বিশাল দল। এই দল যথার্থ রূপে সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিলে বাঙালি সমাজে এক নবীন শক্তি যোগ দেখা দিবে। এই দলের আর্থিক ও আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টায় যাহারা ব্রতী রহিয়াছেন তাঁহারা একটা বড় কিছু করিতেছেন।[৫২] শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের দুরবস্থাকে চিহ্নিত করে তামাসার ভঙ্গিতে বিনয়বাবু লিখেছিলেন, 'আমরা ইস্কুল মাস্টার। ছেলে পিটানো আমাদের পেশা। আমাদিগকে গরু বিবেচনা করা হইতেছে দেশের লোকের রেওয়াজ। আজকাল কিন্তু গরুর সেবা করিবার জন্য

সর্বত্র খেয়াল দেখা যাইতেছে। গোপালন, গবাদির উন্নতি ইত্যাদি কথা যেখানে সেখানে শুনা যায়। অথচ মাস্টারগুলোর উন্নতি বা জীবন বৃদ্ধির চর্চ্চা বেশি হয় না। ... যাহা হউক, মাস্টারেরা নিজেই নিজের উন্নতি সাধনের পথে কর্ম্ম শুরু করিয়াছেন।'[৫৩]

বিনয় বাবু এরপর মনোবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে কীভাবে শিখনকার্যকে ফলপ্রসূ করা যায়, তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর, শিক্ষকদের আর্থিক দুর্গতির প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আর্থিক সংকটে জেরবার বাঙালি শিক্ষকের সমস্যা সংকুল জীবনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'এই সমস্যার মীমাংসা বেতন বৃদ্ধি। মজুরি বাড়াইবার জন্য আন্দোলন চালানো ইস্কুল মাস্টার সম্মিলনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। খাই-খরচের সঙ্গে সঙ্গে সমান অনুপাতে ঝী-চাকরের, রেলকুলির, রাস্তার মুটের, ফ্যাক্টরীর মজুরদের দর্ম্মাহা বাড়িতেছে। অধ্যাপক মাস্টার গুরু মশাইদের দর্ম্মাহা বাড়িবে না কেন? এই জন্য প্রত্যেক জেলায় জিনিসপত্রের দাম বিষয়ক তথ্য তালিকা সংগ্রহ করা আবশ্যক .... সম্মিলনের কয়েকজন সভ্য নিয়মিতরূপে সকল প্রকার হাট-বাজারের মূল্য আর সকল প্রকার চাকুরের বেতন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইতে চেষ্টা করুন তাহা হইলে ইস্কুল মাস্টারদের আর্থিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হইতে পারিবে।'[৫৪] এইভাবে বিনয় বাবু স্বভাবসিদ্ধভাবে নিজের মতো করে শিক্ষা ও সাহিত্যের পাতায় শিক্ষক সমাজের দুরবস্থা ও তার প্রতিকার নিয়ে এই মূল্যবান লেখাটি লিখেছেন। শিক্ষকরা কারোর করুণার পাত্র নন—বরং জাতির মেরুদণ্ড এই বিশ্বাস ব্যক্ত করে বিনয় বাবুর লেখনি নিঃসৃত আরো কয়েকটি পংক্তি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তিনি বলেছিলেন, 'এত দুর্গতি সত্ত্বেও বাঙালি ইস্কুল মাস্টারেরা বিগত বিশ-পঁচিশ বৎসর ধরিয়া পল্লীতে পল্লীতে নয়া বাংলা গড়িয়া তুলিতেছেন। যুবক বাংলার ইতিহাসে ইস্কুল মাস্টারদের কৃতিত্ব অসীম। তাঁহাদের ভাবুকতা ও সাহসিকতা বাঙালি সমাজকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।'[৫৫] শিক্ষকদের আন্দোলনে তাঁদের রুটি রুজির দাবি অবশ্যই উঠেছে। কিন্তু প্রথম থেকেই শুধু অর্থনীতিবাদের বেড়াজালে তা আবদ্ধ থাকেনি। বিনয়বাবু নিজে বিদ্যালয় শিক্ষক না হলেও, তা অনুধাবন করেছিলেন।

আরেকজন বিখ্যাত মানুষ যিনি কর্মসূত্রে স্কুলের শিক্ষকই ছিলেন, শিক্ষক সমাজ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যও সমিতির প্রাথমিক পর্বে তাঁদের মুখপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর নাম কবি শেখর কালিদাস রায়। তথাকথিত ভাবে সংগঠনের নেতৃত্ব পদে না থাকলেও, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় শিক্ষকদের মর্ম জ্বালার জ্বলন্ত প্রকাশ ঘটিয়ে তিনি লিখেছিলেন। ডাক বিভাগের সেই সময়ের ঐতিহাসিক ধর্মঘটের কথা উল্লেখ করে, তিনি 'শিক্ষকের অন্নাভাবে সমাজের ক্ষতি' শীর্ষক লেখায় মন্তব্য করেছিলেন, 'ডাক বিভাগের লোকেরা ধর্মঘট করিল, তাদের সংঘ আছে, সংহতি আছে, তাহাদের সংঘের সঙ্গতিও আছে। অথচ অধিকাংশ শিক্ষক এমনকি গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকের তুলনায় ডাক পিওনরা বেশি মাহিনা পায়। কেরানিরা তো বেশি পায়ই। শিক্ষকেরা নিরুপায়, তাহাদের সংঘ, সংহতি, সঙ্গতি কিছুই নাই। একমাস কালও তাহারা তাহাদের যৎসামান্য পারিশ্রমিক উৎসর্গ করিতে পারে না। তাহারা এই সমাজে নিঃস্বতম।

বর্তমানে সময়ে যে কোন মুচি-মেথর, ঝাড়ুদার রিক্সওয়ালার চেয়েও তাঁহারা দরিদ্র।'[৫৬] মর্মন্তুদ ভাষায় তিনি আরো লিখেছেন 'আশ্চর্য্যের বিষয়, শিক্ষকদের এই শোচনীয় অবস্থার ফলে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার যে কত ক্ষতি হইতেছে—তাহা দেশের জনসাধারণ, শিক্ষিত সম্প্রদায়, শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণ্যমান্য সদস্যগণ কেহই চিন্তা করেন না। আমি তাহাদের হৃদয় বৃত্তির উদেশে আবেদন করিতেছি না—কারণ, এ যুগে হৃদয়ের বড়ই দুর্ভিক্ষ। আমি তাহাদের বিচার বুদ্ধির উদ্দেশেই আবেদন জানাইতেছি।' তবে এই প্রবন্ধের প্রথমেই মধ্যবিত্ত শ্রেণি চেতনার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে ডাকপিওন বা মুচি, মজুর ইত্যাদি পেশাকে 'শিক্ষকতার থেকে কম মহিমাময় পেশা বলে চিহ্নিত করে, সেই সময়কার সাধারণ শিক্ষকদের অহং বোধেরই প্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি। স্বীকারও করেছেন সে কথা। তারই ভাষায় 'এই দারিদ্র্যর কারণ কেবল তাহাদের (শিক্ষক) পারিশ্রমিকের স্বল্পতা নয় তাহারা শিক্ষিত, তাহারা ভদ্র সম্প্রদায়ের লোক, সভ্য সমাজে তাহাদের চলা ফিরা করিতে হয়, তাহাদের বিত্ত নাই, তবু তাহাদিগকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া গণ্য করা হয়। শিক্ষকদের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ ইহাই।'[৫৭] নিঃস্ব গরিবদের প্রতি এই পার্থক্য নিরুপণের চেষ্টাকে আমরা তৎকালীন শিক্ষক আন্দোলনে একটি 'চেতনার ঘাটতি' বলে সহজেই চিহ্নিত করতে পারি। পরবর্তীকালেও অর্থাৎ ১৯৫৪-এর আন্দোলনে সামগ্রিক জনতার সমর্থনে লড়াই করার আগে পর্যন্ত শিক্ষক সমাজের এমনকি তাদের নেতৃবর্গের মধ্যে এই চেতনার অসম্পূর্ণতা কিয়ৎ পরিমাণে ছিল। পরবর্তী কালে শিক্ষক নেতা থেকে অগ্রগামী জননেতাতে পরিণত প্রবাদ প্রতীম নেতা সত্যপ্রিয় রায় পর্যন্ত ৪৮' এর ধর্মঘটের সময় মজুরদের মতো শিক্ষক আন্দোলনে পোস্টার দেওয়াকে অসমীচিন বলে মনে করেছিলেন। অবশ্য খোলা মনের মানুষ বলে, সাম্যবাদী চেতনায় ঋদ্ধ অনিলা দেবী তাঁর মাসিকতার ত্রুটিকে সংশোধন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।[৫৮]

শিক্ষকদের সংঘবদ্ধ পথ চলা

যাক এসব অনেক পরের কথা। যথা সময়ে সেই সব ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা করব। শিক্ষা ও সাহিত্যের পাতায় শিক্ষক সমিতির বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম এর কথা ও বিভিন্ন অধিবেশনের সভাপতিদের ভাষণ ও প্রকাশিত হত—সেগুলিও পরবর্তীতে প্রসঙ্গ ক্রমে আসবে। বিশেষ করে ৫৪ এবং ৬৬-এর শিক্ষক সংগ্রামকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে যে 'শিক্ষক' কেন্দ্রিক সাহিত্য ধারার সৃষ্টি হয়েছিল ঘটনাক্রম আলোচনার সময় তা নিয়েও আলোচনা করব আমরা। আপাততঃ তাই 'শিক্ষা ও সাহিত্যের পাতা মুড়ে রেখে, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ধারাবাহিক চলার পথের সুলুক সন্ধানে রত হব আমরা। সোস্যাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টে সমিতি নিবন্ধীকৃত হবার পর সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ৫ এবং ৬ আগস্ট কোলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে শিক্ষক সংগঠনটির দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রায় বাহাদুর যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে গঠিত এই সম্মেলনে সমিতির উদ্দেশ্যে ঘোষণা করে বলা হল, (1) To improve the status of the teachers (2) To form a brotherhood of teachers and enable the profession.'[৫৯] ১৯২২-এর সম্মেলন থেকে দাবি

করা হল যে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি বা সেনেটের মোট সদস্য সংখ্যার ২৫% শিক্ষক প্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট করতে হবে। স্মর্তব্য তখন বাংলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হত। সম্মেলন বাংলা বর্ণমালার বদলে রোমান হরফে বাংলা লেখার যে প্রস্তাব কোন কোন মহল থেকে করা হচ্ছিল তারও তীব্র প্রতিবাদ করে। এদিকে শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটবে এই আশায়, 'Bengal Retrenchment committee কর্তৃক উত্থাপিত, 'De-provincialisation of Government schools' প্রস্তাবকে সমর্থন করে সম্মেলন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী সরকারি বিদ্যালয়গুলির বেসরকারিকরণের কথা বলা হয়েছিল।[৬০] আসলে সেই সময়ে বিদ্যালয় শিক্ষা খাতে সরকার যে অর্থ ব্যয় করত—তার বেশিরভাগ অংশই সাধারণত জেলা সদরে অবস্থিত, 'মডেল সরকারি বিদ্যালয়গুলির জন্যই ব্যয়িত হত। শিক্ষক সমিতি মনে করেছিল, 'সরকারি শ্বেতহস্তি স্বরূপ এই ধরনের বিদ্যালয়গুলির বেসরকারিকরণ হলে, প্রদেশের অন্যান্য বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহও সরকারি সাহায্য বেশি বেশি করে পাবে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাদের সেই আশা পরিপূরিত হয়নি। নবগঠিত শিক্ষক সমিতিও পরবর্তীকালে তাদের ভাবনার ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিল।

তৃতীয় সম্মেলনের (১৯২৩) সভাপতি ছিলেন অধ্যক্ষ গিরিশ চন্দ্র বসু। সংবিধানে গৃহীত সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সংগঠনের সম্পাদক হলেন মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। যুগ্ম সভাপতি রাজেন্দ্র নাথ বসু ও প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। এই সময় কাশিম বাজার পলিটেনিক, ওরিয়েন্টাল সেমিনারী প্রভৃতি কয়েকটি স্কুলে কয়েকজন শিক্ষককে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করলে, সমিতি এর প্রতিবাদে শিক্ষার্থী, ডি-পি আই ও উপাচার্যের কাছে প্রতিবাদ পত্র পাঠায়। চাকরির নিরাপত্তা, বেতনবৃদ্ধি, শিক্ষক শিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি প্রভৃতি জানিয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমিতি। Bengal Legislative Council নির্বাচনে, ABTA-এর সমর্থিত প্রার্থীদের নামও চূড়ান্ত করা হয়—এরা হলেন ডা. নীলরতন সরকার, শ্রীদেব প্রসাদ ঘোষ ও প্রসন্ন কুমার রায়। এরা অবশ্য কেউই জিততে পারেন নি।[৬১]

১৯২৪ খ্রিঃ মাদারিপুর সম্মেলনে যোগেশ চন্দ্র চৌধুরীর সভাপতিত্বে সমিতির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়—সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে Text Book Sub-committee বাতিল প্রভৃতি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই বছরেই ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক মোহিনী মোহন ভট্টাচার্যকে ওই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি পদচ্যুত করলে, সমিতির পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ করা হয়—সমিতির চাপে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে একটি 'অনুসন্ধান কমিটি' গঠন করতে বাধ্য হয়—কমিটি এই পদচ্যুতিকে অন্যায় বলে রায় দিয়ে ওরিয়েন্টাল সেমিনারী কর্তৃপক্ষকে মোহিনীবাবুকে তাঁর পদে পুনর্বহাল করা ও ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাকে অতিরিক্ত ছয় মাসের মাইনে দিতে বাধ্য করে। শিক্ষক পদচ্যুতির বিরুদ্ধে এটাই সমিতির প্রথম জয়। এ ছাড়া শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুলের চারজন শিক্ষক ছাঁটাই-এর প্রতিবাদ করা হলে, চাপে পড়ে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মি. জে. আর ব্যানার্জীকে ঘটনার তদন্ত করতে বলে। সামগ্রিকভাবে এইসব ছাঁটাই-এর সমাধান কল্পে সমিতি দাবি করে (১) স্কুল কমিটিতে শিক্ষক

প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে, (২) শিক্ষা বিভাগের সালিশি বোর্ডের মাধ্যমে কর্মচ্যুতির ঘটনাগুলোর তদন্ত করতে হবে। (৩) চাকুরি থেকে পদচ্যুতির পূর্বেই শিক্ষককে আগাম সতর্ক করতে হবে, (৪) এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ অমান্য করলে, স্কুলের সরকারি সাহায্য বা অনুমোদন বাতিল করতে হবে। তখনকার ৮৪৬টি স্কুলেই এই দাবিভিত্তিক আন্দোলনের কথা ছড়িয়ে পড়ে।[৬২]

১৯২৫-এর ডিসেম্বর মাসে কাটোয়া শিক্ষক সমিতির ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর আগেই ১৯২৫-এর ১৯ মে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমিতিকে শিক্ষকদের স্বীকৃত অ্যাসোসিয়েশনের স্বীকৃতি প্রদান করে। যাই হোক মি. আর্কুহাটের সভাপতিত্বে পরিচালিত সম্মেলনে ৩১৬ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সমিতির গঠনতন্ত্রেরও আংশিক সংশোধন হয় এই সম্মেলনে। সমিতির সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড গঠন ও বেতন বৃদ্ধির দাবিতেও প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই দাবিগুলির ভিত্তিতে এ.বি.টি-এর পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল শিক্ষা অধিকর্তা (DPI)-র সঙ্গে ১৯২৬-এর ১২ জানুয়ারি আলোচনা করে। প্রসঙ্গত এই বছরেই সমিতি নিখিলভারত শিক্ষক ফেডারেশনের সদস্য পদ গ্রহণ করে। এই সময়কার একটি হিসাবে দেখা যায় প্রায় ৭০০টি বিদ্যালয়ে সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমিতি আন্দোলনের কিছু সাফল্য অর্জন করে এই সময়ে—সুদীর্ঘ চার বছর ধরে আন্দোলনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৬ নম্বর সার্কুলারে স্কুল কোড ও সালিশি বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবন্ধক (Register) জানান, যে স্কুলের কমিটি ভালোভাবে কাজ করছে সেগুলি স্কুল কোড অনুযায়ী পুনর্গঠিত হবে না। সমিতি এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে। স্কুল কোড অনুযায়ী স্কুল কমিটির ১২ জন সদস্যের মধ্যে দুইজন হবেন শিক্ষক প্রতিনিধি। জেলা সালিশি বোর্ডে সাতজনের মধ্যে দুজন শিক্ষক প্রতিনিধি থাকবেন। কেন্দ্রীয় সালিশি বোর্ডের নয়জন সদস্যের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত তিনজন প্রধান শিক্ষক থাকবেন। সেই সময় নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনরত সমিতির এই সাফল্য বড় কম ছিল না।[৬৩]

১৯২৬ খ্রিঃ সমিতির জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য বছর। কেন না এই বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকার কর্তৃক সমিতি অনুমোদন লাভ করে। সেইসময় সমিতির মুখপত্র শিক্ষা সাহিত্য-এর শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবির পাশাপাশি শিক্ষক-কবিরা কাব্যরচনার মাধ্যমে শিক্ষকদের নানা দাবি তুলে ধরতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের একটি কবিতার কথা উল্লেখ করতে পারি। ১৯২৭-এ শান্তিপুরে সমিতির সপ্তম বার্ষিক সম্মেলনে তোমাদের দানে ভরিছে ভুবন, অশেষ দানের তোমরা দাতা। /ওগো ধনহীন, নিঃস্ব-স্বাধীন, ওগো মতিমান আত্মজয়ী /সকল দুঃখ দূর কর ; হেরি কার সে মূরতি জ্যোতির্ময়ী? /অধঃপাতের শেষ সীমানায় চলেছে যাহারা হাস্যমুখে/ ধনের গর্বে গর্বিত যারা, মদোন্মত্ত দাস্য—সুখে/ আপন ইষ্ট পদতলে দলি, মিত্রের বুকে বসায় ছুরী,/যারা কৃতঘ্ন কাপুরুষ অতি, ব্যবসা যাদের ছলনা চুরী/—(স্বাগত)।[৬৪] এখানে নম্র ভাষায় শিক্ষকদের মনোভাব তুলে ধরেছেন কবি—শিক্ষক।

সেই সময় শিক্ষক সমিতি বেতন বৃদ্ধির দাবি রাখার পাশাপাশি, খামখেয়ালি ম্যানেজিং কমিটিগুলির কর্তৃক ইচ্ছাকৃত শিক্ষকদের পদচ্যুতি ঘটাবার বিরুদ্ধে ক্রমশ সোচ্চার হতে শুরু

করে, সমিতি করার অপরাধে পদচ্যুতির ঘটনা ঘটে। পরবর্তীকালে লিখিত হলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টিচার' গল্পে এই ধরনের পদক্ষেপের একটি সুন্দর চিত্র আমরা দেখতে পাই, যেখানে শিক্ষক আন্দোলনের কর্মী দরিদ্র শিক্ষকের, রাজমাতা হাই স্কুলের সম্পাদক রায়বাহাদুর অবিনাশ তরফদার জ্বলন্ত দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়ে, তার উপর মানসিক চাপ দেওয়ার শাস্তি স্বরূপ শিক্ষক গিরিনকে বরখাস্ত করে। শিক্ষক গিরীন জানে, 'রায়বাহাদুর (দরিদ্র্যের সেই চিত্র) ভুলতে পারবেনা, তার ভয় করবে। শিক্ষকদের দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য কীর্তন করে শোনাতে গিয়ে একটু আটকে আটকে যাবে কথাগুলি উচ্ছ্বাসটা হবে মন্দ, দয়া-মায়া সহানুভূতিতে নয়, ভয়ে)।'[৬৫] যাইহোক ১৯২৬ এর ডিসেম্বর মাসে ফেণীতে শিক্ষকদের ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি হন মিস্টার আর্কুহাট। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন ও বেতন বৃদ্ধির দাবি ওঠে অধিবেশনে। বোর্ড গঠন সম্বন্ধে এই সম্মেলনে সমিতি ঘোষণা করে বোর্ডকে সম্পূর্ণ ভাবে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত রাখতে হবে, সদস্যদের মধ্যে শিক্ষকবৃন্দের সংখ্যা সর্বাধিক রাখতে হবে, বোর্ডের সমস্ত পদাধিকারীরা নির্বাচিত হবেন এবং এটি অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত হবে।

এই সময় বাংলার শিক্ষক ছিলেন, ন্যূনধিক ৬৭ হাজার। একজন প্রাথমিক শিক্ষক বেতন পেতেন ৬½ টাকা আর মাধ্যমিক শিক্ষকদের মোট বেতন ছিল ২৯ টাকা। বাংলার সরকারও শিক্ষার প্রসারে বহুলাংশে উদাসীন ছিল। বিদ্যালয় পিছু বছরে মাত্র ৩২০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষকেরা এর প্রতিবাদ করেছিলেন। ১৯২৩ সালের ঢাকার সম্মেলনে বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের বেতন ৫০% বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি অনুদান এবং ভবিষ্যনিধি চালু করার দাবি উত্থাপিত হয়। এই বিষয়ে ৬ সদস্যের একটি উপসমিতি গঠন করে তার উপর সামগ্রিক পরিকল্পনার ভার দেওয়া হয়। দরিদ্র শিক্ষকদের সাহায্য করার জন্য 'টিচার্স' বেনিফিট ফান্ড গঠন করা হয় এই সময়। ১৯২৪ সালের সম্মেলনে অন্যায়ভাবে শিক্ষককে কর্মচ্যুত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং চাকুরির নিরাপত্তা বিধানের জন্য স্কুল কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ানোর কথা বলা হয়। ওই বছরই প্রথম প্রকাশনার জগতে সমিতি পদক্ষেপ কবে এবং পাঠ্য পুস্তক 'সাহিত্যচয়ন' প্রকাশিত হয়। বিশের দশক ছিল দেশে অর্থনৈতিক মন্দার কাল। তখন কর্মসংস্থানের জগতেও হাহাকার। শিক্ষকদেরও সেদিন কোনো প্রকৃত বেতনহারই ছিল না। এই সময় আর একটি সমস্যাও বাংলা প্রদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে তটস্থ করেছিল। যেসব বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার স্বল্পতাহেতু ছাত্র বেতন আদায় খুবই কম হত, সেসব বিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতিল হত। ফলতঃ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দুর্গতির আর সীমা থাকত না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্যযোগ্য যে ঐ সময় যাঁরা শিক্ষকতায় এসেছেন তাঁরা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো নিয়োগপত্র পেতেন না। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা আসলে ছিলেন অস্থায়ী শিক্ষক। ১৯২৫ সালে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী মিস্টার ডোনাল্ড সর্বপ্রথম বেসরকারি স্কুলগুলোর জন্য বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। তার ফলে স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের সভাপতিত্বে ১৯২৫ খ্রিঃ কাটোয়া সম্মেলনে সরকারের প্রশংসা করা হয়। এদিকে প্রকৃতপক্ষে সরকার

শিক্ষাব্যবস্থার সকল দায়িত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে চাইছিল। তাই সে সময় সরকারি স্কুলগুলোকে ডি-প্রভিনশিয়ালাইজেশন নীতি অনুযায়ী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার একটা চেষ্টা হয়। সমিতি প্রাথমিক পর্বে সরকারি এই নীতিকে সমর্থন করেছিল। কেন না, সমিতির নেতৃবৃন্দ মনে করেছিলেন যে, এভাবে সরকারি স্কুলের ব্যয় কমিয়ে এনে সরকার সামগ্রিক স্কুল শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাবে। অবশ্য পরবর্তীকালে তাঁদের এই আশা ফললাভ করেনি।

যাইহোক তৎকালীন সমিতি নেতৃত্ব মাঠেময়দানে নেমে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম না করলেও, তাদের প্রতিকী প্রতিবাদ ও আবেদন নিবেদনের ফলস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন (১৯২৫)। এই অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে ম্যানেজিং কমিটিগুলির দ্বারা শিক্ষকদের অকারণ পদচ্যুতিগুলির যথার্থতা প্রমাণিত হয়। ফলে সরকার ও তৎকালীন স্কুলসমূহের নিয়ামক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আংশিক হলেও বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিতে বাধ্য হন। বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি অন্যায় ভাবে শিক্ষককে অবসৃত করার অভিযোগে কতিপয় বিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতিল করারও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।[৬৬]

শিক্ষক সমিতি সেদিন সঠিক ভাবেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল যে শিক্ষা ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে না পারলে, বা ম্যানেজিং কমিটিগুলির একচেটিয়া ক্ষমতাকে খর্ব না করতে পারলে, শিক্ষকদের চাকুরির নিরাপত্তা কোন ভাবেই রক্ষিত হতে পারবে না। এই লক্ষ্যে সমিতি দাবি করে যে শিক্ষকদের পদচ্যুতি ঘটাবার পূর্বে তাদের সতর্ককীকরণ করতে হবে। পদচ্যুতির ঘটনা সংক্রান্ত বিতর্কের নিষ্পত্তি ঘটাবার জন্য গঠন করতে হবে সালিশি বোর্ড। প্রতি ডিভিশনে সালিশি বোর্ড গঠন করতে হবে। অভিযোগ অপ্রমাণিত হবার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকের পুনর্নিয়োগ করার বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ অমান্য করা হলে, বিদ্যালয়ের অনুমোদন বাতিল বলে গণ্য করতে হবে। শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত রাখবার প্রয়োজনে ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষক সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এই সমস্ত দাবিদাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সমিতির মর্যাদা শিক্ষকদের মধ্যে বহুলাংশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত সালিশি বোর্ডে এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষক সদস্য গ্রহণ করে, করা হলে যখন তখন শিক্ষক ছাঁটাই-এর ঘটনা কিছুটা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ১৯২৬-এ বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎকালীন ঔপনিবেশিক বাংলা সরকার সমিতিকে অনুমোদন ও স্বীকৃতি দান করেন। সেই সময়কার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও তার নানা উন্নয়নমূলক কাজে সমিতির সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করে।[৬৭]

আশুতোষের সময় থেকেই প্রচ্ছন্নভাবে হলেও, হিন্দুত্ববাদীদের একটা প্রভাব সমিতির উপর ছিল। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র শ্যামাপ্রসাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্তাকর্তা হবার ফলে এই প্রভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পায় বলে পরবর্তীকালের সমিতির নেত্রী অনিলা দেবীর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি।[৬৮] বিশেষ করে গত শতকের চল্লিশের দশকে প্রস্তাবিত মধ্যশিক্ষা বোর্ডে, মুসলিম প্রতিনিধিদের জন্য সংরক্ষিত প্রতিনিধিত্বের যে প্রতিশ্রুতি তখনকার বাংলার প্রধানমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী) ফজলুল হক দিয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন হিন্দুত্ববাদী নেতারা। আর আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির

তৎকালীন নেতৃবর্গ এই সংরক্ষণের বিরোধিতা করেছিলেন। অনেক আদর্শ-এর কথা এ প্রসঙ্গে বলা হলেও, আসলে হিন্দু মধ্যশ্রেণি, মাধ্যমিক শিক্ষার উপর এযাবৎ চালু থাকা তাদের প্রভাব হারাতে না চাওয়ার জন্যই এই বিরোধিতা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে পরে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করব।

জেলায় জেলায় সমিতির প্রসার

শুধুমাত্র তৎকালীন বাংলার মূল শাসন কেন্দ্রে অর্থাৎ কোলকাতায়, শিক্ষকদের এই সংগ্রামী মঞ্চ সীমাবদ্ধ ছিল না। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি থেকে দক্ষিণবঙ্গের ২৪ পরগণা প্রায় সব জেলাতেই শিক্ষকরা নতুন ভাবে সংগঠিত হতে আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েছিলেন।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে জলপাইগুড়ি শহরে অনুষ্ঠিত হয় নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ১৬তম বাৎসরিক সম্মেলন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার। বাংলা ভাষায় প্রশ্নপত্র রচনা, ভবিষ্যৎ নিধি তহবিলে অধিক হারে সুদ, ছুটি সংক্রান্ত নিয়মাবলীর বিদ্যালয় কোডে অন্তর্ভুক্তি প্রভৃতি দাবি এই সম্মেলনে উঠে আসলেও, নিয়মতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দের বাধাদানের ফলে এই সব দাবি গৃহীত হতে না পারলেও, সম্মেলনকে কেন্দ্র করে পরবর্তী কালে এখানে শিক্ষক সমিতির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তবে দেশের স্বাধীনতা পাওয়ার আগে অবধি সারা জেলায় একটি শক্ত সংগঠনের উপর দাঁড়িয়েছিল, এরকম বলা সত্যের অপলাপ হবে। তবে পরবর্তীকালে ১৯৪৮, ৫২ বা ৫৪-র সংগ্রামী আন্দোলনে এই জেলা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

এরপর আসব উত্তরবঙ্গের আরেকটি উল্লেখযোগ্য জেলা দিনাজপুরের কথায়। আসলে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার এই জেলায় অন্ততঃ প্রাথমিক পর্বে খুব একটা জোরালো ছিল না। 'Non Schooled area' বলে পরিচিত দিনাজপুরে, ১৯২১ সালে সমিতির জন্মক্ষণে ১২টির বেশি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল না। প্রাথমিক ভাবে এই জেলার মুষ্টিমেয় শিক্ষকদের মধ্যে স্বভাবতঃই সমিতির প্রভাব ততটা ছিল না। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্যচয়ন নামে একটি স্কুল পাঠ্যবই সমিতি প্রকাশ হওয়া ও শিক্ষকদের দাবির প্রেক্ষিতে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে সমিতিকে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃতি দেওয়া, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে স্কুল কোড চালু প্রভৃতি কারণে রাজ্যের অন্যান্য জেলার মতো দিনাজপুরেও ABTA-এর প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে সমিতির প্রতি নৈতিক সমর্থন থাকলেও সমিতি বিরোধী ম্যানেজিং কমিটির ভয়ে অনেকেই সেই সময় সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করেননি। এই জেলায় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে সমিতির ২৪তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পরে অবশ্য এই জেলায় সমিতির সদস্য সংখ্যাও শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। সংবাদপত্রের পাতায়ও আমরা তার ঝলক দেখি।[৬৯]

এর পর আসি বাঁকুড়া জেলার কথায়। সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগ থেকেই বাঁকুড়া জেলায় ABTA-এর যথেষ্ট শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই জেলায় প্রথম সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন, পলাশডাঙ্গা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ভোলানাথ ঘোষ। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ

বাঁকুড়ার বিভিন্ন প্রান্তের কতিপয় শিক্ষক হৃদয়ভূষণ মিশ্র, গোকুল চন্দ্র ঘোষ, রসময় বিশ্বাস প্রভৃতিদের নেতৃত্বে বাঁকুড়ায় সমিতি শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য জেলার মতোই ১৯৪৩-এর বাঁকুড়া রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে, জেলার সংগঠন আরো বেগবতী হয়ে ওঠে। এই সম্মেলন থেকে যে শিক্ষদের মহার্ঘ ভাতা দেবার দাবি ওঠে, বাঁকুড়ার শিক্ষকেরা তাকে সোচ্চারে সমর্থন জানিয়েছিলেন। স্বাধীনোত্তর কালেও বাঁকুড়া সংগ্রাম আন্দোলনে তার গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছিল। সেকথা যথা সময়ে আলোচিত হবে।

সমিতি গঠনের প্রাথমিক পর্বে বর্ধমান জেলায় শিক্ষক আন্দোলন ও সমিতি সংগঠনের রূপকার ছিলেন, হরিদাস গোস্বামী। বর্ধমান জেলায় অবশ্য নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি প্রতিষ্ঠার পূর্বেই রাজস্কুলকে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের একটি সমিতি গড়ে উঠেছিল।[৭০] এই সমিতি সংগঠনের অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে কাজ আরম্ভ করে। প্রথম যুগে সমিতির অন্য নেতাদের মধ্যে প্রধান শিক্ষক নীরদ মাহাতো এবং প্রধান শিক্ষক লক্ষ্মীনারায়ণ কুণ্ডু'র নাম উল্লেখ করাই যায়। সেই সময় রাজ্যের অন্যান্য অংশের মতো বর্ধমানের শিক্ষকবৃন্দের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। সেই সময়কার একজন শিক্ষকের সাক্ষাৎকার অনুযায়ী 'আমি যখন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সদস্য তখন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অবস্থা ছিল এক কথায় শোচনীয়। অনুমোদিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে (Lump) অনুদানের আওতায় ৪/৫ বছর থেকে, তারপর ঘাটতি ভিত্তিক অনুদান পেত... ছাত্র বেতন যা আদায় হত তা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জরুরি প্রয়োজনের ভিত্তিতে দশ কিংবা বিশ টাকা হিসাবে বণ্টন করে দেওয়া হত।....কাজের অবস্থা (Service condition) মোটেই ভাল ছিল না। পরিচালক সমিতির স্বেচ্ছাচারিতার বলি হতে হয়েছে অনেক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে....কাজের নিরাপত্তা বিশেষ কিছু ছিল না।[৭১] সমসাময়িক পত্রিকা থেকে বর্ধমান জেলার কালনায় বর্ধমান জেলা শিক্ষক সম্মেলনের কথা পাই। সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলার পশ্চিম অংশের জেলাগুলির মধ্যে বর্ধমান জেলা প্রথম থেকেই নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির একটি শক্ত ঘাঁটি ছিল। স্বভাবতঃই এই জেলায় সমিতির কার্য কলাপের উপর পুলিশ কড়া নজর রাখতো। ১৯২৬-এ আসানসোলে অনুষ্ঠিত সমিতির জেলা সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হরিদাস গোস্বামী। সম্মেলনে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সিন্ডিকেট সদস্য' বিখ্যাত ব্যবহারজীবী এবং স্বনামখ্যাত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে হরিদাস বাবুর বক্তব্য হিসাবে পুলিশী প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল, '.....Hari Dass Goswami opened the proceedings of the conference in Bengali, welcoming the delagates from various schools and explaining its object, which is to ameliorate the condition of the teachers as well as the pupils. The president, in his address in English, mainly dwelt on the grievances of the Mufassal Schools audit was resolved to bring these to the notice of the Hon'ble vice-chancellor of the Calcutta University with a view to have them redressed।'[৭২] প্রসঙ্গত রায় সাহেব উপাধিতে ভূষিত

হরিদাস গোস্বামী এবং প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন ভাবেই ঔপনিবেশিক সরকারের বিরোধী ছিলেন না। তাদের উপস্থিতি সত্ত্বেও মাত্র ১২৫ জন প্রতিনিধি শিক্ষকের সমন্বয়ের সম্মেলনে পুলিশ নজর রেখেছিল সেই সময়ে। অবশ্য পুলিশি প্রতিবেদনের শেষে, সরকারের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ লিখতে বাধ্য হয়েছিল 'The utlerances of the speakers were free from politics and not objectionable।'

হুগলি জেলা প্রথম থেকেই (১৯২১) সমিতির একটি শক্তিশালী শাখা হিসাবে পরিগণিত হত। মাস্টারমশাই জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে গত শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই একটি সরকার বিরোধী মনোভাব এখানকার বুদ্ধিজীবী, বিশেষ করে শিক্ষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৭৩] এই Anti establishment এর মনোভঙ্গী এখানকার শিক্ষক সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছিল। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে সমিতির প্রথম সম্মেলনে রঙপুরের গাইবান্ধায় হয়েছিল। এই সম্মেলনে হুগলি জেলার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিল। সমিতির দ্বিতীয় সম্মেলনেই হুগলির কোন্নগরের যতীন্দ্রনাথ রায় কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। এই সম্মেলনে উপস্থিত হুগলি জেলার আর পাঁচজন প্রতিনিধির অন্যতম ছিলেন প্রমথনাথ সেন। ১৯২৩-এ ঢাকা শহরের সম্মেলনে হুগলির যেসব প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন, হরিচরণ সিংহ। ১৯২৫ এ ফেনীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে হুগলির প্রতিনিধি হিসাবে মতিলাল মুখোপাধ্যায় ও নারায়ণ চৌধুরী যোগদান করেন।[৭৪]

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইনস্‌স্টিটিউশনে হুগলি জেলা শিক্ষক সমিতির প্রথম জেলা সম্মেলন আহূত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন পূর্বোক্ত স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক হরিমোহন গোস্বামী। তিনিই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে জেলা সভাপতির পদ লাভ করেন। এছাড়া সহসভাপতি রাজকুমার দাস ও হরিসাধন পাল এবং সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দেই কেন্দ্রীয় সমিতির সংবিধান ও নিয়মাবলী রচনার জন্য কার্যনির্বাহী সমিতির যে সভা কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় তাতে হুগলি জেলা সমিতির সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী যোগ দেওয়ার অধিকার অর্জন করেছিলেন। বিশের দশকেই 'শিক্ষা ও সাহিত্য' নামক সমিতির মুখপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন, হুগলির অন্যতম শিক্ষক নেতা উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (সেনশাস্ত্রী) এবং মতিলাল মুখোপাধ্যায়। স্বাধীনোত্তর কালেও হুগলি জেলা তার সংগ্রামী চরিত্র বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। বিশেষ করে সমিতির নরমপন্থী চরমপন্থী অংশের দ্বন্দ্বময় চুঁচুড়া সম্মেলন (১৯৫৩)-এর কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি।[৭৫]

জেলাওয়ারি আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে এবার আমরা সমিতির কাজকর্মের প্রাণকেন্দ্র কোলকাতার সবচেয়ে কাছের জেলা হাওড়ার কথায় আসব। কোলকাতার সন্নিকটস্থ হওয়ায় ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দেই এখানে প্রথম পাশ্চাত্য ধাঁচের স্কুল গড়ে উঠেছিল। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে হাওড়া জেলা স্কুল স্থাপনের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক সরকার এই জেলার শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে আঞ্চলিক ধনাঢ্য ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায়

বেশ কয়েকটি মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এই জেলায়। এই বিদ্যালয়গুলি প্রথম থেকেই অর্থসংকটে ভুগছিল। তা মোচনের জন্য বাংলা সরকারের জুনিয়ার সেক্রেটারি S. C. Baylay, 20/10/1863 তে তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তার কাছে একটি নোটও পাঠিয়েছিলেন।[৭৬] এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা অধিকর্তা Atkinson চিঠি সংখ্যা ১৯৫৮, তারিখ, ২৩.০৯.১৮৬৩।[৭৭] এই জেলায় শিক্ষা পরিচালনার জন্য সরকারি প্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রভাবশালী জমিদার ইত্যাদি তথাকথিত শিক্ষানুরাগীদের সমন্বয়ে একটি 'লোকাল কমিটি' গঠন করে। এই কমিটি শেষ পর্যন্ত কায়েমি স্বার্থের তল্পিবাহক হয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে ছড়ি ঘোরাতে শুরু করলেও, বিদ্যালয়গুলির অর্থনৈতিক দুরবস্থা ঘুচাতে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি। অন্যান্য জেলার মতো এই জেলাতেও শিক্ষকেরা অবর্ণনীয় অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যে কালাতিপাত করতেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ABTA প্রতিষ্ঠার বছরেই এই জেলার বেশ কিছু শিক্ষক, সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। জেলার নেতৃস্থানীয় শিক্ষকদের উদ্যোগে এই সময় জেলার সমস্ত শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে একটি প্রচার পত্র প্রকাশ করেন। সমিতির মুখপত্রে (নানা কথা, পৃষ্ঠা-০২), শিক্ষা ও সাহিত্য ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩২৮)। প্রকাশিত হয়েছিল '.....সুখের বিষয় যে সমিতির আহ্বানে কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলি জেলার শিক্ষকসমূহ সম্মিলিত হইয়া সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষক সমাজকে যোগ দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন।[৭৮] সেই সময়ে জেলার ১১টি হাই ইংলিশ স্কুল ও চারটি মিডল ইংলিশ স্কুল সমিতির সদস্য হিসাবে নথিভুক্ত হয়। ১৯২১-এর সমিতির গাইবান্ধা সম্মেলনে হাওড়া থেকে অনিলভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। প্রথম সম্মেলনেই অনিলভূষণবাবু কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন। আরেকজন হাওড়া প্রতিনিধি সুরেন্দ্রবাবু শিক্ষক সংগঠনের Death Benefit Fund কমিটির সদস্য ছিলেন।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় ABTA-র দ্বিতীয় সম্মেলন অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত স্কুল ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন স্কুলের মধ্যে আর্থিক অনুদানের তারতম্য সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব আনেন।[৭৯] দ্বিতীয় সম্মেলন থেকে জেলায় অন্যতম প্রতিনিধি ফকিরচন্দ্র বিশ্বাস কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ফেনী সম্মেলনে (6th Conference) কেন্দ্রীয় সমিতিতে জেলার সদস্যরা ছাড়াও, চার জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ওই সময় কালে অন্যায়ভাবে কোলিয়া আমীর আলি বিদ্যালয়ের শিক্ষক অমৃতলাল প্রামাণিককে চাকুরি থেকে কর্তৃপক্ষ বহিষ্কার করলে এর প্রতিবাদে হাওড়া জেলার সমিতির সদস্যভুক্ত শিক্ষকেরা একজোট হয়ে প্রতিবাদ করেন। এই পর্যায়েই ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে হাওড়ায় সমিতির জেলা কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির 'প্রভিশনাল সদস্য' হিসাবে সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সহ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, হরিপদ ঘোষ, সতীশচন্দ্র বসু ও অভয়পদ চন্দ্র সহ ১৬ জন সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৯২৭ এর ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল জেলার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সম্মেলনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এই সম্মেলনে এসেছিলেন। ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি

শিক্ষকদের অসহনীয় আর্থিক অবস্থার কথা উল্লেখ করে মন্তব্য করেছিলেন '.....আজকাল কিন্তু গরুর সঙ্গে মাষ্টারদের সেবা করিবার আন্দোলনও বাংলাদেশে প্রবল হইতেছে না কেন?'[৮০]

জেলা কমিটি গঠনের অব্যবহিত পরেই ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে পাঁচজন মাধ্যমিক শিক্ষক নির্বাচনের কথা হয়। জেলা সমিতির সদস্যেরা এই নির্বাচনী প্রচারের কাজে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। সেই সময় জেলার মোট পঞ্চাশটি বিদ্যালয়ের মধ্যে চৌত্রিশটি স্কুলেই সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এইভাবে কোলকাতার পর হাওড়া সমিতির দ্বিতীয় বৃহত্তম শাখায় পরিণত হয়। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে জেলা কমিটির ২য় সম্মেলনের সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন প্রবাসী পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্যে তিনি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে বাংলার শিক্ষার অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার একটি তুলনামূলক আলোচনা করেন। তাঁর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার একটি প্রদেশে শিক্ষাখাতে যে ব্যয় বরাদ্দ থাকে, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্মিলিত শিক্ষা ব্যয় তার থেকে কম। এই ভাবে তিনি সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্যবাদী ব্যবস্থায় শিক্ষা ব্যবস্থা কী রূপ লাভ করে, সেই সম্বন্ধে শিক্ষকদের সচেতন থাকার আহ্বান জানান।[৮১]

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে এই সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু শিক্ষক প্রতিনিধিদের দাবি মেনে সম্মেলনে থাকাকালীন স্কুল ছুটি মঞ্জুর করার কথা মেনে নেন হাওড়া জেলার তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা। এই নির্দেশ একদিক থেকে ছিল যুগান্তকারী। কেননা এই নির্দেশে একটি নজির হিসাবে পড়ে অন্যান্য জেলায় কার্যকর হয়।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে হাওড়া জেলা কমিটির পঞ্চম সম্মেলনের জাঁকজমকের কথা তুলে আপাততঃ হাওড়া প্রসঙ্গে ইতি টানব। এই সম্মেলন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি দিকপালরা শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেছিলেন। সম্মেলনে মূল সভাপতি জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেছিলেন ''.....আমি শিক্ষকদের আন্দোলনকে সন্দেহের চোখে দেখে আসছিলাম। মনে হয়েছিল শ্রমিকদের মতো এটাও একটা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। শিক্ষকরা উপবাসী থাকলে শিক্ষাও বুভুক্ষ হবে। তবে ভিক্ষার ঝুলি হাতে শিক্ষকতা করবেন না।..... আমার এই দেশে শিক্ষামন্ত্রী মোটা মাইনে পায়, শিক্ষক সপরিবারে উপোস করে। শিক্ষার্থী বিদ্যালয় ছেড়ে পালায়।'[৮২] সুপণ্ডিত মানুষটির এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তৎকালীন মানুষের শিক্ষক আন্দোলন সম্পর্কে প্রাথমিক দ্বিধা ও পরিশেষে শিক্ষকদের সদর্থক সংগ্রাম সম্বন্ধে সন্দেহ মুক্ত হবার চিত্রটিই যেন ফুটে উঠেছে।

বাংলার পশ্চিম অঞ্চলের মতো পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায়ও শিক্ষক আন্দোলন যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। তবে বাংলা বিভাগের কারণে সেখানকার শিক্ষক সংগ্রাম ভিন্নমুখী রূপ ধারণ করায়, সেখানকার আন্দোলন অনেকটাই ভিন্নমুখী হয়ে পড়ে। তবে তৎকালীন সংবাদপত্র এবং পুলিশ রিপোর্ট থেকে পূর্ববঙ্গের আন্দোলনের অনেক সংবাদই আমরা পাই। উদাহরণস্বরূপ তৎকালীন বিখ্যাত পত্রিকা 'বাংলার কথা'য় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ঢাকা জিলা শিক্ষক সম্মেলনের কথা—ওই বছরের ১৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত ওই সম্মেলনে মাধ্যমিক শিক্ষার

জন্য স্বতন্ত্র বোর্ডের দাবি তোলা হয়। এছাড়া পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধি নেবারও দাবি ওঠে উক্ত সম্মেলনে।[৮৩]

উপরোক্ত বছরের কিশোরগঞ্জ শিক্ষক সম্মেলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণও আমরা পেয়েছি, সংবাদ পত্রের পাতা থেকে। এই সম্মেলনের সভাপতি হয়েছিল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এস. পি. ওয়েস্ট। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন জগদীশচন্দ্র বাগচী। সম্মেলনে সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার দাবির পাশাপাশি ভবিষ্যনিধি বা প্রভিডেন্ট ফান্ড ব্যবস্থার এবং প্রতিমাসে নিয়মিত বেতনদানের পক্ষে উপস্থিত শিক্ষক প্রতিনিধিরা প্রস্তাব পাশ করিয়ে ছিলেন।[৮৪]

সেই সময়ে পূর্ববঙ্গের মুক্তাগাছায় আর. কে. হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর স্কুলের পরিচালন কমিটি কর্তৃক পদচ্যুত হন। এর বিরুদ্ধে জেলা নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে।[৮৫] বরিশালেও স্কুল পরিচালনা করবার সরকারি নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে শিক্ষক সমিতির সদস্যরা প্রতিবাদ সভা সংগঠিত করেছিলেন।[৮৬] স্বভাবতঃই পূর্ববঙ্গের শিক্ষক সংগঠনের উপর প্রথম থেকেই ঔপনিবেশিক পুলিশের নজর ছিল।

তৎকালীন পূর্ববঙ্গের জেলাগুলি শিক্ষক সমিতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতা থেকে দূরবর্তী হলেও, সেখানকার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সেখানকার শিক্ষক সংগ্রাম যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। পূর্ববঙ্গের প্রায় সব প্রান্তে নিয়মিত জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত। মূল সমিতির 'গাইড লাইন' মেনে চললেও, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী সরকারের শিক্ষানীতি এবং শিক্ষকদের প্রতি তাদের মনোভাব যে শিক্ষা ক্ষেত্রের দুঃর্দশার জন্য বহুলাংশে দায়ী একথা পূর্ববঙ্গের শিক্ষকরা সমিতির কলকাতার স্নায়ুকেন্দ্রে অবস্থানরত নেতাদের থেকে অনেকটাই গভীর ভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তৎকালীন পুলিশী রিপোর্টে আমরা তার যথেষ্ট প্রতিফলন দেখতে পাই।[৮৭]

উদাহরণস্বরূপ আমরা ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই আগস্ট ঢাকা জেলা শিক্ষক সম্মেলন সম্বন্ধে প্রথমেই উল্লেখ করব। সেই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার। তিনি তৎকালীন ঢাকার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ হরিদাস ভট্টাচার্য ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সমভিব্যবহারে সভাস্থলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে '.....was welcomed with shouts of "Bandemataram" by the volunteers, who were mostly students of Narainganj H.E. School and Jaigobinda H. E. School, Nitai Ganj'।[৮৮] স্বাভাবিক ভাবেই পরাধীনতার সেই তিমির লগ্নে, শিক্ষক সমিতির সম্মেলনে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দেবার অনুমতি প্রদান করে ঢাকায় শিক্ষক নেতৃত্ব যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন—দিয়েছিলেন তাঁদের দেশপ্রেমের পরিচয়। বাঘা CID অফিসার নরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য, ঢাকার DIB দপ্তরের পক্ষ থেকে ১৮/০৮/২৯ খ্রিস্টাব্দে এই গোপন প্রতিবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করেছিলেন।

এই সম্মেলনে অবশ্যই শিক্ষকদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেনেট' সহ অন্যান্য শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কমিটিতে মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব প্রদানের দাবি সজোরে উত্থাপিত হয়েছিল। এছাড়া পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকার

স্বীকৃতির দাবিতে সমিতির 'Draft Resolution's-এ বলা হয়েছিল, 'This conference is of opinion that Teachers must have adequate representation on the proposed Text Book Committee and that the rules be so framed as to allow the A.B.T.A. to nominate atleast 7 members on the committee namely one from each division, one from Calcutta and one lady Teacher.'[৮৯]

সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছিলেন, '.....মাষ্টারমহাশয়েরাই Matriculation-এর Examiner হইবার একমাত্র উপযুক্ত।....ডিগ্রীবিহীন ব্যবসায়ী পর্যন্ত পরীক্ষকের উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছেন—হয় নাই কেবল শিক্ষকগণ, আবার যখন ছেলেদের গার্ড দিবার দরকার হয়, তখন 'ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলার' খোঁজ পড়ে। কারণ ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইবার জন্য অন্য জাতীয় জীব বসিয়া নাই। তখন মাষ্টারমশাইদিগকে একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞান সম্পন্ন অলৌকিক জীব ইত্যাদি প্রকার মিঠা বুলিতে চিড়া ভিজান হয়।'—প্রসঙ্গান্তরে সভাপতি আরো বলেছিলেন, 'Calcutta University-র নূতন Bill ত তৈয়ার হইয়াছে। কিন্তু এই Bill-এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের স্থান নির্দেশ করা প্রয়োজন....যে স্কুলগুলির রুধির গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থি মজ্জা পরিপুষ্ট লাভ করিতেছে, সেই স্কুলসমূহের শিক্ষকগণ কি এতই অস্পৃশ্য হইয়াছেন যে, তাহারা বিশ্ববিদ্যা মন্দিরে প্রবেশ করিলেই মন্দির অপবিত্র হইবে? স্কুলগুলো যে University-এর Nursery ইহা যদি তোমরা ঠিক বুঝিয়া থাক, তবে University তে কয়েকজন শিক্ষকের স্থান করিয়া দিয়া Secondary ও University-র মধ্যে একটা যোগসূত্র রাখার বন্দোবস্ত করনা কেন? মাধ্যমিক শিক্ষকদের সংঘবদ্ধ হবার ফলে ঔপনিবেশিক প্রশাসন এবং বিশ্ববিদ্যালয় যে কিছুটা হলেও, শিক্ষকদের সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন, তার উল্লেখ করে রমেশবাবু বলেছিলেন, 'All Bengal Teachers' Association' স্থাপনের পর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুলগুলির কথা কিছু কিছু ভাবিতে সময় পাইতেছেন মনে হয়। অনেক চেষ্টার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জীবিকাকে পদ্ম পত্রের জলের শামিল না করার জন্য একটা 'Arbitration Board' স্থাপনের সংকল্প করিয়াছিলেন। কথা ছিল সেখানে বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক তিনজন থাকিবেন। গভর্নমেন্ট কি করিয়া ৩ জনের পরিবর্তে ১ জন শিক্ষক থাকাই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন, তাহা আমাদের জানা নাই। অধিকন্তু সরকারি স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষককে আমাদের প্রতিনিধি সাজাইয়া দিয়াছেন। পরিহাস আর কাহাকে বলে? সরকারি শিক্ষক আমাদের মর্মব্যথা কি বুঝিবেন? এইরূপ খামখেয়াল প্রসূত Board পাওয়াকে রুটির বদলে লোষ্ট্র খণ্ড পাওয়াই বলে।[৯০]

কালানৌচিত্তে কিছু বিঘ্ন ঘটিয়ে, এবার আমরা সংক্ষিপ্ত রূপে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববঙ্গের রাজশাহীতে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে যে জেলা সম্মেলন হয়েছিল, তার কথায় আসব, পূর্ববঙ্গের রাজশাহীতে ১৯২৭-এর ৬ই মার্চের জেলা সম্মেলনের কথা আমরা সুপারিনটেন্‌ডেন্ট অব পুলিশের কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট থেকে জানতে পারি।[৯১] এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন রাজশাহী ডিস্ট্রিক বোর্ডের চেয়ারম্যান খানবাহাদুর ইমাদুদ্দিন আহমেদ। পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী, এই সম্মেলনে রাজশাহী কলেজের অধ্যাপক রামপদ মজুমদার, প্রাক্তন স্কুল ইনস্‌পেকটর হেমচন্দ্র

সরকার, শিক্ষকদের অত্যল্প বেতন বৃদ্ধি করার ও তাদের 'সার্ভিস কন্ডিশন' সঠিক ভাবে রূপায়ণ করবার দাবী তোলেন। সেখানেই দাবি উত্থাপিত হয় যে, 'That the Government and University be move to fix the minimum pay of a teacher of an High English at Rs. 40/- and that of Head Master at Rs. 100/- as suggested by the All Bengal Teachers' Association.'[৯২] পূর্ববঙ্গে শিক্ষক সমিতির বিস্তার যে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে যথেষ্ট বেগবতী ছিল তা উপরোক্ত পুলিশ রিপোর্ট থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায়।

কোলকাতা সমিতির কর্মচাঞ্চল্যের মূল কেন্দ্র থাকলেও, এখানকার জেলাগত সংগঠন, অন্য অনেক জেলার তুলনায় কিছুটা দেরীতেই সংগঠিত হয়। যাইহোক ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতা জেলার নেতৃত্বে জেলা শিক্ষক সমিতির প্রথম সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে বিখ্যাত দেশপ্রেমী বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, তার অভিভাষণে বলেছিলেন, 'শিক্ষাকার্য অভাব ও অনিশ্চয়ের ভীতি নিরপেক্ষ, সম্ভ্রমমণ্ডিত, সফলতার উপযোগী এবং পবিত্র করিতে হইবে। আপনারা কায়মনোবাক্যে ইহার যোগ্য হউন। সর্বান্তঃকরণে এই সুমহৎ কর্তব্য পালনের চেষ্টা করুন। ভগবান আপনাদের সহায় হইবেন।[৯৩] তিনি শিক্ষকদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সংক্রান্ত এবং অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেছিলেন।[৯৪]

প্রফুল্লচন্দ্র আরো বলেছিলেন, 'আমি সর্বদাই আগ্রহের সহিত আপনাদের এই সঙ্ঘের সংবাদ রাখি। আপনাদের পত্রিকার আমি নিয়মিত পাঠক, আপনারা..., বাংলার বিশ হাজার শিক্ষককে এক আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা ও সৌভ্রাত্রের শৃঙ্খলে বাঁধবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা যথার্থই আনন্দের বিষয়.....আপনাদের এই সংঘকে বাঁচাইয়া রাখুন।....ইহার পুষ্টি ও বিস্তৃতির জন্য চেষ্টা করুন।'[৯৫]

শিক্ষক সমিতি ও ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতিক্রিয়া

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ২০৬, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই বছরেরই ১৬ এবং ১৭ এপ্রিল শান্তিপুরের ভিক্টোরিয়া মিউনিসিপ্যাল স্কুলে শিক্ষক সমিতির সপ্তম বার্ষিক সম্মেলন অধ্যক্ষ হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৩৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অবিলম্বে মাধ্যমিক শিক্ষার পৃথক বোর্ড গঠন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে দুইজন শিক্ষক প্রতিনিধি গ্রহণ, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, পদচ্যুত শিক্ষকদের পুনঃবহাল প্রভৃতি দাবিতে সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই কোলকাতার এথেনিয়াম ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক সহ আট জন শিক্ষককে অন্যায় ভাবে ছাঁটাই করা হয়। সমিতি এর তীব্র প্রতিবাদ করে। সমিতির চাপে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এঁদের পুনর্নিয়োগের আদেশ জারি করলেও, স্কুল কর্তৃপক্ষ সেই নির্দেশ অমান্য করে। স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় এই স্কুলের অনুমোদন প্রত্যাহার করে। ১৯২৭-এর ডিসেম্বর মাসে কোলকাতার রিপন কলেজ হলে, নিখিল ভারত শিক্ষক ফেডারেশনের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন এ. বি. টি. এ.-র উদ্যোগেই অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমন এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন, যে শুধুমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নয়, দেশ বিদেশ ভ্রমণ করে ছাত্রছাত্রীদের, 'First hand knowledge' প্রদান করার পাথেয় উপার্জন করার জন্যও

শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। রমনের ভাষায়, 'If India is to rise again as a free nation, it will not be because of the shouting of the politicians, but by the construetive work accomplished by the teachers in the schools, by the silent labour of the scholar in his study of the man of sciecne in his laboratory.'[৯৬]

সেখানে আমেরিকার শিক্ষকদের বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের সঙ্গে এদেশের শিক্ষক সংগঠনগুলির তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন তিনি। তার বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, ''It is upto us (Teachers) to show that inspite of the miserable pittances paid us as salaries, which are barely sufficient to keep body and soul together, we can muster up enough energy and strength to give a lead to the commnunity.'[৯৭] সেই বছরেই সমিতি সদ্য গঠিত নিখিল ভারত শিক্ষক ফেডারেশনের সদস্য পদ গ্রহণ করে। যদিও সর্বভারতীয় এই ফেডারেশনের শক্তি ছিল সীমিত। কেননা তখনো ভারতের অন্যান্য প্রায় সকল রাজ্যে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক আন্দোলন ছিল অতীব দুর্বল। এর মধ্যে অনেক জায়গায় এই আন্দোলন তখন পর্যন্ত ভ্রূণাবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ABTA-র কাছ থেকে এই বছরটি একটি মাইলফলক বলে বিবেচিত হতে পারে। কেননা ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দেই সরকার সমিতির দাবি মেনে নিয়ে স্কুল কোড এবং সালিশি বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। সময়ের নিরিখে এই সাফল্যের মূল্য বড় কম ছিল না। এই স্কুল কোড বা বিদ্যালয়সমূহ পরিচালনার সুসংহত আইন পঞ্জী খসড়া তৈরির ক্ষেত্রে সমিতির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তবে আইন প্রণীত হলে, অনেক বিদ্যালয়েরই প্রতিক্রিয়াশীল পরিচালন কর্তৃপক্ষ বাস্তবে শিক্ষক স্বার্থে রচিত এই কোডের বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি করেছিল। শিক্ষক সমিতির তৎকালীন প্রধানতম নেতৃত্ব মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, '...school code' চালু হল। ম্যানেজিং কমিটি সম্বন্ধে নির্দিষ্ট রীতিনীতি হল। 'Arbitary Board' সম্বন্ধে সরকার নির্দেশ দিলেন, শুধু সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলে প্রযোজ্য। সমিতির তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার ফলে সরকারকে নতি স্বীকার করতে হল, সব স্কুলেই প্রযোজ্য হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। এই সময়ে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। কলকাতার মর্টন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও মালিক ছিলেন তখন শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কিছুতেই তিনি স্কুল কোড মানবেন না। সমিতি থেকে আন্দোলন তীব্রতর পর্যায়ে যায়। কিন্তু তিনি এতই একগুঁয়ে ছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত স্কুল তুলে দিলেন। তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মেনে নেবেন না'।[৯৮] এমনকি স্কুল কোডকে পর্যাপ্ত প্রতিকূলতার উজানে বাস্তবায়িত করতে, আইন প্রণয়নের পরেও শিক্ষকদের সক্রিয় সচেষ্ট থাকতে হয়।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত Calcutta University Bill-এ মাত্র পাঁচ জন শিক্ষক ১০০০টি স্কুলের পক্ষ থেকে সিনেটের সদস্য থাকবে—এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে—সমিতি এর তীব্র প্রতিবাদ করে এবং ন্যূনতম ২৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধিকে সিনেটের সদস্য করতে হবে—এরকম দাবি জানায়। এই বছরের এপ্রিলে ময়মনসিং শহরে রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সমিতির অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্কুল কোড এবং

সালিশি বোর্ড গঠন কার্যকরী না হওয়ার বিরুদ্ধে শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দ তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এই সম্মেলনে শিক্ষকরা অনতি বিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে স্কুলসমূহের পরিচালন ভার একটি পৃথক বোর্ডের হাতে দেবার দাবি পুনরায় উচ্চারিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ে সালিশি বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়ায়, তারও প্রতিবাদ তীব্র ভাবে করে এই সম্মেলন। ৬৬৫৯ জন শিক্ষক এই প্রক্রিয়া স্থগিত হবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। স্বাক্ষরিত দাবি পত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করে। এই সময়ে বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে অন্যায় ভাবে ছাঁটাই করা হয়—একমাত্র এথোরা এস. সি. ইনস্টিটিউশনেই ছয় জন শিক্ষক কর্মচ্যুত হন। সমিতি ম্যানেজিং কমিটির এই খামখেয়ালের জোরদার প্রতিবাদ করে। এই বছরই সমিতির পক্ষ থেকে দু বছরের অধিক দিন ধরে কর্মচ্যুত শিক্ষকদের একটি তালিকা বা 'Unemployment Register' খোলা হয়। বিভিন্ন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এই Register থেকেই নতুন শিক্ষক নিয়োগ করার অনুরোধ জানায় শিক্ষকদের সমিতি।[৯৯]

মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে তার 'দুয়োরানির' ভূমিকা পরিবর্তনের জন্য, বিশ্ববিদ্যালয় সেই সময় যে চেষ্টা চালাচ্ছিল এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়-এর মতো তৎকালীন বুদ্ধিজীবীরা এই প্রচেষ্টাকে প্রতিনিয়ত সমর্থন জানাচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, '.....ইংরেজি ভাষাটা অতি মাত্রায় বিজাতীয় ভাষা।..... আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোনো প্রকার মিল নাই।..... সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়।' এর প্রতিকার কল্পে তাঁর দাওয়াই ছিল শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য সাধন করতে হলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার করাই বিধেয়।[১০০] রবীন্দ্রনাথের এই মতকে, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি দু হাত তুলে সমর্থন জানিয়েছিল।

১৯২৮-এর এপ্রিলে ময়মনসিং শহরে রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সমিতির অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্কুল কোড এবং সালিশি বোর্ড গঠন কার্যকরী না হওয়ার বিরুদ্ধে শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দ তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এই সম্মেলনে শিক্ষকরা অনতি বিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে স্কুল পরিচালনার ভার একটি পৃথক বোর্ডের হাতে দেবার দাবি পুনরায় উচ্চারিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ে সালিশি বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়ায়, তারও প্রতিবাদ তীব্রভাবে করে এই সম্মেলন। ৬৬৫৯ জন শিক্ষক এই প্রক্রিয়া স্থগিত হবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, স্বাক্ষরিত দাবিপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন।[১০১] এই সময়ে বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে অন্যায় ভাবে ছাঁটাই করা হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মাধ্যমিক শিক্ষকদের দাবি দাওয়া আরো জোরে শোরে উচ্চারিত হবার সুযোগ্য সৃষ্টি হয়। প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষক বিল কার্যকর করবার জন্য সরকারকে তৎপর হতে বলে সমিতি। সমিতির চাপে এই সময় সালিশি বোর্ড কাজ শুরু করে।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহিতে সমিতির নবম বার্ষিক সম্মেলন আহূত হয়েছিল। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এই সম্মেলনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। এই

সম্মেলনেই সমিতি মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ঘোষণা করার দাবি তোলে। এই প্রস্তাবের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য সমিতি সচেষ্ট হয়। এদিকে ওই সময়েই ১৯২৮-এর ঘোষণা অনুসারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী সভা সিনেটে পাঁচজন মাধ্যমিক শিক্ষকের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ হয়েছিল। এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে সমিতি। অবশ্য ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত Calcutta University Bill-এ মাত্র পাঁচজন শিক্ষক ১০০০টি স্কুলের পক্ষ থেকে সিনেটের সদস্য থাকবে এ রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে সমিতি এর তীব্র প্রতিবাদ করে এবং ন্যূনতম ২৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধিকে সিনেটের সদস্য করতে হবে—এরকম দাবি জানায়।[১০২]

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে সমিতির জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। ওই বছরেই সরকার সমিতির দাবির যৌক্তিকতা অনুধাবন করে, নতুন শিক্ষকদের কাজে যোগদানের আগে ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক বাধ্যতামূলক নিয়োগপত্র দেবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়। এই সময়েই শিক্ষক সংসদ গঠন, ম্যানেজিং কমিটিতে বাধ্যতামূলক ভাবে শিক্ষক প্রতিনিধি রাখা এবং স্কুল কর্তৃপক্ষের স্বৈরতান্ত্রিক উপায়ে শিক্ষক ছাঁটাই-এর প্রতিবিধান কল্পে শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন আবশ্যিক করার দাবিতে সমিতি সোচ্চার হয়। এদিকে ওই বছরেই সরকার দেশে ক্রমবর্ধমান জনজাগরণকে রোধ করার লক্ষ্যে ও আইন অমান্য আন্দোলনে ছাত্রদের যোগদান প্রতিরোধ কল্পে, ছাত্রদের নিবর্তনমূলক একটি আইন প্রণয়ন করে। ছাত্রদের এই স্বাধীকারের উপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সমিতি তীব্র প্রতিবাদ করে। ১৯৩০-এর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শিক্ষক সমিতির দশম সম্মেলনে এই সব প্রসঙ্গেই আলোচনা-সমালোচনা হয়। এদিকে পরের বছর ১৯৩১-এর ৩১ আগস্ট চট্টগ্রামের তিনটি বিদ্যালয়ে ব্রিটিশ পুলিশ হামলা চালায় ও বিনা প্ররোচনায় ছাত্রদের উপর লাঠি চার্জ করে। এই বছরেই বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের নির্বাচনে সমিতি ডা. বিধানচন্দ্র রায়কে সমর্থন করে। ডা. রায় কাউন্সিলে নির্বাচিত হন। প্রসঙ্গতঃ সেই বছরের সম্মেলনে সরকারি স্কুলগুলির 'Deprovincialisation', শিক্ষক শিক্ষণের অধিকতর সুযোগ দান, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন, শিক্ষক বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। আমরা জানি যে সেই সময়কার সমিতির রক্ষণশীল নেতৃত্ব সব সময় বাইরের রাজনীতির আঁচ যাতে সমিতির মধ্যে না প্রবেশ করে, তার জন্য সদা সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৩০-৩১ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের ডাকে স্কুল কলেজ বর্জন করে, বৃহদংশ ছাত্রদের আন্দোলনে নামা, পিকেটিং করার বিরুদ্ধে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি মত প্রকাশ করে—দেশের সচেতন সব অংশের মানুষ যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে-প্রতিরোধে সোচ্চার সেখানে সমিতির আত্মকেন্দ্রিক ভাব, আমাদের বিস্মিত না করে পারে না। অবশ্য আমরা দেখি সেই সঙ্গে শিক্ষকদের সমিতি ছাত্রদের উপর দমনমূলক সরকারি সার্কুলারেরও বিরোধিতা করেছিল। সমিতির দাবিতে অবশ্য এই সময়ে সরকার নতুন নিয়োগের সময় বাধ্যতামূলক ভাবে নিয়োগ পত্র দেবার দাবি মেনে নেয়।[১০৩]

অন্যদিকে ১৯৩১-এর ৩১ আগস্ট চট্টগ্রামের তিনটি স্কুলে, প্রবেশ করে, ব্রিটিশ পুলিশের লাঠি চালনার প্রতিবাদে গর্জে ওঠে শিক্ষক সমিতি। চট্টগ্রাম কানুনগোপাড়া স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক সত্যপ্রিয় রায় তার বিদ্যালয়ে পুলিশি অনুপ্রবেশ এর তীব্র নিন্দা করেই ক্ষান্ত

হননি, তিনি পুলিশকে তার বিদ্যালয় ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য করেন।[১০৪] প্রসঙ্গতঃ এই সত্যপ্রিয় রায়ই পরবর্তীকালে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির শীর্ষ নেতার পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। সমিতি এই ঘটনার প্রতিবাদ করে ব্রিটেনের ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব টিচার্স সংস্থাকে পত্র প্রেরণ করে। এই সমিতির মাধ্যমে এই বিষয়টি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দৃষ্টি গোচর করতে সমর্থ হয়। প্রত্যুত্তরে ব্রিটেনের 'National Union of Teachers', নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির তৎকালীন সম্পাদক মনোরঞ্জন সেনগুপ্তকে একটি পত্রে জানায়, '.....The school children who reside in chittagong certainly appear from the reports....to be suffering from very grave injuries received at the hands of the military police & I have been instructed by my Executive to takeup the matter with the Seceretary of State for India.' এই গুরুত্বপূর্ণ চিঠির লেখক ছিলেন, উপরোক্ত ব্রিটিশ জাতীয় শিক্ষক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এফ. মানডার।[১০৫] পরবর্তীকালে এই ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই সংগঠনের সাধারণ সচিব, তৎকালীন ভারত সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে, বাংলার শিক্ষক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক এস. শীলকে একটি পত্রে (১৯৩২) জানান, 'The Secretary of State for India has been approached on your behalf, and I understand he is awaiting the report of the final enquing.....As soon as I have anything definite to report, I will communicate with you again.'[১০৬] এই পত্রদ্বয় থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি, যে শিক্ষক সমিতি গঠনের এই প্রথম পর্বেই, সংগঠন ব্রিটেনের শিক্ষক সমিতির আস্থাভাজন হতে সক্ষম হয়েছিল।

চাপে পড়ে তৎকালীন ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল বলতে বাধ্য হন যে, 'ভারতবর্ষে' যে হিংস্রতা বলের অতিরিক্ত প্রয়োগ বিশেষ করে স্কুলের ছাত্রদের প্রতি দেখানো হয়েছে তাকে অনুমোদন করা হচ্ছে না এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটলে এই অননুমোদনকে কার্যকর করা হবে।[১০৭]

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির উপরোক্ত কার্যকলাপ প্রমাণ করেছিল যে, শিক্ষক সমিতি নিছক অর্থনীতিবাদের বেড়াজালে নিজেদের কার্যকলাপকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। প্রথম যুগ থেকেই শিক্ষা ব্যবস্থার যুগোপযোগী সংস্কারের দাবি ও ছাত্র স্বার্থকে সামনে রেখে বারেবারেই সোচ্চার হয়েছে।

শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার মধ্যে সমিতি যদি নিজেদের কার্যকলাপকে সীমাবদ্ধ রাখতো তবে হয়তো এই সমিতির প্রতি ঔপনিবেশিক সরকার উদাসীন মনোভাব দেখাত। কিন্তু শিক্ষকদের একাংশের ব্যক্তিগতভাবে দেশের মুক্তি সংগ্রামের কাজে লিপ্ত হওয়া এবং তাদের প্রভাবে ছাত্রদের এক বৃহদংশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার পিছনে সমিতির সংঘবদ্ধতা একটি অনুঘটকের কাজ করছে বলে ঔপনিবেশিক সরকারের মনে হয়েছিল। ওই বছরেই জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। সমিতি যদিও আনুষ্ঠানিক ভাবে পিকেটিং ইত্যাদির বিরোধিতা করেছিল, তবুও ছাত্রদের উপর দমনমূলক সার্কুলার জারি করা হলে তার প্রতিবাদ করেন শিক্ষকেরা—সাংগঠনিক ভাবেই সমিতির মধ্যস্বত্বভোগী নেতৃত্ব অবশ্য সেই সময় প্রাথমিক শিক্ষা বিলে, শিক্ষাকর বসানোর প্রস্তাবের বিরোধিতা করে—যা

সমিতির দোদুল্যমানতারই পরিচায়ক। সমিতির দাবি মেনে সরকার ওই বছরেই সমস্ত কর্মরত ও নতুন নিয়োজিত শিক্ষকদের লিখিত নিয়োগপত্র দেবার জন্য ম্যানেজিং কমিটিগুলিকে আদেশ দেয়। যাকে আমরা সমিতির জয় হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। সমিতির জীবনে পরবর্তীকালে অবশ্যই দলীয় রাজনীতির একটা প্রভাব পড়েছিল। বিশেষ করে স্বাধীনোত্তর কালে। কিন্তু সমিতির প্রথম যুগে এই ধরনের কোন প্রভাব, সমিতির উপর পড়েনি। নিজেদের রুটিরুজি যোগাড়ের দাবি দাওয়া নিয়ে তাদের সংগ্রাম মূলতঃ আবেদন নিবেদনের সীমায়ই আবদ্ধ ছিল। অন্ততঃ আনুষ্ঠানিক ভাবে চাপ 'সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী' বা প্রেসার গ্রুপ হিসাবে, নিজেদের দাবিদাওয়া আদায়ের চেষ্টা করত। ব্যক্তিগতভাবে অনেক শিক্ষক সেই সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের যজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়লেও, সমিতি সংঘবদ্ধ ভাবে সেরকম প্রচেষ্টা প্রথম যুগে করেনি বললেই চলে।[১০৮]

যে কোন যুগের স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের মতো দেশের ঔপনিবেশিক সরকার কিন্তু প্রথম থেকেই সমিতির কার্যকলাপের মধ্যে প্রত্যক্ষ রাজনীতির গন্ধ পেত। 'রজ্জুতে সর্প ভ্রম' করা ঔপনিবেশিক সরকারের বিভিন্ন রিপোর্টে এই মনোভাবের প্রভাব পড়েছিল। কয়েকটা উদাহরণ তুলে ধরা এই প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই মনে হয়। ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ-এর একটি গোপন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, আমস্টার ডামের কমিউনিস্ট প্রভাবিত ইন্টারন্যাশানাল ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়নস, কলকাতার অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষরে সংগঠনের মতো নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কাছেও গোপনীয় সার্কুলার পাঠাতো। (CI Dept. Special branch 26 Jun, 1930)। সেই সময় একটি সার্কুলারের ৯টি কপি ভারতে পাঠানো হয়েছিল বলে তৎকালীন পুলিশ সূত্র থেকে জানা যায়। এর মধ্যে একটি ABTA-র কাছে প্রেরণ করা হয়। বাইরের বামপন্থী সংগঠনের সঙ্গে শিক্ষক সমিতির সংযোগ স্বাভাবিক ভাবেই ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের সমিতির আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান করেছিল।[১০৯]

এই সার্কুলারের পরবর্তী থেকেই শিক্ষক সমিতির কাজকর্ম সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ থেকে সমিতির কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়। উদাহরণ হিসাবে আমরা ১৯।০৯।২৯ এর পুলিশের সাপ্তাহিক রিপোর্টে, ১৯২৯-এর ৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত কলকাতা জেলা শিক্ষক সম্মেলনের কথা বলতে পারি। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে, একদিকে যেমন ঔপনিবেশিক সরকারের যে 'tyrannical system of education' এর প্রতিবাদ করা হয়েছিল, ঠিক তেমনি অধ্যাপক নৃপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশি রিপোর্ট অনুযায়ী বলেছিলেন, 'that better pay and prospect were out of the questions unless the Government was uprooted, and he advised those present to look towards the Congress to help them first to emancipate the country.' শুধুমাত্র দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে নেতৃবৃন্দের বক্তব্য থেমে থাকেনি, রিপোর্টে উল্লেখ আছে, 'Professor Rajkumar Chakrabartti urged those present to create a class consciousness among the teachers in order to improve their status'. অর্থাৎ সরকারি দৃষ্টিতে সমিতি শুধু জাতীয় স্বাধীনতার প্রতি সহানুভূতি পোষণেই থেমে থাকেনি—তদুপরি 'শ্রেণি সচেতনতার' কথা উত্থাপিত করে।[১১০] ABTA-র প্রভাব তখনো অবধি সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়লেও,

রজ্জুতেই সর্পভ্রম করে, ইংরেজ সরকার সমিতির অস্তিত্বে আশঙ্কিত হয়ে পড়েছিল এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শিক্ষা অঙ্গনে গণতন্ত্রের যে ক্রমবর্ধমান দাবি, সমিতি তার রাজ্য ও জেলা পর্যায়ের সম্মেলনগুলিতে প্রতিনিয়ত জানাচ্ছিল, তাও দেশের স্বৈরতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে অনভিপ্রেত ছিল। ১৯২৯-এর সমিতির ঢাকা জেলার সম্মেলন সম্বন্ধে IB-র রিপোর্টে তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পাই। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে এই সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হেমচন্দ্র বিশ্বাস-এর বক্তৃতার উল্লেখ করে পুলিশি গোপন রিপোর্টে লেখা হয়েছিল, 'His speech generally deals with the grievances of the teachers who are not allowed to represent themselves in the senate of the University or the Board of Secondary and Intermediate Examinations... The non representation of teachers in the Text Book Committee, Union Board, Local Board, District Board and the council was also criticised in the speech'.[১১১]

ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট প্রভাবিত 'The Educational Workers' International (1922) সম্বন্ধে সরকার এক গোপন রিপোর্ট প্রকাশ করেন। প্যারিসে এই সংস্থার প্রধান কার্যশালা থাকলেও আমাদের দেশের ঔপনিবেশিক সরকার মনে করেছিল যে এই সংস্থা 'clearly supported by Russian money and is a subsidiary of the communist International and that it is making persistent efforts to establish itself and to circulate its propaganda in India.'[১১২] সরকারের মতে এই সংস্থা নবগঠিত All India Teachers Confarence এবং এর পিছনের চালিকা শক্তি, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে প্রভাবিত করে, এই সব সংগঠনের মধ্যে কমিউনিস্ট প্রভাব বৃদ্ধি করতে তৎপর হয়েছে। কমিউনিস্ট জুজুর ভয়ে ব্যতিব্যস্ত সরকারের কাছে পুলিশের IB বিভাগের সুপারিশ ছিল। এই প্রভাবের প্রতিরোধ রূপে, '...no emissary from the Educational international or Persons prominently connceted with it is granted facilities for entering India.'[১১৩]

এটা ঠিকই সেই সময় বামপন্থী মতাদর্শের Educational Workers International' সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির মাধ্যমে ভারতের শিক্ষকদের কাছে একটি আবেদন পত্র পেশ করেছিল। তারা গতানুগতিক আবেদন নিবেদনের পথ পরিত্যাগ করে শ্রেণি সংগ্রামের ভিত্তিতে ভারতের শিক্ষকদের শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে ভারতের শিক্ষক সংগঠনগুলিকে আহ্বান করেছিল। তাদের মতে এর ফলে শিক্ষকরা সর্বহারা শ্রেণির আন্দোলনের কাছাকাছি আসতে সক্ষম হবেন এবং তাদের সকল দূরবস্থার মূল কারণ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে ভারত পরিত্যাগ করতে বাধ্য করবেন। তারা তাদের পত্রে আরো বলেছিল, শিক্ষকদের অর্থনৈতিক, পৌরবিষয়ক এবং বৌদ্ধিক অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব একমাত্র নতুন ভাবে সমাজ গড়ে উঠলে তবেই।[১১৪]

সেই প্রথম যুগে, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি কমিউনিস্ট তো নয়ই, কোনও দলের দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়নি। ব্যক্তিগত ভাবে সমিতির অনেক সদস্যর নির্দিষ্ট কোন মতবাদের

প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে পারে, কিন্তু সমিতির কাজে তার ছাপ সেই সময়ে খুব একটা পড়েনি। সমিতি শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নত কাঠামো ও গণতান্ত্রিকতার পক্ষে অবশ্যই ছিল। এক্ষেত্রে অনেকটা প্রেসার গ্রুপের ভূমিকাই নিয়েছিল শিক্ষক সমিতি, অন্ততঃ প্রাথমিক পর্বে। অবশ্যই সমিতির শিক্ষক সদস্যরা তৎকালীন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাত্রদের, নিঃস্বার্থ ত্যাগ সম্বন্ধে উদাসীন থাকেনি। ABTA-এর কর্মসমিতি ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুলাই ছাত্রদের অহিংস ও সাংবিধানিক মুক্তি সংগ্রামে উৎসাহ দেবার জন্য শিক্ষকদের অনুরোধ করেছিল। কিন্তু পুলিশ রিপোর্টে উল্লেখ থাকলেও সমিতির তৎকালীন কর্মসূচির মধ্যে কমিউনিজমের ভূত খোঁজার চেষ্টা একটি হাস্যকর সরকারি প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।[১১৫]

বরঞ্চ সেই সময় পর্বে সদর্থক অর্থে জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের প্রতিই সমিতি পরোক্ষে সহানুভূতি পোষণ করত। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের তিনটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, ব্রিটিশ সৈন্য দলবদ্ধভাবে ছাত্রদের উপর হামলা করে এবং গুলি চালায়। সেই বছর যশোহরের নড়াইলে সমিতির একাদশ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর প্রতিবাদে সমিতি তার বার্ষিক সম্মেলনে বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ওই ঘটনার প্রতিবাদ জানায়। ইতোমধ্যে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথাভারি প্রশাসনের আওতা থেকে মাধ্যমিক শিক্ষাকে পৃথক বোর্ডের অধীনে ন্যস্ত করার একটি প্রচেষ্টা শুরু হয়। সমিতি প্রথম থেকেই শিক্ষা ব্যবস্থা তৃণমূল স্তরে মূলতঃ যাদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়, সেই শিক্ষকরা যাতে বোর্ডের নীতি নির্ধারণে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে তার দাবিতে সোচ্চার ছিল। তারা নতুন বোর্ডে ন্যূনতম ৩৩% মাধ্যমিক শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্তির দাবি জানায়।[১১৬]

সেই সময় অনেক শিক্ষকই স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বিদ্যালয় সমূহের চাকরিতে যোগদান করলেও, শিক্ষক শিক্ষণ বা B.Ed ডিগ্রি না থাকার অজুহাতে তাদের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি বা ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হত। ওদিকে B. Ed পড়াবার জন্য শিক্ষকদের বেতন সহ ছুটি দিতেও ম্যানেজিং কমিটি সাধারণভাবে অনাগ্রহী ছিলেন। সমিতি শিক্ষকদের এই শাঁখের করাত অবস্থা থেকে মুক্তি দানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের কাছে বিশেষ করে আবেদন করে যে শিক্ষকদের In Service, বিটি ট্রেনিং-এর বন্দোবস্ত অবশ্যই করতে হবে এবং অধিক সংখ্যক শিক্ষক যাতে এই সুযোগ পেতে পারে, সেইজন্য নতুন নতুন শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ খোলার দাবিও তোলা হয়।[১১৭]

প্রথম দশ বছরে সমিতির কাজকর্মের বর্ণনাও বিশ্লেষণের পর আমরা এবারে ত্রিশের দশকে সমিতির কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করব। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে যশোরের নড়াইলে শিক্ষক সমিতির একাদশ সম্মেলন হয়। সেখানে সংশোধিত 'স্কুল' কোডের বিরুদ্ধে শিক্ষক প্রতিনিধিরা প্রতিবাদ করেন। এছাড়া প্রস্তাবিত মাধ্যমিক বোর্ডে ৩৩% প্রতিনিধি শিক্ষকদের মধ্য থেকে নিতে হবে—এই দাবিও উত্থাপিত হয়। এখানে শিক্ষকদের জীবন বিমা ও ভবিষ্যনিধি (প্রভিডেন্ট ফান্ড) চালু করার দাবি ওঠে। তিন বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষককে শিক্ষক শিক্ষণ কোর্সে ভর্তি হবার সবেতন

ছুটি দেওয়া উচিত বলেও শিক্ষকরা মনে করেন। এই সময় শুধুমাত্র নিজেদের দাবি দাওয়া নিয়ে শিক্ষকরা সরব ছিলেন এমনটি নয়। ওই সময়ে উত্তর ও পূর্ব বাংলায় প্রবল বন্যা হয়। সমিতির পক্ষ থেকে বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য রায়বাহাদুর উপেন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে একটি বন্যাত্রাণ কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া আঞ্চলিক ভাবেও শিক্ষকেরা ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ করেন।[১১৮]

সমিতির ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের সম্মেলন খুব গুরুতর কারণে অনুষ্ঠিত হয়নি। ওই বছর শিক্ষকদের রাজ্য সম্মেলন হবার কথা ছিল হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে। কিন্তু তার ঠিক দুই মাস আগে বাংলার গভর্নর জ্যাকসন বিপ্লবীদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সারা বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন কঠোরতর হয়ে ওঠে। শিক্ষক নেতৃত্ব জ্যাকসনের উপর আক্রমণের নিন্দা করে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে বছর ABTA-র বার্ষিক সম্মেলন স্থগিত হয়ে যায়। তবে সমিতির কার্যকলাপ কিন্তু এই বছরেও বন্ধ হয়নি। সমিতির নেতৃত্বেই বেসরকারি বিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা চালু করার লক্ষ্যে রাজশাহীতে পঞ্চাশ জন শিক্ষককে নিয়ে পাঁচ সপ্তাহের একটি শারীরশিক্ষা শিবির সাফল্যের সঙ্গে সংগঠিত হয়। এই সময় বাংলাদেশে দুইটি মাত্র শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ ছিল। সরকার তার মধ্যে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজটি তুলে দেবার প্রস্তাব করেছিল। সমিতির পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ তো করা হয়েই ছিল তদুপরি আরো শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়েছিল।[১১৯] এছাড়া মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের চাকুরির নিরাপত্তার জন্য স্কুল বোর্ড এবং সালিশি বোর্ড গঠনের দাবি এই সময় সমিতি রেখেছিল। সেই সময় শিক্ষা বিভাগের ব্যয় সংকোচন নীতির ফলস্বরূপ প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়। সেই টাকা উন্নততর ও ব্যাপকতর শিক্ষার জন্য বেসরকারি স্কুল ও কলেজের মধ্যে ভাগ করে দেবার জন্য শিক্ষক আন্দোলনের নেতৃবর্গ একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেয়। এছাড়া ম্যাট্রিকুলেশন রেগুলেশন কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী প্রবেশিকা পরীক্ষার সিলেবাস অত্যন্ত বেশি হওয়ার বিরুদ্ধে শিক্ষকরা প্রতিবাদ করেন।[১২০]

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথমে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭৫% বিদ্যালয় সমিতির সদস্য পদ গ্রহণ করলেও মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে ৯৫% শতাংশই সমিতির সদস্যভুক্ত ছিল না। এই সময়ে সমিতি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে তার সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সচেষ্ট হয়। সেই বছরেই শিক্ষক সংগ্রামের চাপে সাহায্য প্রাপ্ত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সরকারি পরিকল্পনা চালু হয়—এই সময়েই প্রায় সমস্ত বিদ্যালয় স্কুল কোডের অধীনে আসে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির দীর্ঘ দিনের দাবি মেনে একটি বেসরকারি ট্রেনিং কলেজকে অনুমোদন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সমিতির পক্ষ এ বছরে কলকাতা ও ঢাকায় দুটি শারীর শিক্ষণ শিবির আহূত হয়। ১৯৩৩-এর এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরে প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দ্বাদশ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে প্রবেশিকা পরীক্ষার মাথাভারী পাঠ্যসূচি এবং ব্যয় সংকোচ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির ১০% অনুদান হ্রাস করবার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এই সম্মেলনের

সময়েই লাহোরে নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং বাংলার শিক্ষকদের প্রতিনিধি হিসাবে তিনজন প্রতিনিধি ওই সম্মেলনে যোগদান করেন। সমিতি সরকারি ব্যয় সংকোচ কমিটির 'Deprovincialisation of Govt. Schools' অর্থাৎ সরকারি স্কুল এর বেসরকারিকরণকে প্রথমে সমর্থন জানিয়েছিল এই ভেবে, যে 'শ্বেতহস্তী' সরকারি স্কুলের বরাদ্দ অর্থ তাহলে বেসরকারি স্কুলের উন্নয়নের জন্য সরকার ব্যয় করবে। কিন্তু বাস্তবে সরকার বেসরকারি বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতির জন্য ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধির কোন চেষ্টাই করেনি। যা সমিতিকে হতাশ করেছিল।[২২১] ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে উত্তর বিহারের ভয়াবহ ভূমিকম্পের সময় সমিতি তার সামাজিক সচেতনতার পরিচয় দিয়ে ৩৬৭০.৮৮ টাকা সাহায্য পাঠায়। সেই সময় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নিলে সমিতি তাতে সাধুবাদ জানায়। এছাড়া সমিতি পূর্ববঙ্গে বন্যাত্রাণ তহবিলেও ৩৩৬.৯৪ টাকা দান করে।

পরবর্তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, পরের বছরে (১৯৩৪) আসানসোলে। সভাপতির অভিভাষণ দান করেছিলেন রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র। সম্মেলনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস করবার জন্য সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করা হয়। এছাড়া বিদ্যালয়সমূহের পরিচালক সমিতিতে অন্ততঃ তিনজন শিক্ষক প্রতিনিধি গ্রহণের দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সমিতির মতে পরিচালক সমিতিতে শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে একদিকে যেমন শিক্ষা দান কার্যের প্রধানতম ঋত্বিক শিক্ষকেরা পাঠ পরিবেশের প্রতিবন্ধকতা কাটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন, তেমনি তারা নিজেদের রুটি রুজির দাবিসমূহকে জোরে তুলে ধরতে কৃতকার্য হবেন। এছাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য Central Medical Clinic খোলার দাবি জানায় সমিতি। এই বছরেও সমিতির উদ্যোগে কোলকাতা ও ঢাকাতে দুটি শারীরশিক্ষা শিবির আহূত হয়। ডিসেম্বরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে যে নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন হয় তাতে সমিতির তরফ থেকে ৯৪ জন প্রতিনিধি যোগ দেন।

ঢাকায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ. এফ. রহমানের সভাপতিত্বে (১৯৩৫) চতুর্দশ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই বছরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ খোলা হয়। যার ফলে শিক্ষকদের সামনে উক্ত ট্রেনিং-এ যোগদানের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়। এর আগে সরকারি স্তরে একমাত্র ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে এই শিক্ষণের সীমিত সুযোগ ছিল। তদুপরি এই কলেজে সরকারি স্কুলগুলির শিক্ষকেরাই প্রাথমিক সুযোগ পেতেন। বেসরকারি ও সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ভর্তির সুযোগ ছিল সীমিত।[২২২]

সেই সময় ক্রমশঃ শিক্ষক সমিতির সঙ্গে বাংলার বিদ্বজ্জন বিশেষ করে যারা শিক্ষাবিদ, শিক্ষা সচেতন বলে পরিচিত, তাদের একটা সংযোগ সাধিত হয়। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মানুষও ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে সমিতির উদ্যোগে প্রতিপালিত শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষ্য করে এক অভিভাষণ দেন যা পরে সমিতির মুখপত্র শিক্ষা ও সাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত অভিভাষণে কবিবর আমাদের দেশের আর্থিক দারিদ্র্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার 'অকিঞ্চিৎকরত্ব' নিয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছিলেন। সমাজের তথাকথিত নিম্নস্তরে যে শিক্ষার প্রসার

ঘটেনি—বক্তৃতায় তারও সমালোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের অন্যতম প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ এই বক্তৃতাতেই আমাদের বহু পরিচিত সেই কথাগুলি বলেছিলেন, 'শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্ব্বজন স্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বেই একদিন বলেছিলাম। আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। .....আজো যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তবে আশা করি, পুনরাবৃত্তি করার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।'[১২৩]

সমিতির ১৯৩৫-এর সম্মেলনে ৯৪০ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। উপরোক্ত দাবি দাওয়ার পাশাপাশি বরিশাল মডেল বাণীপীঠ বিদ্যালয়ের ৯ জন বরখাস্ত শিক্ষককে সমিতির চাপে পুনঃনিয়োগ সম্ভবপর হয়। এছাড়া ২০০ নতুন বিদ্যালয়ে প্রভিডেন্ট ফান্ড গঠন করার দাবিতেও এই অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে সমিতির গঠনতন্ত্রের কিছুটা সংশোধন করা হয়। নতুন নিয়ম অনুযায়ী ঠিক হয়, বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি, আগামী সম্মেলন অবধি সমিতির সভাপতি থাকবেন। এই নিয়ম অনুসারে এ. এফ. রহমান এক বছরের জন্য সভাপতি থাকবেন এমনটা স্থিরিকৃত হয়। এই সময় রায় বাহাদুর ঈশানচন্দ্র ঘোষ সমিতির মুখপত্র 'শিক্ষা ও সাহিত্যের' সম্পাদক পদ থেকে সরে আসেন। একটানা চোদ্দো বছর তিনি এই পদে ছিলেন। শিক্ষা ও সাহিত্যের নতুন সম্পাদক হলেন বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের সূচনাও হয় এই সময়ে। সরকার সেই সময়ে তার শিক্ষা সংকোচ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বহু সংখ্যক স্কুলের অনুমোদন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়। সমিতি এই পদক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ করে। প্রসঙ্গতঃ ধারাবাহিকতা বজার রেখে কোলকাতা ও কুমিল্লায় সমিতি শারীর শিক্ষণ শিবির করে।[১২৪]

১৯৩৬-এর এপ্রিল মাসে সমিতির পঞ্চদশ প্রাদেশিক সম্মেলন হয় কুমিল্লা টাউন হলে। সভাপতি হন কুমিল্লার তৎকালীন জেলাশাসক এস. এন. রায়। তার অনুপস্থিতিতে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন থেকে সভাপতিত্বের দায়িত্ব নেন কালি মোহন ঘোষ। ৮২৮ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। ৬৫ বছর অবধি চাকুরির কার্যকাল বৃদ্ধি, বর্ধিত সরকারি অনুদান (১০%) পুনরায় চালু করা, মাতৃভাষায় প্রশ্নপত্র রচনা, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সন্তানের বিনা বেতনে পড়ানোর দাবি, শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য রেল ও স্টিমারে কনশেসন প্রভৃতি দাবিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে জলপাইগুড়ি শহরে শিক্ষক সমিতির প্রাদেশিক সম্মেলন বসে। ওই সময়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠন করবার বিরুদ্ধে সমিতি নানা স্থানে সভা ইত্যাদি করেছিল। সভাপতির অভিভাষণে রমেশচন্দ্র মজুমদারও এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। বিষয়টির বিস্তারিত বিশ্লেষণ সমিতির ১৯৪০ পর্যন্ত কার্যাবলীর পরে করা হবে। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা বোর্ডে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ছাড়াও, বাংলা ভাষায় প্রশ্নপত্র রচনা, প্রভিডেন্ট ফান্ডে অধিকতর সুদ প্রদান, ছুটি সংক্রান্ত নিয়মগুলি স্কুলকোডে অন্তর্ভুক্তিকরণ, বেসরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির উপর সরকারি উপেক্ষা রদ প্রভৃতি দাবিতে শিক্ষকেরা সোচ্চার হন।[১২৫]

১৯৩৭ সালের ৭ এপ্রিল কোলকাতায় রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে 'ঈশানচন্দ্র স্মৃতিসভা' অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির আহ্বানে বক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবিশেখর

কালিদাস রায়। যিনি নিজেও শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৩৭-এর মে মাসে চট্টগ্রামে সমিতির উদ্যোগে একটি শারীর- শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির আমন্ত্রণে নিখিল ভারত শিক্ষা ফেডারেশনের সম্মেলন ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক পদে আসীন হন যথাক্রমে তৎকালীন কোলকাতার মেয়র সনৎকুমার রায়চৌধুরী ও অধ্যাপক ক্ষিতি প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।[১২৬]

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে, খুলনায় করোনেশন স্কুলে ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সমিতির সপ্তদশ বর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। শিক্ষকদের চাকুরির নিরাপত্তার খাতিরেই স্কুল কোডের ৩২নং ধারা অবিলম্বে সংশোধনের দাবি ওঠে সভাতে। এছাড়া বিদ্যালয়ের মোট ব্যয়-এর এক-তৃতীয়াংশ সরকার কর্তৃক বহন, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতিতে নয় জনের মধ্যে প্রধান শিক্ষক সহ তিনজন শিক্ষক প্রতিনিধি ও তিনজন অভিভাবক প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও জানানো হয়। সেই সময় চাঁদপুর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোপালচন্দ্র মজুমদারকে, চব্বিশ বছর টানা কাজ করবার পরেও পদচ্যুত করা হয়। এছাড়া খিদিরপুর একাডেমির প্রধান শিক্ষকও দশ বছর শিক্ষকতার পর বরখাস্ত হন। গোপালবাবুর বিরুদ্ধে এমনকি মিথ্যা ফৌজদারি অভিযোগ করে প্রথমোক্ত বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি। অবশ্য সালিশি বোর্ডের নির্দেশে গোপালবাবু পুনরায় কাজে যোগ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১২৭] এইরূপ অসংখ্য ঘটনা ঘটবার পরিপ্রেক্ষিতে, সে বছরের সম্মেলনে চাকুরির নিরাপত্তা সম্বন্ধে শিক্ষকেরা সরব হন। মাধ্যমিক শিক্ষা বিল নিয়েও শিক্ষক ও সরকারের মতবিরোধ জটিল রূপ পরিগ্রহ করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয়ের স্নাতক উত্তীর্ণ শিক্ষকেরা প্রাইভেট বি. টি. পরীক্ষা দিতে পারবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলে সমিতি এই সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করে।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বীরভূম জেলার হেতমপুরে ড. মহেন্দ্রনাথ সরকারের সভাপতিত্বে সমিতির অষ্টাদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের জন্য অবিলম্বে সালিশি বোর্ড গঠন, বিদ্যালয়ে ল্যাবরেটরি নির্মাণের জন্য সরকারি সাহায্য দান, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা দফ্তরের অনুমোদন ব্যতীত শিক্ষকদের ম্যানেজি কমিটি কর্তৃক বরখাস্তের ক্ষমতা লোপ করা, সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ে প্রফিডেন্ট ফান্ড বিধির সমরূপতা, চাকুরির নিরাপত্তা প্রভৃতি দাবিতে সম্মেলনে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ওই বছর লেক বালিকা বিদ্যালয়, কোলকাতা মুসলিম বিদ্যালয়, গোখেল মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়, হাওড়া বিবেকানন্দ বিদ্যালয়, কমলা হাইস্কুল, আর্য মিশন স্কুল, মেট্রোপলিটন স্কুল, বরিষা হাইস্কুল, শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বহু সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষিকাকে অন্যায় ভাবে বরখাস্ত করা হয়। সমিতি এই গণ পদচ্যুতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। সমিতির চাপেই অবশ্য প্রত্যেকটি ঘটনা সালিশি বোর্ডে পাঠান হয়। সাংগঠনিক ভাবে মেদিনীপুর, দার্জিলিং ও দিনাজপুর ছাড়া বাংলার সব জেলায় শিক্ষক সমিতির জেলাভিত্তিক প্রাথমিক কাঠামো গড়ে ওঠে এই সময়েই।[১২৮] এই সম্মেলনের সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, 'শিক্ষকদিগের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে এবং শিক্ষা সংস্কারের জন্য আমাদের কর্মতালিকায় জনসাধারণের এবং

সভার সদস্য বর্গের সংস্পর্শে আসিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই জন্য আমাদের সুচিন্তিত কর্মধারা এবং সুনিয়ন্ত্রিত নেতৃত্ব আবশ্যক। এই নেতৃত্ব যাঁহারা গ্রহণ করিবেন তাঁহারা কেবল শিক্ষক নেতা নহেন, তাহারা সমগ্র দেশের শিক্ষক বেত্তা হইবেন।.....শিক্ষা সপ্তাহ, অভিভাবকদিগের সভা, সাময়িক বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ, সংবাদপত্র প্রচার, পুস্তিকা প্রকাশ প্রভৃতির দ্বারা জনসাধারণের সংস্পর্শে আমাদের থাকিতেই হইবে।'[১২৯] এই প্রতিবেদন থেকেই অনুধাবন করা যায়, যে আস্তে আস্তে শিক্ষক সমিতি তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য অভিভাবক সহ জনগণের সামগ্রিক সাহায্যর প্রত্যাশী হয়ে উঠেছিল, অত্যন্ত সঠিক ভাবেই।

১৯৪০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের সমিতির প্রাদেশিক সম্মেলন আহূত হয়। সভাপতিত্ব করেন ড. হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। এই সম্মেলনে বিদ্যালয়গুলিতে বয়স্ক শিক্ষার প্রবর্তন, শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের নিজস্ব দেয় থেকে ৪০% ঋণ নেওয়ার অধিকার, বিনাব্যয়ে ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা, সরকারি অনুদান বৃদ্ধি ও চাকুরির নিরাপত্তার দাবিতে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রসঙ্গতঃ এই সম্মেলন চলাকালীন কলকাতার হেয়ার স্কুলে মিস্টার ডব্লু সি ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর সভাপতিত্বে এই প্রথম সরকারি বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকেরা একটি সম্মেলনে মিলিত হয়। সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এতদিন সরকারি আধিকারিক হিসাবে কোনরূপ সংগ্রাম আন্দোলনে অংশ নিত না। এঁদের এই আন্দোলনের পিছনে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাব অবশ্যই ছিল। যাইহোক তার অভিভাষণে সভাপতি হরেনবাবু মাধ্যমিক শিক্ষকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূরীকরণের পাশাপাশি, পাঠ্য বইসমূহ সংস্কারের উপরও জোর দেন। তিনি আরো বলেন যে ম্যানেজিং কমিটিগুলির মতোই সরকারি স্কুল ইনস্‌পেক্টরেরাও যে ভাবে শিক্ষকদের প্রতি অধঃস্তন কর্মচারীর মতো আচরণ করেন, তা নিন্দনীয়। এছাড়া সরকারি স্কুলগুলির তুলনায়, সাহায্য প্রাপ্ত বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিকে সরকার কর্তৃক যে স্বল্প অনুদান মঞ্জুর করে, তারও সমালোচনা করেন হরেন বাবু।[১৩০] সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে খুব কৌতুহলোদ্দীপক একটি ঘটনা ঘটে। সেখানে 'কচিকচি ছেলেরা স্বেচ্ছাসেবকের ব্যাজ পরে'—সম্মেলনের প্রতিনিধিদের বিছানাপত্র ও সুটকেশ টানা হেঁচড়া করে, তাঁদের হাত থেকে নিয়ে, সুন্দর করে তাঁদের থাকার স্থানে সাজিয়ে রাখে, বিব্রত শিক্ষকেরা ছাত্রদের বাধা দিতে পারেন নি।[১৩১]

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল ও সমিতি

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তাবিত মাধ্যমিক বোর্ড গঠনের বিল-এর বিরোধিতা করে শিক্ষক সমিতি। ৪০-এর ২১ থেকে ২৩ ডিসেম্বর সমিতির উদ্যোগে এই বিলের বিরুদ্ধে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকদের সভা ডাকা হয়। বিলের প্রতিবাদে শিক্ষক সমিতি একটি বিশেষ অধিবেশনও আহ্বান করে। এই প্রথম সমিতি বিভিন্ন দাবিতে প্রস্তাব পাস ও নিয়মতান্ত্রিক আবেদন নিবেদনের বদলে মিটিং মিছিল সভা সংগঠিত করে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের পথে নামে। এই আন্দোলন নিয়ে একটি বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

ABTA-নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি ১৯২১-এর জন্মলগ্ন থেকেই মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের ন্যায্য রুটি-রুজির লড়াইয়ের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। শিক্ষক সমিতির এই

দীর্ঘ পথ চলায় স্বাধীনতাপূর্ব যুগে একবারই এদের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। সেটি হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণমুক্ত পৃথক বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে সমিতির ভূমিকা। শিক্ষা বোর্ড গঠনের প্রস্তাব ও সমিতির প্রতিক্রিয়াই এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকেই আমাদের দেশের বিদ্যালয় শিক্ষার পরিচালনার ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরই ন্যস্ত ছিল। এটা স্বাভাবিকই মাথাভারী প্রশাসনের সাহায্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির বিশাল দায়িত্ব সামলে বিদ্যালয় শিক্ষার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কমই নজর দিতে পারত। এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের সামন্ততান্ত্রিক পরিচালকবর্গ এবং কখনো কখনো প্রধান শিক্ষকেরা স্বৈরতান্ত্রিক ভাবে বিদ্যালয়ের পরিচালন করত। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের টিচার বিভিন্ন যুগের কাহিনি পড়লেই আমরা এর যথার্থতা অনুধাবন করতে পারি।

স্যার আশুতোষ মুখার্জী যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথম কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'ফিডার' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ণধার আশুতোষ এই সময় সার্বিকভাবেই মন্তব্য করেছিলেন 'Education in the university is the development, amplification of school and some issues, its complement.'[১৩২] তিনি মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য 'দুর্নীতিগ্রস্ত' ম্যানেজিং কমিটির ওপর বিশ্ববিদ্যালয় অধিকতর নিয়ন্ত্রণ আরোপের পক্ষপাতী ছিলেন। শিক্ষকদের ন্যূনতম বেতন, নিয়মাফিক পরিচালন সমিতি গঠন ছাত্রদের হাজিরা সব বিষয়ে নজর রাখতে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুলগুলির সামগ্রিক মান বৃদ্ধির মানসে, প্রধান শিক্ষকবৃন্দ ও ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে নিয়মিত বৈঠকে বসারও সিদ্ধান্ত নেয়।

এদিকে ঔপনিবেশিক সরকার ১৯১৭-তে এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে 'স্যাডলার কমিশন' নিয়োগ করে। এই কমিটি অন্যান্য সুপারিশের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করে, 'No satisfactory reorganisation of the university system of Bengal will be possible unless and until a radical reorganization of the system of Secondary Education upon which university work depends, is carried into effect'. তখন থেকেই ভাবনাচিন্তা শুরু হয়, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য আলাদা প্রশাসনিক ব্যবস্থা গঠনের।[১৩৩]

ইতোমধ্যে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের 'ভারত শাসন আইন' অনুযায়ী প্রাদেশিক ক্ষেত্রে 'দ্বৈত শাসনের' শুরু হয়। শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় দেশীয় প্রতিনিধিদের হাতে। কিন্তু সেই সময় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রভাস চন্দ্র মিত্র বা মৌলভী ফজলুল হকের মতো শিক্ষা মন্ত্রীরা মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূলগত পরিবর্তনে কোনো উৎসাহ দেখাননি। এদিকে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন আইন অনুযায়ী, ১৯৩৭ নির্বাচনের পর বাংলার শাসনভার কৃষক প্রজাপার্টি ও মুসলিম লিগ জোটের করায়ত্ত হল। যদিও কংগ্রেস নেতৃত্বের অপরিণামদর্শিতার ফলেই ফজলুল

হকের কৃষক প্রজাপার্টি, মুসলিম লিগের শরিক হতে বাধ্য হয়েছিল, তবুও মুসলিম জনগোষ্ঠী প্রভাবিত এই সরকার তৎকালীন বাংলার সব ক্ষেত্রের মতোই শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রণী হিন্দু উচ্চবর্ণের ভদ্রলোক শ্রেণির বিরাগভাজন হয়ে পড়েছিল। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলায় সরকার ও আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থায় মুসলিম জনগোষ্ঠী নিয়ন্ত্রক হবে এই সহজ সত্য তাঁরা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না।[১৩৪]

নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হলে শিক্ষা দপ্তরের ভার নিলেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী আব্দুল কাশেম ফজলুল হক স্বয়ং। এই মন্ত্রীসভা হয়তো সাম্প্রদায়িক চাল হিসেবেই 'হিন্দু নিয়ন্ত্রিত' বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব থেকে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিযুক্ত করতে তৎপর হল। ফজলুল হক আজন্ম অসাম্প্রদায়িক একজন মানুষ— ব্যক্তিগতভাবে সাম্প্রদায়িকতায় নয়—বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনতার হাতে শিক্ষার নিয়ন্ত্রণে রশি থাকুক—এটুকুই তাঁর কাম্য ছিল। আর মুসলিম লিগ যতই সাম্প্রদায়িক হোক না কেন শিক্ষা ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের পক্ষে দাঁড়িয়ে, 'ইতিহাসের অচেতন যন্ত্রের' মতোই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা পূরণের সহায়ক হয়েছিল—এটা ঐতিহাসিক সত্য।[১৩৫]

এর আগে ১৯২০-২৯ সময় পর্বে ঔপনিবেশিক প্রশাসন অনেকবারই মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের চেষ্টা করলেও, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদারপন্থী, কংগ্রেস বা হিন্দু মহাসভা কোন দলই এ বিষয়ে খুব একটা উৎসাহ দেখায় নি। মূলতঃ বর্ণ হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণাধীন এই তিন দল, জোতদার জমিদারদের যে মৌরসী পাট্টা শিক্ষা ক্ষেত্রে ছিল—তা ভাঙতে চাইত না। এই পরিস্থিতিতে নতুন সরকার একটি বিলের খসড়া করে, মাধ্যমিক শিক্ষাকে পৃথক বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে আনার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই খসড়া পরবর্তীকালে 'Bengal Secondary Bill 1940' নামে আত্মপ্রকাশ করে। সেটা অবশ্য কিছু পরের কথা। এই খসড়া বিল অনুযায়ী নতুন বোর্ডের সদস্য সংখ্যা হবে পঞ্চাশ জন, যারা মধ্যশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে থেকে নির্বাচিত বা মনোনীত হবেন। এছাড়া থাকবেন সরকারি প্রতিনিধিরা। বোর্ডের সভাপতি হবেন সরকার মনোনীত। সভাপতিকে বাদ দিয়ে বাকি ঊনপঞ্চাশ জন সদস্যের মধ্যে ২২ জন হিন্দু কুড়িজন মুসলিম এবং সাত জন ইউরোপিয়ান গোষ্ঠীগুলি থেকে আসবেন এই রকমটা বলা হয়। বোর্ডের কার্যকরী সমিতির মোট ১৪ জন সদস্যের মধ্যেও, এক্ষেত্রেও সভাপতি বাদে বাকি সদস্যদের ৬ জন হিন্দু ৫ জন মুসলমান ও একজন ইউরোপিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত হবে এরকম প্রস্তাব করা হয়। বোর্ডের গঠন থেকে এটা পরিষ্কার কোন ভাবে এখানে মুসলমান সদস্যদের সংখ্যাধিক্য হচ্ছে না—সভাপতি পদে যদি একজন মুসলিম নির্বাচিতও হন—তবু দুই সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা সমান হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রী ফজলুল হক এই মাধ্যমিক বিলের মাধ্যমে শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মুসলমানদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন—অন্য কিছু নয়।

কিন্তু বর্ণ হিন্দু প্রাধান্য বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে, আলোচনার জন্য এই বিল প্রেরিত হলেও মূলতঃ 'The board must be constituted on academic lines and must not be based

on communal politics'-এর অজুহাত তুলে বিলের তুমুল বিরোধিতা করা হল।[১৩৬] আশ্চর্যজনকভাবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো হিন্দুত্ববাদী ব্যক্তির সঙ্গে বিধান চন্দ্র রায়, চারুচন্দ্র বিশ্বাস বা প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধায়-এর মত 'সিন্ডিকেট' সদস্যরা বিলের তীব্র বিরোধিতা করতে শুরু করলেন। তারা প্রচ্ছন্ন হিন্দু গৌরবে ভুলে গেলেন সমস্ত অবিভক্ত বঙ্গের স্কুল ও মাদ্রাসাগুলিতে মুসলিম ছাত্র সংখ্যা যথেষ্ট থাকলেও, ঐতিহাসিক কারণেই হিন্দু বা বর্ণ হিন্দুরা স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি বা শিক্ষকদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল—তাঁদের দ্বারাই স্কুলের নিয়ম কানুন এমনকি অনেক সময় পাঠ্যসূচি নির্ণীত হত—এক্ষেত্রে অনেক সময় হিন্দুয়ানী প্রভাব যে পড়তো না এমন নয়। আসলে বর্ণহিন্দু উপরোক্ত নেতারা এই আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছিলেন। বিধানচন্দ্র বা চারুচন্দ্রের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের রাজনীতির মূলগত পার্থক্য থাকলেও, এরা সকলেই ছিলেন বর্ণ হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণির প্রতিনিধি। তাই এই বিষয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া সমরূপই ছিল।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে যে স্যাডলার কমিশন সুপারিশের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত এই মধ্যশিক্ষা বিলের মাধ্যমে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও এতদিনকার অবদমিত বাংলার মুসলিম সমাজ নতুনভাবে জেগে উঠতে চাইছিল। তারা 'Sought to remove secondary education from the clutches of Calcutta University.....Actually the Muslims by and large, believed that the creation of the secondary education board would give them a say in the control of the education system of the province.'[১৩৭] এই বিল প্রণয়নের ক্ষেত্রে মুসলিম লিগ নেতৃত্বের রাজনৈতিক চালের কথা যদি আমরা মেনে নিই, তাহলে বলতে হবে যে, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনতার এই চাওয়ার মধ্যে অন্যায় কিছু ছিল না।

আর হিন্দু নেতৃত্ব মুখে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বোর্ডের সদস্য নির্বাচন শিক্ষার 'spirit' নষ্ট করবে, বললেও আসলে 'প্রথমে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ লাভকারী' বর্ণহিন্দুরা শিক্ষা ক্ষেত্রে একক আধিপত্যের সুযোগে যে হিন্দুয়ানী কায়েম করেছিল তার অবলুপ্তির সম্ভাবনাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে অমৃতবাজার পত্রিকা এই মনোভাবের প্রতিধ্বনি তুলে তাই বলেছিল, 'the object of the bill is to strike a fatal blow at the political and social power of the Hindu community and to place education as a monopoly in the hands of a Board will be a tool in the armoury of Muslim Government.'[১৩৮]

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথা অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বেসরকারিভাবে যে অর্থ ব্যয় হয়—তার বেশির ভাগ অর্থই হিন্দুরা দেয়, তাই শিক্ষা প্রশাসনে তাদের আধিপত্য থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। একথা যদি সত্যি বলে মেনে নিও, 'শুধু টাকা দিই' বলে বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনতাকে শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কোন আদর্শের নিরিখে বর্ণহিন্দুদের থাকতে পারে—তার কোন সদুত্তর হিন্দু নেতৃত্বের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। এই বিল নিয়ে আইনসভার বিতর্ক একটা সাম্প্রদায়িক খেউরে পরিণত হয়েছিল। প্রস্তাবিত মধ্যশিক্ষা পর্ষদ-এর গঠন, সরকার নিরপেক্ষ ভাবে কতটা একে স্বশাসন দেওয়া যায়, শিক্ষক প্রতিনিধিত্বের শূন্যতা ঘুচিয়ে, সত্যিই যারা প্রত্যক্ষ ভাবে মানুষ গড়ার কারিগর তাদের কীভাবে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া যায়—এসকল

বিষয়ের বদলে হিন্দু না মুসলিম কাদের প্রাধান্য থাকবে, তাই নিয়ে সস্তা তর্ক শুরু হয়। হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর মতো আপাত অসাম্প্রদায়িক কংগ্রেস নেতা আলোচনায় বলে ফেলেন, '.....বর্ণহিন্দুরাই তাদের রক্ত দিয়ে এইসব স্কুল গড়েছেন'—উত্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ফজলুল রহমান স্পষ্টভাবে বলেন, এই টাকা 'গরিব কৃষকের খরচায় বলুন। আপনার আয় তো গরিব কৃষকের থেকেই'।[১৩৯] মুসলিম লীগ সদস্যের 'সাম্প্রদায়িক ইঙ্গিতের' সমালোচনা করেও বলা যায় যে, ফজলুল রহমানের কথার মধ্যে যথেষ্ট সত্য লুক্কায়িত আছে। বাংলার তৎকালীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির একাধারে প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক ছিল বর্ণহিন্দুজাত জমিদার শ্রেণির লোকেরা। তাদের আয়ের উৎস ছিল, কৃষক প্রদত্ত অর্থ—আর বাংলার কৃষকরা বৃহদংশে ছিল মুসলমান ও নিম্নবর্গের হিন্দু। এই শোষণজাত ও অর্থে খুব সামান্যই জোতদার—জমিদার শ্রেণি শিক্ষাখাতে ব্যয় করত। এর পিছনেও তাদের প্রজাহিতৈষণার থেকেও বলবতি ছিল নিজেদের যশ-খ্যাতি বৃদ্ধির লোভ। তাই প্রকারান্তরে মুসলিম জনতার অর্থই বাংলার শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয়িত হত—এর মধ্যেই মিথ্যা নেই কিছুই।

এবার আসা যাক আইনসভার বাইরে, এই বিলের পক্ষে বিপক্ষে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথায়। এই বিতর্কে কিন্তু মূল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষকেরা। বিশেষ করে তাদের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি বা এ.বি.টি.এ.। ১৯৩৭-এর ৬ আগস্ট বিলের খসড়া প্রকাশের অব্যবহতি পরেই অ্যালবার্ট হলে, স্কুল পরিচালক সমিতিগুলির সদস্য ও শিক্ষকদের এক সভা ডাকা হয়। এই সভাটিতে স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু শিক্ষকদের প্রাধান্য ছিল, (কারণ স্বরূপ শিক্ষায় পশ্চাৎপদ মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষক হবার মতো উচ্চ শিক্ষিতের হার সে সময় যথেষ্ট কম ছিল)। যাইহোক এই সভায় প্রস্তাবিত বিলটিকে 'প্রতিক্রিয়াশীল ও জাতীয়তা বিরোধী' বলে চিহ্নিত করা হয়। ন্যায্যতঃ এখানে সরকারি নিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদ করা হলেও, কেন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলায়, শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হচ্ছে—সে সম্বন্ধে এ.বি.টি.এ. নেতারা নিশ্চুপ থাকেন। অবশ্য 'হিন্দু নেতারা' নিশ্চুপ থাকলেও, প্রধান শিক্ষকদের বাদ দিয়ে বোর্ডের শিক্ষক প্রতিনিধি না থাকারও প্রতিবাদ করে সমিতি।[১৪০]

আমরা জানি যে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির শিক্ষকেরা মূলতঃ স্কুল ম্যানেজিং কমিটিগুলির স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের বিরোধিতা করার মধ্য দিয়েই শিক্ষক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। নতুন বিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজিং কমিটির ক্ষমতা হ্রাস করার কথায় তাদের সমর্থন থাকাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সমিতি এই বিলের বিরোধিতায় তাদের শত্রুপক্ষ ম্যানেজিং কমিটিগুলির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আন্দোলনে নামে। একমাত্র, বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণির (শিক্ষকের বেশির ভাগই ছিলেন এই শ্রেণিভুক্ত) মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রকাশ ছাড়া তৎকালে শিক্ষকবৃন্দের এই কার্যকলাপের আর কোন কারণ নির্দেশ করা যায় না—এই (অপ) চেতনা এতটাই গভীর ছিল যে, প্রতিনিয়ত বেতন সংক্রান্ত ও চাকরির শর্তাবলী সম্পৃক্ত প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েও তারা তাদের স্বশ্রেণিভুক্ত বর্ণ হিন্দু ভদ্রলোক ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের পাশে দাঁড়াতে দ্বিধাবোধ করেনি।

আলোচ্য বছরে ১৮ আগস্ট কলিকাতা জেলা স্কুল সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে শ্যামাপ্রসাদ হিন্দুদের জন্য পৃথক মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের প্রস্তাব দিলে, তা সাড়ম্বরে গৃহীত হবার মধ্য দিয়ে 'উগ্র হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী প্রস্তাবকের' সঙ্গে 'প্রগতিশীল' শিক্ষকদের শ্রেণি চরিত্রের সাযুজ্যের প্রকাশ ঘটেছিল। এরপরে ২৮ ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আহ্বানে এই অশুভ বিলটি প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ মত প্রকাশ করেন এই বিলটি শিক্ষার প্রসার হ্রাস করবে ও এটা জাতীয়তা বিরোধী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাথাভারী প্রশাসনের হাত থেকে আলাদা বোর্ডের হাতে মাধ্যমিক শিক্ষা ন্যস্ত হলে অবশ্য মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি পাবার কথা ছিল। বর্ণ হিন্দুরা নয়—বাংলা সংখ্যাগুরু মুসলিম জনতার বৃহদংশই তখন অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তথাকথিত মুসলিম প্রাধান্য যুক্ত বোর্ড তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে অধিকতর আগ্রহের সঙ্গে ব্রতী হবে, এটাই স্বাভাবিক। তাই সমিতির উক্ত বক্তব্য কোনোভাবেই ধোপে টেকে না। আর জাতীয়তাবাদের নামে হিন্দু প্রভুত্ববাদ চাপিয়ে দেবার যে খেলা উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা এবং তৎকালীন কংগ্রেসের নরম হিন্দুরা খেলতেন, শিক্ষকসমাজ—তথাকথিত এগিয়ে থাকা গোষ্ঠী হলেও তারই সহজ শিকার হয়ে পড়েছিলেন, এ কথা বলা যেতেই পারে।

সত্যিকারের জাতীয়তাবাদে তো সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু উভয়েরই সমান সুযোগ পাবার কথা। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যতক্ষণ সমতা প্রতিষ্ঠা না হচ্ছে, ততক্ষণ সুবিধাহীন শ্রেণিটিকে বিশেষ সুবিধা দানের মাধ্যমে সুবিধাভোগী শ্রেণির সম পর্যায়ে পৌঁছে দিতে হবে—এটাই নীতি। চিত্তরঞ্জন দাশ যখন 'বেঙ্গল প্যাক্টের' মাধ্যমে এই নীতি প্রয়োগ করে, প্রকৃত জাতীয়তাবাদ প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তখনও কংগ্রেসের ভেতরের ও বাইরের হিন্দুত্ববাদীরা উপরোক্ত ধরনের জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তুলেই, এর বিরোধিতা করেছিলেন—এটা আমরা দেখেছি।[১৪১]

যাইহোক, ইতিমধ্যে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে প্রায় ৪০০ মতো বিদ্যালয় প্রস্তাবিত বিলের বিরোধিতা করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই স্কুলগুলির বেশিরভাগই ছিল পূর্ববঙ্গের। বাংলার এই পূর্বভাগে জনতার বৃহদংশ মুসলিম জনগোষ্ঠীভুক্ত। প্রস্তাবিত মাধ্যমিক বোর্ডের সংরক্ষণের মাধ্যমে অধিকতর মুসলিম সদস্য নির্বাচিত হলে, এ অঞ্চলের শিক্ষকদের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তা সুবিধার হওয়ারই কথা। কেননা মুসলিম সংখ্যাধিক্য মানেই বোর্ডের পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া—এর একমাত্র ফল পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ জোতদার ও 'অনুপস্থিত জমিদারবৃন্দের' প্রতিনিধি সংকুল স্কুল ম্যানেজিং কমিটি প্রভাব হ্রাস ছাড়া কিছুই নয়। এর ফলে উপকৃত হত ধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষকরাই। আসলে ধার্মিকতা তখনই সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হয়, যখন কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মের সব মানুষ শ্রেণি নির্বিশেষে স্বধর্মের সব মানুষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্বার্থের তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন।[১৪২]

তৎকালীন শিক্ষকবৃন্দ এবং তাদের সংগঠন এ.বি.টি.এ. নেতৃত্ববৃন্দ সেই একই ভুলের শিকার হয়েছিলেন, এটা বলা যেতেই পারে। আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ের ১৯৩৭-এর খুলনায় অনুষ্ঠিত

এ.বি.টি.এ.-এর প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল, 'ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষার মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিষ প্রবেশ করিলে, শিক্ষার উন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। আমরা শিক্ষক আমাদের নিকট হিন্দু মুসলমান সব ছাত্র সমান। শিক্ষা সম্পর্কে আমরা জাতি-ধর্মের গণ্ডির বাহিরে। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থায় যাহাতে সাম্প্রদায়িক বিষ প্রবেশ না করে তার জন্য, আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে।'[১৪৩] প্রসঙ্গত এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন গোঁড়া হিন্দুত্ববাদী ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার। ১৯৩৮ এবং ৪০-এ প্রাদেশিক সম্মেলনে ও সমিতি একই দাবির পক্ষে সোচ্চার হয়েছিল। যেখানে প্রস্তাবিত বোর্ডের শিক্ষক ও শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বিকাশের স্বার্থে শিক্ষক প্রতিনিধিত্ব রাখবার দাবি গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল, সেখানে উক্ত প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে মিঠে মিঠে কথার অন্তরালে কায়েমি বর্ণহিন্দু গরিষ্ঠ ম্যানেজিং কমিটিগুলির পৃষ্ঠ কন্ডুয়ন সেদিন শিক্ষক নেতৃবৃন্দ করেছিলেন—এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এদিকে ১৯৪০-এর ৬ আগস্ট অ্যালবার্ট হলে ডাক্তার হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শিক্ষকেরা পুনরায় 'বিল'-এর বিরুদ্ধে মিলিত হন। ১৯৪৮ পর্যন্ত শিক্ষকদের এই প্রতিবাদ চলতেই থাকে।

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে যখন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, যদুনাথ সরকার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়-এর পাশাপাশি সর্বতোভাবে অসাম্প্রদায়িক আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, বিলটির গঠনগত দিক বা শিক্ষক প্রতিনিধিত্ব না থাকার বিষয়ে সমালোচনার পরিবর্তে, প্রস্তাবিত বোর্ডের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, '.....বর্তমান সরকার যত অপকর্ম ও অপচেষ্টা করেছে তার মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল হচ্ছে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিতে সবচাইতে ক্ষতিকর।' দুর্ভাগ্যজনকভাবে এরপরে জাতীয়তাবাদের ক্ষতি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'সরকারি স্কুল আর দেড়শোর কিছু কম খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল বাদে এই প্রদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা যেসব বিদ্যালয় আছে তা হিন্দুর তৈরি আর হিন্দুরা চালায়।.....তাঁদের সংস্কৃতির মূলে আঘাত হানে সে ব্যবস্থা হিন্দুরা মানতে রাজি নয়।'[১৪৪] না—প্রফুল্ল চন্দ্রকে সাম্প্রদায়িক বলার সাহস বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের নেই। তবু বলতেই হয়, এখানেও যেন বিলটি 'শিক্ষা বিরোধী' বলে নয়—কায়েমি বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে ক্ষতিকারক বলেই সমালোচিত হয়েছে।

আসলে পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক মানুষ তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক বাংলার সাধারণ মানুষ হিসেবে বিশেষ করে তাদের বৃহদংশ পশ্চাৎপদ মুসলিম জনতার স্বার্থ রক্ষা করা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষণ করার জন্যই মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত এই বিল এনেছিলেন। মন্ত্রীসভার অন্য শরিক মুসলিম লিগের অভিজাত নেতৃত্ব এক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ অনুযায়ী সাম্প্রদায়িকতা মৌলবাদ- এর তাস খেলে, ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইলেও ফজলুল হকের কাজের মধ্যে এই চিন্তার কোনো ছাপ ছিল না। আমরা কি করে ভুলে যাই যে আজীবন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতীক হক সাহেব, ১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করেই তার কৃষক প্রজা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেস নেতৃত্বের অপরিণামদর্শীতার ফলে বাধ্য হয়ে তাকে মুসলিম লিগের সঙ্গে চলে যেতে হয়েছিল। মনে রাখতে হবে ভূমি সংস্কারের লক্ষ্যে 'ফ্লাউড কমিশন' গঠন এবং সেই সূত্রে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব

সংশোধনী আইন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি পূর্বেই কায়েমি উচ্চবর্ণ হিন্দু জমিদারদের স্বার্থে আঘাত হেনেছিলেন, (সঙ্গে অবশ্যই অভিজাত বংশজাত মুসলিম জমিদারদের স্বার্থে আঘাত পড়েছিল)। প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বিল এই পথে 'হাজার বছরের চলমান শব', সেই বর্ণহিন্দুদের শিক্ষা ক্ষেত্রে মৌরসী পাট্টা অবসান ঘটাতে চেয়েছিল—এই সংক্রান্ত ক্রোধের প্রতিফলন ঘটেছিল বর্ণ হিন্দুদের আচরণে—আর শ্রেণিগত বিরোধের থেকেও বর্ণগত একতা রুদ্ধ করে দিয়েছিল অন্ততঃ সাময়িক ভাবে, শিক্ষকদের স্বচ্ছ দৃষ্টি। সমিতির মুখপত্র শিক্ষা সাহিত্য বা Teacher's Journal-এও মধ্যশিক্ষা সম্পর্কিত সমিতির মতামত প্রকাশিত হতে থাকে, সেই সময়ে। পত্রিকাটির সেই সময়কার একটি সংখ্যায় বলা হয়, যে ১৯৪০-এর মধ্যশিক্ষা বিল, 'From the composition of the select committee, we do not expect much improvement of the bill' কেননা পূর্ববর্তী স্যাডলার শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক বোর্ডে স্বয়ং শাসনকে গুরুত্ব দিলেও, প্রস্তাবিত বিলে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকছে বলে ABTA মনে করে।[১৪৫]

যাইহোক কিছুদিনের মধ্যেই মুসলিম লিগের সঙ্গে মূলগত বিরোধের ফলে লিগ হক মন্ত্রীসভার পতন ঘটলে, আপাতত মাধ্যমিক শিক্ষা বিল বাস্তবায়িত করা সম্ভব হল না। তাছাড়া তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে গিয়েছে—শুরু হয়েছে পঞ্চাশের মন্বন্তর। সবারই দৃষ্টি আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে সরে গিয়েছিল। শিক্ষক নেতৃবৃন্দও সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে সহমত পোষণকারী, স্কুলসমূহের জমিদার-মালিকদের ও ম্যানেজিং কমিটিগুলির সঙ্গে তাদের পুরনো শত্রুতার দিনে ফিরে গিয়েছিল। 'অন্ন চিন্তা চমৎকারা'র আহ্বানে শিক্ষক সমিতি আবার লড়াই শুরু করেছিল স্কুল কর্তৃপক্ষসমূহের বিরুদ্ধে। মাধ্যমিক শিক্ষা বিল নিয়ে এ.বি.টি.এ.-এর আন্দোলন তার জন্মাবধি প্রতিবাদী ভূমিকায় চন্দ্রকলঙ্কের মত ইতিহাসের পাতায় মুখ লুকিয়ে ছিল।

১৯৪০-৫০ এর যুগ ঃ সমিতির সক্রিয়তা ঃ সাহিত্যে প্রতিফলন

১৯৪০ থেকে ৫০ এই দশকটি সারা পৃথিবীর কাছেই একটি গুরুত্বপূর্ণ দশক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সারা পৃথিবীকেই রাজনৈতিক-সামাজিক অর্থনৈতিক ভাবে ঝাঁকিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। আমাদের দেশেও তার অভিঘাত অবশ্যই পড়েছিল। যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাবে দেশের জনজীবন একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। পঞ্চাশের মন্বন্তর বাংলার জনজীবনকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিল। কোলকাতা মহানগরীতে অক্ষশক্তির জাপানের বোমা বর্ষণের ঘটনায় আতঙ্কিত নাগরিকেরা দলে দলে শহর ছাড়তে বাধ্য হল। ফলে শহরাঞ্চলের স্কুলগুলিতে ছাত্রাভাব দেখা দিতে শুরু করল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অনুবর্তন' উপন্যাসে এই সময় মাধ্যমিক শিক্ষা তথা সামগ্রিক ভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় দেখা গিয়েছিল তা আমাদের সামনে সমসাময়িক শিক্ষা ব্যবস্থার এক বাস্তব চিত্র তুলে ধরে ওই উপন্যাস থেকে দুই-চার ছত্র তুলে ধরা এক্ষেত্রে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না। কাহিনির বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকেরা অনিয়মিত বেতন পেতেন। ভালো মন্দ নির্বিশেষে প্রায় সকল শিক্ষকই উপ-শিক্ষকতার মাধ্যমে কোনো

রকম ভাবে দিনাতিপাত করতেন। ১৯৪২-এর মন্বন্তরে শিক্ষকরা চরম সংকটের সম্মুখীন। গোদের উপর বিষ ফোড়ার মতো কোলকাতায় তখন জাপানি বোমা পড়ার আতঙ্ক। শিক্ষকদের মধ্যে যদুবাবু এবং নারায়ণ বাবুর মতো বিপরীত চরিত্রের মানুষও আছেন। লেখকের ভাষায়, 'যদুবাবু ফাঁকিবাজ মাস্টার' অভাবে কিংবা মানসিকতার জন্য, যদুবাবু এমনকি ছেলেদের দ্বিপ্রহরের আহার ও লুকিয়ে চুরিয়ে খেয়ে নিতেন। আবার 'বেশি দূর যাইতে হইবে না। তাহাদের স্কুলেই রহিয়াছেন নারায়ণ বাবু.....আজীবন পূত চরিত্র, আদর্শ শিক্ষক।' নতুন শিক্ষকদের শিক্ষকতার বৃত্তিতে আসতে যদুবাবু নিরুৎসাহিত করেন। অন্যদিকে আমরা স্কুলের নতুন শিক্ষক মিঃ দত্তের মধ্যে শিক্ষক আন্দোলনের প্রথম প্রস্ফুরণের চিহ্ন দেখতে পাই। যিনি যদুবাবু বা মিঃ আলমের মতো স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেন না—বরঞ্চ আগ বাড়িয়ে নিজের জন্য নয় অন্যান্য শিক্ষকদের পাওনা গণ্ডা নিয়ে সোচ্চার হন। সহজেই স্কুলের হেডমাস্টার মশাই-এর কাছে, তিনি মাইনে না পাওয়া সহকর্মীদের স্বার্থে সোচ্চার হন। লেখকের ভাষায় 'নতুন টীচার হাতের কাগজ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, ক্ষেত্রবাবু কুড়ি টাকা, জ্যোতির্বিনোদ পনেরো টাকা, শ্রীশবাবু আঠারো টাকা, হেড পণ্ডিত দশ টাকা' পুজোর ছুটির আগে দিতেই হবে। সাহেব হেডমাস্টার এই দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করলে, নতুন টিচার 'দত্ত' বলে ওঠে, 'না স্যার এঁদের না হলে চলবে না, এঁদের অবস্থা সত্যিই খারাপ—প্রত্যেকেরই বিশেষ দরকার আছে।' 'নতুন টিচার' এর বিদ্যাবত্তার প্রতি আস্থাশীল হেডমাস্টার সাহেব নতুন টিচারকে নিজের জন্য কিছু চাইতে অনুরোধ করলে, নতুন যুগের 'নতুন টিচার' আদর্শবাদের মূর্ত প্রতীক হয়ে বলেছিলেন, 'না স্যার। আমি একরকম ম্যানেজ করে নেব। ধন্যবাদ স্যার।'[১৪৬]

উপন্যাসকে বিশ্লেষণ করে আমরা এখানে ৪০'-এর দশকের তিন ধরনের মাস্টার মশাই-এর সন্ধান পাই। দারিদ্র্যের চাপে দুর্নীতিপরায়ণ যদুবাবু আদর্শবান কিন্তু নির্বিরোধী শিক্ষক নারায়ণ বাবু এবং আগামী সংগ্রামের প্রতীক মিঃ দত্ত বা 'নতুন টিচার'। এই নতুন টিচাররাই ৪০-এর দশক থেকেই শিক্ষকদের স্বার্থে তাদের প্রতিবাদের সমষ্টিকরণ করেন শিক্ষক সমিতির মাধ্যমে। আর এই কাজে দুহাত ভরে আশীর্বাদ পান নারায়ণবাবুর মতো আদর্শবান অথচ নির্বিরোধী শিক্ষকদের। সত্যিই সাহিত্যের দর্পণে সমসাময়িক শিক্ষক সমাজের সত্য চিত্র বিভূতিবাবুর উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।[১৪৭]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্দীপন পাঠশালার একক শিক্ষক নায়ক সীতারাম পণ্ডিতের কথাও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মর্তব্য—এই কাহিনি যেন আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ১৯২১ থেকে ৪২-এর সমান্তরাল। শিক্ষকদের বেঁচে থাকবার লড়াই-এর প্রতীক স্বরূপ। সেখানে শিক্ষালয়ের পণ্ডিতদের দু/পাঁচ টাকা সরকারি 'এইডের জন্য শিক্ষকদের লড়াই, মাধ্যমিক শিক্ষকদের লড়াই এরই প্রতিচ্ছবি। কাহিনির নায়ক স্বল্প শিক্ষিত সীতারাম একজন আদর্শ শিক্ষক—'ব্রত' এবং বৃত্তি' দুভাবেই সে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষাধারার উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট—হয়তো কতকটা অসচেতন ভাবেই। সন্দীপন পাঠশালার প্রতিষ্ঠা লগ্নে তাই তিনি বলে ওঠেন, '....আমি প্রাণ দিয়ে খেটে পড়াব, মাইনে চাই বৈকি আমার। কিছু পাব বলেই তো কাজ করতে

এসেছি।.....আমার দুঃখের সঙ্গে ছাত্রদের বাড়ির দুঃখের কথাও তো আমাকে ভাবতে হবে। কেউ যদি একমাস মাইনে দিতে না পারে, আপনারা যদি দেখেন, মাইনে বাকি ইচ্ছে করে পড়ে নাই, তবে তার নাম কাটব না, থাকবে।'[১৪৮] পাঠশালায় নিমগ্ন হয়েও সীতারাম পণ্ডিত হয়তো তাঁর ছাত্রতুল্য দেশব্রতী 'ধীরাবাবুর পরোক্ষ প্রভাবেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে মানসিক ভাবে সম্পৃক্ত।

সীতারামের মতো মাস্টার মশাইদের অনেকেই সেই সময়কার স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবে যোগদান করতে পারেনি—কেননা বিদেশি সরকারের দাপটে তাদের স্কুলের ক্ষতি হবার ভয় তাদের তাড়া করে ফিরেছিল। তাদের সান্ত্বনা ছিল ধীরাবাবুর মতো স্বদেশির লেখা চিঠি। যেখানে বলা হয়েছিল, পণ্ডিত আপনাকে আমি রামায়ণের ভগীরথের সঙ্গে তুলনা করি।.....আমার কাছে শিক্ষাই হল সত্যকারের পতিত—পাবনী ধারা। অশিক্ষার অভিশাপে অভিশপ্ত ভস্মস্তূপে ঢাকা মানুষের আত্মাকে মুক্তি দেয়।'[১৪৯] দিন যায়, ১৯৩৫-এর পর ভারতে তথা বাংলায় আংশিক স্বায়ত্তশাসনের ফলে সৃষ্ট স্বদেশি সরকারগুলির আমলে শিক্ষকেরা এমনকি, বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে শিক্ষকেরা, তাদের আর্থিক ও পারমার্থিক অর্থাৎ রুটিরুজির লড়াই এবং আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। সীতারামের মতো শিক্ষকেরা এই সব সম্মেলনে যোগ দেয়—অনেক সময় সংগঠকের ভূমিকাও গ্রহণ করে। শুরু হয় ব্যক্তি শিক্ষকের ব্যক্তিগত লড়াই থেকে সাংগঠনিক লড়াই এর প্রস্তুতি—৪২'-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন এবং ৪৩'-এর মন্বন্তরে এই লড়াই সংগ্রামের আগ্নেয়গিরি নিভে যাবার পরিবর্তে আরো দ্বিগুণ জ্বলে উঠেছিল। যার ইতিহাস আমরা এই অভিসন্দর্ভে বারে বারেই উল্লেখ করবো।

বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত লেখকত্রয় 'তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের' মধ্যে দুজন লেখক শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আন্দোলনের আলোচনা সংক্ষেপে সিংহাবলোকন করলাম।

তৃতীয় লেখক হিসাবে যাঁর শিক্ষক সম্বন্ধীয় রচনা ছাড়া, শিক্ষক আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করা যায় না। তিনি হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণের অনুবর্তনে 'নতুন মাস্টারের' আবেদনমূলক আন্দোলন, যা তারাশঙ্করের সীতারামের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই, তা ক্রমশঃ সংগঠিত হচ্ছিল ১৯২১-এ যে সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, তা ১৯৩৬ কিংবা ৪২'-এর অভিঘাতে যখন শিক্ষক আন্দোলন একটি বেগবতী স্রোতস্বিনী' রূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে, তারই কাহিনি রূপ আমরা দেখতে পাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টিচার' গল্পে। ঘটনার 'কাল' হিসাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের টিচার-এর নায়ক গিরিণ বাবু বিভূতিভূষণের 'নতুন মাস্টার' বা তারাশঙ্করের 'সীতারামের' থেকে অনেক নবীন। সমবেত সংগ্রামের জয়তিলক অঙ্কিত হয়ে রয়েছে তার ললাটে। কালানৌচিত্য দোষে দুষ্ট হলেও, এখানে একত্রে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিক্ষক চরিত্রের' বৈশিষ্ট্য এক সঙ্গে লিপিবদ্ধ করার লোভ তাই সংবরণ করা গেল না। যদিও ঘটনাক্রম অনুসরণ করলে, এই গল্পটি মানিক বাবুর 'খতিয়ান' নামক গল্প সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে। তখন আমাদের এই বিভক্ত পোড়া বাংলায় শিক্ষক আন্দোলনে

একটা বড় পরিবর্তন সংগঠিত হচ্ছে। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও আমাদের আচার্যবৃন্দ রাস্তার আন্দোলনে নামবার কথা ভাবছেন। এতদিনকার শিক্ষকতা 'ব্রত' বলে সমাজ যে অর্থনৈতিকভাবে শিক্ষকদের 'ব্রাত্য' করে রেখেছে—সেই বিষয়ে সচেতন হচ্ছেন তারা। বেতন বৃদ্ধি করার দাবিতে ধর্মঘট বা কর্মবিরতির কথাও চলছে। তখন কোনো একটি রাজমাতা হাই স্কুলের সেক্রেটারি রায়বাহাদুর অবিনাশ তরফদার শিক্ষকদের দাবিকে কূটকৌশলে বানচাল করতে সচেষ্ট। তার এই ধূর্ত প্রচেষ্টাকে একটি তথাকথিত আদর্শের মোড়কে মুড়ে, তাঁর মনোভাব প্রকাশার্থে মাণিকবাবুর লেখনী লিপিবদ্ধ করছে, 'টিচাররা ধর্মঘট করবে বেতন কম বলে। বেতন বাকি বলে, এটা সেটা হরেক রকম অসুবিধা আছে বলে চাকরি করতে। বাপের জন্মে রায়বাহাদুর এমন কথা শোনেনি, বিদ্যালয়ের শিক্ষক তারা কি মজুর না ধাঙ্গড় যে ধর্মঘট করবে।'[১৫০] কোনো এক শনিবার তাই সেক্রেটারি মশাই শিক্ষকদের জড়ো করে বুনো রামনাথের মতো 'প্লেইন লিভিং এবং হাই থিংকিং'-এর বাণী বিতরণ করলেন। এদিকে বেতনের স্বল্পতা ও অনিমিয়তা প্রধান শিক্ষক সহ সমস্ত গুরুকুলকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। কেউ নীরবে, কেউ বা সরবে সমালোচনা করছে সরকারের ও ম্যানেজিং কমিটির। গিরীন নামে একজন মাস্টার মশাই এই সরবের দলের নেতা। বুনো রামনাথের শিক্ষকসুলভ আদর্শের কথা তুলে, আসলে রায়বাহাদুর, শিক্ষকদের বেতন ও চাকুরির স্থায়িত্ব-এর কথা বলে 'শিক্ষকদের হুমকি দিয়ে গেলেন এ বিষয়ে গিরীনের কোন সন্দেহ ছিল না। রায়বাহাদুর দারিদ্রের গুণগান করলেও স্বভাবতঃই দরিদ্র ছিলেন না—ছেলের অন্নপ্রাশনের ভুয়ো আমন্ত্রণে সে রায়বাহাদুরকে নিজ গৃহে নিয়ে আসলো—পরিবারের লোকের অসুস্থতা, দারিদ্র্য জনোচিত অগোছালো গৃহ, যার অন্নপ্রাশন সে প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন। রায়বাহাদুর এই পরিস্থিতিতে মানসিক ভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েন। শিক্ষক মহাশয়দের ভয়াবহ দারিদ্র্য তার গায়ে যেন জলবিছুটির চাবুক হাঁকড়ে গেল। দারিদ্র্যের এই করাল ছায়া দেখে, করুণায় নয়—মানসিক ভয়ে বিপর্যস্ত, গিরীনকে তার বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব দিলে, গিরীনের আদর্শবাদ সেই প্রস্তাবকে নাকচ করে দিল। সে বলে উঠলো, 'তা করবেন না স্যার। লোকে বলবে ছেলের মুখের ভাতের ছলে আপনাকে বাড়িতে ডেকে খাতির করে মাইনে বাড়িয়ে নিয়েছি, বাকি মাইনে আদায় করেছি। আমার সর্বনাশ করবেন না স্যার।' কোনো বিপদ নয়—তর্ক নয়—প্রহার নয়—গিরীন মানসিক ভাবে 'দারিদ্র্য বিলাসী' রায়বাহাদুরকে দারিদ্র কাকে বলে তা দেখিয়েছিল, পরিশেষে স্বাভাবিক ফলাফলই হল। 'সোমবার গিরীন নোটিশ পায় বরখাস্তের নোটিশ' কিন্তু প্রতিবাদী শিক্ষক গিরীন রায়বাহাদুরের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। 'শিক্ষকদের দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য কীর্তন করে শোনাতে গিয়ে একটু আটকে যাবে কথাগুলি। উচ্ছ্বাসটা হবে মন্দা, দয়া-মায়া সহানুভূতির নয় ভয়ে।'[১৫১] সমাজের প্রতিচ্ছবি ছেড়ে আপাততঃ বাস্তবে আসা যাক।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে শিক্ষক আন্দোলনের গতি বদল

যাইহোক ১৯৪৫-এ কালান্তক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি হল। জার্মান জাপান ইতালির অক্ষশক্তি হল পরাজিত। বিজয়ী হল গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও সোভিয়েত

ইউনিয়নের জোট অর্থাৎ মিত্রপক্ষ। এই নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই যে, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে অনাক্রমণ চুক্তি ভেঙে জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলে, স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত লালফৌজ 'পিতৃভূমি' রক্ষার জন্য মরণপণ লড়াই করে এবং তারাই ১৯৫৪-এর মে মাসে জার্মানীর রাজধানী বার্লিনে, হিটলারের শাসন কর্তৃত্বের কেন্দ্রভূমি রাইখস্ট্যাগের শীর্ষদেশে রক্ত পতাকা উত্তোলন করতে সফল হয়। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঐখানেই শেষ হয়ে যায়। ভারতের কমিউনিস্টদের সেই সময়কার কার্যকলাপ ও মুসলিম লিগ ও আম্বেদকারের ভূমিকা নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। তা অবশ্য আমাদের আলোচনার সীমা বহির্ভূত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয়ের পর বিশ্বের সর্বত্র মুক্তিকামী মানুষদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। সাম্রাজ্য বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সৃষ্টি হয় জোয়ারের।[১৫২] আজাদ হিন্দ ফৌজের ধৃত সৈনিকদের বিচার, নৌবিদ্রোহ প্রভৃতি সাধারণ মানুষকে আরো স্বাধীনতা সচেতন করে তোলে। শ্রমিক কর্মচারীদের আন্দোলনেও তখন নতুন আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময় ডাক-তার শ্রমিক কর্মচারীদের জঙ্গি আন্দোলন বাংলায় আলোড়ন তোলে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য সেদিনের ছবি তাঁর রচিত অনুভব কবিতার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে/আমি যাই তারি দিন পঞ্জিকা লিখে/এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ/দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ/স্বপ্নচূড়ার থেকে নেমে এসো সব/শুনেছ? শুনেছ উদ্দাম কলরব?/নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট/রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদ পট/।[১৫৩]

এদিকে ১৯৪১-এর এপ্রিল মাসে বহরমপুরে পুনরায় হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি নির্বাচিত করে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির বিংশতি তম অধিবেশন আহূত হয়। ওই বছরেরই ২৬শে মে তে, ওয়েলিংটন স্কোয়ার (বর্তমানে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার)-এর কাছে স্যার মন্মথ নাথ মুখার্জী, এ.বি.টি.এ. বিল্ডিং-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। উক্ত গৃহ নির্মাণের জন্য কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট-এর থেকে ২৬,৭০৮ টাকা দিয়ে ৪ কাঠা ১২ ছটাক জমি সংগ্রহ করা হয়েছিল আগেই। কিন্তু যুদ্ধের জন্য নির্মাণ সামগ্রীর দাম অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় কিছুদিন গৃহ নির্মাণের কাজ বন্ধ রাখতে সমিতি বাধ্য হয়েছিল। যাইহোক পরবর্তী কালে উক্ত স্থানে যে গৃহ নির্মাণ করা হয়েছিল তা সমিতির প্রাদেশিক কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।[১৫৪] ১৯৪১-এর জুলাই মাসে বরিশাল ও নোয়াখালি জেলায় এক বিশাল ঘূর্ণিঝড়ে শিক্ষক সহ বহু মানুষ বিপদে পড়েন। এঁদের সাহায্য দেবার জন্য সমিতির উদ্যোগে বাংলার অন্যান্য অংশের শিক্ষকবৃন্দ বিপুল সাড়া দেন। ঐ বছরেই হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়, খুলনা বি. কে. ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক ও সমিতির কার্যকরী কমিটির সদস্য উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও লোহাগড়া যদুনাথ একাডেমির প্রধান শিক্ষক যোগেন্দ্রনাথ বাগচীকে উক্ত বিদ্যালয়গুলির পরিচালন সমিতি অন্যায় ভাবে বরখাস্ত করে। কিন্তু সমিতির প্রচেষ্টায় সব কয়টি ক্ষেত্রেই সালিশি বোর্ডের নির্দেশে উপরিউক্ত শিক্ষকগণ তাঁদের স্বপদে সসম্মানে বহাল হন।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ চলার জন্য এবং দেশে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সমিতির বার্ষিক অধিবেশন স্থগিত রাখা হলেও, সংগঠিত ভাবে না হলেও, শিক্ষকরা বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনতার এই নতুন আন্দোলনে যোগ দেন। উত্তরের জলপাইগুড়ির চারুচন্দ্র সান্যাল থেকে দক্ষিণের হুগলি জেলার জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের মতো স্বনামধন্য মাস্টারমশাইরা এই আন্দোলনে যোগ দেন।[১৫৫] তবে সংগঠনগত ভাবে সমিতি এই আন্দোলনে যোগদান করেনি। কেননা তখনও অবধি সমিতির নরমপন্থী নেতৃত্ব বৃহত্তর রাজনীতি বিযুক্ত হয়ে অর্থনৈতিক বাদের ও ছাত্রকল্যাণের দাবিকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। জাপানি বোমার আতঙ্কে তখন কোলকাতা সহ সন্নিহিত অঞ্চলের অনেক বিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হয়। ৪২টি মাধ্যমিক এবং ৯৩টি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। দেখা যায়, খাদ্য সংকট। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের ক্ষোভ প্রশমিত করতে ঔপনিবেশিক সরকার, এককালীন ৭৫ টাকা তাদের দিতে বাধ্য হন।

যাইহোক ১৯৪৩-এর ২৪ ও ২৫ এপ্রিল বাঁকুড়ার চণ্ডীদাস মিত্র মন্দির সভাগৃহে অনুষ্ঠিত নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির একবিংশ সম্মেলনে ড. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। এই বছরেই রেঙ্গুন শহরে বোমা বর্ষণের ফলে ভয়ার্ত হয়ে, কোলকাতায় বহু বাসিন্দা শহর পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। ফলে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে অস্বাভাবিক ভাবে ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পায়। ওই বছরেই শিক্ষকদের জন্য সরকারি সাহায্যের দাবিতে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আহ্বানে 'সারা বাংলা শিক্ষক দিবস' পালিত হয়েছিল।

১৯৪৪-এর এপ্রিল মাসে মেদিনীপুর শহরের বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল হলে শিক্ষক সমিতির দ্বাবিংশতিতম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নলিনী রঞ্জন সরকারকে সে বছর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার জন্য মনোনীত করা হয়েছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় পাঁচশো জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই বছর থেকেই সমিতি পরিচালিত শিক্ষক সাহায্য ভাণ্ডার থেকে দুঃস্থ শিক্ষকদের জন্য সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৪৩-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৪৪-এর মার্চ মাস পর্যন্ত শিক্ষক ছাঁটাই ও তাঁদের প্রতি ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক অবমাননাকর আচরণের অনেকগুলি অভিযোগ সমিতির কাছে আসে। তার মধ্যে মোট তেরোটি ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অনুকূলে ফয়সালা করা সম্ভব হয়।[১৫৬] এই সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন প্রাদেশিক শিক্ষা মন্ত্রী তমিজুদ্দিন খান। শিক্ষকদের দুরবস্থা মোচনের জন্য জন প্রতি পাঁচ টাকা মহার্ঘভাতা দেবার অঙ্গীকার করেন তিনি।

১৯৪৫-এ কৃষ্ণনগর শহরে সমিতির ত্রয়োবিংশতিতম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপক হুমায়ুন কবির। সম্মেলনে বেসরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের জন্য ন্যূনতম দুইশো টাকা ও সহকারি শিক্ষকদের জন্য একশো পঁচাত্তর টাকা বেতন দাবি করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা বিল নিয়ে আমরা যতই সমালোচনামূলক মন্তব্য করি না কেন এটা ঠিকই এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই শিক্ষক আন্দোলন সভা থেকে সড়কে নেমে এসেছিল। তারই অনুরণনে, কৃষ্ণনগর সম্মেলনের দাবিকে বাস্তবে রূপায়িত করার

জন্য ১৯৪৫-এর ১৯ এপ্রিল ভারত সভা হলে দাবিপত্র পেশ করার জন্য পাঁচশো শিক্ষক সমবেত হলেন—কিন্তু ইংরেজ সরকার কোনো দাবিই মেনে নিল না। ম্যানেজিং কমিটির শোষণের ধারাবাহিকতা রেখেই ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দেও কয়েকজন শিক্ষক অন্যায় ভাবে বরখাস্ত হন। সমিতি এই বিষয়টি নিয়ে সালিশি (আরবিট্রেশান) বোর্ডে অভিযোগ জানায়। নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় সেই সব শিক্ষকদের কাজে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য সালিশি বোর্ড সুপারিশ করে এবং পরিশেষে তাদের কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। আমরা আগেই মাধ্যমিক শিক্ষা বিল নিয়ে সমিতি ও সরকারের পরস্পর বিরোধী মনোভাব ও সমিতির তৎকালীন কার্যাবলী নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এই বিল আপাতত লাল ফিতের ফাঁসে বেঁধে ফেলতে সমিতি সমর্থ হলেও এই জয় ছিল নেতিবাচক। ইতিবাচক আন্দোলনের জন্য আমাদের আরো দুই-এক বছর অপেক্ষা করতে হবে।

সূত্র নির্দেশ

১. পূর্বাভাস বসু, শংকর (সং), আগরতলা, ২০১৬, প্রবন্ধ ঃ '১২৫ বছর-এ অ্যান্তনীয় গ্রামসি ঃ জীবন ও শিক্ষা—প্রবাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৪২
২. বসু, অঞ্জন—বাংলায় বামেরা, রাজপথে ও রাজ্যপাটে (১৯২০-২০১১), কলকাতা, ২০১৭, পৃঃ ১৫
৩. চন্দ্র, বিপান ও অন্যান্য—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃঃ ১৫৫
৪. তদেব, পৃঃ ১৫৩-১৫৪
৫. সেন, সুকোমল—ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০-২০০০), কলকাতা, ২০০৩, পৃঃ ১৪৮-৪৯
৬. বসু, অঞ্জন—বাংলায় বামেরা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪
৭. ভট্টাচার্য, দেবব্রত—সমকালীন বাঙালীর দৃষ্টিতে সোভিয়েত দেশ (১৯১৭-১৯৪৭), কলকাতা, ১৯৯৬, পৃঃ ১০
৮. তদেব, পৃঃ ১৯
৯. তদেব, পৃঃ ৩৮
১০. তদেব, পৃঃ ৪০
১১. তদেব, পৃঃ ৪৮
১২. তদেব, পৃঃ ৪৯
১৩. তদেব, পৃঃ ৫৮
১৪. তদেব, পৃঃ ৫৮
১৫. বসু, অঞ্জন—বাংলায় বামেরা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭
১৬. সরকার, সুমিত—আধুনিক ভারত, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ২২২

১৭. মজুমদার, রমেশচন্দ্র—বাংলা দেশের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড (মুক্তি সংগ্রাম), ঢাকা, ২০১৮, পৃঃ ২৩০-৩২
১৮. দাশ, চিত্তরঞ্জন—দেশবন্ধু রচনা সমগ্র, মণীন্দ্র দত্ত, হারাধন দত্ত (সং), প্রবন্ধ ঃ 'দেশের কথা', কলকাতা, ১৩৮৪ (বঙ্গাব্দ), পৃঃ ৪৭
১৯. তদেব, পৃঃ ৪৭-৪৮
২০. তদেব, পৃঃ ৪৯
২১. সরকার, সুমিত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬০
২২. চন্দ্র, বিপান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৬
২৩. ঘোষ, শংকর—মাস্টারদা সূর্যসেন, কলকাতা, ২০১২, পৃঃ ৭৬-৭৭
২৪. ভট্টাচার্য, সব্যসাচী—বাংলায় সন্ধিক্ষণ (ইতিহাসের ধারা—১৯২০-১৯৪৭), নয়া দিল্লী, ২০১৮, পৃঃ ০৩
২৫. Porter, AE, ICS, Report of the census of Bengal in 1931, Cal, 1932—উদ্ধৃতি ভট্টাচার্য সব্যসাচী, তদেব, পৃঃ ৫২
২৬. আচার্য কাহিনি—নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, প্রাগুক্ত, 'হেডমিলেস্ট্রস নরেন্দ্রনাথ মিত্র', কলকাতা, ১৪১১ (বঙ্গাব্দ), পৃঃ ১৬৮-৬৯
২৭. সেন, মণিকুন্তলা, সেদিনের কথা, কলকাতা, ১৯৮২, পৃঃ ২৪৭
২৮. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর স্মরণীয় বারো দিন, কলকাতা, সাল উল্লেখ নেই, পৃঃ ০২
২৯. দত্ত, সীমা (সং)—শিক্ষা ও সাহিত্য, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির শতবর্ষ সংখ্যা, প্রবন্ধ ঃ নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির চলার পথে একুশ বছর—দু'চার কথা, শান্তিরাম ভট্টাচার্য, কলকাতা, ২০২১, পৃঃ ২৫৪-২৫৫
৩০. বাগ, অজিত (সং)—শিক্ষা সাহিত্য, কলকাতা, আগস্ট, ১৯৯৭, সংকলন, পৃঃ ৫৪১
৩১. দত্ত, সীমা (সং)—শিক্ষা ও সাহিত্য, শতবর্ষ, প্রবন্ধ ঃ 'শতায়ু শিক্ষা ও সাহিত্য' সমিতির সংগ্রামী ঐতিহ্যের দর্পণ—শিব প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ২০২০, পৃঃ ৫৫৬
৩২. দত্ত, সীমা (সং)—শিক্ষা ও সাহিত্য, শতবর্ষ সংখ্যা, শতায়ু 'শিক্ষা ও সাহিত্য' সমিতির সংগ্রামী ঐতিহ্যের দর্পণ—শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৫৬
৩৩. তদেব, প্রবন্ধ শিক্ষা ও সাহিত্য, উজ্জ্বল বাতিস্তম্ভ—উৎপল রায়, পৃঃ ৫৬৪
৩৪. দত্ত, সীমা (সং)—শিক্ষা ও সাহিত্য, সমিতি শতবর্ষ সংখ্যা, প্রবন্ধ শান্তিরাম ভট্টাচার্য—প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৫
৩৫. বাগ, অজিত (সং), নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী সংখ্যা, প্রবন্ধ ঃ 'কলিকাতা শিক্ষক সম্মেলন ঃ প্রথম অধিবেশন—প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃঃ ৪৭৯
৩৬. বাগ, অজিত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জুবিলী সংখ্যা, প্রাগুক্ত, ভাষণ—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পৃঃ ৪৮৩

৩৭. দত্ত, সীমা (সং)—শিক্ষা ও সাহিত্য সমিতি শতবর্ষ সংখ্যা, প্রবন্ধ ঃ দ্রোহকাল শতবার্ষিকী বৃক্ষের উতল প্রণোদনা—অশোক অধিকারী, কলকাতা, ২০২১, পৃঃ ২৬৭

৩৮. দত্ত, সীমা (সং)—শিক্ষা ও সাহিত্য শতবর্ষ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, ২০২০, প্রবন্ধ ঃ শিক্ষা ও সাহিত্য—উজ্জ্বল বাতিস্তম্ভ—উৎপল রায়, পৃঃ ৫৬৫

৩৯. সাহা, অপূর্ব (সং), সেকালের শিক্ষা ঃ উজ্জ্বল উদ্ধার, কলকাতা, ২০১৩, প্রবাসী, ১৬শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩২৩, পৃঃ ২১৩

৪০. তদেব, পৃঃ ২১৩

৪১. তদেব, পৃঃ ২১৪

৪২. তদেব, প্রবন্ধ ঃ 'শিক্ষকের বেতন', 'শিক্ষক' ১ম খণ্ড. ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২৭, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, পৃঃ ২২৮

৪৩. দাশ, চিত্তরঞ্জন, দেশের কথা—প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭

৪৪. তদেব, পৃঃ ৪৯

৪৫. শিক্ষা ও সাহিত্য, শতবর্ষ সংখ্যা, ২০২০, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ শতায়ু 'শিক্ষা ও সাহিত্য' সমিতির সংগ্রামী ঐতিহ্যের দর্পণ, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৫৬

৪৬. শিক্ষা ও সাহিত্য, শতবর্ষ সংখ্যা, ২০২০, তদেব, পৃঃ-টাইটেল পেজ (প্রথম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২৮, প্রথম সংখ্যা), পৃঃ ৩৯৯

৪৭. তদেব, পৃঃ ৫৫৬

৪৮. তদেব, পৃঃ ৫৬৬

৪৯. তদেব, পৃঃ ৫৬৬

৫০. শিক্ষা ও সাহিত্য, মার্চ, ১৯৪০, ভল্যুম XIX, No.-3, পৃঃ

৫১. শিক্ষা ও সাহিত্য, শতবর্ষ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ এদেশের শিক্ষা সমস্যা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৩৯৮

৫২. বাগ, অজিত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য ঃ প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ 'নয়া বাঙ্গলার ইস্কুল মাষ্টার—বিনয় কুমার সরকার', পৃঃ ৪৮৭

৫৩. তদেব, পৃঃ ৪৮৭

৫৪. তদেব, পৃঃ ৪৯৫

৫৫. তদেব, পৃঃ ৪৯৫

৫৬. দত্ত, সীমা (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য—শতবর্ষ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১৩

৫৭. তদেব, পৃঃ ৪১৩

৫৮. মণ্ডল, বিকাশ (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য—সত্যপ্রিয় রায় জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা, প্রবন্ধ ঃ 'জন্মশতবর্ষে আমাদের শপথ—চিরসাথী হোন সত্যপ্রিয় রায়'—অমিতাভ সেন, কলকাতা, ২০০৭, পৃঃ ৩১২

৫৯. লাহিড়ী, অমূল্য নাথ (সভাপতি), সুবর্ণ জয়ন্তী (১৯২১-৭১) স্মরণিকা, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, প্রবন্ধ ঃ নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পঞ্চাশ বছর' সুনীল ঘোষ, কলকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ৬৪

৬০. তদেব, পৃঃ ৬৫

৬১. লাহিড়ী, অমূল্য নাথ (সং), সুবর্ণ জয়ন্তী, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, তদেব, পৃঃ ৬৫

৬২. তদেব, পৃঃ ৬৫

৬৩. তদেব, পৃঃ ৬৬

৬৪. বাগ, অজিত (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী, প্রাগুক্ত—কবিতা ঃ 'স্বাগত'—মোহিতলাল মজুমদার, পৃঃ ৫১৪

৬৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক—উত্তরকালের গল্প সংকলন, 'টিচার', কলকাতা, ১৯৭২, পৃঃ ১৮৩

৬৬. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, চুয়ান্নয় স্মরণীয় বারো দিন, কলকাতা, তারিখ হীন, পৃঃ ০৪

৬৭. সিংহ, দীনেশচন্দ্র—আশুতোষের শিক্ষা চিন্তা, কলকাতা, ১৯৯২, পৃঃ ৪০৭

৬৮. বিশ্বাস, অনিল (সং) শারদীয় গণশক্তি, কলকাতা ১৯৯৫, প্রবন্ধ ঃ শিক্ষক আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ—অনিলা দেবী, পৃঃ ১৬২-৬৩

৬৯. বাগ, অজিত (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ সংগ্রামী উত্তরাধিকার, নৃপেন্দ্রনাথ মহান্তি, পৃঃ ৫৭৮

৭০. ভট্টাচার্য, জ্যোর্তিময় (সং?) নতুন চিঠি, বর্ধমান, ২০১৬, প্রবন্ধ ঃ ঔপনিবেশিক যুগে বর্ধমান শহরে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার, প্রবাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৮৫

৭১. বাগ, অজিত (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী সংখ্যা, প্রাগুক্ত, বর্ধমান জেলা শিক্ষক সমিতি (এ.বি.টি.এ)-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—স্মৃতিচারণা—দেবেন্দ্র কুমার লাহিড়ী, পৃঃ ৫৯২

৭২. Extract from W. C. R. for w/e 18th July 1926, Assansol 69/7/26 (রাজ্য লেখ্যাগার)

৭৩. বিপ্লবাচার্য অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, (সংকলন), হুগলী, ২০০৯, পৃঃ ১১-১২

৭৪. বাগ, অজিত (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ আন্দোলন ও সংগঠনের বিকাশের ধারায় এ বি টি এ'-র হুগলী জেলা শাখা—কালিপদ সেনগুপ্ত ও সমীর বড়াল, পৃঃ ৫৯৫

৭৫. নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি—চুয়ান্নর সংগ্রামী ঐতিহ্য ও তার উত্তরাধিকার, ভূমিকা ঃ শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ২০০৫, পৃঃ ৩৯

৭৬. বাগ, অজিত (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী, প্রাগুক্ত, ইতিহাস অনুসন্ধান ঃ হাওড়া জেলা—কল্যাণ ঘোষাল, উদ্ধৃতি, Education report, Letter no 2175 (state Archives) পৃঃ ৫৯৮

৭৭. তদেব, Letter no 1958, dt 23/09/1863 (State Archives) পৃঃ ৫৯৮

৭৮. তদেব, উদ্ধৃত 'নানা কথা' পৃষ্ঠা ২, শিক্ষা ও সাহিত্য ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩২৮, পৃঃ ৫৯৯

৭৯. তদেব, পৃঃ ৫৯৯

৮০. তদেব, শিক্ষা ও সাহিত্য, ১৩৩৪, ৭/৮/৯ সংখ্যা, উদ্ধৃতি, এ. বি. টি. এ-র প্ল্যাটিনাম জুবিলী সংখ্যা, পৃঃ ৬০০

৮১. তদেব, শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জুবিলী সংখ্যা, পৃঃ ৬০০-৬০১

৮২. তদেব, পৃঃ ৬০২

৮৩. বাংলার কথা (২৪শে আগষ্ট, ১৯২৮), পৃঃ ০৬

৮৪. তদেব, (৩১শে জুলাই, ১৯২৮), পৃঃ ০৬

৮৫. তদেব, (১৯শে জুলাই, ১৯২৮), পৃঃ ০১

৮৬. তদেব, (১৬ই জুলাই, ১৯২৮), পৃঃ ০৪

৮৭. File no : 235/29, office of the DIG of police, CI dept, Intelligence Branch, dt. 01.011928, p. 05 (রাজ্য লেখ্যাগার)

৮৮. Confidential, Proceeding of the Tenth session of the Dacca District Conference, 17 Aug, 1929 (File no 235/29), p. 01 (রাজ্য লেখ্যাগার)

৮৯. তদেব—ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট টিচার্স কনফারেন্স, পৃঃ ০১, ঐ

৯০. মজুমদার, রমেশচন্দ্র ঃ অভিভাষণ, ঢাকা জেলা শিক্ষক সম্মেলন, দশম অধিবেশন, ১৯২৯, (পুলিশ ফাইলে রক্ষিত 235/29) পৃঃ ৮ এবং ৯ (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার)

৯১. CR OF POLICE, File no 69, p/27, dt 12 March, 1927 (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার)

৯২. উদ্ধৃতি, CR OF POLICE, File no 69, p/27 (Extract from weekly confidential report of S.P, Rajshahi, the 12th March, 1927 (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার)

৯৩. বাগ, অজিত (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী সংখ্যা—প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮৩

৯৪. মিশ্র, সুবিমল (সং) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষা ভাবনা, কলকাতা, ২০১৩, পৃঃ ২৯৯

৯৫. বাগ, অজিত (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী সংখ্যা—প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭৯

৯৬. বাগ, অজিত (সং), তদেব, (Teachers Journal) ভাষণ Prof C. V. Raman—All India Federation of Teachers Associations Conference, Third Session 1927, Presidential Address, p. 122

৯৭. তদেব, পৃঃ ১২১

৯৮. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং) নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, সুবর্ণ জয়ন্তী (১৯২১-৭১) স্মরণিকা, প্রাগুক্ত, সমিতির প্রবীণ নেতা মনোরঞ্জন সেনগুপ্তের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার, শ্রুতি লেখন—বিশ্বনাথ খাঁ, পৃঃ ৯০

৯৯. তদেব, প্রবন্ধ ঃ নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পঞ্চাশ বছর—সুনীল ঘোষ, পৃঃ ৬৬

১০০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষা (সংকলন) প্রবন্ধ ঃ শিক্ষার হেরফের, কলকাতা, ১৪১৭, পৃঃ ৮

১০১. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং), এ.বি.টি.এ. সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, সুনীল ঘোষের প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬

১০২. তদেব, পৃঃ ৬৭

১০৩. দত্ত, সীমা (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য সমিতি শতবর্ষ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ শান্তিরাম ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৬

১০৪. মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ এবং অন্যান্য (সং), সত্যপ্রিয় রায় ও উত্তরাধিকার, প্রবন্ধ ঃ জন্ম শতবর্ষে আমাদের শপথ—চিরসাথী হোন সত্যপ্রিয় রায়, কলকাতা, ২০০৮, পৃঃ ৪৮

১০৫. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর স্মরণীয় বারো দিন, উদ্ধৃতি, পৃষ্ঠা ঃ পরিশিষ্ট 'চ'

১০৬. তদেব, উদ্ধৃতি, পৃষ্ঠা ঃ পরিশিষ্ট 'ঙ'

১০৭. তদেব, পৃঃ ৮২

১০৮. বাগ, অজিত (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, আগষ্ট, ১৯৯৭, কলকাতা, পৃঃ ৫৪৬

১০৯. C. I. Dept, Special Branch, 26 June, 1930, p. (State Archives)

১১০. Extract from I. B. weekly report, 11/09/1929 No. 235/29 (State Archives)

১১১. DIG of Police, Intelligence Branch, File no. 235/29, 17th Aug, 1929

১১২. Secret, No-D 1102/Poll, Simla, the 28th May 1929 (State Archives)

১১৩. No. D 1102/Poll, GOI, Home dept, Political, Simla, the 28th May 1929 (State Archaivs)

১১৪. Govt of Bengal office of the D.C. of Police special Branch, No. 7/4869 II-C, dt 20th June, 1930

১১৫. IB, Weekly Report, dt the 26th July, 1930 No. 271/29, (State Archives)

১১৬. Dutta, Mrinal Kanti. The origin and development of the West Bengal Board of Secondary Education, Kolkata, 1988, p. 16

১১৭. বাগ, অজিত (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী, প্রাগুক্ত, এক নজরে পঁচাত্তর বছর—(লেখকের নাম নেই), পৃঃ ৪৬৫

১১৮. সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, এ.বি.টি.এ., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬-৬৭

১১৯. চট্টোপাধ্যায়, গৌতম (সং), ইতিহাস অনুসন্ধান-১২, কলকাতা, ১৯৯৮, প্রবন্ধ 'ঔপনিবেশিক ভারতে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা ও ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, প্রবাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ২৯৭-২৯৮

১২০. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং) সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, এ.বি.টি.এ., প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭-৬৮

১২১. তদেব, পৃঃ ৬৮

১২২. চট্টোপাধ্যায়, গৌতম—ইতিহাস অনুসন্ধান-১২, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৭

১২৩. বাগ, অজিত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী, কলকাতা, ১৯৯৬, প্রবন্ধ 'এ দেশের শিক্ষা সমস্যা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৪৭৭

১২৪. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং), এ.বি.টি.এ সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮-৬৯

১২৫. তদেব, পৃঃ ৬৯

১২৬. তদেব, পৃঃ ৬৯
১২৭. তদেব, পৃঃ ৬৯
১২৮. তদেব, পৃঃ ৬৯-৭০
১২৯. দত্ত, সীমা (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য সমিতি, শতবর্ষ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ শতবর্ষের শপথ—শিব প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৩৯
১৩০. শিক্ষা ও সাহিত্য (Teachers Journal) ইংরেজী বিভাগ, মার্চ, ১৯৪০, কলকাতা, Vol-XIX, No.-03 pp. 272-73
১৩১. শিক্ষা ও সাহিত্য, বিংশ বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৪৬, কলকাতা, পৃঃ ২৭৩
১৩২. সিংহ, দীনেশ, প্রসঙ্গ ঃ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাগুক্ত, কলকাতা, পৃঃ ৪৫৬
১৩৩. উদ্ধৃতি, গোস্বামী হরিসাধন—ভারতের শিক্ষা—ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ২৫৩-৫৪
১৩৪. দে, অমলেন্দু—বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, কলকাতা, ১৯৯১, পৃঃ ২৪০
১৩৫. ব্যানার্জী, সচ্চিদানন্দ—ফজলুল হক—জীবন ও রাজনীতি, কলকাতা, ২০০১, পৃঃ ৩৩-৩৪
১৩৬. সিংহ, দীনেশ—প্রসঙ্গ ঃ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬৯
১৩৭. তদেব, পৃঃ ৪৭০
১৩৮. তদেব, উদ্ধৃত, Struggle and strife in urban Bengal, (1937-47) Pranab Chattopadhya, পৃঃ ৪৭০-৭১
১৩৯. তদেব, পৃঃ ৪৬৯
১৪০. বাগ, অজিত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জুবিলি সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬৫
১৪১. সেনগুপ্ত, প্রবাল, চিত্তরঞ্জন দাশ ও বাংলার রাজনীতি, সমালোচনার আলোকে, কলকাতা, ২০১৮, পৃঃ ১১৫-১৬
১৪২. চন্দ্র, বিপান, আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতা, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ০২
১৪৩. Bhattacharya, Biswajit (Ed) IJHSSS, Karimganj 2019, প্রবন্ধ ঃ ঔপনিবেশিক পর্বে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গঠনের চেষ্টা ও নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, প্রবাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ৩৪
১৪৪. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি—আকাদেমি ভাষণ সংকলন, কলকাতা, ২০০৭, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা (২০০২), পরমেশ আচার্য, ভাষণ ঃ শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, পৃঃ ৩১৩
১৪৫. শিক্ষা ও সাহিত্য (Teachers Journal, May-June 1940, Vol XIX, No-5-6, pp. 590-91
১৪৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, বিভূতি রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, কলকাতা, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ। উপন্যাস ঃ অনুবর্তন, পৃঃ ৬২-৬৩
১৪৭. আচার্য কাহিনি, কলকাতা-১৪১১ (বঙ্গাব্দ), প্রসঙ্গ ঃ আচার্য কাহিনি—রামরমণ ভট্টাচার্য, পৃঃ X

১৪৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৮১, ত্রয়োদশ মুদ্রণ ১৪২৫ (বঙ্গাব্দ), উপন্যাস—সন্দীপন পাঠশালা, পৃঃ ৩২
১৪৯. তদেব, পৃঃ ৯০
১৫০. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক—উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ, কলকাতা, ১৯৮৮, গল্প ঃ 'টিচার', পৃঃ ১৭৭
১৫১. তদেব, পৃঃ ১৮২-৮৩
১৫২. সরকার, সুমিত—আধুনিক ভারত, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃঃ-৪২৬ এবং ৪৩৪
১৫৩. ভট্টাচার্য, সুকান্ত—সুকান্ত সমগ্র, কলকাতা, (কবিতা), বৈশাখ ১৩৭৫, পৃঃ ৪৪-৪৫
১৫৪. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং), এ.বি.টি.এর সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০
১৫৫. চট্টোপাধ্যায়, নরেন (প্রকাশক) বিপ্লবাচার্য অধ্যাপক জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ (সংকলন), হুগলী, ২০০৯, প্রবন্ধ ঃ 'মহান বিপ্লবী'—গোপেশচন্দ্র মল্লিক, পৃঃ-৬৬ এবং পরিতোষ কুমার দত্ত (প্রকাশক) চারুচন্দ্র সান্যাল স্মারক গ্রন্থ, জলপাইগুড়ি ১৯৯২, প্রবন্ধ ঃ জাতীয় জীবনে ডা. চারুচন্দ্র সান্যাল—ভবরঞ্জন গাঙ্গুলী, পৃঃ ১৬৫
১৫৬. লাহিড়ী, অমূল্য নাথ (সং) এ.বি.টি.এ. সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনোত্তর কালে শিক্ষকদের গণমুখীনতা ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম—আন্দোলনে ব্যক্তির ভূমিকা

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ এবং ২১ এপ্রিল অবিভক্ত দিনাজপুরে শিক্ষক সমিতির চতুর্বিংশতিতম সম্মেলন আহ্বান করা হয়। ওই বছরেই সমিতির পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রতি জেলায় রজত জয়ন্তী উৎসব পালন করার সিদ্ধান্ত ও সমিতির পক্ষ থেকে নেওয়া হয়। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা। দ্বিতীয় দিনে তাঁর অনুপস্থিতিতে সভাপতির কার্যভার গ্রহণ করেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক নীহার রঞ্জন রায়। প্রথম দিনে কবিশেখর কালিদাস রায়, যিনি একজন শিক্ষকও বটে—তার লিখিত গান গেয়ে সভার উদ্বোধন করা হয়েছিল।

সেই সময় গড়ে মাসিক মাত্র ১০ টাকা বেতন বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকেরা যে প্রস্তাব সরকারের কাছে করেছিল—অদ্ভুত ঔদাসীন্যে সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে। এর ফলে শিক্ষকদের ক্ষোভ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই প্রথম নিয়মতান্ত্রিক ধাঁচের বদলে, প্রত্যক্ষভাবে 'সাধারণ ধর্মঘট' ডাকার দাবি জানায় প্রতিবাদী শিক্ষকবৃন্দের একাংশ। এই সভায় সভাপতি মেঘনাদ সাহা তাঁর অভিভাষণে বলেছিলেন, 'আমার মতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকেরা, সামান্য চাঁদা দিয়ে, আপনাদের সমিতিকে ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তিতে এগিয়ে আনুন। স্থানীয় আঞ্চলিক কমিটি তৈরি করে পিরামিডের আকারে একটা সত্তার সৃষ্টি করুন। এর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি প্রতিকারের বিকল্প পথ না পেলে জোর ও কৃত সংকল্প নিয়ে সাধারণ ধর্মঘট ডাকতে দ্বিধা করবে না।'[১]

ভাগ বিড়ম্বিত শিক্ষক সমাজের অন্তর্নিহিত মনের ইচ্ছাই যেন মেঘনাদ সাহার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। নিয়মতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দের আবেদন নিবেদন নীতির মাধ্যমে শিক্ষক সমাজের অবস্থার মূলগত পরিবর্তন ঘটবে না। বিকল্প হিসাবে সমিতিকে আন্দোলনমুখী হতে হবে, এই সংকল্প সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যে ক্রমশঃ সঞ্চালিত হচ্ছিল, এই সময় পর্বে । এরই প্রতিধ্বনি স্বরূপই যেন এই সম্মেলনে ড. সাহা তাঁর বক্তব্য রেখেছিলেন। আমরা সবাই জানি মেঘনাদ সাহা শুধুমাত্র শিক্ষক বা বিজ্ঞানী হিসাবে ল্যাবরেটরি/লাইব্রেরির অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বসে নিছক জ্ঞান চর্চায় সময় অতিবাহিত করেন নি। স্বাধীনতা পূর্ব যুগে এমনকি স্বাধীন ভারতেও তিনি বারে বারে শিক্ষক সহ, সাধারণ মানুষের সংগ্রামের শরিক হয়েছিলেন। শিক্ষক আন্দোলনও তার কূর্মবৃত্তি পরিত্যাগ করে, সংগ্রামশীল হয়ে উঠুক এই ছিল তাঁর একান্ত কামনা। তাঁর মতে, 'India is on the threshold of a great revolution....I can assure you that the condition that led to the war of American Independence have been present in modern India. The same colonial policy....was being followed in India right up to the present time'।[২] এই পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র বৃত্তিগত উন্নয়ন নয় আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অংশগ্রহণের আবেদন রেখে মেঘনাদ বলেছিলেন, 'The object of the All Bengal Teachers

Association is not only to point out the defects of the present system, agitate for the removal of the existing grievances like the enhancement of the teachers pay and prospects but also to lay down a broad basis, a philosophy of the secondary Education. The object of secondary education in every country is to prepare the juveniles for the dulies of the duties of citizenship....'[৩] বামপন্থী মতাদর্শের প্রতি আজীবন বিশ্বস্ত ড. সাহা এর পরে দেশের শিক্ষাঙ্গন কোন্ পথে চলবে, তার দিক নির্দেশ করে বলেছিলেন, 'In Pre-Revolution Russia (before 1918), the situation was very similar to ours. About 90 per cent of the people were peasants...Russian army which was composed of illiterate peasant was no match for any European powers, but when after the revolution the country was industrialized, its resources were many times multiplied and a large percentage of people become industrial workers'।[৪] মেঘনাদ সাহা বিশ্বাস করতেন যে, সোভিয়েতের পথেই ভারতের শিক্ষানীতিতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শুধুমাত্র '3R' বা রিডিং রাইটিং এবং (অ্যা) রেথমেটিক-এর তাত্ত্বিক শিক্ষা ভারতকে উন্নতির চরম শিখরে নিতে পারবে না। তখনো পরাধীন দেশ। তা সত্ত্বেও শিক্ষক সমিতির তৎকালীন রাজনীতি বিমুখ' নেতৃত্বকে তিনি একটি অন্যতর পথের সন্ধান দিয়েছিলেন—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের বিশ্বাস করতে ভালো লাগে যে মেঘনাদ বাবু, শিক্ষক আন্দোলনের যে তাত্ত্বিক রূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন, তাতেই পা মিলিয়ে স্বাধীনোত্তর ভারতে নতুন ও র‍্যাডিক্যাল শিক্ষক নেতৃত্ব আন্দোলনে নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন—সে অবশ্য কিছু পরের কথা।

১৯৪৬-এর সম্মেলন আরেকটি কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মেঘনাদ সাহার বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হয়েই যেন, কর্মসূচি নিরূপণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে একটি 'সংগ্রাম পরিষদ' গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল সমিতির পক্ষ থেকে। সরকার ও ম্যানেজিং কমিটিগুলির শোষণ ও শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির আশায় সমিতির তৎকালীন সম্পাদক মনোরঞ্জন সেনগুপ্তকে আহ্বায়ক করে বারো জন সদস্য নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হয়েছিল। পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (ঢাকা), সুরেশচন্দ্র চৌধুরী (পাবনা), শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (মেদিনীপুর), সিদ্দিক রহমান (চাঁদপুর), মনীন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ফেনী), কামিনীকুমার ঘোষ (কোলকাতা) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৫] সাধারণভাবে গত শতকের ৪৮ থেকে ৫৪ খ্রিস্টাব্দকে আমরা সমিতির সংগ্রামমুখীনতার সূচনা বলে মনে করি। এবং এক্ষেত্রে মূলতঃ সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবীর মতো সুযোগ্য নেতৃত্বের মুখেই পাদপ্রদীপের সবটুকু আলো এসে পড়ে। তাদের সংগ্রামমুখীনতাকে শ্রদ্ধা জানিয়েও আমরা বলতে পারি যে তাত্ত্বিকস্তরে মেঘনাদ সাহার বক্তব্যে প্রভাবিত হয়েই ৪৬-এর সত্যপ্রিয় পূর্ববর্তী নেতারাই ভবিষ্যৎ স্টাইক সম্বন্ধে শিক্ষক শিক্ষিকাদের মতামত জানবার তাগিদে স্টাইক ব্যালট ও বিদ্যালয়ে এই সংক্রান্ত 'প্রশ্নমালা' প্রেরণ করতে শুরু করেন। অবশ্য ৪৬-এর ভয়াবহ ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার কারণে তাঁরা এক্ষেত্রে খুব একটা সফল হতে পারেননি—সে অন্য প্রশ্ন।

স্বাধীনতা লাভ ঃ শিক্ষা ও শিক্ষক ঃ 'আমরা কারা? বাস্তুহারা'

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত একসাথে স্বাধীন ও বিভক্ত হল। স্বাধীনতার আনন্দোৎসব অনেকাংশে ম্লান হয়ে গেল দেশ বিভাগের ভয়াবহতার কাছে। শতশত মানুষকে পূর্ব বঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে হল। এই সমস্ত পরিযায়ী মানুষদের মধ্যে শিক্ষক সমাজেরও অনেকে ছিলেন। স্বল্প বেতন হলেও এই সমস্ত শিক্ষকরা পূর্ববঙ্গের সমাজে একটা সম্মানজনক অবস্থানে বিরাজ করতেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যখন তাঁরা আসলেন, তখন প্রকৃত অর্থেই তারা সর্বহারা। তবে পূর্ববঙ্গের মানুষদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তারা তাঁদের উত্তর-পুরুষদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারকে একটি মহৎ কর্তব্য মনে করতেন। এই দেশে এসে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের পেশাজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা কোলকাতার উপকণ্ঠে এবং অন্যান্য স্থানেও কলোনি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, তাদের মাথার উপর খড়ের চাল তৈরি করার পরেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। কলোনি থেকে কলোনিতে আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে থাকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এমনকি কলেজও। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর 'মার্জিনাল মেন' বা 'প্রান্তিক মানুষ' গ্রন্থটিতে সেই সময়কার উদ্বাস্তুদের এই শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'কলোনি গড়ে তোলার আগে তারা ছিল পুরোপুরি সর্বহারা। এখন অন্ততঃ এক টুকরো জমি ও একটা কুঁড়েঘর তাদের আয়ত্তাধীন। আর তারা ডুবে যাওয়া জাহাজের ভাসমান যাত্রী নয়। অবৈধভাবে হলেও এখন তারা পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে প্রোথিত।[৬] উদ্বাস্তুরা ইতিমধ্যে সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের (UCRC) সংগঠনের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ। শক্ত মাটিতে পা দিয়ে এবার কাজ শিক্ষা বিস্তারের। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দিকের জবর দখল উদ্বাস্তু কলোনির অন্যতম হল—দক্ষিণ কোলকাতার যাদবপুরের বিজয়গড় কলোনি। এই কলোনিতে কীভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটল তা জানার মধ্য দিয়ে আমরা শিক্ষা সম্বন্ধে উদ্বাস্তুদের মনোভঙ্গী কিছুটা হলেও বুঝতে পারব। বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন হবে তাতে।

বিজয়গড় কলোনির প্রথম স্কুল স্থাপিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার এক মিলিটারী ক্যাম্পে। উদ্বাস্তু শিশুদের পড়াশোনার জন্য ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে জনৈক সন্ধ্যা সেন ও গৌরী ঘোষ দস্তিদারের প্রচেষ্টায় এখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৪৯-এ উদবাস্তু নেতাদের চেষ্টায় ওখানেই একটি হাইস্কুল গড়ে ওঠে। বিদ্যালয়টি যাদবপুর বাস্তুহারা বাণীপিঠ নামে পরিচিত হয়। প্রাতঃকালীন বালিকাদের ও দিবাভাগে বালকরা এই স্কুলটিতে পাঠাভ্যাস করত। স্কুলটির উভয় বিভাগেরই প্রধান শিক্ষক ছিলেন বিশিষ্ট বাস্তুহারা শিক্ষক অমৃতলাল দাশগুপ্ত। স্কুলটির ম্যানেজিং কমিটির কর্তা ছিলেন প্রখ্যাত উদ্বাস্তু নেতা সন্তোষ কুমার দত্ত এবং নলিনীমোহন দাশগুপ্ত। প্রথম দিকে শিক্ষকদের বেতন দেবার ক্ষমতাও ছিল না কর্তৃপক্ষের। পরে অবশ্য খুব সামান্য বেতন থোকে দেওয়া হত। তার না ছিল বেতন স্কেল, না মহার্ঘভাতা না ইনক্রিমেন্ট। চাকরির কোনো নিরাপত্তাও ছিল না। অবশ্য মনে রাখতে হবে পূর্ববঙ্গাগত 'প্রাক্তন' শিক্ষকরাই এখানে মূলতঃ শিক্ষাদাতার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাদের কাছে শিক্ষকতা শুধু একটি বৃত্তি ছিল না—ছিল ব্রত বা মিশন। আসলে সেই সময় সহায় সম্বলহীন উদ্বাস্তুদের পক্ষে

দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা কোনো রকমে করা সম্ভব হলেও, সন্তান-সন্ততিদের পড়াশোনা করাবার ব্যয় নির্বাহের কোনো ক্ষমতা ছিল না—বিনা বেতনেই ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো ছাড়া তাই কোনো উপায় ছিল না কলোনির উদবাস্তু নেতাদের।[৭]

পরবর্তীকালে অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার চাপে পড়ে উদ্বাস্তু শিশু এবং বয়স্কদের জন্য শিক্ষা ও বিভিন্ন কারিগরি শিখনের ব্যবস্থা করার জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করে। প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণিতে পাঠরত দুঃস্থ ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হত। পুনর্বাসন মন্ত্রক বিভিন্ন কলোনিতে ৯টি নতুন মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ মঞ্জুর করে। বিভিন্ন স্কুলের সম্প্রসারণের জন্যও অর্থ মঞ্জুর করা হয় যাতে তারা অতিরিক্ত উদ্বাস্তু ছাত্র ভর্তি করতে পারে। ২৩৮টি মধ্য ও উচ্চবিদ্যালয়কে ১৯৫১-৫২ পর্যন্ত ২৫.১৭ লক্ষ টাকা অনুদান এবং ৩.৩৫ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে সাহায্য করা হয়েছিল।[৮]

বিজয়গড় বাস্তুহারা জবর দখল কলোনির প্রতিষ্ঠাতা সন্তোষ কুমার দত্তের কর্মপ্রচেষ্টায় ও সরকারি মহলে কিছু প্রভাব থাকার জন্য এই টাকার একটি অংশ উক্ত কলোনির স্কুলটিও পায়। তার ফলে স্কুলটি কিছুটা হলেও শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল। তবে তখনো অবধি শিক্ষকদের কাছে বেতন বৃদ্ধি বা চাকুরির নিরাপত্তা অধরাই থেকে গিয়েছিল। আর সব কলোনির কাহিনিও কমবেশি একরকমই ছিল। জীবন ও জীবিকার তাগিদে যেমন পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুরা UCRC নামক সংগঠনের ছত্রতলে একত্রিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি উদ্বাস্তু কলোনির বাস্তুহারা শিক্ষকেরাও নিজেদের জীবিকার উন্নয়ন ও সুস্থ শিক্ষা পরিবেশ গড়ে তোলবার লক্ষ্যে একটি প্রগতিশীল শিক্ষক সংগঠনের অনুসন্ধান করছিলেন। তাদের সেই প্রয়োজন মিটিয়েছিল তৎকালীন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি।

শুধুমাত্র কোলকাতার শহরতলীর উদ্বাস্তু অঞ্চলগুলি নয়—গ্রামাঞ্চলেও উদ্বাস্তু নেতাদেরও আমরা সমরূপ প্রচেষ্টার কথা জানতে পারি। সেখানেও নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করে স্থানীয় মানুষ ও উদ্বাস্তুদের সন্তানগণকে শিক্ষা দেওয়ার একটি চেষ্টা, স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বেই শুরু হয়েছিল। বিজয়গড়ের মতো এখানেও একটি উদাহরণ আমরা নিতেই পারি।

পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ব্লকের একটি অজগ্রাম ছিল বিদ্যানগর। চৈতন্যদেবের শিক্ষক বাসুদেব সার্বভৌম-এর এই গ্রাম। মধ্যযুগে সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষার একটি বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে বর্গীর আক্রমণ ও বর্ধমান জ্বরের প্রকোপে অঞ্চলটি জনহীন হয়ে পড়ে।[৯] পরে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পরে পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুরা বহুল সংখ্যায় এই অঞ্চলটিতে এসে বসবাস করতে থাকে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে পূর্ববঙ্গাগত 'বাঙাল'দের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—সেটা হচ্ছে খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানে জোগাড় করবার পরেই তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শিক্ষা প্রসারের কাজে রত হত। বিদ্যানগর অঞ্চলও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

বিদ্যানগরের 'বাঙাল' ও আঞ্চলিক অধিবাসীরা মিলে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এর পিছনে রসরাজ দেবনাথ বা অশ্বিনী

কবিরাজের মতো মান্যগণ্য উদ্বাস্তুরা নেতৃত্ব দেন। এক বছরের মধ্যেই বিদ্যালয়টি মিডিল ইংলিশ স্কুলে পরিণত হয়। এই সময়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে বিদ্যালয়ের হাল ধরেন পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তু শিক্ষাবিদ পরেশচন্দ্র গোস্বামী। তাঁরই একান্ত চেষ্টায় ১৯৫৩ তে স্কুলটি জুনিয়র হাই এবং ১৯৫৫ তে হাইস্কুলে পরিণত হয়। ৫০-এর দশকেই স্কুলটি 'মুলো-কলাটা ও একহাড়ি টাটকা গুড়ের কল্যাণে' শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন পায়। রিফিউজি রিহাবিলেশান দপ্তরের কল্যাণে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের টাকাও পাওয়া যায়। ক্রমে একটি বহুমুখী বিদ্যালয়ে পরিণত হয় স্কুলটি।[১০]

উদাহরণ হিসাবে শহর ও গ্রামের দুইটি উদ্বাস্তু অঞ্চলের যে ইতিহাস আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম তা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনির ক্ষেত্রেই কম বেশি সত্য।

যাইহোক মূল প্রশ্নে ফিরে আসি। সেটা হল এই সমস্ত উদ্বাস্তু অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকেরা খুব শীঘ্রই তাদের পেশাগত দাবি দাওয়া এবং বিদ্যালয়গুলির সামগ্রিক উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে তাদের আন্দোলনের মঞ্চ হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

বিদ্রোহ চরিদিকে

আমাদের আলোচ্য সময়টিতে সামগ্রিকভাবে বাংলার রাজনীতিতে এক উত্তাল সময় হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। সামগ্রিক ভাবে ভারতবর্ষ তো বটেই, বিশেষ করে বাংলায় তখন শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুবদের আন্দোলনে ছটফট করছে। ১৯৪৫ থেকে ৪৬-এর মধ্যে যে সমস্ত রক্তঝরা আন্দোলন চলেছে—তারই এক ঝলক নিম্নরূপ—গ্রামে মিলিটারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে একলক্ষ মানুষের প্রতিবাদ মিছিল, কলকাতার ব্রেথওয়েট স্টীলের শ্রমিকদের উপর গুলি চালনা করা হলে দুজন আন্দোলনরত শ্রমিক নিহত, ও কয়েকজন শ্রমিক আহত, কলকাতায় রশিদ আলি দিবসের মিছিলের উপর গোলাবর্ষণ, অবিভক্ত বঙ্গের নারায়ণ গঞ্জে ধর্মঘটকারী শ্রমিকদের উপর পুলিশি গুলিবর্ষণ—চারজন শ্রমিক নিহত, রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে কলকাতায় পনেরো হাজার ছাত্রের শোভাযাত্রা—আমরা এই তালিকা থেকেই বুঝতে পারি, বাংলা তখন সংগ্রাম আন্দোলনে উত্তাল। উত্তাল তার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা।[১১]

সেই সময়কার আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে ট্রাম শ্রমিকদের আন্দোলন ও ডাক তার শ্রমিক ধর্মঘট পৃথক ভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। ১৯৪৬-এর ২১ জুলাই ডাক ও তার কর্মীদের আন্দোলন শুরু হয়। চাকুরির নিরাপত্তা ও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে। ২৯ জুলাই ছাত্রযুব কৃষক শ্রমিক সবাই ডাক তার কর্মীদের এই আন্দোলনে সংহতি জানাতে পালন করেন সর্বাত্মক গণ হরতাল।[১২] এমনকি সাধারণ ভাবে সর্বদা ছাড় পাওয়া সংবাদপত্রকে ধর্মঘটের আওতার মধ্যে আনা হয়। তৎকালীন সমস্ত সংবাদপত্রে এই ধর্মঘটের বর্ণনা বিশদভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ৩১/০৭/৪৬ আনন্দবাজার পত্রিকার শিরোনাম, 'কলকাতার ইতিহাসে অভূতপূর্ব ব্যাপক হরতাল। গড়ের মাঠে লক্ষ লক্ষ নরনারীর বিরাট সমাবেশ।' বুদ্ধিজীবীরাও শামিল হয়েছিলেন জনতার এই কাতারে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতা লিখলেন, 'স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! ডাক তার ভাই/টেলিফোন বোন/ভয় নেই পাশে/আমরা। দুঃশাসনের পাঁজর খুলবে/গা থেকে খসা চামড়া'।[১৩] সমগ্র আন্দোলনে

নেতৃত্ব দেয় প্রভিন্সিয়াল পোস্টাল অ্যান্ড আর এম্ এস অ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম সার্কেল।[১৪] পাশাপাশি বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদের পতন, আজাদ হিন্দ ফৌজের শৌর্য কাহিনি, ছাত্রসংগ্রামের ঢেউ, নৌবিদ্রোহ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে সারা দেশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাও উত্তাল হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক এই সংগ্রামের সময়কালে বাংলার আইন সভায়ও সংগ্রাম আন্দোলনের ছাপ এসে পড়ে। '৪৬-এর নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি তার ইস্তাহারে লেখে, 'নতুন জীবন, সকলের জন্য খাদ্য/সকলের জন্য কাজ।' ওই নির্বাচনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষভুক্ত লোকদের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে বামপন্থীদের লড়াই চলে। মোট কুড়িটি আসনে প্রার্থী দিয়ে বামপন্থীরা জেতে তিনটি আসনে। রেলওয়ে শ্রমিক কেন্দ্র থেকে জ্যোতি বসু, দার্জিলিং কেন্দ্রে রতনলাল ব্রাহ্মণ এবং দিনাজপুর কেন্দ্রে রূপনারায়ণ রায়। নিরপেক্ষ ভাবে দেখলেও, এটা বলা যেতেই পারে, তখন কমিউনিস্ট পার্টিই কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে—তাই তাদের এই জয় আসলে চল্লিশদের দশকের সংগ্রামী মানুষের জয় বলেই আমরা মনে করতে পারি।[১৫]

সক্রিয় শিক্ষক সমিতি ঃ অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব

এই রকম পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই ৪০-এর দশকের মধ্যভাগের শিক্ষক আন্দোলনের গতি প্রকৃতি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আসলে বাইরের সংগ্রাম আন্দোলনমুখী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমিতি সদস্য শিক্ষকদেরও একটি গুণগত পরিবর্তন সেই সময়ে পরিলক্ষিত হয়েছিল। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সমিতি সভাপতি মেঘনাদ সাহার বক্তব্যেই সমিতিকে সংগ্রামমুখী করবার আহ্বান ছিল। এই মনোভাব পরিবর্তনের পরিষ্কার প্রভাব আমরা দেখতে পাই ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে। সেই সময়, এতদিনকার সংগ্রাম বিমুখ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একদল প্রগতিশীল ও বিক্ষুব্ধ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসেন। তখন জাতীয় জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। স্বাধীন দেশে কংগ্রেস তখন কেন্দ্রে ও রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় আসীন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে শিক্ষকদের আর্থিক দুরবস্থা নিবারণ বা কর্ম পরিবেশের উন্নতির দিকটায় তারা খুব একটা নজর প্রথম থেকেই দেননি।[১৬] বিদেশি শাসকদের ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির পরিবর্তনের জন্য কোনো সুস্পষ্ট দিশাও তারা দেখাতে কৃতকার্য হননি। সরকারের এই অবহেলা—শিক্ষকদের পুঞ্জিভূত ক্ষোভকে আরো বৃদ্ধি করেছিল। দেশভাগের আগে মুসলিম লিগ সরকার শিক্ষকদের জন্য মাসিক পাঁচ টাকা ও শিক্ষাকর্মীদের মাসিক তিন টাকা মহার্ঘভাতা প্রবর্তন করেছিল। শিক্ষকদের দাবি ছিল এই মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করে মাসিক দশ টাকা করতে হবে। স্বদেশি শাসকেরা কিন্তু ওই দাবিতে কর্ণপাত করবার কোনো প্রয়োজন বোধ করলেন না। স্বভাবতই সমিতির অভ্যন্তরে ওই দাবি আদায় ও সরকারি অবহেলার প্রতিবাদে আন্দোলনমুখী কর্মসূচির দাবি উঠেছিল। প্রগতিবাদী কিছু শিক্ষক সেই সময় এই চেতনাকে ছড়িয়ে দেবার কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। হীরেন্দ্রনাথ রায়, সুধারায়, শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ ভট্টাচার্য, মীরা চট্টোপাধ্যায়, অনিলা দেবী, অজিত দাস প্রভৃতি শিক্ষকরা ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন

বামপন্থী দলের সদস্য সমর্থক ছিলেন। তারা শিক্ষক সমিতিতে একটি প্রগতিশীল গ্রুপ রূপে কাজ করতে থাকলেন। এদের নেতৃত্বে উঠে আসলেন পূর্ববঙ্গাগত, কোলকাতার কালিধন ইনস্‌টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক সত্যপ্রিয় রায়।[১৭]

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়া ব্যর্থ হলে, সাধারণ শিক্ষকেরা এর প্রতিবাদে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করবার জন্য সমিতির উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকলেন। আমরা আগেই বলেছি, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য একটি 'সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। তৎকালীন সমিতির সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত আহ্বায়ক ছিলেন এই পরিষদের। ১২ জন সদস্যর এই কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, জিতেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র চৌধুরী, শচীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, সিদ্দিক রাহমান, মনীন্দ্রচন্দ্র মুখার্জী, কামিনী কুমার ঘোষ ইত্যাদি সেই সময়কার লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষক নেতৃবৃন্দ। ১৯৪৬-এর শেষেই সমিতির ওয়ার্কিং কমিটি আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির রূপরেখা অঙ্কনের জন্য বৈঠকে বসল। সরকারি নিস্পৃহতার প্রতিবাদে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত হল। তবে তা শিক্ষকদের 'স্ট্রাইক ব্যালটের' মধ্য দিয়ে স্থিরিকৃত করার একটি প্রস্তাবও পুরনো নেতৃত্ব দিল। বহু সভার পর সমিতি সংগ্রাম সম্বন্ধে শিক্ষকদের মনোভাব যাচাই করার জন্য স্কুলে আন্দোলন সংক্রান্ত প্রশ্নমালা প্রেরণ করতে শুরু করল। তবে সেই সময় দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হবার ফলে এই কর্মসূচি সাফল্যের মুখ দেখতে অপারগ হল। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক সমিতির পুরনো নেতৃত্ব প্রত্যক্ষ আন্দোলন সম্বন্ধে উদাসীন মনোভাব দেখাতে শুরু করলেন। পূর্বোল্লিখিত 'সংগ্রাম পরিষদ' ধর্মঘটের ব্যাপারে শিক্ষকদের খুব একটা সাড়া নেই—এই মন্তব্য করে আন্দোলনমুখী শিক্ষকদের দাবিয়ে দিতে সচেষ্ট হল।[১৮]

এতদ্ সত্ত্বেও ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের প্রাদেশিক সম্মেলনে নির্দিষ্ট বেতনক্রমের প্রস্তাব নিয়ে ও মহার্ঘভাতার দাবিতে সংগ্রামী অংশের শিক্ষকেরা সোচ্চার হলেন। ইতিমধ্যে ভারতের অন্যত্র যথা বিহারে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ শিক্ষকদের আন্দোলন ছাড়াও বোম্বাই, মাদ্রাজ, পঞ্জাব ও ওড়িশায় শিক্ষক আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল। সেই সময় দিল্লীর ৩৫৫টি স্কুলের পাঁচ হাজার শিক্ষক ধর্মঘট করেছিলেন। এই সব ঘটনার প্রভাব বর্ধমান সম্মেলনে পড়ে। তাই সমিতির আপোসকামী নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করে সম্মেলনে স্থিরিকৃত হয় যে বাড়তি বেতনের দাবিতে ১৯৪৭-এরই ১৫ এবং ১৬ জুলাই বাংলা জুড়ে ধর্মঘট হবে, এবং এতদসত্ত্বেও সরকার দাবি না মেনে নিলে, ওই বছরেরই ৩ ডিসেম্বর থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট করা হবে।

সংগ্রামী অংশের শিক্ষকেরা সরাসরি সরকারি মনোভাবের নিন্দা করলেও, আপোসকামী সমিতি নেতৃত্ব এই আন্দোলনকে সরকার বিরোধী নয়—বরঞ্চ স্কুল কমিটিগুলির বিরুদ্ধেই এই আন্দোলন—এরকমটা প্রচার করতে থাকেন। এদিকে ৪৭-এর মে মাস থেকেই দেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ শুরু হয়ে গেল। প্রস্তাবিত ধর্মঘটের আগেই ব্রিটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা বিলে স্বাক্ষর দিলেন।[১৯] তখনো পর্যন্ত দেশভাগের পরে দুই ভিন দেশের সীমানা নির্ধারণ নিয়ে একটা অস্বচ্ছতা ছিল। পূর্ব বাংলার সমিতি তখনও পশ্চিম বাংলার সমিতি থেকে পৃথক

হয়নি। এমনকি সমিতি এই অবস্থায়ও পরবর্তী সম্মেলন পূর্ববঙ্গের মৈমনসিং-এ হতে পারে কিনা তা নিয়েও চিন্তাভাবনা করছিল।

যাইহোক ইতিমধ্যে দেশভাগ হবার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা অজুহাত দেখিয়েই পুরনো নেতৃত্ব ১৯৪৮-এর বার্ষিক অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন প্রফুল্ল ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেছেন। নতুন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের নির্বাচনে সমিতি কিছুটা আনন্দিত হয়েছিল। কারণ বিধানবাবু এক সময় সমিতির প্রতিনিধি হয়ে আইনসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। আমরা দেখতে পাই পরবর্তীকালে এই আশা খুব একটা ফলবতী হয়নি। যাক সে পরের কথা। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ১৯৪৬-এর পর থেকে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শিক্ষক আন্দোলনে সংগ্রামশীল অংশের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তৎকালীন সমিতি সম্পাদক মনোরঞ্জন সেনগুপ্তও এই পরিবর্তমান মনোভাব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। একটি 'প্রেসার গ্রুপ' বা চাপ সৃষ্টিকারী সংস্থা হিসাবে সমিতিকে আরো সংগ্রামশীল করার ক্ষেত্রে বাধাদান করে কোনো কার্য সিদ্ধি হবে না—এটা পুরনো নেতৃত্বের মধ্যে বলা যায় একমাত্র মনোরঞ্জন বাবুই উপলব্ধি করেছিলেন। সমিতির একদম জন্মকালীন নেতা হিসাবে সমিতির মধ্যে যাতে ঐক্য বজায় থাকে সে দিকেও তার নজর ছিল।[২০]

অরুণ চৌধুরীর এক লেখায় সে সময়কার সমিতির অভ্যন্তরীণ টানা পোড়েনের একটি চিত্র প্রকাশিত হয়। তিনি বলছেন, 'স্বাধীনতার পরেও শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রাপ্য বাড়লো না। সমিতির দাবি মহার্ঘ ভাতা মাসিক দশ টাকা করার। কিন্তু ঐ দাবিতে স্বদেশি শাসকেরা কান দিলেন না। তাই সমিতির অভ্যন্তরে ঐ দাবি আদায় ও সরকারি অবহেলার প্রতিবাদ জানাবার জন্য কর্মসূচি নেবার দাবি উঠল। সমিতির জীবনে এখান থেকেই সংগ্রামমুখীনতার সূচনা হল। শিক্ষক সমাজের একটা অংশ সমিতির মধ্যে চেতনা সঞ্চারের জন্য উদ্যোগী হলেন। কিছু রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন শিক্ষকেরা এগিয়ে এলেন।'[২১] অরুণ বাবু, সত্যপ্রিয় রায়, হীরেন্দ্রনাথ রায়, শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধা রায়, অনিলা দেবী প্রমুখদের নাম করেছেন এই প্রসঙ্গে। প্রসঙ্গত সমিতির উপরিউক্ত নেতাদের প্রত্যেকেরই একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল। এরা প্রায় সকলেই ছিলেন পূর্ববঙ্গাগত বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী নেতা। সবাই হয়তো নির্দিষ্ট কোনো পার্টির সদস্য ছিলেন না। তবে কংগ্রেস সরকার যে আন্দোলন সংগ্রাম না করলে শিক্ষকদের কোনো রকম আর্থিক উন্নয়ন ঘটাবেন না, সেই বিষয়ে এরা নিঃসন্দেহ ছিলেন। অন্যান্য গণসংগঠনের মতো সমিতিতে তখনো অবশ্য কোনো রাজনৈতিক দলের একাধিপত্য ছিল না। তবে এই রাজনৈতিক চেতনাই শিক্ষক সমিতির মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এই সময় থেকেই বামপন্থী দলগুলির একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী যুগের শিক্ষক আন্দোলনের পোড় খাওয়া নেত্রী ও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য অনিলা দেবীর স্মৃতিচারণ-এর বক্তব্য উদ্বৃত করতেই হয়। সেই সময় পোড়খাওয়া এই নেত্রী তখন কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম সংগঠন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির দায়িত্বে ছিলেন। তারই কথায়, '১৯৪৮ সাল, বোধহয় জুলাই এর শেষদিক। মহিলা সমিতির কাজে কালীধন স্কুলের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে ডাক

এল। দেখলাম পরিচিত অনেকে আছেন, আলোচনা চলছে। ভারত সভা হলে আসন্ন শিক্ষক কনভেনশনের প্রস্তুতি নিয়ে।...তারপর এল ১ সেপ্টেম্বর, একদিনের প্রতীক ধর্মঘট। এবিটিএ সংগঠনে নতুন জোয়ার এল। আন্দোলনমুখী কর্মসূচির জন্য উদ্বেল হয়ে উঠল শিক্ষক সমাজ। যোগ্য নেতৃত্বেরও অনুসন্ধান শুরু হল। বাঁক এল সংগঠনে....।'[২২]

এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শিক্ষক আন্দোলনের পূর্বাভাষ পেয়ে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন কাঠামো পুনঃগঠনের একটি প্রস্তাব দিলেন। ঠিক হল অবস্নাতক শিক্ষকরা পাবেন মাসিক ৫০-৮০ টাকা, স্নাতকরা ৬০-১০০ টাকা এবং শিক্ষণপ্রাপ্ত স্নাতক শিক্ষকেরা ৭৫-১০০ টাকা। এছাড়া একজন স্নাতকোত্তর তার চাকুরি জীবনের সূচনায় পাবেন ৯০ টাকা। এই অতিরিক্ত খরচের জন্য ছাত্র বেতন বৃদ্ধিরও এক প্রস্তাব দিলেন সরকার। গ্রাম, মফঃস্বল শহর, কোলকাতার ছাত্রদের তিন রকম ছাত্র বেতন বর্ধিত হারে আদায় করবার কথা বলা হল। স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষকেরা সরকারের এই মুষ্ঠিভিক্ষা গ্রহণে রাজী বলেন না—ছাত্র বেতন বৃদ্ধিরও তীব্র প্রতিবাদ করলেন তাঁরা। নিজেদের ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ১৯৪৮-এর ২২ আগস্ট ভারতসভাগৃহে ৮০০ জন শিক্ষক একটি কনভেনশনে মিলিত হলেন। কনভেনশনে পৌরোহিত্য করেছিলেন চেতলা বয়েজ হাই স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তখন শিক্ষক সমিতির কোলকাতা জেলার বড় নেতা।[২৩]

সমিতির কনভেনশনে ঝড় উঠল। বলা হল মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য তৎকালীন সরকার মাত্র ১৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন যা মোট বাজেটের মাত্র ৬%। প্রতিক্রিয়াশীল হলেও, এর আগে মুসলিম লিগ সরকারের সময় এই খাতে ব্যয়বরাদ্দ ছিল ১১%। এদিকে স্বাধীনতা লাভের পরে, মধ্যপ্রদেশ সরকার ১৩% এবং অবিভক্ত মহারাষ্ট্র সরকার ১৫% শিক্ষা খাতে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধির দাবি করা হল। দাবি উঠল মোট বাজেট বরাদ্দের ২০% শিক্ষা খাতে ব্যয় করার জন্য।[২৪] সরকারের প্রস্তাবিত বেতন কাঠামোরও তীব্র বিরোধিতা করা হল কনভেনশনে। বিশেষ করে অবস্নাতক শিক্ষকদের জন্য যে অত্যল্প হারে বেতনহার ধার্য করার প্রস্তাব সরকার দিয়েছিল তারও প্রতিবাদ করা হল তীব্রভাবে।

কনভেনশনে আলোচ্য বিষয় নিয়ে দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করলেন নতুন প্রজন্মের শিক্ষক নেতা সত্যপ্রিয় রায়। মৈমনসিং-এর এক মধ্যবিত্ত পরিবারের এই সন্তান, অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও শিক্ষক-শিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ সরকারি পদের জন্য নির্বাচিত হয়েও, শিক্ষকতাকেই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে পূর্ববঙ্গের মৃত্যুঞ্জয় উচ্চ ইংবেজি বিদ্যালয়, জাফরগঞ্জ স্কুল এবং চট্টগ্রামের কানুনগো পাড়া স্কুলে কাজ করবার পর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কালিধন ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মরত হন। এবং এখানে কর্মরত অবস্থাতেই নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কোলকাতা জেলার নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হন।[২৫]

সেদিনের সম্মেলনে সত্যপ্রিয় রায়ের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে পরবর্তীকালে সমিতির অন্যতম নেতা অমিতাভ সেন বলেছিলেন, 'সমিতির নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা সত্ত্বেও,

সমিতির কলকাতা জেলা শাখার সম্পাদক সত্যপ্রিয় রায়ের উদ্যোগে শিক্ষকদের মহার্ঘভাতা দশ টাকা এবং পাঁচ টাকা স্নাতক ও অবস্নাতক শ্রেণির জন্য (যা আগে ছিল যথাক্রমে পাঁচ টাকা ও তিন টাকা) করার দাবিতে ১৯৪৮ সালে ভারত সভা হলে অনুষ্ঠিত শিক্ষকদের কনভেনশনে, ওই বছরের ১ সেপ্টেম্বর এক দিনের কর্মবিরতি পালনের সিদ্ধান্ত সমিতির চিন্তা চেতনায় নতুন দিক নির্দেশ করলো।'[২৬]

যাইহোক, অনেক আলোচনার পর ঠিক হল, শিক্ষকেরা ট্রেড ইউনিয়নের মতো 'ধর্মঘট' করবেন না—করবেন সিজ ওয়ার্ক বা কর্মবিরতি। শিক্ষক সমিতির বিশিষ্ট নেত্রী সুধা রায় যিনি তৎকালীন লেবার পার্টির কর্মী ছিলেন, সম্মেলনে মূল প্রস্তাব পেশ করলেন। প্রস্তাবে বলা হল, (১) গ্র্যাজুয়েট ও আন্ডার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকদের বেতন নিতান্ত কম এবং জীবন ধারনের উপযুক্ত নয়।.... কনভেনশন আশা করে, সরকার নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে বেতনক্রম সংশোধন করবেন। (২) সরকার শিক্ষা খাতে স্বল্প ব্যয় করে দেশের অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের কাজের সঙ্গে বৈপরীত্য করছে। শিক্ষাখাতে অধিক অর্থ ব্যয় করতে হবে। (৩) প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে যে বেতন বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সরকারকে সেটি প্রত্যাহার করে নিতে হবে। (৪) সরকার মহার্ঘ ভাতা হিসাবে শিক্ষকদের ৫ টাকা ও অশিক্ষকদের ৩ টাকা বরাদ্দ করেছেন...এই ভাতা বাড়ানো হোক। (৫) দাবি দাওয়া আদায়ের সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কলকাতার ৪ জন এবং প্রতি জেলা থেকে ২ জন প্রতিনিধি নিয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হবে। (৬) সরকার এই দাবিগুলি সত্বর মান্য না করলে আগামী ১ সেপ্টেম্বর কর্মবিরতি হবে।'[২৭]

প্রস্তাবটিকে যারা সমর্থন করলেন তাঁদের মধ্যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা এবং কালীঘাট ওরিয়েন্টাল একাডেমির শিক্ষক হীরেন্দ্রনাথ রায়। কমিউনিস্ট নেত্রী অনিলা দেবীও দ্বর্থহীন কণ্ঠে সমর্থন করলেন প্রস্তাবটিকে। আরেকজন শিক্ষিকা মীরা সেন, তিনিও কমিউনিস্ট ছিলেন, প্রস্তাবের পক্ষে দাঁড়ালেন। সভার সভাপতি শৈলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপরোক্ত প্রস্তাবগুলোকে শিক্ষকদের সংগ্রামশীল মনোভাবের প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর মতে উক্ত প্রতিবাদসভা বা কর্মবিরতির ডাক কখনোই সরকারকে বিব্রত করার লক্ষ্যে চালিত নয়। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির অসহায় ও অবহেলিত শিক্ষকদের সমস্যা সাধারণ জনতা ও কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরাই এই আন্দোলনের লক্ষ্য। কর্মবিরতির বিরুদ্ধে সরকারি অগ্রিম শাসানির ও সমালোচনা করে তিনি বলেন যে সরকার একগুঁয়ে মনোভাব পরিত্যাগ করুন এবং শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানে আন্তরিক ভাবে যত্নবান হোন। শিক্ষকদের শাস্তি নয়—তাদের ক্ষোভের কারণগুলি খুঁজে বার করাই স্বদেশি সরকারের আশু কর্তব্য বলেও মত প্রকাশ করেন তিনি।

এবার আমরা বাংলার সমসাময়িক আর্থ-রাজনৈতিক পটভূমিকায় কীভাবে এই কর্মবিরতি (১৯৪৮) করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল তা নিয়ে আলোচনা করব। আমরা জানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুঃস্বপ্ন অপসারিত হবার পর পরই ১৯৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় চোরাকারবারি ও মজুতদারি

প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। চালের দাম বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল মণ প্রতি আটাশ টাকা। লঙ্গরখানার দ্বারে দ্বারে তখন দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের হাহাকার। এর পাশাপাশি চলছে বন্দী মুক্তির আন্দোলন। 'রশিদ আলি দিবসে' সারা বাংলায় আন্দোলন সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে—সমাজতন্ত্রী সোভিয়েতের বিশ্বযুদ্ধে বিজয়, দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণির আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করেছে—আমাদের দেশ, আমাদের বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়। মহার্ঘভাতার দাবিতে সরব হয়েছে বাংলার আড়াই লক্ষ চটকল শ্রমিক। সুতাকলে, রেল, ট্রাম, বাস, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প শ্রমিকেরা লড়ছে নিজস্ব রুটি রুজির লড়াই। সুকোমল সেনের লেখায় আমরা পাই, ''১৯৪৫-৪৬ সালের গণ অভ্যুত্থানের ঘটনাবলী ভারতের নতুন শক্তি সমাবেশকে সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরল। সাম্প্রদায়িক বিভেদকে অগ্রাহ্য করে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণির ঐক্য ও রাজনৈতিক গণসংগ্রামে অংশগ্রহণের প্রেরণা, জনগণের অন্যান্য সংগ্রামী অংশের মধ্যে আপসহীন সংগ্রামী দৃঢ়তা....(সৃষ্টি করল).... (যখন) বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে তখন কংগ্রেস....হরতাল ও বিদ্রোহের প্রকাশ্য নিন্দা ও বিরোধিতায় অগ্রসর হলো।[২৮] আমরা লক্ষ না করে পারি না—ওই সময়কালের শেষদিকে সংগঠিত শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রতি কংগ্রেসি সরকার অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ ঘটিয়েছিল। একই সময় গ্রামবাংলা জুড়ে শুরু হয়েছিল কৃষকদের আন্দোলন। হাটতোলা, তোলা গন্ডি দিয়ে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ৪৬-এ তা ফেটে পড়েছিল তেভাগা আন্দোলনে। আন্দোলন হল অল্পবিস্তর পরিমাণে ১৫টি জেলায়। (কৃষক) সমিতি প্রায় ৬০ লক্ষ কৃষককে সংগঠিত করেছিল এই আন্দোলনে। একই সঙ্গে বিদেশি শাসক ও তাদের সহযোগী সামন্তবাদী জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে এই আন্দোলন প্রবাহিত হয়েছিল।[২৯]

গ্রাম বাংলায় অনেক শিক্ষকই তখন প্রান্তিক ভূমির মালিক ছিলেন। কৃষকদের এই আন্দোলন তাদেরও চেতনার মূল ধরে নাড়া দিয়েছিল। পরবর্তীকালে শিক্ষক আন্দোলনে যে চরমপন্থার প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল তার পিছনে গত শতাব্দীর ৪০-এর দশকের কৃষক শ্রমিক আন্দোলনের একটি পরোক্ষ প্রভাব ছিল। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে চল্লিশের দশকের মধ্যভাগের ও শেষার্ধের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিস্থিতির কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। তখন সর্বত্র চলছে এই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা—কিন্তু শ্রমিক কৃষক ছাত্র আন্দোলনের মতো শিক্ষক আন্দোলনেও তার প্রভাব পড়েনি বললেই চলে। সর্বদলীয় শান্তি সেনা, যাতে বামপন্থীরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তারাও যথা সম্ভব সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এই সময়।[৩০]

শিক্ষকরা এই সামগ্রিক পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের আন্দোলনকে পরিচালিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। শিক্ষক সমিতির রক্ষণশীল নেতৃত্ব যতই এই আন্দোলনকে 'সরকার বিরোধী নয়' বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করুন না কেন, সাধারণ সংগ্রামী শিক্ষকেরা মনে করেছিলেন, যে কংগ্রেস শিক্ষাকে জাতীয় রূপ দেবার নীতি গ্রহণ করেছিল, শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন অঙ্গীকার করেছিল, উপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামোর বদলে জাতীয় কাঠামো, জাতীয়তাবোধ সমৃদ্ধ পাঠ্য বিষয় পাঠ্যসূচির অঙ্গীকার করেছিল—স্বাধীন দেশের ক্ষমতায় এসেই

কিন্তু তাদের এই প্রতিশ্রুতির কথা বাংলার কংগ্রেস সরকার ভুলে গিয়েছিল। শিক্ষা জগতের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পেশাগত উন্নয়নের দিকেও তারা নজর দেয়নি। বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষাকর্মীরা এই সব ভাবনা থেকেই ১ সেপ্টেম্বর এর ধর্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করতে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে সত্যপ্রিয় রায়, সুধা রায়, হীরেন্দ্র নাথ রায়ের মতো সংগ্রামশীল নেতৃবৃন্দকে সমিতির পুরনো নেতৃত্ব খালি বাধাদান করতে শুরু করেছিল। ৪৮-এর ২৯ আগস্ট দুই পক্ষের বিবাদ মোচনের জন্য এক বৈঠক ডাকা হল—সমস্যার সমাধান হল না তাতে। বাধ্য হয়ে সংগ্রামশীল অংশের নেতারা সমিতির মধ্যেই 'Democratic front' নামে একটি মঞ্চ গড়ে আন্দোলনকে সুসংবদ্ধ করার প্রয়াস নিলেন। সেদিনের সেই ঝোড়ো দিনগুলির স্মৃতিচারণ করে শিক্ষক আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী লিখেছেন 'তখন পরিস্থিতিটা ছিল এইরকম ঃ ইংরেজ সরকার চলে গেছে কিন্তু তার রেশ বর্তমান। কংগ্রেসি সরকারও পুরানো পথেই চলছে। শিক্ষকেরা পথে নেমে মজুরদের মতো ধর্মঘট করবে, এ ছিল অকল্পনীয়। কিন্তু আমরাও ঠিক করেছিলাম, ধর্মঘট সফল করবোই। আমাদের মাত্র ৫ টাকা ডি এ বৃদ্ধির দাবি আদায় করবোই। সেই অনুসারে আমাদের সংগঠনকে গড়ে তোলা হল। দলবদ্ধ ভাবে প্রতিটি বিদ্যালয়ে গিয়ে প্রচার করা শুরু হলো। প্রথমে কোলকাতায় পরে তার বাইরে গিয়ে প্রচার চালানো হলো। সমিতির তখন পয়সাকড়ি ছিল না। নিজেদের খরচে সব করতে হয়েছে। পায়ে হেঁটে, বাসে কিংবা রেলের তৃতীয় শ্রেণির কামরায় চড়ে কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছে।[৩১]

সেদিনকার কমিউনিস্ট পার্টি তখন কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, উদ্বাস্তু—সকল রকম গণ আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করছে। শুধুমাত্র দলগত শক্তি বৃদ্ধির তাগিদে তাঁরা এরকমটা করেছিল—সেটা বললে সত্যের অপলাপ হয়। আসলে বিভিন্ন প্রেসার গ্রুপকে সংগঠিত করে, গণফ্রন্টের আকার দিয়ে অবহেলিত শোষিত মানুষের আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর নীতিই সেদিন তারা নিয়েছিল—এর ফল হিসাবে তাদের পার্থিব শক্তি বৃদ্ধি হবে—এই আশাও তারা করেছিল। এইটুকু বলা যেতে পারে। স্বভাবতঃই কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ করে মহিলা ও ছাত্রফ্রন্ট শিক্ষকদের এই আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সহায়তা করতে এগিয়ে এল। বিদ্যালয়ে পিকেটিং করবার কর্মসূচীতে বড় সহায় হলেন ছাত্ররা।[৩২] এল ১ সেপ্টেম্বর। ঘোড়সওয়ার পুলিশ নামিয়েও সরকার ধর্মঘট রোধ করতে পারল না। স্টেটসম্যানের মতো সরকারপন্থী কাগজেও লিখতে বাধ্য হল, 'মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা গতকাল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রস্তাবিত বেতনক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ এক প্রতীক ধর্মঘট করেন।[৩৩]

নামে কর্মবিরতি হলেও ১ সেপ্টেম্বর শ্রমিক সংগঠনের ধাঁচেই আন্দোলনটি করেছিলেন শিক্ষকেরা। মিটিং মিছিল, পিকেটিং সবই ছিল এই আন্দোলনের অঙ্গ। এই প্রসঙ্গে অমিতাভ সেনের স্মৃতিচারণায় এক কৌতুক উদ্দীপক অথচ একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা জানতে পারি। তিনি লিখছেন ''১৯৪৮ সালের একদিনের কর্মবিরতির প্রস্তুতি পর্বে এক শিক্ষক সভায়

অনিলাদি (অনিলা দেবী) বলেছিলেন—প্রচারের জন্য আমরা পোস্টার দিতে পারি।' সত্যপ্রিয় রায় বলেছিলেন 'পোস্টার তো মজুরেরা দেয়।' উত্তরে অনিলাদি বলেছিলেন ধর্মঘট তো মজুরেরাই করে, যে নামেই ডাকুন কর্মবিরতি ধর্মঘটই।[৩৪] শেষ পর্যন্ত সত্যপ্রিয় রায় পোস্টার দিতে রাজী হয়েছিলেন। তবে প্রকাশ্যে নয়, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিশ্রাম কক্ষে। আসলে প্রাচীন রক্ষণশীল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সত্যপ্রিয় রায় প্রগতিপন্থীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঠিকই—কিন্তু তাকে আমরা সেই সময়ের নিরিখে উদারপন্থী গণতান্ত্রিক মতধারারই প্রবক্তা বলতে পারি। আন্দোলনকে ট্রেড ইউনিয়নের ধাঁচে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল—অন্য দিকে অনিলা দেবী ছিলেন কট্টর কমিউনিস্ট। জঙ্গি আন্দোলনের সমর্থক। পোস্টার দেওয়া নিয়ে মতভেদের মধ্য দিয়েই তাদের দুজনের এই মানসিক পার্থক্যটা পরিস্ফুট হয়েছিল। পরবর্তীকালের ঘটনা প্রবাহে আমরা দেখব অনিলা দেবী নয়, সত্যপ্রিয় রায়ই তার পূর্বতন মনোভঙ্গী অনেকটাই পরিবর্তন করেন। ক্রমশ বামপন্থী মতাদর্শের দিকে সরে আসেন—তাতে সংগঠন হিসাবে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি, শিক্ষকদের মুক্ত মঞ্চ হিসাবে তার অস্তিত্ব হারিয়েছিল ঠিকই—কিন্তু দাবি আদায়ের এক জবরদস্ত সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। এর ভালো মন্দ ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

সফল ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে, প্রগতিশীল শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ মঞ্চ 'ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ৪৮-এর ১ সেপ্টেম্বরের সফল ধর্মঘটের পর, চেতলা স্কুলে এই ডেমোক্রেটিক টিচার্স ফ্রন্টের এক সভা হয়। সেখানে আনুষ্ঠানিক ভাবে 'ফ্রন্ট' পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হল। কমিটির সভাপতি হন শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক নির্বাচিত হন হীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় আর যুগ্ম সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেন মীরা চট্টোপাধ্যায় ও সত্যপ্রিয় রায়। পরবর্তীকালে ১৯৪৯ থেকে অবশ্য সত্যপ্রিয় রায়ই ফ্রন্টের সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব সামলান। সরাসরি কমিটির পদাধিকারী না হলেও, ফ্রন্টের নীতি ও কর্মসূচী নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন, সাম্যবাদী শিক্ষক নেত্রী অনিলা দেবী। সত্যপ্রিয় বাবুর কালিধন ইনস্টিটিউশনেই এই ফ্রন্টের কার্যালয় স্থাপিত হয়। গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের একটি মুখপত্রও সেই সময় প্রকাশিত হতে শুরু করে। নাম 'শিক্ষা ও শিক্ষক'। পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়ভার গ্রহণ করেন ভূজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য। এটা ঠিকই ৪৮-এর একদিনের ধর্মঘটে অবশ্য শিক্ষকদের দাবি দাওয়া সরকার প্রায় কিছুই মানেননি। তবু শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ মারকুটে মূর্তি কংগ্রেস সরকারকে ভীত করে তুলেছিল এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এদিকে ১৯৪৮ তে কমিউনিস্ট পার্টির 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' নীতির প্রতিক্রিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি বলে সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করল।[৩৫] সেই বছরেই তৎকালীন বিধান রায় সরকার ঔপনিবেশিক ইংরেজ আমলে সৃষ্ট বিনা বিচারে আটক আইনে কিছু অদল বদল করে, বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল' অ্যামেন্ডমেন্ট বা P.D. Act প্রণয়ন করে এবং এই আইনের বলে, অন্যান্য কমিউনিস্টদের সঙ্গে শিক্ষক আন্দোলনের নেত্রী অনিলা দেবীকে কারারুদ্ধ করা হয়। অন্নদাশংকর রায়ের ছড়ায় বলা 'যেখানে যত অনাসৃষ্টি/কে দায়ী?/কমিউনিষ্টি', তখন সরকারের একমাত্র উচ্চার্য। সরকারের কাছে তখন শিক্ষক আন্দোলনের পিছনে কমিউনিস্টদের

মদৎ দেওয়ার নীল নক্সাটি উন্মোচিত। অনিলা দেবীকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে সরকার সমস্ত শিক্ষক সমাজকে একটি শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন সময়টাই আলাদা—শিক্ষকদের শত বছরের ঘুম তখন ভেঙে গিয়েছে। এই শিক্ষক আন্দোলনের জলতরঙ্গ তখন রুদ্ধ করা কংগ্রেস সরকারের কাছে অসম্ভব ছিল। যাইহোক অনিলা দেবীর এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে সমস্ত শিক্ষক সমাজ গর্জে উঠেছিল।

অনিলা দেবী শুধুমাত্র একজন সংগ্রামী শিক্ষক নেতা ছিলেন না—ছিলেন সাম্যবাদের এক লড়াকু সৈনিক। শুধুমাত্র শিক্ষক আন্দোলনে নয় ১৯৪৮ খিস্টাব্দে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়ের গৃহের উদ্দেশ্যে যে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেছিল তাতেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ওই মিছিলের উপর পুলিশ গুলি বর্ষণ করলে ৩ জন নারী নেত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্বভাবতঃই অনিলা দেবীর মতে বিপদজনক বিপ্লবীকে সরকার জেলে পাঠান। লড়াকু শিক্ষক নেত্রী অনিলা দেবী অবশ্য কারাগারেও চুপ করে বসে থাকার মানুষ ছিলেন না। বন্দীদশায়ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য এবং যোগ্য সম্মান দেবার দাবিতে অন্যান্য বামপন্থী সাথীদের সঙ্গে তিনিও বাহান্ন দিন অনশন ধর্মঘট করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে কারামুক্ত করতে সরকার বাধ্য হয়।

ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র গান্ধীজীর আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন 'সংগ্রাম-সমঝোতা-সংগ্রাম' এইভাবেই পরাধীন ভারতবর্ষে আন্দোলন চলত।[৩৬] আমাদের রাজ্যের শিক্ষক আন্দোলনও অনেকটাই সেই পথেরই পথিক হয়েছিল। সত্যপ্রিয় রায় বলতেন, আন্দোলন ও সংগ্রাম পর্বত অভিযানের মতো। কিছু ঊর্ধ্বে উঠে আরো উপরে উঠবার বেসক্যাম্পের বা সাময়িক যুদ্ধ বিরতির প্রয়োজন আছে।[৩৭]

তাই ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষক আন্দোলনের তরঙ্গকে আরো উত্তাল করার মানসে, নিজেদের সাংগঠনিক ভাবে মজবুত করার চেষ্টা করেন সত্যপ্রিয় বাবুর মতো সংগ্রামী শিক্ষক নেতারা। ইতোমধ্যে ৪৮-এর ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করবার 'অপরাধে' অনেক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকেই কর্মচ্যুত করা হয়। এঁদের মধ্যে শিক্ষক নেতা সন্তোষ ভট্টাচার্য ও অজিত দাসও ছিলেন। এদের কাজে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবিতে ও সমিতির সংগ্রামী অংশটি আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে থাকে।

৫০-এর দশক ঃ সংগ্রামশীল শিক্ষক আন্দোলন—প্রাচীন ও নব্য নেতাদের দ্বন্দ্ব, ক্রমবর্ধমান

ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে ১৯৪৯-এর মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত সমিতির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশ ভাগজনিত কারণে শিক্ষক সমিতি দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়। এই বঙ্গের শিক্ষক সমিতির নাম হবে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি—এরকমটাই ঠিক হয়। কিন্তু সমিতির পুরনো নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্ত রূপায়ণের ক্ষেত্রে টালবাহানা শুরু করে। নবীন নেতৃত্ব এই সুযোগে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ব্যানারে নিজেদের সংগঠিত করতে সচেষ্ট হয়।[৩৮] মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সঙ্গে অনেক আগে থেকেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও প্রাথমিক শিক্ষক

সমিতির একটি নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তিন পক্ষের নেতৃবৃন্দই অনুভব করতেন যে সমগ্র শিক্ষক সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সাযুজ্য আছে। এমনকি অনেক সময় একটি সমিতির নেতৃবর্গ অন্য শ্রেণির শিক্ষকদের আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ ভাবে মদত দিতেন। অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তীর মতো মূলতঃ অধ্যাপক সমিতির নেতা যেমন মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির দৈনন্দিন কাজকর্মের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন, তেমনি কেশবেশ্বর বসুর মতো মূলতঃ স্কুল শিক্ষক অংশকালীন অধ্যাপক হয়েও অধ্যাপক সমিতির নেতৃত্বে আসীন হয়েছিলেন। যাইহোক ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকেরা একত্রে ১৫-১৬ নভেম্বর দুই দিনের কর্মবিরতির ডাক দেয়। মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের পুরনো নেতৃত্ব এই ধর্মঘট সম্বন্ধে উদাসীনতার দেখালেও, সমিতির সংগ্রামশীল অংশের অংশগ্রহণে এই যৌথ কর্মবিরতি যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে। বিধানচন্দ্র রায়ের সরকার এই 'ধর্মঘট' সম্বন্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে। বিধানবাবু সরাসরি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন বৃদ্ধির দায়িত্ব সরকারের নয়—এরকম মন্তব্য করে আন্দোলনের দাবিদাওয়া নিয়ে নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করেছিলেন। তবে তার মতে ধর্মঘট বিষয়টি আইনশৃংখলার সমস্যা, তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গ যদি পুলিশি সাহায্য চায় তবে তা দেওয়া সরকারের কর্তব্য। শিক্ষা অধিকর্তার দপ্তর থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হল, যে শিক্ষকরা এই ধর্মঘটে যোগ দিলে শিক্ষক পিছু সরকারের দেয় ৫ টাকা মাসিক ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হবে।[৩৯]

মাধ্যমিক শিক্ষকদের রক্ষণশীল নেতৃত্ব কর্মবিরতির মূল্যায়নে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করলেন। তাঁদের মূল্যায়নে মেদিনীপুর জেলা ছাড়া অন্য সব জেলাতে কর্মবিরতি আংশিক মাত্র সফল হয়েছিল। আর ধর্মঘটের মূল কেন্দ্র কলকাতায় নাকি অবস্থান ও হিংসাত্মক হুমকি সত্ত্বেও বেশির ভাগ বিদ্যালয়ে কাজের বিঘ্ন হয়নি। নবীন নেতৃত্বের প্রতি অসূয়া বশতঃই তারা এমন বিকৃত মূল্যায়ন করেছিল—এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্বাধীন সমিতির নবীন কর্মীরা অবশ্য তাদের 'Radical' কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ থামালেন না। এদিকে পুরনো নেতৃত্ব, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিতে সংগ্রামী শিক্ষকদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে ভীত হয়ে, মূল সমিতির অস্তিত্বকে লোপ করে, 'পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির' নামে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এদিকে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সমিতির অবলুপ্তি সাধারণ সম্মেলনের ২/৩ অংশের সমর্থন ছাড়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই সমর্থন আদায় করতে সমিতির পুরানো নেতৃত্ব অপারগ হলেন। ১৯৪৯-এর শেষের দিকে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আইনানুগ অস্তিত্বে আপত্তি জানিয়ে সত্যপ্রিয় রায় উকিলের নোটিশ দিলেন এবং ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের প্রথমার্ধে হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত একটি মামলা রুজু করলেন। সংগঠনের গণতন্ত্রীকরণের জন্য সমিতিকে মহকুমা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে, সেখান থেকে সদস্য অনুপাতে নির্বাচন করে, কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি গঠনের জন্য গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্যও প্রগতিপন্থীরা সচেষ্ট ছিলেন। অন্যদিকে সমিতির রক্ষণশীল অংশ পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত না করতে পেরে সাধারণ সম্মেলন ডেকে, মূল সমিতিতে নিজেদের মৌরসী পাট্টা স্থাপনের সংকল্প করলেন।

১৯৫০-এর ১৬-১৭ জুলাই বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে সমিতির প্রাদেশিক সম্মেলন আহূত হল। সম্মেলনের উদবোধক ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন অধ্যক্ষ দেব প্রসাদ ঘোষ। ইতোমধ্যে নতুন মধ্যশিক্ষা আইন পাস হল ১৯৫০-এর প্রথম ভাগে। আইন অনুযায়ী মধ্যশিক্ষা পর্ষদের চুয়াল্লিশ জন সদস্যের মধ্যে আট জন শিক্ষক ও পরিচালন কমিটি থেকে ছয় জন নির্বাচিত হবে এমনটা ঠিক হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষক সমিতিগত ভাবে নির্বাচন লড়াই-এর প্রয়োজনেই পুরনো নেতৃত্ব বিষ্ণুপুর সম্মেলন আহ্বান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সম্মেলনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে, শিক্ষকবৃন্দের ন্যূনতম বেতন একশো টাকা ও চল্লিশ টাকা মহার্ঘভাতা দেবার দাবি উঠল। এর জন্য দরকার পড়লে পুনরায় ধর্মঘট করার প্রস্তাবও করলেন অনেকে। শিক্ষকরা ধর্মঘট করলে জনমত তার বিরুদ্ধে চলে যাবে—এই ঠুনকো যুক্তি সাজিয়ে প্রবীন নেতৃত্ব জঙ্গি আন্দোলন মানসিকতাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেও সাধারণ শিক্ষক সমাজ তার বিরোধিতা করেছিলেন। পুরনো নেতৃত্ব তখনও সরকারের কাছে স্মারকলিপি প্রদানের মধ্যেই শিক্ষকদের আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখবার কথা ভাবছিলেন। বিষ্ণুপুর সম্মেলনে পদাধিকারী নির্বাচনে অবশ্য পুরনো নেতৃত্বের সমিতির উপর মৌরসী পাট্টার কিছুটা ভাঙন ধরে। আগত প্রতিনিধিদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের দাবিতে তৎকালীন নেতৃত্ব সংগ্রামী শিক্ষকদের নেতা সত্যপ্রিয় রায়কে সমিতির সহসভাপতি পদে নির্বাচনে সম্মত হন।[৪০] এর সাথে সাথে শিক্ষক সংগঠনের একটি গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র রচনার জন্য আট সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করতে স্বীকৃত হন। যার মধ্যে সমিতির সংগ্রামী অংশের চারজন প্রতিনিধি থাকবেন—এরকমই স্থির হয়। তবে পুরনো নেতৃত্ব তার সংগ্রাম-বিমুখীনতা ত্যাগ করতে কোনো রকমেই প্রস্তুত ছিল না। সাধারণ শিক্ষকেরা তখন নিজেদের রুটি রুজির দাবি নিয়ে সোচ্চার। ১৯৪৮-৪৯-এর ধর্মঘট তাদের মনোবল বৃদ্ধি করে দিয়েছিল। শিক্ষকেরা তাই বহুলাংশে সংগ্রামী নেতাদেরই পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। শিক্ষক সমাজের চাপে তদানীন্তন সমিতি নেতৃত্ব ১৯৫১-এর ২২ জুলাই কুলটিতে একটি বিশেষ সম্মেলন আহ্বান করলেন। এই সম্মেলনে ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের খসড়া গঠনতন্ত্র ছাড়া, প্রগতিশীল নেতৃত্বের পক্ষ থেকেও একটি খসড়া গঠনতন্ত্র এর প্রস্তাব করা হয়। সম্মেলনে প্রগতিশীল নেতৃত্বের পক্ষে সমর্থনের জোয়ারে ভীত হয়ে পুরনো নেতৃত্ব কুলটি সম্মেলনকে স্থগিত করে দেন। সেই বছরেই ৫ আগস্ট কলকাতার ভারত সভা হলে স্থগিত সম্মেলনটি আহূত হয়। বিপুল সমর্থনে এখানে সংগ্রামশীল অংশের প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্রটি গৃহীত হয়। নিরুপায় সাবেকি নেতৃত্ব উপরি উক্ত দুইটি সম্মেলনই অবৈধ ঘোষণা করে।[৪১]

তা সত্ত্বেও এখানকার গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যে বেতনক্রম সুপারিশ করেছে সরকারকে তা মেনে নেবার অনুরোধ করা হয়। শতকরা সাড়ে সতের টাকা হারে, অথবা পঁয়ত্রিশ টাকা যেটা কম হবে তা মহার্ঘভাতা হিসাবে দেওয়ার দাবি ওঠে। সরকারি সাহায্য দান রীতিরও পরিবর্তন করে কোনো বিদ্যালয়ের ২/৩ অংশ ছাত্র চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে, সেই বিদ্যালয়কে সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় হিসাবে ঘোষণার দাবি ওঠে। আমাদের আলোচনার আলোকে এটা বোঝা যাচ্ছে সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী, শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফুলরেণু

গুহের মতো সংগ্রামী শিক্ষকদের গড়ে তোলা গণতান্ত্রিক শিক্ষক সংস্থা নামক মঞ্চ নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির মধ্যে তার প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি করে চলেছিল। তবে ১৯৫২-এর আগে নতুন ও পুরাতনের এই দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ সমাধান হয়নি। সে কথা পরে।

এদিকে চারের দশক থেকে, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথাভারী প্রশাসনের হাত থেকে মুক্ত করে বাংলার বিদ্যালয়গুলিকে একটি স্বশাসিত মাধ্যমিক বোর্ডের অধীনে আনবার যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, তার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। স্বাধীনতা পূর্বকালে বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে হিন্দু মুসলিম অনুপাত নিয়ে মত বিরোধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ ইত্যাদি কারণে এই বোর্ড গঠনে বিলম্ব হয়। অবশেষে স্বাধীন দেশে বিভাজিত বঙ্গের পশ্চিম অংশের সরকার এরকম একটি বোর্ড গঠনের জন্য বিল আনয়ন করেন।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী 'West Bengal Sceondary Education Bill, 1949' নামে একটি খসড়া বিল আইনসভায় পেশ করেন। বিল নিয়ে আলোচনার পর সদস্যেরা এটি একটি সিলেক্ট কমিটির কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনার জন্য প্রেরণ করেন। শ্রী ডি. এন. মুখার্জী, হেমন্ত কুমার বসু, বিমলকুমার ঘোষ, সৈয়দ বদোরুজ্জা, খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও জে. সি. গুপ্তের মতো বিশিষ্ট আইনসভার সদস্যদের এই সিলেক্ট কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনীত করা হয়।[৪২] এই প্রসঙ্গে বক্তৃতা কালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মন্তব্য করেন, 'This Bill was well received by the press and public and the non-communal character of the board's constitution was highly welcomed'.[৪৩]

প্রস্তাবিত বিলটির কিছু ত্রুটি অবশ্যই শিক্ষক সমিতি ও শিক্ষানুরাগী মানুষদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য গঠিত বোর্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য এবং প্রধান শিক্ষকবৃন্দ ছাড়া সহ শিক্ষকদের কোনো প্রতিনিধি না রাখার ব্যবস্থাকে 'অগণতান্ত্রিক' বলে তারা চিহ্নিত করেন। পরবর্তীকালে অবশ্য সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী বোর্ডের পরিচালন পর্ষদের সদস্যের সংখ্যা বিয়াল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ জন করা হয়। সহশিক্ষকদের বোর্ডে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মে আইনসভায় পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা বিলটি আইনে পরিণত হয়। আংশিক ভাবে সরকার মনোনীত এবং আংশিক ভাবে শিক্ষা জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ। ঠিক হয় বোর্ডের সভাপতি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন শিক্ষা বিভাগের সরকারি আমলাদের মধ্য থেকে মনোনীত সচিব।

মধ্যশিক্ষা আইনে এই বোর্ডের কার্যের পরিধি হিসাবে বলা হয়, 'Where as it is expedient to provide for the regulation, control and development of Secondary Education in West Bengal..... it shall be the duty of the Board to take such measures from time to time as it deems necessary for making suitable provision for Secondary Education through out the state.'[৪৪] এইভাবে স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের

অ্যাকাডেমিক ও অ-অ্যাকাডেমিক পরিচালনা, পাঠ্যসূচি নির্ণয় ও চূড়ান্ত পরীক্ষা নেওয়ার অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে একটি পৃথক বোর্ডের হাতে ন্যস্ত হল।

স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষকেরা তাদের দণ্ডমুণ্ডের পরিচালন সমিতিতে নিজেদের প্রতিনিধি প্রেরণ করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, ১৯৫১-এর এপ্রিল মাস থেকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এর কাজ শুরু হয়। আসে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রশ্ন। পর্ষদের আইন অনুযায়ী তিনজন প্রধান শিক্ষক, দুইজন সহকারী শিক্ষক, একজন সহকারী শিক্ষিকা এবং একজন প্রধান শিক্ষিকা বোর্ডে নির্বাচিত হবেন। এছাড়া পরিচালন কমিটিগুলি থেকেও তিনজন সদস্য নির্বাচনের কথা। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পুরনো ও নতুন নেতৃত্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে উঠল। আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে পুরনো নেতৃত্ব ৫১ সালের ৭ জানুয়ারির এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, নতুন নেতৃত্বকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে জেলা সম্পাদক এবং কার্যনির্বাহী কমিটি সদস্যদের মনোনয়ন দেন। নিজেদের তল্পিবাহকদেরই এই সব পদে বসানো হয়। নতুন নেতৃত্বের কোনো উল্লেখযোগ্য সদস্যকেই কোনো পর্যায়েই পদাধিকারী করা হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ শিক্ষকদের সমর্থনে বলিয়ান নতুন সংগ্রামশীল নেতৃত্ব এর বিরোধিতা করেন। আসন্ন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্বাচনে শিক্ষক সমিতির প্রার্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। নতুন ভাবে চাঙা করে তোলা হয় ডেমোক্রেটিক টিচার্স ফোরাম বা গণতান্ত্রিক শিক্ষক সংস্থাকে। এই মঞ্চের ব্যানারেই কাজ করতে থাকেন সংগ্রামশীল শিক্ষকেরা। সংঘবদ্ধ সোচ্চার আন্দোলনের ডাক দিয়ে তারা সাধারণ শিক্ষক সমাজকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে থাকেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নির্বাচনে সমস্ত শিক্ষক ও পরিচালন কেন্দ্রে স্বভাবতঃই মূল শিক্ষক সমিতি ও ডেমোক্রেটিক ফোরামের লড়াই হল। এই লড়াই বা নির্বাচনের ফলাফল দাঁড়াল ঃ ''প্রধান শিক্ষক কেন্দ্রে বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (এবিটিএ), শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (গণতান্ত্রিক শিক্ষক সংস্থা) ও কামিনী কুমার ঘোষ (স্বতন্ত্র), প্রধান শিক্ষিকা কেন্দ্রে ড. ফুলরেণু গুহ (গঃ শিঃ সংস্থা), সহশিক্ষক কেন্দ্রে বামন দাস মণ্ডল (এবিটিএ), জ্ঞানেন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত (গঃ শিঃ সংস্থা), সহ শিক্ষিকা কেন্দ্রে অনিলা দেবী (গঃ শিঃ সংস্থা), পরিচালন কমিটি প্রতিনিধি কেন্দ্রে মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, বিজয়ী হলেন।[৪৫]

এই নির্বাচনের ফল পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায় প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা, বা সহ শিক্ষক/শিক্ষিকা কেন্দ্রে পুরাতন নেতৃত্বাধীন মূল এ. বি. টি. এ.-র সঙ্গে নতুন নেতাদের মঞ্চ গণতান্ত্রিক শিক্ষক সংস্থার লড়াই একেবারে যাকে বলে, সমানে সমানে হয়েছিল। প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা কেন্দ্রে জোরদার লড়াই হয়েছিল। সহ শিক্ষক/শিক্ষিকা কেন্দ্রেও লড়াই ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পূর্ণ—তবে শেষ বিচারে বলা যেতেই পারে যে এতদিনকার সমিতির মূল পরিকাঠামো পুরনো নেতৃত্ব ব্যবহার করেও নতুন নেতৃত্বকে সম্পূর্ণ ভাবে ধূলিসাৎ করতে সক্ষম হয়নি। নতুন নেতৃত্ব সবে গড়ে ওঠা মঞ্চের নামে লড়ে যথেষ্ট ভালো ফল করেছিল। বোঝাই যাচ্ছিল সাধারণ শিক্ষকরা ক্রমশ নতুন মঞ্চের সমর্থক হয়ে পড়ছে।

একদিকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অভ্যন্তরে শিক্ষক সমিতির দুই গোষ্ঠী নীতিগত প্রশ্নে লড়াই চালাবার পাশাপাশি, মূল সমিতির পরিচালক কারা হবেন সেই নিয়ে দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে উঠেছিল।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রথমেই বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর মঞ্চ গণতান্ত্রিক শিক্ষক সংস্থা, মহাবোধি সোস্যাইটি সভাগৃহে এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করল। এই সভায় সত্যপ্রিয় রায় নিজস্ব প্রস্তাব পেশ করে বললেন, ''শিক্ষা জাতির মৌলিক সমস্যা। ভারতের ন্যায় অনগ্রসর দেশে জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনায় শিক্ষাকেই সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের বর্তমান সরকার এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন বললেও অত্যুক্তি হয় না। শিক্ষা খাতে সরকারি ব্যয় নগণ্য। পশ্চিমবাংলার শিক্ষা বাবদ মোট ব্যয়ের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ সরকারি তহবিল থেকে আসে এবং বাকি খরচ বহন করে নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ভুক্ত অভিভাবকগণ। বহু শিক্ষার্থী পয়সার অভাবে শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এটি জাতীয় অপচয় ও শিক্ষার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। বিদ্যালয়গুলির অবস্থা শোচনীয়। শিক্ষকগণের ন্যূনতম বেতন ৫০ টাকা ও ঊর্ধ্বতম ৯০ টাকা। এই স্বল্প বেতনে শিক্ষকগণের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে তাদের গুরুদায়িত্ব পালন সম্ভব নহে এবং দেশে প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারও অসম্ভব। শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন চালাতে গণতান্ত্রিক শিক্ষক সংস্থা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।''[৪৬] সভায় স্থির হয় যে শিক্ষকদের সমস্ত ন্যায্য দাবিকে কেন্দ্র করে জনমত গঠন করতে হবে এবং সেই জন্য ১৯৫২-এর ৩১ মার্চ থেকে ৬ এপ্রিল 'দাবি সপ্তাহ' পালনেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিকে পুরনো ও নতুন নেতৃত্বের মধ্যে আদর্শগত কারণে মতভেদ সৃষ্টি হলেও, কখনো কখনো তা 'কলতলার' ঝগড়াতেই পরিণত হচ্ছিল। পুরনোপন্থী নেতাদের বিরুদ্ধে নবীন নেতারা, এমনকি অভিযোগ আনেন যে পুরনো নেতৃত্ব পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য প্রণীত Test papers ছাপাবার জন্য সমিতি ভবন নির্মাণের তহবিল থেকে ১৮,০০০ টাকা নিয়েছেন, কিন্তু Test paper সংক্রান্ত খরচে তার কোন উল্লেখ নেই। প্রফুল্ল কুমার দে সরকার তখন মূল শিক্ষক সমিতির সম্পাদক—তিনি এর প্রতিবাদ করেন। তিনি ও পুরনো নেতৃত্বের প্রভাবাধীন 'পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির' সম্পাদক বামন দাস মণ্ডল বলেন, দেশভাগের পর নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি ভেঙে এই বঙ্গে যে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি গড়ে ওঠে তাকে মূল সমিতি নেতৃত্ব এই খাতে দশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছিল। পরবর্তীকালে সেই ঋণ পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি Test paper বিক্রির লভ্যাংশ থেকে পরিশোধ করে দেয়। তাই পুরনো সমিতির কোনো টাকা তছরুপ হয়নি। যাইহোক এই বিতর্ক প্রমাণ করে আদর্শগত ভাবে পুরনো ও নতুন নেতৃত্বের মতবিরোধ শুরু হলেও তা অনেক সময়েই অপরাজনীতির আবিলতায় মলিন হয়েছিল।[৪৭]

আদর্শের মোড়কেও অনেক সময় দুই পক্ষ অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতেন এটাও আমরা দেখি। ১৯৫১-এ মূল সমিতি নেতৃত্বের কর্তৃত্বাধীন, সমিতির মুখপত্র 'শিক্ষা ও সাহিত্য'তে, পুরনোপন্থী গোষ্ঠীর লোক সুধাময় মুখোপাধ্যায়, 'শিক্ষক—যা ছিলেন, যা হয়েছেন, যা হবেন' শীর্ষক একটি লেখায়, শিক্ষকদের অর্থগৃধ্নুতার নিন্দা করে বলেন, 'শিক্ষার লক্ষ্য মনুষ্যত্বের পূর্ণায়ত প্রকাশকে সম্ভব করে তোলা'..। অবশ্যই যুগে যুগে শিক্ষক সমাজের জীবনাদর্শের পরিবর্তন ঘটে, তবে তাদের দেশকালাতীত কিছু আদর্শ অবশ্যই থাকতে হবে। এক সময়ের তপোবন কেন্দ্রিক শিক্ষা (যা ছিলেন), এরপর পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক শিক্ষা (যা হইয়াছেন) এবং জাতীয় শিক্ষা (যা হইবেন), এই তিন ধরনের শিক্ষা পরিবেশেই সমাজ যেমন শিক্ষকের প্রতি আস্থা রাখবেন,

তাদের সম্মান দেবেন, তেমনি শিক্ষক আন্তরিকতা নিয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দেবেন।' শিক্ষকতা শেষ বিচারে একটি 'ব্রত' বলেই তিনি তার প্রবন্ধ শেষ করেছিলেন। ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতো ও ময়লা ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত তৎকালীন শিক্ষকদের কাছে তার এই প্রবন্ধ অবশ্য খুব একটা শিক্ষণীয় হয়নি। সমিতির পরবর্তী গতি প্রকৃতির মধ্যে আমরা সেই রকম ইঙ্গিতই দেখতে পাই।[৪৮]

এদিকে এই ডামাডোলের মধ্যে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাজ শুরু হয়েছিল। মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব উঠে এসেছিল। পাঠ্যক্রমকে কীভাবে স্বাধীন দেশের উপযোগী করে গড়ে তোলা যায়, সে বিষয়েও ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনার বেদ-বাইবেল-কোরাণ স্বরূপ 'স্কুলকোড'কেও যুগপোযোগী করবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত গ্র্যান্ট-ইন-এইডে' বিদ্যালয়গুলিকে প্রদত্ত স্বল্প অর্থ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বৃদ্ধি করতে পদক্ষেপ নিতে পারে এই আশা জাগ্রত হয়েছিল অনেক শিক্ষকের মনে। এছাড়া বিদ্যালয়গুলির পরিচালন কমিটিগুলিকেও গণতান্ত্রিকভাবে গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব পর্ষদের উপর পড়েছিল। সমিতি এই বিষয়গুলি নিয়ে আন্দোলনে সংগঠিত করুক—এই দাবি সমিতির অভ্যন্তরে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল, সত্যপ্রিয় রায় নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক শিক্ষক সংস্থা। মূল সমিতির উপর চাপ সৃষ্টি করার মানসে প্রায় দুইশো জন শিক্ষকের স্বাক্ষর সহ এক আবেদনপত্র সমিতির সাধারণ সম্পাদকের কাছে প্রেরণ করা হয়। এবং ১৯৫১-এর ১২ আগস্ট মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁদের উদ্যোগেই একটি কনভেনশন আহ্বান করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু রক্ষণশীল নেতৃত্ব এই দাবিতে কর্ণপাত করবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এই পরিস্থিতিতে সংগ্রামশীল নেতৃত্ব পরিচালিত গণতান্ত্রিক শিক্ষক সংস্থা, ১৯৪৯-এর সরকারি আইন অনুযায়ী শিক্ষকদের যে বেতনক্রম দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছিল, তার তীব্র বিরোধিতা করতে শুরু করেছিল। এর বিরুদ্ধেও সমিতির সংগ্রামশীল অংশ এই সময় প্রতিবাদ এর সুর আরো চড়া করলেন।[৪৯]

নব্য শিক্ষক নেতৃত্ব ও প্রাচীন নেতৃত্বের সমঝোতা

শেষ পর্যন্ত মূল শিক্ষক সমিতির তদানীন্তন নেতৃত্ব ঘোষণা করলেন যে, ১৯৫২-এর ১২-১৩ এপ্রিল সমিতির বার্ষিক অধিবেশন দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হবে। তখন শিক্ষক সমিতির মধ্যে পারস্পরিক দোষারোপ, গোষ্ঠী কেন্দ্রিকতার করাল ছায়া দেখা যাচ্ছে। প্রতিনিধি প্রেরণের কার্য পদ্ধতিতে তার ছাপ আমরা লক্ষ্য না করে পারি না। সমিতির মত অনুযায়ী সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের চাঁদা ও পত্রিকার ফি শুধু পরিশোধ যোগ্য নয়, তাদের কার্যকরী সদস্য হিসেবে অবশ্যই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পরিচয়পত্র আনতে হবে।[৫০]

শিলিগুড়ি গার্লস স্কুলে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তথা শিলিগুড়ি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ভবানী চরণ গুহের স্বাগত ভাষণের পর, সমিতির সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত কার্য বিবরণী পাঠ করলেন। সমিতির প্রাচীন নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছিলেন যে সংগ্রামী অংশকে পুরোপুরি সমিতির ক্ষমতা কেন্দ্র থেকে দূরে রাখা যাবে না। তাই তারা প্রগতিশীল অংশের

নেতাদের সঙ্গে একটি বোঝাপড়ায় আসতে চাইলেন। সভায় সমিতির গঠনতন্ত্রের রদবদল, ১৯৫২-৫৩ খ্রিস্টাব্দের সরকারি বাজেটে শিক্ষা খাতে স্বল্প ব্যয় বরাদ্দকরণের বিরোধিতা, মধ্যশিক্ষা পর্ষদে ন্যূনতম আট জন শিক্ষক প্রেরণের দাবি উঠেছিল। সম্মেলনে চূড়ান্ত ভাবে সংগঠনের গঠনতন্ত্রে কিছু পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছিল। সদস্যদের সভ্য চাঁদা ও পত্রিকা চাঁদা নির্দিষ্ট করা হল। বিদ্যালয় সদস্য, সহযোগী সদস্য ও সাম্মানিক সদস্যকরণের মাপকাঠিও স্থিরিকৃত হল। ঠিক হল নেতৃত্বের খেয়ালখুশী মতো বাৎসরিক সম্মেলন ডাকা চলবে না। প্রতিবছর ৩০ জুনের মধ্যেই এই সম্মেলন আহ্বান করতে হবে। সম্মেলনে সমিতির সভাপতি ছাড়াও, তিনজন সহসভাপতি নির্বাচিত হবার বিধান গৃহীত হল। ঠিক হল প্রত্যেক মহকুমার একশোজন সদস্য পিছু একজন গোপন ভোট পত্রের মাধ্যমে কার্যকরী সমিতির সদস্য হিসাবে গৃহীত হবেন। শিক্ষিকাদের মধ্য থেকে পৃথকভাবে দুইজন কার্যকরী সমিতিতে আসবেন। সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির পরিচালনায় থাকবেন সভাপতি, সহসভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, পত্রিকা সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ। এরা সকলে ও সব কয়টি ডিভিশন থেকে মোট চার জনকে নিয়ে গঠিত হবে, সমিতির সর্বোচ্চ ওয়ার্কিং অ্যান্ড ফিনান্স কমিটি।

প্রগতিশীল নেতৃত্বের সঙ্গে সমঝোতা করে, তাদের নেতা সত্যপ্রিয় রায়কে মূল সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করা হল। তিনজন সহ সভাপতি হলেন, বিজয় বিহারী বসু, জগদীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং শচীন্দ্রনাথ সরকার। সাধারণ সম্পাদক হলেন সমিতির মধ্যে দুই বিপরীত পক্ষের সংযোগ সাধক মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। 'শিক্ষা ও সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক ও সহ সম্পাদক হলেন যথাক্রমে বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও অনিলা দেবী। কোষাধ্যক্ষের গুরুত্বপূর্ণ পদটি পেলেন জ্ঞানেন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত।[৫১]

ঠিক সেই সময়েই মাধ্যমিক বোর্ড নির্ধারিত নতুন খসড়া স্কুল কোর্ড প্রকাশিত হল—সেখানে শিক্ষক স্বার্থ রক্ষার কোনো চেষ্টা না করে, বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিচালন সমিতি ও মাধ্যমিক বোর্ডের কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা সচেতন শিক্ষক সমাজের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। এর প্রতিবাদে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির বহু সদস্য সভা সমিতি স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজে নেমে পড়েছিলেন। বাধ্য হয়ে বোর্ড এই স্কুল কোডকে সিলেক্ট কমিটির কাছে বিবেচনার জন্য প্রেরণ করল। আংশিক জয় হল শিক্ষক সমাজের। সমিতি এইবারে শিক্ষকদের 'Service condition' ও বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন সংগঠিত করতে নতুন উদ্যমে পুনরায় সচেষ্ট হয়ে উঠল। ১৯৫৩-এর ৮ ফেব্রুয়ারি ভারত সভা হলে, সত্যপ্রিয় রায়ের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় কনভেনশনে বাজেটের ২০% শিক্ষা খাতে ব্যয়, দুইশো টাকা শিক্ষকদের সর্বনিম্ন বেতন ও কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ টাকা মহার্ঘভাতা, চাকুরির নিরাপত্তার দাবি তোলা হল। এর আগেই প্রায় এগারো হাজার শিক্ষকের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি সরকারের কাছে পেশ করেও কোনো ফল পাওয়া গেল না। এরপরেই আসল সেই ঐতিহাসিকক্ষণ, প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষকের বিশাল মিছিল তাদের দাবির সমর্থনে বিধানসভা অভিযান করল।[৫২] মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় বা শিক্ষামন্ত্রী এই অভিযানের নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে দেখা করার সৌজন্যটুকুও দেখালেন না। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ নেতা শিক্ষকদের ন্যায্য দাবির প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছিলেন।

আসলে ১৯৫১-এর শিলিগুড়ি সম্মেলন সমিতির ইতিহাসে একটি জলবিভাজিকা স্বরূপ গণ্য হয়েছিল। প্রগতিশীল শিক্ষকেরা অন্ততঃ আংশিক ভাবে সমিতি নেতৃত্বের অংশ হতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং এতদিনের আবেদন নিবেদনমূলক অসফল সংগ্রামকে সরিয়ে দিয়ে, মাঠে ময়দানে শিক্ষক আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিয়ে প্রগতিপন্থীরা সমিতিকে একটি সংগ্রামশীল চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পা এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমিতির পুরনো নেতৃত্বের মৌরসী পাট্টা ভেঙে সত্যপ্রিয় রায় অনিলা দেবীর নেতৃত্বে সমিতিতে নতুন রক্তের সরবরাহ হয়েছিল। তদুপরি সমিতি এই সময় থেকেই দেশের রাজনৈতিক ব্যাপারেও মতামত দিতে শুরু করে। সত্যপ্রিয় রায় প্রমুখেরা সমিতির সাধারণ শিক্ষক শিক্ষিকা সদস্যদের এটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, দেশের আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ছাড়া অন্যান্য খেটে খাওয়া মানুষদের মতো শিক্ষকদের দুরবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না। তাই বর্ধমান সম্মেলন অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে একত্রে আন্দোলনে নামবার একটি প্রস্তাব উঠেছিল। বিষ্ণুপুর সম্মেলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় শিক্ষকেরা যাতে সংসদ বিধানসভা বা বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত হতে পারেন—তার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করার কথা হয়। নেতৃত্বের আশা ছিল এই সব নীতি নির্ধারক সভার সদস্য হলে, শিক্ষকেরা জোরের সঙ্গে তাদের দাবি, মন্ত্রীমণ্ডলী ও দেশবাসীদের সামনে তুলে ধরতে পারবেন।[৫৩] সত্যপ্রিয় বাবুদের চেষ্টায় ১৯৫২-এর নির্বাচনে শিক্ষক কেন্দ্র থেকে কিছু প্রগতিশীল শিক্ষক বিধান পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এতদিনে শিক্ষকেরা অনুভব করতে পেরেছিলেন, যে দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দ্বারা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করলেই শিক্ষকদের জীবন ও জীবিকার সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হবে। জয় হবে তাদের করায়ত্ত।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, ঔপনিবেশিক যুগের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা পরিচালনার জন্য একটি 'স্কুল কোড' প্রণীত হয়েছিল। এখন নতুন গঠিত মধ্যশিক্ষা পর্ষদ স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি 'স্কুল কোড' প্রণয়নের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। বোর্ড সদস্যদের মধ্যে এ বিষয়ে কিছু মতভেদ হবার ফলে, প্রস্তাবটিকে সিলেক্ট কমিটির কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী স্কুল কোডে নতুন বিদ্যালয়ের অনুমোদনের জন্য অনেক বিধি নিষেধ আরোপিত হল। যে স্কুলে প্রতি ছাত্র পিছু ১০ বর্গফুট জায়গা থাকবে না, তাদের পর্ষদ অনুমোদন দেবে না। এরকমটাই স্বীকৃত হল। বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটিকেও নবতর রূপ দেওয়া হল। স্থির হল বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটিতে হিতৈষী বা বেনিফেকটরদের মধ্য থেকে তিন জন প্রতিনিধি, প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষানুরাগীদের তিনজন প্রতিনিধি, তাছাড়া যে সব অভিভাবক দশ টাকা চাঁদা দিয়ে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করবেন, তাদের মধ্য থেকেও নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দুইজন নির্বাচিত হবেন। শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে টুঁ শব্দটিও করা হল না এই খসড়া বিলে। এর ফলে স্কুলে কায়েমি স্বার্থের মৌরসী পাট্টা কিন্তু ভাঙা হল না।[৫৪]

সাধারণতঃ স্থানীয় বিত্তশালীরা তাঁদের অর্থের জোরে স্কুলগুলির প্রাথমিক প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে চিহ্নিত হতেন, আর অভিভাবকদের প্রতিনিধি হিসাবে মূলতঃ তাদের লোকেরাই

নির্বাচিত হতেন। তার ফলে, পূর্ববৎ গ্রামীণ জোতদার, জমিদার, বিত্তশালী স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবেন এই আশংকা ছিলই। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগ বা পদচ্যুতির ক্ষেত্রে এই নতুন ব্যবস্থায় তাঁদেরই ক্ষমতা বলবৎ রয়ে গেল। স্কুলকোডে অনেক নিয়ম নীতি রাখা হল শিক্ষকদের জন্য। তারা একটা নতুন ও প্রস্তাবিত বেতনক্রমের অধিকারী হলেন। অবস্নাতক শিক্ষকদের পঞ্চাশ টাকা এবং স্নাতক শিক্ষকদের ষাট টাকা কর্মে নিযুক্ত হবার সময় পাওয়া যাবে—এরকম একটা প্রস্তাব রাখা হল। যা তৎকালীন 'বাজার দরের' তুলনায় যথেষ্ট কম বলেই বিবেচিত হত। এছাড়া শিক্ষকদের নিজস্ব দাবি দাওয়া, চাওয়া পাওয়ার জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে মঞ্চ হিসাবে যে শিক্ষক সংসদ' ছিল, বিসদৃশ ভাবে সেই মঞ্চের সম্পাদক নিযুক্তিকরণের অধিকার শিক্ষকদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হল। অর্থাৎ নিজেদের মঞ্চের নেতা নির্বাচনের অধিকার শিক্ষকদের কাছ থেকে অপসৃত করে, ম্যানেজিং কমিটি ও প্রধান শিক্ষকের পেটোয়া ব্যক্তির শিক্ষক সংসদের সম্পাদক হওয়া অনিবার্য হয়ে উঠল। গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রের উপর এরকম আঘাত সত্যি অকল্পনীয়। এছাড়া দরিদ্র শিক্ষক সমাজ তখন অনেক সময়ই পেটের দায়ে ব্যক্তিগত ভাবে গৃহশিক্ষক হিসাবে অর্থাৎ প্রাইভেট টিউটরের কাজ করতেন। উপযুক্ত বেতন বৃদ্ধি ব্যতিরেকেই শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনের অধিকার বিলুপ্ত করার চেষ্টাও করেছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ছাত্রদের সম্বন্ধে যে নিয়মনীতির কথা এই কোডে প্রস্তাবিত হয়েছিল তা ঔপনিবেশিক যুগের কার্লাইল সার্কুলার বা লায়ন সার্কুলারের স্মৃতিকেই জাগ্রত করে তুলেছিল। ছাত্র ধর্মঘট করলে, তার জন্য প্রধান শিক্ষক কর্তৃক শাস্তিদানের ব্যবস্থা ছাড়াও অনুমতি ছাড়া ছাত্রদের ক্লাব বা সভা সমিতিতে যোগদান নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব দেওয়া হল।[৫৫]

নতুন স্কুল কোড ঃ শিক্ষক সমিতির প্রতিক্রিয়া

স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষকদের পক্ষে এই ছাত্র-শিক্ষকের হেনস্থাকারী নিয়মাবলীর গলাঃধকরণ করা সম্ভব ছিল না। তারা স্কুল কোডের নাম দিলেন, স্কুল পেনাল কোড। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক বিরোধী স্কুল কোডের আপত্তিজনক অংশ বাতিল করবার জন্য শিক্ষকেরা জনমত গঠন করতে উদ্যোগী হলেন। বোর্ডের শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দ মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, বামনদাস মণ্ডল, ফুলরেণু গুহ প্রমুখেরা ১৯৫২-এর জুলাই ও আগস্ট মাসে সারা রাজ্য জুড়ে সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সভা সমাবেশ করলেন। আপাততঃ দলাদলি ভুলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর শিক্ষক নেতৃত্ব পর্ষদের অভ্যন্তরে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে মনস্থ করলেন। বাইরে মাঠে ময়দানেও শিক্ষক ও ছাত্ররা প্রতিবাদের ঝড় তুললেন। ৫২-এর ২২ জুলাই সমিতির পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন কার্যকরী সভাপতি সত্যপ্রিয় রায়। তিনি বললেন, 'স্কুল কোডে বিদ্যালয় পরিচালনায় শিক্ষকের ভূমিকা অস্বীকার করা হয়েছে।...এরপর থেকে কেবল মাত্র অর্থশালী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা, যারা আসলে শিক্ষার কিছুই বোঝেন না, তারা বিদ্যালয় পরিচালনার নামে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে পারবেন।'[৫৬] এছাড়া সত্যপ্রিয় বাবু কোডে শিক্ষকদের যথোপযুক্ত বেতন না দেবার বিষয়টি উল্লেখ করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর দাবি শিক্ষকদের কমপক্ষে দুইশো টাকা বেতন ও শতকরা সাড়ে সতেরো

টাকা হারে মহার্ঘভাতা দিতে হবে। ন্যূনতম বেতন না দিয়ে শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন নিষিদ্ধ করারও তিনি সমালোচনা করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে ছাত্রদের যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তারও প্রতিবিধানের দাবি করেছিলেন। স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে পর্ষদের নীতি নিয়ম ঠিক মতো প্রেরিত না হবার ফলে, প্রধান শিক্ষকদের পক্ষে বিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালন করতে অসুবিধা হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন। বিদ্যালয়গুলির বিধিসম্মত পাঠ্যক্রম, শ্রেণি প্রতি ছাত্র সংখ্যা নির্ধারণে কঠোরতা, যার ফলে স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি না হতে পারা প্রভৃতির প্রতি তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বজ্র কঠিন দৃঢ়তায় প্রস্তাবিত স্কুল কোড-এর সমালোচনা করে তিনি বলেছিলেন, "The Board after two years of labour has produced a School Code. But it has been lying comfortably shelved in the Government archives and ugly rumours are afloat that it is not soon coming in to force. Teachers in the mean time are kept on the tenterhook of suspense and an idea is fast spreading among them that the Government would deliberately postpone the teachers of the few grudging privileges conceded to them in the Code. On behalf of the Association we demand that the Code should be given immediate effect to."[৫৭] এর সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবিত স্কুল কোডের আপত্তিকর ধারাগুলি বাতিলের দাবিও তিনি জানিয়েছিলেন।

১৯৫২-এর ২৩ জুলাই অর্থাৎ সাংবাদিক সম্মেলনের পরের দিনই ভারত সভা হলে সমিতির পক্ষ থেকে একটি সভা আহূত হল। সেখানে সকল স্কুলের শিক্ষকদের একই রকম বেতন ও ভাতা, শিক্ষক সংসদ নির্বাচনে গণতান্ত্রিক অধিকার, পরিচালন কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তির দাবির পাশাপাশি ছাত্রদের প্রতি পুলিশি রাষ্ট্রের মতো দমনপীড়ন না চালিয়ে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। ওই বছরেরই ৩ আগস্ট ভারত সভা হলে, আবার প্রতিবাদ সভা হল। ৪ আগস্ট সত্যপ্রিয় রায় ও মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত পর্ষদ সভাপতিতে 'Code' সম্পর্কে সমিতির মতামত ও দাবি জানিয়ে আসলেন। কলকাতাতে ৯ আগস্ট হাজরা পার্কে, ১০ আগস্ট ওয়েলিংটন পার্কে এবং ১৭ আগস্ট শ্রদ্ধানন্দ পার্কে শিক্ষকরা প্রস্তাবিত কোডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সভা সংগঠিত করলেন। ১৮ আগস্ট স্কুল কোডকে সরকার অপরিবর্তিত ভাবে কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত নিলে শিক্ষক ও ছাত্র সমাজ চরম ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। ছাত্র-শিক্ষক সমন্বয়ে গড়ে ওঠা 'শিক্ষা সংকট প্রতিরোধ কমিটির' আহ্বানে সেদিন পশ্চিম বাংলায় ছাত্র ধর্মঘট ডাকা হল।[৫৮]

উত্তরে দার্জিলিং থেকে দক্ষিণে সুন্দরবন অবধি প্রায় সব স্কুলে সেদিন ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়েছিল। ছাত্র শিক্ষকেরা কোলকাতায় ওয়েলিংটন পার্ক (বর্তমানে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) সমবেত হয়ে, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোডে পর্ষদ কার্যালয়ে মিছিল করে উপস্থিত হয়। সে সময়ে কার্যালয়ে পর্ষদের বৈঠক চলছিল। বৈঠকে উপস্থিত শিক্ষক নেতৃবৃন্দ শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিকৃত কোড স্থগিতের দাবি তুললেন। পর্ষদের অন্যান্য প্রধান শিক্ষক/শিক্ষক সদস্যবৃন্দ

যেমন ফুলরেণু গুহ, অনিলা দেবী, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও কোডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি বাইরের সভা সমিতিতে যে দাবি জানাচ্ছিলেন, তার অনুরণন তুলে এইসব পর্ষদ সদস্য শিক্ষকেরা কোডের পরিচালন কমিটি গঠনের শিক্ষকদের বেতন, ছাত্র শৃংখলা এবং প্রাইভেট টিউশন সংক্রান্ত ধারাগুলির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন। বোর্ডের শিক্ষানুরাগী সদস্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শিক্ষকদের দাবি সমর্থন করে মন্তব্য করেছিলেন, 'আমাদের এমন আচরণ করতে হবে যাতে যে কোন ব্যক্তির গঠনমূলক প্রস্তাব আমরা চাই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বোর্ড একটা আইনানুগ সংস্থা, আমরা সরকারের ক্রীড়নক নই।'[৫৯] তিনি আরো বলেছিলেন, শিক্ষকদের বর্ধিত বেতনের টাকা কোথা থেকে আসবে, তাই নিয়ে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে। তবে তাই বলে শিক্ষকদের ন্যায্য দাবিকে ক্ষমতার জোরে দমন করা হলে, তা অবশ্যই আপত্তিজনক। পর্ষদকে শিক্ষকদের ন্যায্য বেতনক্রম অবশ্যই স্থির করতে হবে। তারপরে সেই টাকা মঞ্জুর করবার জন্য পর্ষদের সবাই মিলে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

যাইহোক শেষ পর্যন্ত এই সমবেত প্রতিবাদ ও চাপে পর্ষদ কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত 'স্কুল কোড' স্থগিতকরণের দাবি মেনে নিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হল একটি বিশেষ কমিটি স্কুল কোডের সময়োচিত সংশোধনের দায়িত্ব নেবে। বাইশ জন সদস্য সমন্বিত এই বিশেষ কমিটির সদস্য হলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সহ নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি সাতজন পর্ষদ সদস্য। সভার পর ছাত্র প্রতিনিধিদের পর্ষদ কার্যালয়ে আহ্বান করে, তাদেরও সিদ্ধান্তগুলি জানিয়ে দেওয়া হল। ছাত্র তথা শিক্ষক সমিতির আন্দোলন-এর ফলে জয়যুক্ত হল, এটা বলা যেতেই পারে।[৬০]

এদিকে ১৯৫২-এর নভেম্বর মাসেই স্কুল কোড সংক্রান্ত পর্যালোচনাকারী সমিতি কোডের সংশোধিত খসড়া তৈরি করে ফেলেন। ওই মাসেই সমস্ত বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য শিক্ষক সম্মেলন আহ্বান করল সমিতি। নতুন প্রস্তাবে স্কুল পরিচালনা কমিটিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার পাওয়ার জন্য অভিভাবকদের দশ টাকা চাঁদা দেবার প্রথা রদ করা হল। ছাত্রগণের ক্লাব, সমিতির সদস্য হবার ক্ষেত্রে যে বাধানিষেধ ছিল তা প্রত্যাহার করা হল। নতুন কোডে শিক্ষকদের সর্বনিম্ন বেতন হার ন্যূনতম কুড়ি টাকা বৃদ্ধির পক্ষে সওয়াল করা হল। নতুন প্রস্তাবিত বেতনহার অনুযায়ী অবস্নাতক শিক্ষকদের সত্তর টাকা, স্নাতকদের আশি টাকা, স্নাতকোত্তরদের জন্য একশো টাকা এবং প্রধান শিক্ষকদের একশো পঞ্চাশ টাকা ন্যূনতম বেতন পাবেন বলে প্রস্তাব করা হয়েছিল।[৬১] সমিতি নেতৃত্ব মত প্রকাশ করলেন যে পর্ষদের এই পদক্ষেপ ইতিবাচক হলেও সমিতি শিক্ষকদের ন্যূনতম বেতন দুইশো টাকা ও পঁয়ত্রিশ টাকা মহার্ঘভাতার দাবি বজায় রাখবে। সেই অনুযায়ী শিক্ষকদের এক সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নিয়োজিত কমিটি স্কুল কোডের বিতর্কমূলক ধারা পরিবর্তনের পক্ষে যে মত দিয়েছেন, সমিতি তাকে স্বাগত জানাচ্ছে তবে শিক্ষকদের বর্ধিত বেতন ও মহার্ঘভাতা সংক্রান্ত দাবিসমূহ পুনরায় সরকার ও পর্ষদের কাছে পেশ করা হোক।

এক ধাপ লড়াইয়ে জিতে সমিতি বিশেষ করে সমিতির সংগ্রামী অংশটি, তাঁদের লড়াইকে আরো উচ্চস্তরে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করলেন। ষাট বছরে শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের ব্যাপারে সমিতির সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল, গ্র্যাজুয়িটি ও পেনসন দানের ব্যবস্থা না করে, এই বিধি বলবৎ করা যাবে না। শুধুমাত্র শিক্ষকদের নয়—শিক্ষা কর্মীদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিয়েও সমিতি লড়াই চালনা করতে শুরু করেছিল। তৎকালীন রাজ্য সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় শিক্ষকদের দাবি মতো তো নয়ই এমনকি মধ্য শিক্ষা পর্ষদের নির্ধারিত বেতন দিতেও রাজী হলেন না। শিক্ষকরা ডেপুটেশন দিলে মুখ্যমন্ত্রী কোষাগারে অর্থের অভাবের কথা বলে, শিক্ষকদের ন্যায্য দাবিকে নাকচ করে দিলেন। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্ররা, শিক্ষকদের এই অপমানে স্তব্ধ থাকল না। তারা আবার শিক্ষকদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। আন্দোলন তীব্রতর হল। এদিকে সরকার গোয়েন্দগিরি শুরু করলেন ছাত্র-শিক্ষকদের আন্দোলনের 'খবর' জানবার জন্য। শিক্ষকদের কারোরও যদি ন্যূনতম রাজনৈতিক যোগ থাকে তাহলে তাকে চাকুরি থেকে বরখাস্তের নীতি প্রয়োগ করতে শুরু করল সরকার।[৬২]

মুদালিয়র কমিশন ও শিক্ষক সমিতি

এসে গেল ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের জন্য গঠিত 'সেকেন্ডারি এডুকেশন কমিটির' প্রতিবেদন তখন জনসমক্ষে এসেছে। উক্ত রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করবার জন্য বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত পাঠ্যসূচির সংস্কার, পাঠ্যক্রমকে কোন পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরতে হবে তার পরিকল্পনা, ছাত্রদের শারীরিক মানসিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত চাহিদার পরিপূরণ, পরীক্ষা ও অভীক্ষার নতুন ধারার সৃষ্টিকরণ ইত্যাদির পাশাপাশি শিক্ষকদের শিখন সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়। কমিশন শিক্ষকদের শিক্ষা দেবার সামর্থ্য সম্বন্ধে বলেন, 'We are, however convinced that the most important factor in the contemplated educational reconstruction is the teacher--his personal qualities, his educational qualifications, his professionel training and the place that he occupies in the school as well as in the community'.[৬৩]

মুদালিয়র কমিশনের মতে সামাজিক অবস্থান, বেতন এবং কর্মস্থলে উপযুক্ত পরিবেশের অভাব দেশের শিক্ষকদের প্রতিনিয়ত অসুবিধায় ফেলছে। প্রশাসনের অন্যান্য পদে সমযোগ্যতা সম্পন্ন কর্মচারী এবং নিম্ন যোগ্যতার কর্মীদের থেকেও শিক্ষকেরা কম বেতন পান বলে কমিশনের সমীক্ষায় মত প্রকাশ করা হয়েছিল। তাদের কাজের কোনো নিরাপত্তাও নেই। শিক্ষক সমিতিগুলিও কমিশনের কাছে এরকম মতই ব্যক্ত করেছিল। বাইরের আন্দোলন চলাকালীন, ব্যস্ত সময়ে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক সমাজ মুদালিয়র কমিশনের কাছে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও বাংলার শিক্ষকদের আর্থিক ও পেশাগত সমস্যা সম্বন্ধে নিজেদের অভিমত প্রেরণ করেছিলেন। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দুই গোষ্ঠীর তরফে বি. সি. চট্টোপাধ্যায় এবং সত্যপ্রিয় রায় কমিশনের প্রেরণ করা প্রশ্নাবলীর নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক সমাজের সমস্যা ও তা সমাধানের দিক নির্দেশ মেমোর‍্যান্ডাম এর আকারে পেশ করেছিলেন। কমিশন তাদের মতামতের দ্বারা প্রভাবিত

হয়ে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির পক্ষে সওয়াল করেছিলেন তাই নয়, শিক্ষকদের সন্তানদের বিনা বেতনে পড়বার বন্দোবস্ত, তাদের বিদ্যালয়ের সন্নিকটে বসবাস করার কোয়ার্টার-এর ব্যবস্থা, রেলওয়ে ভ্রমণে ভাড়ায় ছাড় ছাড়াও বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে তাদের জন্য হলি ডে হোম ও চিকিৎসা কেন্দ্র ও অন্যান্য সুবিধার পাশাপাশি তাদের জন্য 'Study leave' এর ব্যবস্থা থাকা উচিত বলে রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন।[৬৪]

পরিশেষে কমিশন মন্তব্য করেছিলেন, 'We have already referred to the importance of the teachers social status. There is a growing feeling that the lead in this matter should be taken by persons in high public positions who should show special recognition of the status and dignity of teachers and treat them not on the basis of their salary and economic status but on the importance of the nation building work that is entrusted to them.'[৬৫]

স্বাভাবিক ভাবেই, সারা দেশের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক সমাজও কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়িত হলে, তাদের অবস্থা পরিবর্তন হবে বলে আশা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু সত্যপ্রিয় রায়ের মতো পোড় খাওয়া সমিতি নেতৃত্ব সঠিক ভাবেই অনুধাবন করেছিলেন যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা না থাকলে কমিশনের রিপোর্ট বাক্স বন্দীই হয়ে থাকবে। বাস্তবে তা ফলপ্রসূ হবে না। তাঁরা আরো বুঝেছিলেন যে নিজেদের লক্ষ্য পূরণের জন্য শিক্ষক সমাজকে যেমন বাইরে মাঠে ময়দানে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে, তেমনি দেশের কর্ণধারদের কাছেও তাদের অভাব অভিযোগের অভিজ্ঞতার লিখিত বিবরণ পৌঁছে দিতে হবে। সেই সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে বাংলার শিক্ষকদের মতামত জানতে চান। এই সুযোগের পূর্ণ সুযোগ করে সত্যপ্রিয় রায়। ১৯৫৪-এর নভেম্বর মাসের দুই তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি মেমোর‍্যান্ডাম প্রেরণ করেন তিনি। সত্যপ্রিয় বাবু এই স্মারক লিপিতে কোন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে গঠনমূলক কাজের অনুরাগী শান্ত শিক্ষকেরা, আজ সভা সমিতি রাজপথে আন্দোলনরত তা বিশদে ব্যাখ্যা করেন। এমন কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা গঠিত মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে গঠিত একটি কমিশনে শিক্ষকদের কোনো প্রতিনিধি না রাখার জন্য, তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রতিবাদও জানান। মুদালিয়র কমিশনের সদর্থক ভূমিকার উল্লেখ করে, কমিশনের সুপারিশ বাস্তবে কতটা রূপায়িত করা সম্ভব সেই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে, সত্যপ্রিয় রায় মেমোর‍্যান্ডামে উল্লেখ করেছিলেন, 'The Mudaliar Commission Report has simply ignored facts. It has given a blurred picture of an ideal state of things. It has however, for gotten that in human affairs revolution in the absolute sense of the term a complete break with the present is an imposibility and things must undergo a gradual and evolutionary change with conscious efforts..... Any attempt to implement these recommendations that ignore realities will be as wasteful and extravagant as the big projects

undertaken in other fields of national life.'[৬৬] এরপরে সত্যপ্রিয় বাবু বাংলার বিদ্যালয়সমূহের পরিকাঠামোগত দুরবস্থা, শিক্ষকদের অত্যল্প বেতনের পরিপ্রেক্ষিতে, অবস্থা সামাল দিতে রাজ্য বাজেটের ২০% ও কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০% শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান। অবশ্য পরিশেষে সবই অরণ্যে রোদন হয়। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় প্রশাসনই এই যুক্তিযুক্ত পূর্ণ আবেদনে কান দেননি।

এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থার ও শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ অবস্থা তদন্তের জন্য নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্যকে দেশের প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা পরিস্থিতির হালহকিকৎ সম্বন্ধে একটি প্রতিবেদন রচনার দায়িত্ব দিলেন। তার দেওয়া প্রতিবেদন অনুযায়ী সারা দেশেই বিভিন্ন রাজ্য কেউই শিক্ষাখাতে মোট বাজেটের ২০% ব্যয় করে না। এদের মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা যথেষ্ট পরিমাণেই খারাপ। শিক্ষা খাতে সেই সময়ে যেখানে মধ্যপ্রদেশ ১৭%, বিহার ১৪%, আসাম ১৬% রাজস্ব ব্যয় করছে, সেখানে এই খাতে পশ্চিমবঙ্গের ব্যয় বরাদ্দ মাত্র ৭%। উড়িষ্যাতে যখন পুলিশ খাতে ১১% ব্যয় ও শিক্ষাখাতে ১৩% ব্যয় করা হয় তখন পশ্চিমবঙ্গে সেই ব্যয় বরাদ্দ হল যথাক্রমে ১৬% এবং ৭%। শিক্ষাখাতে যে মোট ব্যয় পশ্চিমবঙ্গে হত তার মাত্র ৩৭.৫% সরকার থেকে পাওয়া যেত। বাকী সবটাই আসত স্থানীয় সংস্থা বা ব্যক্তির অনুদান বা ছাত্র বেতন থেকে।[৬৭] দুর্গাপ্রসাদবাবু আরো দেখিয়েছিলেন যে বাংলায় আয় ও ব্যয় এবং উভয়ের মধ্যে মাসে মাসে কতটা ফারাক। এই প্রসঙ্গে নিচের সারণি দ্রষ্টব্য।

ইনকাম গ্রুপ	গড় আয়	গড় ব্যয়	ঘাটতি	শিক্ষকপরিবারের গড় আয়	ব্যয়ের অনুপাত শিক্ষক পরিবারের আয়ের শতকরা অনুপাত[৬৮]
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১-১০০	৯৩.০	১৫৩.৯	৬০.৮	৬৮.৭	৪৪.৬
১০১-২০০	১৬১.০	২২৮.৮	৬৭.৮	১৩১.৮	৫৭.৬
২০১-৩০০	২৩৬.১	৩১৭.৮	৮১.৭	১২৫.৩	৩৯.৪
৩০১-৪০০	৩২৬.১	৩৭৬.৫	৫০.৪	১৩৫.৪	৩৬.০
৪০১-৫০০	৪০১.৬	৪৫৫.৯	৪৮.৩	৬৩.৩	১৩.৯
৫০১-এর ঊর্ধ্বে	৬৬৩.৩	৭৯৫.১	৫১.৮	৮৭.৮	১০.৮
সর্বমোট	২১৫.৮	২৭৬.৮	৬১.০	১১৫.৬	৪০.৮

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, যে সমস্ত শিক্ষক পরিবার থেকে এইসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাদের ৫০%ই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু। সংগৃহীত তথ্যে এটাও পাওয়া যায় যে শিক্ষক পরিবারগুলির মধ্যে ১৪% পরিবারের আয় ১-১০০ টাকা, ৪৬.২% এর আয় ১০১-২০০ টাকা, ২০১-৩০০ টাকার মধ্যে আয় ১৪.২% পরিবারের, ৩০১-৪০০ টাকা আয়কারী ৯.২% এবং ৪০১-৫০০ টাকার মধ্যে আয় ৬.২% এবং ৫০০ এর ঊর্ধ্বে আয়কারী

শিক্ষক পরিবার মাত্র ৪.৬%। এর থেকে সহজেই আমরা বলতে পারি তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক পরিবারগুলির প্রায় অর্ধেকাংশের আয় ৫০ টাকার কাছাকাছি।[৬৯]

এই রিপোর্টের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে শিক্ষার পরিকাঠামো ও শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক দুরবস্থা গত শতাব্দীর ৫০-এর দশকে চরম রূপ ধারণ করেছিল। এই পরিস্থিতিতে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি পুনরায় শ্লোগান তুলল, জাতীয় পুনর্গঠনে শিক্ষার দাবি অগ্রগণ্য বলে স্বীকৃতি দিতে হবে। জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ সর্বজনীন শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। উদ্দেশানুগ শিক্ষা দিতে হবে শিক্ষার্থীদের, যাতে ভবিষ্যতে সফল কর্মজীবনে তাদের প্রবেশ করার পথ সহজসাধ্য হয়। এছাড়া জনসাধারণের বদান্যতায় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিকে সরকারি সাহায্য ও ছাত্রদের বৃত্তি, টিফিন প্রভৃতি দেবারও দাবি তোলে সমিতি। তারা আরো দাবি তোলে যে মাধ্যমিক শিক্ষকদের ন্যূনতম দুইশো টাকা মূল বেতন হিসাবে ও পঁয়ত্রিশ টাকা মহার্ঘভাতা দিতে হবে। শেষতঃ এই সব খাতে ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজস্বের অন্ততঃ ২০% শিক্ষাখাতে ব্যয় করতে হবে বলেও সমিতি সোচ্চার হয়।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ক্ষেত্রে তখন চরম অচলাবস্থা চলছে। আমাদের এই ভাঙা বাংলায় মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা তখন ৮৬০টি। তার মধ্যে মাত্র ২৫৪টি বিদ্যালয় সরকারি সাহায্য পায়। সাহায্য ও সাহায্য বিহীন বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা যথাক্রমে ১০,৪৭২ জন এবং ৬,৫২৬ জন। এদিকে সরকারের সংশোধিত বেতনক্রম অনুযায়ী অবস্নাতক শিক্ষকদের বেতন ৫০-৮০ টাকা, স্নাতকদের ৬০-১০০ টাকা ও স্নাতকোত্তরদের ৭৫-১৫০ টাকা দেবার প্রতিবাদে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি অন্যান্য প্রদেশের শিক্ষকদের বেতন হার তুলে ধরেছিল। সমিতি দেখিয়েছিল যে সমসময়ে বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং উত্তর প্রদেশের শিক্ষণ ডিগ্রিধারী গ্র্যাজুয়েট-এর বেতন হার যথাক্রমে ৮০-২০০ টাকা, ১৮৫-২৪৫ টাকা এবং ৮০-১৩২ টাকা। প্রধান শিক্ষকেরাও এই সব প্রদেশে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় যথেষ্ট বেশি বেতন পেতেন।[৭০]

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন স্তরের সরকারি কর্মচারী ও সরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় ও সমযোগ্যতা বা বেশি যোগ্যতার অধিকারী শিক্ষকদের বেতন ছিল অত্যন্ত কম। নিচের সারণী থেকে তা আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি।

সারণি—১[৭১]

সরকারি কর্মচারী ঃ

(অবর বর্গীয় সহায়ক)	বেতক্রম (টাকা)	মহার্ঘভাতা সহ বেতন (টাকা)
সেক্রেটারিয়েট	৮০-১৮০	১২৭-২৫২
ডাইরেক্টরেট	৭০-১৫০	১১৬-২০৯
জেলা পর্যায়ে	৫৫-১৫০	৯৪-১৭৪

(উচ্চবর্গীয় সহায়ক)	বেতনক্রম (টাকা)	মহার্ঘভাতা সহ বেতন (টাকা)
গ্র্যাজুয়েট সেক্রেটারিয়েট	১৮০-৪০০	২০৯-৫১৪
ডাইরেক্টরেট	১৩০-২১০	২০৯-২৮৫
জেলা পর্যায়ে	১০০-১২৫	১৪১-২৮০

এবার আসি সরকারি বিদ্যালয় সমূহের কথায়—নিম্নলিখিত সারণি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, একই ধরনের একই কাজ করলেও তাঁদের তুলনায় কত কম বেতন পেতেন বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা।[৭২]

ম্যাট্রিক ট্রেন্ড শিক্ষক	৭০-১৫০	১০৬-১৯৫
ভাষা শিক্ষক	৮০-১৮০	১১৬-২২৫
শিক্ষণ বিহীন স্নাতক	৬০-১০০	৭০-১১০
শিক্ষণপ্রাপ্ত স্নাতক	৭৫-১৫০	৮৫-১৬০

এই সারণি থেকেও বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তুলনায় অত্যল্প বেতন আমাদের নজর এড়িয়ে যায় না। তাছাড়া সরকারি ভাবে সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ৬১-৮০ টাকা বেতন হারে বেতন পাবার কথা থাকলেও, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কায়েমি পরিচালকমণ্ডলী নানা ছুতোয় তাঁদের ৪১-৬০ টাকা বেতন হারে বেতন নিতে বাধ্য করতেন। এই শোষণকে আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জাত জমিদারদের 'আবওয়াব' বা অতিরিক্ত কর আদায়ের মতো সম্পূর্ণ বেআইনি একটি পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত করতে পারি।

আত্মসচেতন শিক্ষক সমাজ ঃ সংগ্রামে শামিল

এতদিন শিক্ষকেরা তাদের দারিদ্র্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, কিন্তু উপরোক্ত সমীক্ষার ফলে, তারা এমনকি সমযোগ্যতার অন্যদের তুলনায় কত বেশি শোষিত হচ্ছেন, তার একটি পরিষ্কার চিত্র তাদের সামনে ফুটে ওঠে। সামগ্রিক বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মনের আগুন আগে থেকেই ধিকি ধিকি জ্বলছিল, এবার তারা সুসংগঠিত ভাবে দাবানল-এর সৃষ্টি করতে চাইলেন। চাইলেন সুযোগ্য নেতৃত্বের তত্ত্বাবধানে সংগ্রামশীল লড়াই চালাতে। সামনেই ৫৩-এর এপ্রিল মাসে শিক্ষকদের প্রাদেশিক সম্মেলন চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু প্রগতিশীল শিক্ষকেরা আর ধৈর্য ধরতে নারাজ। সাধারণ শিক্ষক বৃন্দের সংগ্রামমুখী মনোভাব আঁচ করেই ৫৩-এর ৮ ফেব্রুয়ারি ভারতসভা হলে, সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্বে প্রগতিপন্থী শিক্ষকেরা একটি সভায় মিলিত হন। সেখানে পুনর্বার জাতীয় ব্যয়ের ২০% শিক্ষাখাতে ব্যয়, পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকদের ২০০ টাকা ন্যূনতম মাসিক বেতন, ৩৫ টাকা মহার্ঘভাতার দাবি সহ চাকুরির নিরাপত্তা ও শিক্ষাঙ্গণে গণতান্ত্রিক পরিসর সৃষ্টির দাবি তোলা হল। ওই বছরেরই ২৪ ফেব্রুয়ারি শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিধানসভা অভিযান করলেন। প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষকের দীপ্ত মিছিল বিধানসভা অভিমুখে যাত্রা করল। পথিমধ্যে অবশ্য পুলিশ গতিরোধ করল তাঁদের। বাধা পেয়ে শিক্ষকরা সেখানেই

অবস্থান করতে শুরু করলেন। সমিতি থেকে বিধানসভা এবং বিধান পরিষদের সদস্যদের শিক্ষকদের পাশে দাঁড়াতে অনুরোধ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল মাত্র ২৬টি সরকারি বিদ্যালয়ের জন্য যেখানে কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে সেখানে রাজ্যের বারোশত বেসরকারি বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র। এই অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য আইনসভার সমর্থন চাইলেন শিক্ষকেরা।[৭৩]

বিধানসভায় সেইদিন এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। দলমত নির্বিশেষে বিরোধীরা শিক্ষকদের দাবি সমর্থন করে, মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় বা তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পান্নালাল বসুকে শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করবার দাবি জানালেন। বিধানসভার বিরোধী নেতা জ্যোতি বসু এই দাবিকে সমর্থন জানালেন। হেমন্ত বসুর মতো সর্বজন মান্য বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রীকে শিক্ষকদের সামনে যাবার অনুরোধ করে বলেছিলেন যে, শিক্ষকদের শোভাযাত্রা একটি সামান্য ব্যাপার নয়। বিপ্লবী গণেশ ঘোষও বিধানসভায় শিক্ষকদের প্রতি বিধান রায় সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেছিলেন।[৭৪] তৎকালীন বিরোধী পক্ষের সদস্যরা সরকারি অনীহার বিপরীতে, শিক্ষক সমাবেশে গিয়েছিলেন। হেমন্তকুমার বসু, জ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদার, ড. মনীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী, সুবোধ ব্যানার্জী, লুৎফুল হক প্রমুখ বিরোধী পক্ষের তাবড় নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি বিরোধীপক্ষের নেতা জ্যোতি বসু সমাবেশে শিক্ষকদের দাবির প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

তৎকালীন সংবাদ মাধ্যমও মোটের উপর শিক্ষকদের দাবিগুলিকে সমর্থন জানিয়েছিল। আনন্দবাজার পত্রিকা ২৬/২/৫৩ তে লিখেছিল, 'শিক্ষা ও শিক্ষকদের ভাগ্যে উদ্বৃত্ত উচ্ছিষ্ট ছাড়া কিছু জুটে না, এই প্রচলিত ব্যবস্থার সংস্কার নহে, আমূল পরিবর্তন ব্যতীত শিক্ষক ও শিক্ষার দুর্গতি ঘুচিবে না।[৭৫] বসুমতী পত্রিকাও শিক্ষকদের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে লিখেছিল '....অভাব অভিযোগের প্রতিকার যখন কিছুতেই আর হয় না, আবেদন নিবেদন যখন সমস্তই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, দুঃখ দুর্দশার চাপে জীবন যখন দুর্বিষহ হইয়া ওঠে, তখন উপায়ন্তর না দেখিয়া মানুষ যদি প্রতিকারের একমাত্র শেষ উপায়কেই গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তা হইলে উহা বিস্ময়ের বিষয় হয় না।'[৭৬]

যুগান্তর পত্রিকায় ২৫.০২.৫৩ তে প্রতিবেদন প্রকাশিত হল, 'সেই মৌন মুখ, শান্ত, শান্তিপ্রিয় শিক্ষক সমাজকেও পাঁচ বছরের কংগ্রেসী শাসন অবশেষে মুখর করিয়া তুলিয়াছে'[৭৭] স্বাধীনতা পত্রিকা লিখল (২৬।০২।৫৩) 'কংগ্রেসী শাসকেরা শিক্ষকদের দাবি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কিন্তু সারা জাতি উহাকে গ্রহণ করিয়াছে নিজের দাবি রূপে।'[৭৮] শিক্ষকদের নতুন শ্লোগান শিক্ষার দাবি জাতীয় দাবি/জাতীয় দাবি মানতে হবে' ছড়িয়ে পড়ল বাংলার সর্বত্র। এই শ্লোগানে শিক্ষকদের সঙ্গে গলা মেলালেন ছাত্র, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবক, শিক্ষাপ্রেমী মানুষ—সবাই।

চুঁচুড়া সম্মেলন

যাইহোক, এসে পড়ল শিক্ষক সমিতির ২৮তম সম্মেলন। স্থান চুঁচুড়া। সময়কাল ১৯৫৩ এর ১২ এবং ১৩ এপ্রিল। সভাপতিত্ব করলেন শ্রী জে. এম. সেনগুপ্ত। চুঁচুড়া সম্মেলন নিখিলবঙ্গ

শিক্ষক সমিতির সংগ্রামময় জীবনের মধ্যে একটি মাইলস্টোন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই সম্মেলন থেকেই ১৯৫৪ এর ঐতিহাসিক সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল যতদিন পর্যন্ত সমস্ত মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এর 'স্কুল কোডের' সুপারিশকে সম্মান দিয়ে নির্দিষ্ট শিক্ষক বেতনের হার ন্যূনতম ২০০ টাকা এবং ৩৫ টাকা মহার্ঘভাতা দেওয়া হবে না, ততদিন সমিতি লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাবে এবং এরই চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৫৪-এর ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষক সমাজ লাগাতার কর্মবিরতির কর্মসূচি রূপায়িত করবেন, সরকারি ঔদাসীন্যের প্রতিবাদে।[৭৯] এদিকে অনিলা দেবীর নেতৃত্বে সমিতির মুখপত্র 'শিক্ষা ও সাহিত্যে' সময়োচিত প্রবন্ধ/নিবন্ধ/গল্প/কবিতা প্রকাশ হতে শুরু করেছিল। চল্লিশ দশক অবধি সমিতির নেতাদের নির্দেশ মতো পত্রিকাটিতে মূলতঃ শিক্ষা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক লেখাই প্রকাশিত হত। কিন্তু ৫০-এর দশক থেকেই মুখপত্রটির একটি চারিত্রিক পরিবর্তন আমাদের নজর এড়িয়ে যায় না। ১৯৫৩-এর ২৪ ফেব্রুয়ারির বিশাল আন্দোলনের ছায়া পড়ল পত্রিকাটিতে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখায়। শাসন কংগ্রেসের প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে শিক্ষক বারিদ বরণ ঘোষ কবিতার ভাষায় লিখলেন ''ওঠ জাগ ভাই, হুমকী ওদের দুই পায়ে দলি চল/উদ্ধত শিরে ফিরায়েছে যারা শিক্ষক মহাজনে/ তাদের গর্ব খর্ব করিতে রাজপথে তুমি বল/নিপীড়িত তাই একতা মোদের হাতিয়ার আজি রণে''।[৮০]

চুঁচুড়া সম্মেলনের আগে সমিতির মুখপত্রে সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও কার্যকরী সভাপতি সত্যপ্রিয় রায় যৌথ বিবৃতিতে বললেন, 'শিক্ষক ও শিক্ষিকা ভ্রাতা ভগ্নীগণ, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পতাকাতলে দাঁড়াইয়া শিক্ষা ও শিক্ষকের দাবি মুখরিত যে ঐতিহাসিক ২৪শে ফেব্রুয়ারি আপনারা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার জন্য দেশের সমস্ত মানুষ আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়াছেন। আপনাদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে নতুন মর্যাদা দান করিয়াছে। সমিতির পক্ষ হইতে আমরাও আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোবৃত্তি ও ঔদাসীন্যের প্রতি কঠিন আঘাত দিবার সময় আসিয়া গিয়াছে। শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষকদের ভাগ্যোন্নতির জন্য প্রয়োজন দুর্বার শিক্ষক আন্দোলন।'[৮১]

মুখপত্রে যে মানসিকতা সাধারণ শিক্ষক ও শিক্ষক নেতৃত্বের লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল, তারই ছায়া ঘন হয়ে পড়েছিল চুঁচুড়া সম্মেলনে। যাইহোক, ৫৪-এর স্বপ্ন বুকে নিয়ে সংগঠনকে সংহত করার ডাক দিয়ে মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত তার সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করলেন। তিনি মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা, স্কুল কোড, শিক্ষকদের দুরবস্থার প্রতি সরকারের ঔদাসীন্য এবং সমিতি সংগঠনের বছরওয়ারী তথ্য পেশ করলেন। সম্মেলনে বিশ্বশান্তি সম্মেলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন, বিনা বিচারে আটক আইনের মেয়াদ বৃদ্ধির অবসান ও রাজনৈতিক কারণে শিক্ষক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। এই সম্মেলনে শুধুই 'শিক্ষকদের মাইনে বাড়াবার বাহানা' ছিল না। বেতনের পাশাপাশি সামগ্রিক শিক্ষা পরিবেশের উন্নতি কল্পে আরো কিছু দাবিও তুলেছিল সমিতি। এই সমস্ত প্রস্তাবের কয়েকটি

হল, (১) রাজ্যের সমস্ত অ-অনুমোদিত বিদ্যালয় সমূহকে অনুমোদন দান ও সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করা। (২) বিদ্যালয়গুলির পঠন-পাঠনের উন্নতির স্বার্থে আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা। (৩) অনগ্রসর এলাকায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। (৪) শিক্ষা খাতে কেন্দ্রীয় বাজেটের দশ ভাগ ও রাজ্য বাজেটের কুড়ি ভাগ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা এবং (৫) শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের পেশাগত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।[৮২]

পুরনোপন্থী নেতাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে সরকার কর্তৃক শিক্ষকদের অপমানকরণের প্রতিবাদে সংগ্রামী আন্দোলন করার ডাক দিয়ে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন সত্যপ্রিয় রায়। প্রস্তাবে বলা হয় জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনায় শিক্ষাকে প্রাধান্য দেবার কোন চেষ্টা কেন্দ্র বা রাজ্য কোনো সরকারই করেনি। শিক্ষা খাতে ব্যয় কমিয়ে দেবার ফলে, এমনকি ঔপনিবেশিক যুগে যেটুকু শিক্ষা কাঠামো ছিল, তাও নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। আর দরিদ্র শিক্ষকদের অর্থনৈতিক কোনো উন্নয়ন হয়নি। মহার্ঘভাতা দেবার প্রশ্নে সরকারি নীরবতার কারণ ও এই প্রস্তাবে জানতে চাওয়া হয়েছিল। ১৯৫৩-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি শিক্ষক জমায়েতের ডেপুটেশন গ্রহণ করতেও সরকার রাজী হয়নি। তাই 'এই সম্মেলন দৃঢ়ভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে যে, শিক্ষকদের দাবি অবিলম্বে গৃহীত না হইলে শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি সরকারি ঔদাসীন্যের প্রতিবাদে পশ্চিমবাংলার মাধ্যমিক শিক্ষক সমাজ আগামী ১৯৫৪ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি হইতে যতদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষকবর্গকে বেতনহার ও ৩৫ টাকা দুর্মূল্যভাতা দিবার সুপারিশকে কার্যকরী করা না হইবে, ততদিন পর্যন্ত শিক্ষাদান কার্য হইতে বিরত থাকিবেন।'[৮৩]

সর্বসম্মতিক্রমে সভায় উপরোক্ত প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয়। আন্দোলনের প্রতি সাধারণ জনগণ ও বিরোধী দলগুলির সহানুভূতি অত্যন্ত জরুরি ছিল। সমস্ত দলমত নির্বিশেষে তাই সমস্ত অভিভাবক ও শিক্ষাদরদীদের সমিতির পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। এই উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য স্থির হয় যে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে সমিতির কর্মপরিষদ গঠন করার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে সমর্থন আদায় করবার জন্য গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করার কাজ চালাতে হবে। আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই সমস্যা মেটানোর লক্ষ্যে ঠিক হয়েছিল প্রত্যেক শিক্ষক-এর কাছ থেকে মাথাপিছু পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়ে একটি সংগ্রাম তহবিল গড়ে তোলা হবে। জনসাধারণের কাছেও সাধ্যমতো অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করার সিদ্ধান্ত নেয় শিক্ষক সমিতি।

চুঁচুড়া সম্মেলনে আরো কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত নিলেন শিক্ষক প্রতিনিধিরা। তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে পুরনো ও নতুন নেতৃত্বের মধ্যে সংযোগকারী নেতা হিসাবে মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হলেও, অন্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত হলেন সংগ্রামশীল নেতৃবৃন্দ। স্বাভাবিক ভাবেই সত্যপ্রিয় রায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হলেন। সমিতির মুখপত্র 'শিক্ষা ও সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক পদে অনিলা দেবীকে নির্বাচিত করা হল। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন কোষাধ্যক্ষ। এছাড়া সংগ্রামশীল নেতাদের প্রতিনিধি স্বরূপ সমিতির ওয়ার্কিং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে থাকলেন নির্মলচন্দ্র গুপ্ত ও ড. ফুলরেণু গুহ।

ততদিনে কংগ্রেস সরকারবিরোধী বামপন্থী এবং কিয়ৎপরিমাণে কংগ্রেসবিরোধী দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি, উদ্বাস্তু আন্দোলন, ট্রাম শ্রমিক সংগ্রাম, ডাক-তার আন্দোলনের মধ্যে তাদের প্রভাব ছড়িয়ে দিতে স্বাভাবিক ভাবেই তৎপর হয়ে উঠেছিল। এইসব দলের নেতৃবৃন্দ সভা/সমিতিতে সমাজের আন্দোলনরত অংশগুলিকে সংহতকরণের জন্য বক্তৃতা দিতেন। বিশেষ করে শিক্ষক আন্দোলনও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তাঁদের আন্দোলনের পাশে বামপন্থী ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, মহিলা সব গণফ্রন্টের কর্মীরাই এসে দাঁড়িয়েছিল। শিক্ষক সমিতির নেতাদের মধ্যে যারা কর্মে ও বিশ্বাসে বামপন্থী ছিলেন, তারা গণসংগঠন ও নিজ দলের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে সেই সময় সচেষ্ট হয়েছিলেন। শিক্ষক ফ্রন্ট ও মূল দলের (এখানে কমিউনিস্ট পার্টির) সংযোগ বৃদ্ধি করার কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রবাদ প্রতীম শিক্ষক নেত্রী অনিলা দেবী। সরকার জানত আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতা ও প্রধান মুখ সত্যপ্রিয় রায় হলেও, আন্দোলনকে গণভিত্তির উপরে দাঁড় করানোর মুখ্য রূপকার হলেন অনিলা দেবী। ১৯৫৩-এর চুঁচুড়া সম্মেলনে শিক্ষকদের আগামীতে যে তীব্র আন্দোলনের নীল নক্সা তৈরি হয়েছিল, তার পিছনে অনিলা দেবীর ভূমিকা যথেষ্ট ছিল। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা অমিতাভ সেনের বক্তব্য যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, ''মার্কসবাদী অনিলা দেবী তার অগ্রণী চেতনায় যেমন ভাবে শিক্ষক আন্দোলনকে বুঝতেন—সত্যপ্রিয় রায় তখনও ঠিক সেইভাবে বুঝতেন না। শিক্ষক আন্দোলনের শীর্ষ নেতা সত্যপ্রিয় রায়ের আন্দোলনের চিন্তা ভাবনাকে পাশে দাঁড়িয়ে ধৈর্য ও যত্নের সাথে জীবনমুখী করে তুলেছিলেন কমরেড অনিলা দেবী। শিক্ষক আন্দোলনে এটা তার উল্লেখযোগ্য অবদান। বিভিন্ন সংগ্রাম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সত্যপ্রিয় রায়ের চেতনার পরিবর্তন হয়েছিল। তিনি নিজেই শ্রমিক শ্রেণি ও শ্রমজীবী মানুষের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে অগ্রণী হয়েছিলেন।''[৮৪]

আন্দোলনে অনিলা দেবীর এই বিশেষ ভূমিকার কথা সরকারও জানত। তাই ৫৩-এর সংগ্রামী কর্মসূচি শিক্ষক আন্দোলনের মঞ্চে গৃহীত হবার অব্যবহিত পরেই, ২৭ সেপ্টেম্বর সরকার কর্তৃক অনিলা দেবীকে নিবর্তনমূলক আটক আইনে গ্রেফতার করা হল। সরকার এই ভাবে আন্দোলনকে দমন করতে সচেষ্ট হলেও, অনিলা দেবীর এই গ্রেফতার শিক্ষকদের সংগ্রামী মনোভাবকে আরো দৃঢ় ও সংহত করে তুলেছিল। বিক্ষোভের ঝড় উঠল এই গ্রেফতারি ঘটনায়। সমিতির মুখপত্র 'শিক্ষা ও সাহিত্যে' শিক্ষক সমিতির নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ও সংগ্রামী অংশের অবিসংবাদিত নেতা সত্যপ্রিয় রায় সরোষে লিখেছিলেন, ''শিক্ষা ও সাহিত্যের সম্পাদিকা, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ওয়ার্কিং কমিটি ও একজিকিউটিভ কমিটির সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্যা শ্রীমতী অনিলা দেবীকে অদ্য (২৭শে) প্রাতে নিবর্তনমূলক আটক আইনে গ্রেফতার করা হইয়াছে শুনিয়া আমরা মর্মাহত হইয়াছি। সরকারি মহার্ঘভাতা এবং বেতন সম্পর্কে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সুপারিশ কার্যকরী করার যে ন্যায় সংগত শিক্ষক আন্দোলন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রবল হইয়া উঠিতেছে তাহাকে

আঘাত করাই এই গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষ হইতে আমরা আইনের ছদ্মবেশে এই বে-আইনি আটকের তীব্র নিন্দা করিতেছি।"[৮৫] শুধুমাত্র বিবৃতি দানের মধ্যেই অবশ্য শিক্ষক সমিতির কাজ থেমে যায়নি। ১৯৫৩-এর ১ অক্টোবর ভারত সভা হলে এই গ্রেপ্তারির প্রতিবাদ করে কেন্দ্রীয় সভার আয়োজন করা হয়। রাজ্যের সর্বত্র শিক্ষকেরা জনপ্রিয় নেত্রীর কারাদণ্ডে প্রভূত বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। অবশেষে জনমতের চাপে ভীত সরকার অনিলা দেবীকে কারামুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিল।

এদিকে সরকার শুধুমাত্র শিক্ষক আন্দোলন প্রশমিত করবার জন্য প্রত্যক্ষভাবে প্রশাসনের সাহায্যে এবং পরোক্ষভাবে ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে শিক্ষকদের উপর শুধু দমনপীড়ন নামিয়ে আনেনি, পুরনো ব্রিটিশ যুগের 'Divide and rule' নীতি প্রয়োগের দ্বারা শিক্ষক আন্দোলনকে বিভক্ত করে, তাকে দুর্বল করার জন্যও সচেষ্ট হয়েছিলেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকেই নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির বিপরীতে, বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষকদের একটি জোট গঠনের জন্য সরকারি মদতে চেষ্টা শুরু হয়। রাজনীতি বিমুক্ত সংগঠন বলে পরিচিতি লাভ করতে সচেষ্ট হলেও, সরকারপন্থী এই শিক্ষক সংগঠন বা হেডমাস্টার্স অ্যাসোসিয়েশান, প্রথম থেকেই ABTA-র সংগ্রামী আন্দোলনমুখী আন্দোলনের বিপক্ষে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। কিছুটা পিছিয়ে ১৯৪৮-এর দিকে তাকিয়ে আমরা দেখতে পাব, যে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিতে বামপন্থীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব রুখতে তৎকালীন শাসক দলের অনুগামী বেশ কিছু প্রধান শিক্ষক নিজেদের পৃথক একটি সংগঠন গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর হন। এঁদের মধ্যে ধরণিমোহন মুখোপাধ্যায়, কামিনী কুমার ঘোষ, জ্যোতিবিকাশ মিত্র, মোহিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখকে আমরা প্রধান শিক্ষক সমিতির জন্মলগ্নের প্রাণপুরুষ বলে চিহ্নিত করতে পারি। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ক্রমশঃ বেড়ে চলা জনসমর্থনকে রোখার জন্য সরকারি মদৎ ও মেলে প্রধান শিক্ষক সমিতির। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রধান শিক্ষক সমিতি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এবং সরকারি শিক্ষা বিভাগের অনুমোদন লাভ করে। সমিতির সাবেক সভাপতি সুধীর অধিকারীর ভাষায়, ''প্রধান শিক্ষক সমিতি জন্মলগ্ন থেকে শিক্ষকদের পেশাগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকে গুরুত্ব দিলেও তাকেই শিক্ষক আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেনি। শিক্ষার প্রসার, শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষার পরিবেশের সুস্থতা, শিক্ষার প্রশাসনিক উৎকর্ষতা ও শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা ও শিক্ষা লাভ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দান সমিতির কর্মসূচীতে প্রাধান্য লাভ করে।"[৮৬]

স্বাভাবিক ভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির মাধ্যমে, তাঁদের মসৃণ জীবনযাপনের ব্যবস্থা না করে, প্রধান শিক্ষক সমিতি আর পাঁচটা শূন্যগর্ভ দাবি তুলে, শিক্ষক আন্দোলনকে প্রথম থেকেই দুর্বল করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিল। শিক্ষকদের জীবন মানের উন্নয়ন করলেই যে শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে সে সত্যই বিস্মৃত হয়েছিল প্রধান শিক্ষকদের সমিতি। গোড়া কেটে শিক্ষা জগতের আগায় জল দেবার নিষ্ফল প্রচেষ্টা ছাড়া তাদের কর্মসূচির কোনো বাস্তব ভিত্তি ছিল না। এদিকে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ডাকে যখন ব্যক্তি শিক্ষক ও শিক্ষা ক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বলিষ্ঠ আন্দোলনের সূচনা

হতে যাচ্ছিল, তখন প্রধান শিক্ষক সমিতি এই আন্দোলন সংগ্রাম কর্মবিরতির বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার চালায়। আমরা দেখি যে বিধানচন্দ্র রায়ের সরকারের শিক্ষা সচিব, শিক্ষকদের দাবির প্রেক্ষিতে সরকারি চাপরাশ এর কাজ গ্রহণের প্রস্তাব দিয়ে শিক্ষক সমাজকে চরম অপমান করেছিলেন, সেই সরকারের প্রধান ডা. বিধান চন্দ্র রায় প্রধান শিক্ষক সমিতির নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর গদগদ কণ্ঠে মন্তব্য করেছিলেন, "I had since the issue of the last statement interviewed a deputation consisting of Head masters of secondary schools as also the members of another deputation from the Board of Secondary Education. I was glad to meet them because they gave me an opportunity of exchanging ideas and discussing all the points raised by the representatives of the All Bengal Teachers Association."[৮৭] নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দলছুট সংগঠন, পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির প্রসঙ্গে পরে আবার আসা যাবে।

৫৪' এর প্রস্তুতি

এখন আমরা ৫৩-এর চুঁচুড়া সম্মেলনের পরে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আন্দোলন সংগ্রামের প্রশ্নে আসব। এই সময়টি সমিতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ৫৪-এর বিশ্বখ্যাত ধর্মঘটের উচ্চ শিখরে উঠবার সোপান শ্রেণি হিসাবেই আমরা এই কালকে চিহ্নিত করতে পারি। সামগ্রিক ভাবেও পশ্চিমবঙ্গে তখন একটি টালমাটাল অবস্থা চলছে। পূর্ব বাংলা থেকে আসা বাস্তুহারাদের দুরবস্থার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এছাড়া মূল্য বৃদ্ধি, খাদ্যাভাব, এর সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস সরকারের জনবিরোধী নীতিসমূহ ও জনতার আন্দোলনকে দমন করার জন্য সরকার কর্তৃক যথেচ্ছ ভাবে নিবর্তনমূলক আটক আইন ব্যবহার করার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ তখন চরমতম পর্যায়ে পৌঁছেছে। কমিউনিস্ট পার্টিকে ৪৮' খ্রিস্টাব্দেই দেশ বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজ্যের মানুষের উপর ওই পার্টির প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।[৮৮] কোলকাতা ও কাকদ্বীপে মহিলাদের উপর জঘন্য অত্যাচার চালিয়েছে কংগ্রেস প্রশাসন। লতিকা সেনদের পাশাপাশি শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন, অহল্যা মা দের মতো সংগ্রামী বীরাঙ্গনারা। আমাদের আলোচ্য সময়পর্বের ১৯৫১ তে সবেমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। বামপন্থীরা কংগ্রেস বিরোধী জোট গড়ে পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার প্রথম নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ২৮টি আসনও পেয়েছিল তারা। কংগ্রেস ২৩৮টি আসনের মধ্যে ১৫০টি পেয়ে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পেলেও, কংগ্রেসের প্রতি মানুষের অনীহার প্রতীক হিসাবে, প্রথম নির্বাচনেই পরাস্ত হয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন, কালিপদ মুখার্জী, বিমলচন্দ্র সিংহ, ভূপতি মজুমদার, রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর মতো বাঘা বাঘা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ।[৮৯] কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম মুখ জ্যোতি বসু, বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা হিসাবে উদ্বাস্তু থেকে ট্রাম শ্রমিকদের দাবিদাওয়া নিয়ে সোচ্চার হচ্ছেন আইনসভায়। আমাদের আলোচ্য শিক্ষক আন্দোলনের দাবি দাওয়া নিয়ে তিনি বিধানসভার অভ্যন্তরে ও বাইরে সোচ্চার।

এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে, সংগ্রামশীল শিক্ষক নেতারা রাজ্যের সর্বত্র জেলায় জেলায় আসন্ন সংগ্রামের বার্তা ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হলেন। উত্তরে কোচবিহার থেকে দক্ষিণে

২৪ পরগণার জেলা সম্মেলনগুলি, শিক্ষকদের দাবি দাওয়ার শ্লোগানে হয়ে উঠলো মুখরিত। ইতোমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট নির্বাচনে শিক্ষক সমিতির অন্যতম নেত্রী অনিলা দেবী সহ কয়েকজনের জয় শিক্ষকদের মনোবল আরো বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছিল। শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন দান সহ শিক্ষা পরিকাঠামোর সামগ্রিক উন্নতি বিধানের জন্য অধিক অর্থ ব্যয় বরাদ্দের শ্লোগান তুলল শিক্ষক সমিতি। 'শিক্ষা সপ্তাহ' উপলক্ষ্যে ১৯৫৩-এর আগস্ট মাসে সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও সম্পাদক সত্যপ্রিয় রায় একটি যৌথ বিবৃতিতে বলেছিলেন, ''কেবল শিক্ষকদের দাবিতেও নয়, সমগ্র জাতির কল্যাণের দাবিতে এই আন্দোলনে জাতির কল্যাণকামী ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই সক্রিয় সহযোগিতা ও সাহায্য আমাদের কাম্য। আমাদের ভরসা আছে আমাদের এই আন্দোলন আপনাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও সর্বপ্রকার সহযোগিতা লাভ করিবে।''[৯০] মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবীর পাশাপাশি চুঁচুড়া সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'শিক্ষা সপ্তাহ' পালনের কর্মসূচি রূপায়ণের প্রস্তুতিতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলেন বীনা মজুমদার, বেলা ঘোষ বা অজিত দাসের মতো সংগঠনের দ্বিতীয় সারির নেতারা। ১৯৫৩-এর ৯ আগস্ট কোলকাতায় বড় জমায়েতের ডাক দেওয়া হল। শিক্ষা সপ্তাহ পালন উপলক্ষে বিদ্যালয়ে প্রদর্শনের জন্য ৩০০ পোস্টার, বাইরের জনতার মধ্যে প্রচারার্থে ১৫ হাজার পোস্টার—এক লক্ষ প্রচার পত্র প্রকাশ করা হয়েছিল। সাধারণ শিক্ষক সহ সব রাজ্যবাসীকে শিক্ষক ও শিক্ষার দাবির কাতারে শামিল করবার লক্ষ্যে, অনিলা দেবীর সম্পাদনায় সমিতির মুখপত্র 'শিক্ষা ও সাহিত্য'তে জ্বালাময়ী লেখা প্রকাশিত হতে থাকে সেই সময়। মুষ্টিমেয় সরকারি স্কুল সরকারের সুয়োরানী হিসাবে অর্থ সাহায্য পেলেও, বেসরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ভাঁড়ে মা ভবানী অবস্থা। ছাত্র বেতনের উপরই বহুলাংশে নির্ভরশীল এই সমস্ত স্কুলগুলি। দেশের আর্থিক অবস্থা তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বেশির ভাগ অভিভাবকের পক্ষে ওই ন্যূনতম বেতনও দেওয়া সহজসাধ্য নয়। ফলে বেসরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা 'Drop out' এর ফলে ক্রমহ্রাসমান। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি সত্যিই তখন সংকটের মুখোমুখি পড়েছিল। এর বিরুদ্ধেই দুর্বার শিক্ষক আন্দোলনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। শিক্ষকদের মুখপত্রে সগর্বে ঘোষিত হয়েছিল শিক্ষকদের দাবি জাতীয় দাবি, শিক্ষার দাবি জাতীয় দাবি—জাতীয় দাবি মানতে হবে।'

ক্রমশঃ শিক্ষা ও সাহিত্য পত্রিকা আরো বেশি আন্দোলনমুখী কথাবার্তা প্রকাশ করতে শুরু করল। সম্পাদকীয়তে লেখা হল, ''যে শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলন ১৯৪৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর ও ১৯৪৯ সালের ১৫ ও ১৬ নভেম্বর সংগ্রামী চেতনায় আত্মপ্রকাশ, যে শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলন ১৯৫৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি জনসাধারণের পাশে রাজপথ চিনে নিয়েছে। ৯ আগস্টের মহান সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ুক ১০ ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় আকারে। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় একজন মাত্র সব্যসাচীকে তৈরি করে, একজন মাত্র দ্রোণাচার্য যদি লক্ষ লক্ষ সব্যসাচী তৈরি করবার এবং লক্ষ লক্ষ একলব্যের 'বাস্তব গুরু' হবার প্রতিক্ষায় দৃঢ় হয়ে ওঠেন, নতুন বাংলা তথা নবভারত রচনায় তাঁদের সমিতির সংগ্রামী ভূমিকাকে সেদিন কোনো অন্ধকার, কোন অধর্ম, কোন দর্পী শক্তি অস্বীকার করবে।''[৯১]

একদিকে শিক্ষকেরা সেই সময় যেমন আন্দোলনের চরম বিস্ফোরণের দিকে তাকিয়ে দিন গুনছেন, প্রস্তুতি নিচ্ছেন, সেই একই সময়ে রাজ্য সরকারও, আন্দোলনের তরঙ্গ দেখে প্রমাদ বোধ করছেন। শিক্ষক ছাঁটাই চলছে লাগাতার ভাবে। এই সময়ে শিক্ষক সমিতি শিক্ষক ব্যতিরেকে শিক্ষাকর্মীদের দাবি দাওয়া নিয়েও সোচ্চার হয়েছিল। স্কুল এর কর্মীরাও দলে দলে বালার্ক অঙ্কিত সমিতির পতাকা তলে যোগ দিচ্ছেন। কেননা তারা বুঝেছিলেন যে এই সমিতির নেতৃত্বে তাদের দুরবস্থার অবসান কল্পে সঠিক ভাবে আন্দোলন করা সম্ভবপর হবে।

সেই সময় ট্রাম শ্রমিকদের আন্দোলনে কোলকাতা উত্তাল। তাঁদের দাবিদাওয়ার সমর্থনে ছাত্র, মহিলা সংগঠনগুলি সোচ্চার। শ্রমিক সংগঠন তো তাঁদের পাশে আছেই। ১৯৫৩-এর জুলাই মাস জুড়ে চলেছে এই আন্দোলন। আন্দোলনের বলি হয়েছেন ষাট বছরের বৃদ্ধ শিক্ষক শৈলেন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রথম নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে ধারাবাহিক সংগ্রামের পাশাপাশি অন্যান্য শ্রমজীবীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল শিক্ষক সমিতি। ১৯৫৩-এর ১৫ জুলাই ট্রাম শ্রমিকের দাবি দাওয়ার পক্ষে এবং ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি এক সভা আহ্বান করেছিল। সেখানে নিহত শিক্ষক শৈলেন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ট্রাম আন্দোলনের 'শিক্ষক শহীদ' হিসাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ৩ আগস্ট দিনটিকে 'শৈলেন্দ্র হত্যা প্রতিবাদ দিবস' হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেন শিক্ষকেরা। এর পাশাপাশি ২ থেকে ৯ আগস্টের 'শিক্ষা সপ্তাহ' পালনের জন্যও প্রস্তুতি চালাচ্ছিল শিক্ষক সমিতি। শুধুমাত্র রাজধানী কোলকাতায় নয়, প্রায় প্রত্যেক জেলা ও মহকুমা স্তরে জনসভা করে নিজেদের আন্দোলন সংগ্রামের কথা সাধারণ মানুষে মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিল। আন্দোলনের সপক্ষে শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের সই সংগ্রহ করা ছাড়াও সংগঠনের আর্থিক বুনিয়াদকে শক্ত করার তাগিদে কুপন বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহের কাজও করছিলেন শিক্ষকেরা। এর সঙ্গে সমিতি সদস্য শিক্ষকদের কাছ থেকে জন প্রতি পাঁচ টাকা চাঁদা নিয়ে সংগ্রাম তহবিলও গঠন করতে তৎপর হয়ে ওঠে সমিতি। ৫৩-এর ৯ আগস্ট, শিক্ষা সপ্তাহ পালনের চূড়ান্ত দিনে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (অধুনা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) এক জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন আহূত হয়েছিল।[৯২]

এই সময়ে কোলকাতার বাইরে মফঃস্বলে আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে দেবার ক্ষেত্রে অনিলা দেবী একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এছাড়া আন্দোলনের প্রস্তুতির জন্য সারা বাংলা জোড়া প্রচার কার্যে যারা আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ রায়, সুধা রায় ও কালিপদ কুণ্ডুর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোলকাতায় অজিত দাস, শচীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আন্দোলনের রাশ ধরার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া হাওড়ার বিজয়রত্ন বক্সী, বীনা সেনগুপ্ত, হুগলিতে সমিতির সহসভাপতি বলাই চাঁদ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ষষ্ঠীচরণ সেন, অনিল বসু, সুহাসিনী সেন প্রমুখ, অবিভক্ত চব্বিশ পরগণায় নির্মলচন্দ্র গুপ্ত এবং বামনদাস মণ্ডল, মেদিনীপুরে জগদীশচন্দ্র দাস ও কালোবরণ চট্টোপাধ্যায়, অবিভক্ত বর্ধমানে তারাকুমার মিশ্র, ধীরেন পতি, ধর্মদাস চৌধুরী প্রমুখ, মুর্শিদাবাদে

সন্তোষ ভট্টাচার্য এবং সুশীল ঠাকুর, নদীয়ার বীরেন আচার্য, জলপাইগুড়িতে চুনীলাল সাহা ও সুরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুরে ধীরেন ভট্টাচার্য, হেমপ্রসন্ন চক্রবর্তী, মালদহে রেণু লাহিড়ী, কমলা চৌধুরী, বীরভূমে শরৎচন্দ্র প্রামানিক এবং বাঁকুড়াতে ভোলানাথ ঘোষ ও তারাপদ শিকদারের নেতৃত্বে শিক্ষকদের আসন্ন আন্দোলন যজ্ঞের সমিধ সংগ্রহের কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সংগঠিত হয়েছিল।[৯৩] অনেক নতুন নতুন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী উপরোক্ত নেতৃত্বের প্রভাবে, সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে আন্দোলনের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

বিভিন্ন জেলায় জেলাওয়ারি যে সব সভা, সমিতি সংগঠিত হয়েছিল তার একটি চুম্বক বিবরণ দেওয়া হয়তো এ প্রসঙ্গে অসঙ্গত হবে না।

সারণি—২[৯৪]

জেলা	সভার স্থান	তারিখ
কোলকাতা	হাজরা পার্ক	০৪।০৮।৫৩
	দেশবন্ধু পার্ক	০৬।০৮।৫৩
	কেশব অ্যাকাডেমী	০৭।০৮।৫৩
	ভবানীপুর মিত্র ইনসটিটিউশন, ওরিয়েন্টাল অ্যাকাডেমি ও বেলতলা বালিকা বিদ্যাপীঠ	
হাওড়া	আমতা পীতাম্বর বিদ্যালয়	০৫।০৮।৫৩
	সেবা সংঘ ময়দান	০৬।০৮।৫৩
	ফ্রেন্ডস্ ইউনিয়ান হল	০৭।০৮।৫৩
	সালকিয়া আর্যসমাজ হল	০৮।০৮।৫৩
	এছাড়া বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে সভা হয়	
অবিভক্ত ২৪ পরগণা	ভাটপাড়া উচ্চবিদ্যালয়	০১।০৮।৫৩
	যাদবপুর বাস্তুহারা বিদ্যাপীঠ	০২।০৮।৫৩
	কাঁচড়াপাড়া, বীজপুর	০২।০৮।৫৩
	বরানগর ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়	০২।০৮।৫৩
	বজবজ প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যালয়	০৫।০৮।৫৩
	বেলঘরিয়া বিদ্যালয় ময়দান	০৫।০৮।৫৩
	হিজল পাড়া ইউনিয়ন বোর্ড	০৫।০৮।৫৩
	বাহাদুরপুর উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়	০৬।০৮।৫৩
	ডায়মন্ডহারবার বিদ্যালয়	০৬।০৮।৫৩
	খড়দহে জনসভা	০৭।০৮।৫৩
	গার্ডেনরিচ কবরডাঙ্গা ময়দান	০৭।০৮।৫৩

	বনগাঁ হরিপদ ইনসটিটিউশন	০৭।০৮।৫৩
	বীজপুর উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়	০৭।০৮।৫৩
	ব্যারাকপুর এ. বি. মডেল বিদ্যালয়	০৮।০৮।৫৩
২৪ পরগণা	মহেশতলা	০৮।০৮।৫৩
	বনগ্রাম বিদ্যালয়	০৮।০৮।৫৩
	সরিষা বিদ্যালয়	০৮।০৮।৫৩
	ইকড়া বিদ্যালয়	০৮।০৮।৫৩
	হাড়োয়া	০৮।০৮।৫৩
	রহড়া, ইছাপুর	০৮।০৮।৫৩
	গড়িয়া বরদা প্রসন্ন বিদ্যালয়	০৮।০৮।৫৩
	গারুলিয়া, কাঁচড়াপাড়া, গয়েশপুর	০৮।০৮।৫৩
	তপসী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়	০৯।০৮।৫৩
বর্ধমান	বর্ধমান পৌর বিদ্যালয়	০২।০৮।৫৩
	বর্ধমান শহরে সভা	০৩।০৮।৫৩
	পাটুলি উচ্চ বিদ্যালয়	০৩।০৮।৫৩
	বাণীপীঠ বিদ্যালয়	০৪।০৮।৫৩
	বর্ধমান শহরে শোভাযাত্রা	০৭।০৮।৫৩
	রাণীগঞ্জ শহরে সভা	০৭।০৮।৫৩
	কাটোয়া সূর্যনারায়ণ মেমোঃ হল	০৮।০৮।৫৩
	কাটোয়া টাউন হল	১৬।০৮।৫৩
	শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে গুসকরা, ভাতার সেহারা, মেমারি ও হীরাপুরেও সভা হয়	
নদীয়া	আড়ংঘাটায় সভা	০৭।০৮।৫৩
	শিকারপুরে সভা	০৭।০৮।৫৩
	কৃষ্ণনগরে সভা	০৮।০৮।৫৩
	মাজদিয়া রাজুবালা ভারতী হল	০৮।০৮।৫৩
	নবদ্বীপ বড় আখড়ায় সভা	০৮।০৮।৫৩
মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর শহরে সভা	০৩।০৮।৫৩
	মনীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাপীঠ	০৬।০৮।৫৩
	বহরমপুর গ্র্যান্টস হল ময়দান	০৮।০৮।৫৩
	জঙ্গীপুর লোঢ়া পার্ক	০৮।০৮।৫৩
	ধূলিয়ান ও লালবাগ শহরে	০৮।০৮।৫৩

* শিক্ষা সপ্তাহে এছাড়াও রাজারামপুর এবং পাঁচগ্রামে সভা হয়েছিল

বীরভূম	রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল পৌরমন্দির	০৮।০৮।৫৩
	সিউড়ি বিদ্যালয়	০৮।০৮।৫৩
	সবদলপুর রেল ময়দান	০৮।০৮।৫৩
	বোলপুর শিক্ষক-ছাত্রবৃন্দের মিছিল	০৮।০৮।৫৩
	নলহাটি বিদ্যালয়	—
	সাঁইথিয়া বিদ্যালয়	১১।০৮।৫৩
হুগলী	চুঁচুড়া ময়দানে সভা	০৮।০৮।৫৩
	শ্রীরামপুর মহকুমায় সভা	—

*এছাড়া কিংকরবাটী কৃষি উচ্চ বিদ্যালয়, গরলগাছা, ডিহি বাগাশাল স্কুল এবং কে বি রায় স্কুলে শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দিনে সভা হয়

বাঁকুড়া	বাঁকুড়া কলেজিয়েট স্কুল	০৮।০৮।৫৩
	তিসুড়ী কাছারী প্রাঙ্গণে	০৯।০৮।৫৩
	বিবেকানন্দ হিন্দু বিদ্যালয়	০৯।০৮।৫৩
মেদিনীপুর	পেডকি মেমোরিয়াল হল	০৩।০৮।৫৩ এবং ০৮।০৮।৫৩
	রামনগর	০৮।০৮।৫৩
	কৃষ্ণলাল শিক্ষায়তন	০৮।০৮।৫৩
	মোড়গ্রাম ননীবালা বিদ্যালয়	০৯।০৮।৫৩
জলপাইগুড়ি	আলিপুরদুয়ার পুরনো দুর্গাবাড়ি	০৭।০৮।৫৩
	জলপাইগুড়ি শহর শিক্ষক সভা	০৭।০৮।৫৩
	চেঙ্গমারি	০৯।০৮।৫৩
	জলপাইগুড়ি ফণীন্দ্রদেব উচ্চ বিদ্যালয়	০৯।০৮।৫৩
পশ্চিম দিনাজপুর	বালুরঘাট সুরেশরঞ্জন পার্ক	০৭।০৮।৫৩
	কালিয়াগঞ্জ মহেন্দর গঞ্জ ময়দান	০৫।০৮।৫৩
	হরিরামপুর শহর	০৮।০৮।৫৩
	নজমুনাট্য নিকেতন	০৯।০৮।৫৩

এইভাবে যদি আমরা দেখি, তবে দেখতে পাব যে বাংলার প্রায় সব জেলায় চূড়ান্ত শিক্ষক সংগ্রামের প্রস্তুতি জোর কদমেই সেই সময় চলেছিল। উপরোক্ত অঞ্চলগুলি ছাড়াও মালদহ জেলার মালদহ টাউন হলে, দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়িতে এবং কোচবিহারে ৮ আগস্ট ১৯৫৩তে শিক্ষক সপ্তাহ উপলক্ষ্যে সভা বসেছিল।

জেলায় জেলায় আসন্ন আন্দোলনের প্রস্তুতি

এই প্রসঙ্গে জেলা স্তরের যে সমস্ত নেতারা আসন্ন আন্দোলনের অগ্রদূত হিসাবে ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে কিছু মানুষের নাম উল্লেখ করতেই হয়—কারণ এরাই মূল আন্দোলনের মঞ্চের খুঁটি স্বরূপ হয়ে আন্দোলনকে একটি শক্ত পরিকাঠামোর উপর দাঁড় করিয়েছিলেন। জেলাওয়ারি হিসাবে আমরা প্রথমেই কোলকাতার সন্নিকটস্থ হাওড়া জেলার কথা উল্লেখ করব। হাওড়া জেলায় ১৯৫০-এর দশক থেকেই শিক্ষক সংগঠনের প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছিল। হাওড়ায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই এখানে ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা প্রথম পাশ্চাত্য ধাঁচের স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৪৬ খ্রিঃতে সরকারি উদ্যোগে হাওড়া জেলা স্কুল স্থাপিত হবার পর, সালকিয়া, বলুহাটি, জগৎবল্লভপুর, শিবপুর, ব্যাটরা প্রভৃতি অঞ্চলে ক্রমশঃ বেসরকারি উদ্যোগে বিদ্যালয়সমূহ গড়ে উঠতে শুরু করে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি গঠন করার অব্যবহিত পরে হাওড়াতে এই সংগঠনের শাখা গড়ে ওঠে। প্রথম দিকে অনিলভূষণ গাঙ্গুলি ও সুরেন্দ্র মোহন ঘোষের নেতৃত্বেই শিক্ষক সমিতির কাজকর্ম চলত। আমাদের বর্তমান আলোচ্য সময়ে জেলা সম্পাদক সুধাংশু শেখর ভট্টাচার্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিজয় রতন বক্সী ও নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নেতৃত্বে জেলা সংগঠন পরিচালিত হত। ১৯৫৩ খ্রিঃ আন্দোলনকে তার প্রচার ও সাফল্যের উদ্দেশ্যে এই জেলার তরুণ শিক্ষকরা যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গাগত শিক্ষকেরা এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছেন। ৫৩-এর একটি হিসাবে দেখা যায়—আন্দোলনের জোয়ারে বিদ্যালয় সদস্যভুক্তি ১৯ থেকে এক লাফে ৩৮টি স্কুলে বিস্তৃত হয়।[৯৫]

হুগলী জেলাতেও ১৯২২ খ্রিস্টাব্দেই সমিতির শাখা গড়ে ওঠে। প্রারম্ভিক পর্বে যতীন্দ্রনাথ রায়, হরিচরণ সিংহ প্রমুখেরা জেলা সংগঠনের দায়ভার গ্রহণ করেন। গত শতকের ৫০-এর দশকে জেলা সমিতি পরিচালনার দায়িত্ব বর্তায়—শিক্ষক নেতা শশিমোহন ভট্টাচার্য, মোহিনী মোহন পাল চৌধুরী ও অজিত বাগের উপর। এই পর্যায়ে শিক্ষিকা সুহাসিনী সেনও জেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।[৯৬]

পুরুলিয়া জেলার প্রায় সবটাই স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেও বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুরুলিয়া বিহার প্রদেশের অংশ থাকাকালীনই এখানে 'মানভূম জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি' বা MDSSTA, শিক্ষক স্বার্থে আন্দোলন পরিচালনা করত। এদিকে পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকেই মানভূম অঞ্চলের বাংলাভাষী অঞ্চলগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তিকরণের দাবিতে লোকসেবক সংঘের নেতৃত্বে এক ঐতিহাসিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এই আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৫৬ তে পুরুলিয়া অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাই ১৯৫৩-৫৪-এর আন্দোলনে স্বাভাবিক ভাবেই পুরুলিয়া জেলার শিক্ষকেরা অংশ নেয়নি। তবে তারা এই আন্দোলনের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিল।[৯৭]

এবার আসি বর্ধমান জেলার কথায়—এই জেলায় সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন হরিদাস গোস্বামী। এছাড়া ওই সময়পর্বে জেলা নেতাদের মধ্যে নীরদ মাহাতো এবং লক্ষ্মীনারায়ণ কুণ্ডুর নাম বিশেষ ভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়। এদের পরে যাঁরা

জেলা কমিটির হাল ধরেছিলেন, তারা হলেন অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিক্ষকবৃন্দ। ১৯৫৩ খিস্টাব্দে জহর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক থাকাকালীন প্রাদেশিক স্তরের মতো এই জেলার শিক্ষকেরাও আন্দোলনের তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে প্রবল ভাবে সক্রিয় হন। এই সময়ে বর্ধমানে শিক্ষক সমিতির এতটাই প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে জেলা স্তরের নিচে মহকুমা স্তরেও আন্দোলন পরিচালনার জন্য সুদক্ষ নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। বর্ধমান সদর, আসানসোল, কাটোয়া ও কালনায় মহকুমা সমিতি গঠিত হয়। বর্ধমান সদরের সম্পাদক নির্বাচিত হন দেবেন লাহিড়ী। পরে এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন আমোদবিহারী বসু। এছাড়া কালনার সূর্যকুমার সিংহ, দেবেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, কাটোয়ার পটল মিত্র, রামরঞ্জন সিংহ, আসানসোল মহকুমার অশ্বিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, চতুরানন চট্টোপাধ্যায় এবং বর্ধমান সদরের বিমলাপদ হাজরা, আসরফ আলম, অজিত দত্ত, সরোজ গুপ্ত প্রমুখ শিক্ষক নেতাদের নাম আমরা উল্লেখ করতেই পারি।[৯৮]

বাঁকুড়া জেলায়, মূল সমিতির জন্মের প্রায় এক দশক পরে সমিতির শাখাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার প্রথম সভাপতি ছিলেন ভোলানাথ ঘোষ। এছাড়াও হৃদয়ভূষণ মিত্র, রসময় ভট্টাচার্য প্রভৃতি নেতারা ও বিভিন্ন কালপর্বে জেলায় শিক্ষক সমিতি গঠনের ভগীরথ বলে বিবেচিত হন। স্মর্তব্য সরকারি প্ররোচনায় বামনদাস মণ্ডলের নেতৃত্বে ৫০-এর দশকে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি থেকে কিছু শিক্ষক বের হয়ে আসেন এবং W.B.T.A. বা পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি নামে একটি ভুঁইফোড় সংগঠন স্থাপন করেন। এই ভাঙন যেহেতু ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর সম্মেলনে সংঘটিত হয়েছিল, তাই এই জেলায় আংশিকভাবে শিক্ষক সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যাইহোক তা সত্ত্বেও বাঁকুড়ার শিক্ষকেরা ১৯৫৩-৫৪ এর আন্দোলনে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।[৯৯]

অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা জেলায়ও গত শতাব্দীর ৫০-এর দশকে শিক্ষক আন্দোলন দুর্বার হয়ে পড়েছিল। চব্বিশ পরগণা জেলার সাবেক জেলা সম্পাদক রমেশ ভট্টাচার্য একটি সাক্ষাৎকারে বর্ণনা দিয়েছেন কীভাবে পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুহারা হয়ে এসে, দক্ষিণ ২৪ পরগণার শিক্ষক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। উনি অবশ্য অবিভক্ত বাংলায় অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের কুমিল্লায় থাকাকালীনই নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সংস্পর্শে এসেছিলেন। এদিকে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ২৪ পরগণার জেলায় সমিতির সম্পাদক ছিলেন নির্মলচন্দ্র গুপ্ত। তিনি এবং বিজয় বসু এবং রমেশ ভট্টাচার্য তখন জেলায় সংগঠন পরিচালনা করতেন। রমেশ বাবু যেহেতু পরবর্তীকালের উত্তর চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে কাজ করতেন, তাই তাঁর লেখায় নৈহাটি, ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, জগদ্দল অঞ্চলের শিক্ষকদের তৎকালীন জঙ্গি আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে।[১০০]

দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে যদি আমরা ১৯৫৩-৫৪ খ্রিস্টাব্দের আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির খোঁজ করি, তাহলে দেখতে পাব যে রাজ্যের উত্তরাংশে তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলায় আন্দোলন যথেষ্ট জোরদার ছিল। প্রথমে জলপাইগুড়ির কথায় আসি। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে যখন জলপাইগুড়িতে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ষোড়শ অধিবেশন হয়, তখন থেকেই জেলায় সমিতির কার্যকলাপে একটা নতুন গতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। তরণীমোহন চক্রবর্তী, হরিপদ বিশ্বাস প্রভৃতি বিশ্রুত শিক্ষকেরা এই প্রাথমিক পর্বে জেলায় সমিতির নেতৃত্বে

ছিলেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে শিলিগুড়ি সম্মেলনে নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবীরা যখন সমিতিতে সংগ্রামশীল অংশের প্রাধান্য সুনিশ্চিত করেন, তখন সুরেন্দ্র মোহন শাস্ত্রী, শচীভূষণ ঘোষ, উপেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, সত্যশরণ বাগচী প্রমুখের নেতৃত্বে, জেলা সমিতির কর্মধারায় এক নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। উপরোক্ত নেতৃত্ব ছাড়াও এই সময়ে এই জেলায় সুধীর কুমার চক্রবর্তী, তারা বন্দ্যোপাধ্যায়, চুনীলাল সাহা প্রভৃতি শিক্ষকের উদ্যোগে, ৫৩ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষক সপ্তাহ পালন, সংগ্রাম তহবিল সংগ্রহ অভিযান, স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজ যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে প্রতিপালিত হয়। কোলকাতায় সেই সময় সমিতির যে কেন্দ্রীয় সভাগুলি হত, সেখানেও জলপাইগুড়ি সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে তারা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল বাগচী, ষষ্ঠী পাল প্রভৃতি জেলা নেতৃত্ব প্রতিনিয়ত যোগদান করতেন। জেলায় সমিতির ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রামের নব পর্যায় এইভাবেই শুরু হয়।[১০১]

তৎকালীন অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলায়ও ৫০ এর দশকে সমিতির কার্যকলাপে যথেষ্ট গতিবেগ এসেছিল। এই জেলায়ও ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে সমিতির চব্বিশতম প্রাদেশিক সম্মেলনের পর শিক্ষক সমাজ সমিতির কর্মধারা সম্বন্ধে বেশি বেশি করে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। শিক্ষক নেতা নৃপেন্দ্রনাথ মহন্তের এক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়—'সমিতির এই দিনাজপুর সম্মেলন কার্যত 'নক্ষত্র সম্মেলনে' পরিণত হয়। সভাপতিত্ব করেন ড. মেঘনাদ সাহা। উদ্বোধনী ভাষণ দেন অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ আর শিক্ষামূলক অধিবেশনে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন ড. নীহাররঞ্জন রায়, অধ্যক্ষ জে. এম. কেনিথকর প্রমুখ জ্ঞানতাপস।'[১০২] থাক সে কথা—গত শতাব্দীর ৫০-এর দশকে সমিতির সংগ্রামময় দিনগুলিতে জেলা সমিতির সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকার ছাড়াও বিশ্বমোহন রায়, ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নিশীথরঞ্জন রায়, গোপেন্দ্রনাথ সাহা প্রমুখ অগ্রণী শিক্ষকেরা জেলায় সমিতির সংগ্রামী মশালকে বহন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষক সমিতির চুঁচুড়া সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলা সমিতির সদস্যদের উদ্যোগে অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ সহ জেলার প্রায় সব গ্রাম শহরে মিটিং মিছিলের আয়োজন করা হয়। একদল সাহসী কর্মী বাহিনী সেই সময়ে জেলা সমিতিকে সমৃদ্ধ করে। এঁদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ সাহা, নরেন পাল, নারায়ণ বাগচী, পুষ্প রায় (চক্রবর্তী) প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতেই পারে। এছাড়া মূলতঃ প্রচার আন্দোলনে জেলায় হেমপ্রসন্ন চক্রবর্তী এবং সুশীল ঠাকুরের কথা সমসাময়িক অনেক ব্যক্তিরই মনে পড়তে পারে।[১০৩]

জেলা পরিক্রমার পর ফিরে আসি কোলকাতায়। কোলকাতা দ্বিধা-বিভক্ত বঙ্গের পশ্চিমাংশের রাজধানী তাই শিক্ষক সমিতির রাজ্যব্যাপী আন্দোলনের স্নায়ুকেন্দ্র ছিল এই শহর। কোলকাতায় ৫৩-৫৪-এর মূল আন্দোলন যারা পরিচালনা করেছিলেন সেই সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী, রথীন্দ্র কৃষ্ণদেব, গোলকপতি রায় ব্যতিরেকেও কোলকাতাকেন্দ্রিক আন্দোলনকে জেলার তৃণমূল স্তরে ছড়িয়ে দেবার ক্ষেত্রে একদল নীরব কর্মীও উঠে এসেছিলেন। তৎকালীন এইসব নেতা কর্মীদের অন্যতম নীলিমা সেনের স্মৃতিচারণা থেকে আমরা জানতে পারি, 'এই সংগ্রামের সঙ্গে আমি (নীলিমা দেবী) খুব ঘনিষ্ঠভাবেই যুক্ত ছিলাম।.... স্কুলে স্কুলে যাওয়া,

ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করা এই সব আমরা করে যাচ্ছিলাম। তারপর যখন অবস্থান এবং Cease work শুরু হয়ে গেল আমরা তো এসপ্ল্যানেড ইস্টেই বসে থাকতাম। সেই সঙ্গে সকালে মরনিং স্কুল এবং তারপরই ডে স্কুলগুলোতে পিকেটিং-এর জন্য ছুটতে হত। মাস্টারমশাইরা এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে থাকতেন। একটু ফাঁক পেলেই স্কুলে ঢুকে পড়তেন। তাই আগে থেকেই গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তাঁদের আসার সম্ভাবনা থাকত।'[১০৪] আন্দোলনের ক্রমপ্রগতির উদাহরণ হিসাবে কিছু জেলার সংগঠন ও সংগ্রামের সালতামামি লিখবার পর এবার আবার আমরা ৫৩-৫৪ সালের মূল আন্দোলনের ঘটনাক্রমিক ধারাবাহিক বিবরণ দানে প্রবৃত্ত হব।

আন্দোলনের নান্দিমুখ

১৯৫৩-এর ৯ আগস্ট শিক্ষক সংগঠনের ডাকে 'জাতীয় শিক্ষা দিবস' পালনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। ওই দিন পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও শিক্ষকেরা এসে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) সমবেত হয়েছিলেন। এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, কংগ্রেস সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কর্মীরা, প্রাদেশিক কৃষক ও শ্রমজীবীদের সংগঠন, আইনজীবীদের সংস্থা সহ শিক্ষাব্রতী ত্রিগুণা সেন, গোপাল হালদার ও আনন্দবাজার পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের মতো বিশিষ্ট নেতারা উপস্থিত ছিলেন, এই সভায়।

১৯৫৩-এর এই জাতীয় শিক্ষক দিবসের প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, ''যে সকল বিদ্যালয় স্থানীয় অধিবাসীর শিক্ষালাভের তাগিদে এবং জনসাধারণ বা ব্যক্তি বিশেষের বদান্যতার সাহায্যে গড়িয়া উঠিয়াছে, সমস্ত দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সরকারকে সেগুলিকে স্বীকৃতি দিতে হইবে এবং সরকারি সাহায্য দিয়া সেগুলির মান উন্নত করতে হবে।... শিক্ষকদের চাকুরির নিরাপত্তা, দায়িত্বানুযায়ী বেতন ও মর্যাদা স্বীকার ব্যবস্থা করিতে হইবে....এই পরিপ্রেক্ষিতে এই জাতীয় সম্মেলন মনে করে যে এই দুর্মূল্যের দিনে ২০০ টাকা বেতনের কমে পরিবার প্রতিপালন করিয়া নিশ্চিত মনে স্বীয় দায়িত্ব পালন করা কোনো শিক্ষকের পক্ষে সম্ভবপর নহে।"—এই সম্মেলনের এই ঘোষণা প্রমাণ করে, শিক্ষক আন্দোলন নিজেদের আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হলেও, কখনোই 'অর্থনীতিবাদের' দ্বারা প্রভাবিত হয়নি এবং নিজেদের দাবি দাওয়ার পাশাপাশি সামগ্রিক ভাবে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নয়নও তাঁদের কাম্য ছিল।[১০৫]

বাংলার প্রায় সব প্রখ্যাত জননেতা সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে শিক্ষক আন্দোলনের তাঁদের সহমর্মিতা প্রকাশ করেন। এদের মধ্যে আমরা জ্যোতি বসু, সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত বসু, ত্রিদিব চৌধুরী, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরদা মুকুটমণি, রণেন সেন, বঙ্কিম মুখার্জী প্রমুখের নাম উল্লেখ করতে পারি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজ্ঞ রাধাবিনোদ পাল সরকারি শিক্ষানীতির সমালোচনা করে শিক্ষা ও সংস্কার ও শিক্ষকদের জীবন জীবিকার লড়াই-এ তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেন। শিক্ষক আন্দোলনের নেত্রী মায়া চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণ থেকে আমরা জানতে পারি, পূর্ব বাংলা থেকে উৎখাত হয়ে আসা উদ্বাস্তু শিক্ষকেরাও দলে দলে অম্বিকা চক্রবর্তী, জ্যোতিষ জোয়ারদার কিংবা প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর মতো উদ্বাস্তু নেতাদের আহ্বানে শিক্ষক আন্দোলনকে সাফল্যের সিংহদুয়ারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন।[১০৬] শিক্ষকদের দাবির

যৌক্তিকতা সমর্থন করে, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সম্পাদক কেশবেশ্বর বসু সরকারের কাছে আবেদন করলেন যে, বাইশ হাজার শিক্ষক ও সাড়ে সাত লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে শিক্ষকদের সঙ্গে সরকারের মীমাংসায় বসা উচিৎ।[১০৭]

ওয়েলিংটনের সভায় মূল প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন সত্যপ্রিয় রায়—তাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন অনিলা দেবী। প্রস্তাব রাখা হল, রাজ্যের সমস্ত অসরকারি বিদ্যালয়কে স্বীকৃতি ও সাহায্য দান, আধুনিক শিক্ষা সহায়তাকারী সাজ সরঞ্জাম প্রদান, অনগ্রসর অঞ্চলে নতুন নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও গণতান্ত্রিক মধ্য শিক্ষা পরিষদ গঠন, শিক্ষাখাতে রাজ্যের ১০% এবং কেন্দ্রীয় বাজেটের ২০% প্রদান। সর্বোপরি শিক্ষকদের চাকরির নিরাপত্তা ও ৩৫ টাকা মহার্ঘভাতা সহ মাসিক অন্যূন ২০০ টাকা বেতন—সরকারকে এই সমস্ত দায়ভার নেবার দাবিতে সভায় মতৈক্য প্রকাশ করা হয়েছিল।

সত্যপ্রিয় রায়/অনিলা দেবী বুঝেছিলেন, আন্দোলনকে সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হলে, শুধু শিক্ষককুল বা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকে সম্বল করলে চলবে না—সংগ্রামকে যদি সঠিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত করতে হয় তবে লৌহদৃঢ় একটি সাংগঠনিক কাঠামো অবশ্যই প্রস্তুত রাখতে হবে। সাংগঠনিক ভাবে শক্তিশালী হবার রূপরেখা প্রস্তুতের জন্য ৫৩-এর ৩০ আগস্ট সমিতির কার্যকরী পরিষদের সভা বসল, ওই মাসেরই ৩১ তারিখে আহূত হল মহকুমা সম্পাদকদের বৈঠক। শিক্ষক সংগ্রামের জোয়ারে তখন পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব মহকুমাতেই সমিতির শাখা তৈরি হয়ে গিয়েছে। সদস্য বিদ্যালয় হিসাবে প্রায় ৯৪৮টি স্কুলকে নথিভুক্তকরণের কাজও প্রায় সমাপ্তির পথে। পুরনো রাজনৈতিক কর্মীদের অনেকে তাঁদের অন্যান্য কাজকর্ম সামলে, আন্দোলনের জলতরঙ্গে তখন প্রায় সম্পূর্ণভাবে সমিতির সর্বক্ষণের কর্মীতে পরিণত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে হাওড়ার নীলিমা সেন ও হুগলীর শশিমোহন ভট্টাচার্যের নাম আমরা উল্লেখ করতেই পারি। শশীমোহন বাবু এক স্মৃতিচারণায় পূর্ববঙ্গে থাকাকালীনই তিনি সমিতির সদস্যভুক্ত হয়েছিলেন বলে, বিবৃতি দিয়েছিলেন, 'সমিতির কুড়ি বছরের আবেদন-নিবেদন আন্দোলনের গণ্ডী ভেঙে সদস্যদের ''সমিতি চেতনার'' প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ১৯৪০ সনে। নতুন নেতৃত্বের অভিযান শুরু হয় ১৯৪৮ সনে.... এগিয়ে এলো ১৯৫৩ সনের ঐতিহাসিক চুঁচুড়া সম্মেলন। সংগ্রামী প্রতিনিধিদের সোৎসাহে অংশগ্রহণ গৃহিত হলো শিক্ষা ও শিক্ষাকর্মীর দাবি সনদ ও আন্দোলনের কর্মসূচি। সরকারকে সময় দেওয়া হল প্রায় এক বছর।'[১০৮]

ওই সময়ই আন্দোলন সংগ্রামের তরঙ্গশীর্ষে সমিতির নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন গোলকপতি রায়। প্রথম জীবনে সুভাষবাদী শ্রীরায়, প্রথমে কোলকাতার সারদাচরণ এরিয়ান স্কুল এবং পরে কমলা হাইস্কুলে শিক্ষকতার মধ্যে দিয়ে অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ১৯৫২-৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকেই তাঁকে একজন সক্রিয় কর্মী হিসাবে শিক্ষক সমিতি পেয়েছিল। কলকাতার নেতৃত্ব মীরা চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'গোলকদা, রথীনদা, সমরেশ আর আমি। আমাদের কাজ ছিল সারা অঞ্চল টহল দেওয়া। ভোর হতে হতেই.....বেরিয়ে পৌঁছে যেতাম.....স্কুলে স্কুলে কর্ম বিরতি সফল করতেই হবে। ৫৪-এর আন্দোলনে গোলোকপতি রায়ের ওপর দায়িত্ব ছিল, স্কুলে স্কুলে পিকেটিং করার।'[১০৯]

আরেকজন এই সময়কার নেতৃস্থানীয় কর্মীর কথা উল্লেখ না করা হলে অন্যায় করা হবে—তিনি হলেন রথীন্দ্র কৃষ্ণ দেব। শ্রীবিদ্যানিকেতনের এই সংগ্রামী শিক্ষক সম্বন্ধে অনিলা দেবীর স্মৃতিচারণ থেকে আমরা জানতে পারি—'এই সময়ে পার্টির পক্ষ থেকে শিক্ষা ও শিক্ষকের আন্দোলনকে যথোচিত সাহায্য ও সংগঠিত করার দায়িত্বে ছিলেন প্রয়াত অধ্যাপক কমরেড নীরেন্দ্রনাথ রায়। কমরেড নীরেনদার পরিচালিত মাধ্যমিক শিক্ষক পার্টি সদস্যদের ইউনিটে ১৯৫০ সালে কমরেড রথীন যুক্ত হন এবং এবিটিএ-র উত্তর কোলকাতার অন্যতম সংগঠকের দায়িত্বে থাকেন।....১৯৫৪ সালে পশ্চিমবাংলা ব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষাকর্মীর ঐতিহাসিক কর্মবিরতি ও অবস্থান সত্যাগ্রহকে কেন্দ্র করে....কমরেড রথীনও আন্দোলনের পুরোভাগে এসে যান। সত্যপ্রিয় রায়.....কারারুদ্ধ হয়ে গেলে আন্দোলনের মেজাজকে অক্ষুণ্ণ রাখতে কমরেড রথীন বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।'[১১০]

আন্দোলনের প্রস্তুতিতে সেই সময় প্রচুর সভা হয়, শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে। তারই এক ঝলক

সারণি—৩[১১১]

তারিখ	স্থান	বক্তা/সভাপতি
০৫।০৯।৫৩	বীজপুর/কাঁচড়াপাড়া সার্কাস ময়দান	মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত/সত্যপ্রিয় রায়/অনিলা দেবী
০৬।০৯।৫৩	বহরমপুর গ্রান্টস ময়দান	সতীনাথ বাগচি/অনিলা দেবী
১৩।০৯।৫৩	বারাসাত কালীকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়	সত্যপ্রিয় রায়
১৯।০৯।৫৩	বারাকপুর মহকুমা সমিতি	অনিলা দেবী
২৫।০৯।৫৩	আলিপুর কসবা চিত্তরঞ্জন বিদ্যাপীঠ	ফকিরচন্দ্র রায়/মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত/সত্যপ্রিয় রায়
২৭।০৯।৫৩	—	কালীপদ কুণ্ডু
০৯।০৯।৫৩	ভবানীপুর সাউথ সুবারবান স্কুল	কালীপদ কুণ্ডু/সত্যপ্রিয় রায়
১৩।০৯।৫৩	কালীঘাট-কালিধন ইনস্টিটিউশন	সত্যপ্রিয় রায় /অনিলা দেবী
১৫।০৯।৫৩	খিদিপুর সেন্ট বার্ণাবাস স্কুল	সত্যপ্রিয় রায়
১৫।০৯।৫৩	বেলতলা মডেল স্কুল	অনিলা দেবী/কালিপদ কুণ্ডু/শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫।০৯।৫৩	চেতলা বয়েজ স্কুল	সত্যপ্রিয় রায়/শৈলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫।০৯।৫৩	তালতলা	সত্যপ্রিয় রায়/মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত/কালীপদ কুণ্ডু
১৮।০৯।৫৩	বালিগঞ্জ অঞ্চল	অনিলা দেবী
১৮।০৯।৫৩	সত্যভামা স্কুল	সত্যপ্রিয় রায়/কালীপদ কুণ্ডু
১৮।০৯।৫৩	জুবিলী হাই স্কুল (উত্তর কলকাতা)	সত্যপ্রিয় রায়/কালীপদ কুণ্ডু
১৯।০৯।৫৩	হাজরা পার্ক (যতীনদাস পার্ক) জনসভা	ড. হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত/সত্যপ্রিয় রায়/মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত/কালীপদ কুণ্ডু
২২।০৯।৫৩	পার্ক সার্কাস শিশু বিদ্যাপীঠ	কালীপদ কুণ্ডু
২৩।০৯।৫৩	শ্রীবিদ্যানিকেতন কলকাতা	সত্যপ্রিয় রায়/গোলকপতি রায়/কালীপদ কুণ্ডু
২৪।০৯।৫৩	বেলগাছিয়া মনোহর একাডেমি	সত্যপ্রিয় রায়
২৫।০৯।৫৩	বাগবাজার বিদ্যালয়	কালীপদ কুণ্ডু

মফস্বলের সঙ্গে সঙ্গে কোলকাতার স্কুল এবং এলাকাগুলিতে প্রচুর শিক্ষক সভা এই সময়ে সংগঠিত করা সম্ভবপর হয়েছিল।

সেই সময়কার কিছু নেতৃস্থানীয় শিক্ষক সংগঠকের নাম এ প্রসঙ্গে করা যেতেই পারে। তাঁরা হলেন সমরেশ সেন, অমূল্যনাথ লাহিড়ী, সুশীল কুণ্ডু, আমোদবিহারী বসু, সরোজ গোস্বামী। এই সব প্রথম সারির নেতাদের পিছনে পদাতিক হিসাবে আন্দোলনের অংশ ভাগ হলেন, অরুণ চৌধুরী, অজিত বাগ, মায়া চক্রবর্তী, হীরেন দাশগুপ্ত, অমিতাভ সেন, সুবোধ মিত্র, তুষার পঞ্চানন প্রমুখেরা—সব মিলিয়ে এই সব নেতা-কর্মীর নেতৃত্বে পিরামিডাকৃতি একটি শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলতে সেদিনের শিক্ষকেরা সফল হয়েছিলেন।[১১২]

আমরা আগেই বলেছি সংগঠনকে শক্তিশালী করবার জন্য ও শিক্ষকদের প্রতি জনগণের সহযোগিতা সংগঠিত করবার প্রয়োজনে সেপ্টেম্বর '৫৩ থেকেই সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্বে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ সারা রাজ্য জুড়ে সভা সমাবেশ করতে শুরু করেন। উপরে উল্লিখিত সারণি থেকেই বুঝতে পারা যাবে যে সেই সময়ে শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে সংপৃক্ত নেতা ও কর্মীরা কি অক্লান্ত অমানুষিক পরিশ্রম করেছিলেন। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ও শিক্ষকদের স্বার্থে। এছাড়া এই মাসেই মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠে ও হাওড়ায় উলুবেড়িয়া স্কুলে শিক্ষকদের স্বপক্ষে সভা আহূত হয়েছিল।

এই ম্যারাথন সভাগুলির শীর্ষদেশে আসন্ন সংগ্রাম আন্দোলনের রূপরেখা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ১৯৫৩ এর ২৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল কলকাতা জেলা শিক্ষক সম্মেলন। বিপুল পরিমাণ শিক্ষকদের উপস্থিতিতে সম্মেলন সফল হল। তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের কাছে শিক্ষক আন্দোলনের এই জঙ্গীভাব অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আমরা জানি সেই সময় শিক্ষক আন্দোলনের হৃদয় ছিলেন সত্যপ্রিয় রায়, কিন্তু মস্তিষ্ক ছিলেন অনিলা দেবী। দীর্ঘদিনের বামপন্থী আন্দোলনের শরিক ও মহিলা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অনিলা দেবীই আসন্ন আন্দোলনের 'নীল নক্সা' তৈরি করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনের কিশলয়কে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার জন্য তাঁর মূল স্বরূপ অনিলা দেবীকে নিবর্তনমূলক আটক আইনে পুনরায় গ্রেফতার করা হল—সম্মেলনের পর দিনই।

অনিলা দেবীর মতো ছাত্রপ্রিয় শিক্ষকের উপর এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে পথে নেমে এল কলকাতার ছাত্রছাত্রীরা। তাঁর নিজের বিদ্যালয় বেলতলা গার্লসের পাশাপাশি কসবা চিত্তরঞ্জন, রামরিক, সারঙ্গাবাদ ও খিদিরপুর অ্যাকাডেমি স্কুলে ছাত্র সমাজ প্রবল প্রতিবাদে সরব হল সরকারের সিদ্ধান্তের। ধর্মঘটও হল কোথাও কোথাও। সত্যপ্রিয় রায় একটি বিবৃতিতে জানালেন, আন্দোলন ধ্বংসের উদ্দেশ্যে এই গ্রেফতারের বিরুদ্ধে শিক্ষক সমাজ সোচ্চার হবে।[১১৩] সামগ্রিক ভাবে আন্দোলনের চাপে ২৯ সেপ্টেম্বর অনিলা দেবীকে কারামুক্ত করতে সরকার বাধ্য হল। এটা প্রমাণিত হল জেলজরিমানা করে শিক্ষক আন্দোলনকে দমন করা যাবে না। সংগ্রামের প্রথম ধাপেই সরকার হল পরাস্ত। ১৯৫৩-এর অক্টোবর নভেম্বর মাসে নব উৎসাহে আসন্ন আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসাবে সভা সমাবেশ হতে থাকে। কলকাতার পর এবার জোর দেওয়া

হল মফঃস্বলে সভা সমাবেশ সংঘটনের কাজে। পূর্বের মতোই একটি সারণির মাধ্যমে সভাগুলির বক্তা ও স্থান নির্ণয় করা যেতে পারে।

সারণি—৪[১১৪]

তারিখ	স্থান	বক্তা/সভাপতি
০৩।১০।৫৩	বনগাঁ টাউন হল ময়দান	অনিলা দেবী/মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত
০৪।১০।৫৩	বাঁকুড়া শহর	সত্যপ্রিয় রায়/অনিলা দেবী
০৭।১০।৫৩	রাজারহাট	কালীপদ কুণ্ডু
০৯।১০।৫৩	হাওড়া বি. কে. পাল্‌স ইনস্টিটিউশন	সত্যপ্রিয় রায়
১১।১০।৫৩	আড়িয়াদহ	মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত/সত্যপ্রিয় রায়
১১।১০।৫৩	খড়্গপুর	সন্তোষ বাগচী/সত্যপ্রিয় রায়
০৪।১১।৫৩	জিয়াগঞ্জ লোঢ়া পার্ক ময়দান	সন্তোষ বাগচী/অনিলা দেবী
০৬।১১।৫৩	ঝাড়গ্রাম বীনপুর	মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত/বীরেন আচার্য/সুশীল ঠাকুর
০৮।১১।৫৩	কৃষ্ণনগর	সত্যপ্রিয় রায়
১৫।১১।৫৩	নবদ্বীপ বড় আখড়া	বীরেন আচার্য/সুশীল ঠাকুর/অনিলা দেবী/ মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত

ABTA তখন প্রেসার গ্রুপ হিসাবে নিজেকে প্রমাণের উদ্দেশ্যে ও সর্বসাধারণের সাহায্যে আন্দোলনকে দৃঢ় করতে সদা সচেষ্ট। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে কমিউনিস্ট পার্টি সহ অন্যান্য বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী দলের নেতাদের সমর্থন শিক্ষক নেতৃবৃন্দ আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবার আইনসভার অভ্যন্তরে শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের কথা তুলে ধরবার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ও অধুনালুপ্ত বিধান পরিষদের প্রগতিশীল সদস্যদের একটি সভায় নিমন্ত্রণ করলেন সমিতির নেতারা। ৫৩-এর ১৯ নভেম্বরের এই সভায় জ্যোতি বসু, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, অধ্যাপক মনীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী, আবদুল হালিম প্রমুখ যোগ দিয়েছিলেন। উপস্থিত প্রতিনিধিরা সমিতির দাবি পত্রে সমর্থন সূচক স্বাক্ষর প্রদান করেছিলেন।

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হল সংবাদপত্র সমূহ—তাই শিক্ষক সমিতি সংবাদপত্র সম্পাদকের কাছেও আহ্বান জানালেন শিক্ষকদের সমর্থন করার জন্য। তাদের বক্তব্য যাতে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সাধারণ জনতার মধ্যে ছড়িয়ে যেতে পারে এই অনুরোধ রাখলেন শিক্ষকেরা। সংবাদপত্র সম্পাদকদের পক্ষ থেকে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সমিতির অনুরোধ মেনে নেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখব সংবাদপত্রগুলি ৫৪-এর আন্দোলনের তুঙ্গ মুহূর্তে শিক্ষকদের পক্ষেই দাঁড়িয়েছিল—সরকারের পক্ষে নয়। আন্দোলনের তরঙ্গ উন্মোচনের সময় আমরা সেকথা নিয়ে আলোচনা করব।

শুধুমাত্র মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রচেষ্টায় শিক্ষক আন্দোলন সফল হবে না। শিক্ষক সমিতি এই সত্য অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাদের ডাকে, এই ক্রান্তিকালিন মুহূর্তে অধ্যাপকদের

সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সহোদর ভাইয়ের মতোই তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। শিক্ষকদের আন্দোলন উত্তুঙ্গ হবার আগে, তার প্রস্তুতি পর্বেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির তৎকালীন সম্পাদক কেশবেশ্বর বসু সংবাদপত্রসমূহে একটি সংবাদ বিবৃতি দিয়ে তাদের মাধ্যমিক শিক্ষক বন্ধুদের দাবি দাওয়াকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ৬ ডিসেম্বর ৫৩তে বলেছিলেন, 'This special genreal meeting of the West Bengal College and University Teachers Association convened to discuss a letter from the A.B.T.A. Association has given the most careful and serious consideration to the circumstances under which the secondary teachers of West Bengal Governments refusal to implement the recommendations of the Board of Secondary Education regarding pay and DA. .....

This meeting fully supports the most modest and legilamate demands of secondary teachers for the implementation of the unanimous recommendations of the Board of Secondary Education strongly sympathises with the desperate step forced upon them as the only way open under the circustances and assures them of its fraterual assistance'.[১১৫]

অধ্যাপক সমিতি শুধুমাত্র প্রস্তাব পাসের মাধ্যমেই নিজেদের কর্তব্য সীমাবদ্ধ রাখেনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষক বিরোধী নীতির বিরোধিতা করে সরকারের কাছে এক খোলা চিঠিতে ওই সমিতির সম্পাদক কেশবেশ্বর বসু জানান, ''মাধ্যমিক শিক্ষকগণ বেতন ও মাগ্গীভাতা সম্পর্কে যে দাবি জানাইয়াছেন তাহা শুধু যে যুক্তিসঙ্গত তাহা নহে অতি সামান্যও ইহা যে কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বীকার করিবেন। দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যে সকল বিবৃতি প্রত্যহই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং আসন্ন সঙ্কটে কমপক্ষে ১২,০০০ শিক্ষক এবং ৭,৫০,০০০ ছাত্রছাত্রী জড়িত হইয়া পড়িবে তাহা নিবারণ কল্পে দাবিসমূহ মানিয়া লইতে সরকার সম্মত হইতেছেন না কেন। তাহা ধারণা করা কঠিন। .....আসন্ন সঙ্কট নিবারণের উদ্দেশ্যে দাবিসমূহ পূরণের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন আমি (কে. বসু) পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বিশেষ ভাবে মুখ্যমন্ত্রীর নিকটা আবেদন জানাইতেছি।[১১৬] শুধুমাত্র আন্দোলনের নান্দীমুখে নয়, আন্দোলন চলাকালীনও অধ্যাপক সমিতির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে মাধ্যমিক শিক্ষকদের দাবিদাওয়ার সমর্থনে সোচ্চার হয়েছিল। মূল আন্দোলনের বর্ণনা প্রসঙ্গে সেই কথা আলোচিত হবে।

প্রাথমিক শিক্ষকেরাও এই অবস্থায় নিস্পৃহ থাকেনি। সমগ্র শিক্ষা পিরামিডের মধ্যবর্তী ধাপের এই আন্দোলনে পিরামিডের ভিত্তিস্বরূপ প্রাথমিক শিক্ষকেরা প্রথমাবধিই মাধ্যমিক শিক্ষকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। শুধুমাত্র বিবৃতি দিয়ে নয়—১৯৫৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসে নিজেদের ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের দাবিদাওয়ার পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি মাধ্যমিক শিক্ষকদের

সঙ্গে মিলিত ভাবে বিধানসভা অভিযান করেন। প্রায় পাঁচ হাজার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১১৭] পরবর্তীকালেও ১২ জুলাই কমিটির ছত্রছায়ায় এই দুইটি সংগঠন একত্রে কাজ করেছে এবং সেই ট্র্যাডিশন নানা রূপ প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করে আজো চলেছে। পরবর্তী কালে এই দুই শিক্ষক সমিতির যৌথ আন্দোলনের কথা আসবে আন্দোলনেরই অনুষঙ্গে।

আমরা এই অনুচ্ছেদেই সংগঠন হিসাবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির যৌথ আন্দোলনের সূচনা সম্বন্ধে কিছু কথা বলেছি। সাংগঠনিক ক্ষেত্র ছাড়াও অনেক অধ্যাপক ও প্রাথমিক শিক্ষক ব্যক্তিগত ভাবেও নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। মাধ্যমিক শিক্ষকদের আন্দোলনের জন্মলগ্ন থেকেই কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা, মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিলেন। এমনকি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির প্রতিষ্ঠার পূর্বেও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সি. ভি. রমন, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ প্রথিতযশা অধ্যাপক মাধ্যমিক সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করে চলতেন। ৫৪-এর আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্বেও সন্তোষ মিত্র, গোপাল হালদার, পীযূষ দাশগুপ্ত, নির্মল ভট্টাচার্য, গোপাল হালদার প্রভৃতি অধ্যাপকেরা মাধ্যমিক শিক্ষকদের সক্রিয় ভাবে সহায়তা প্রদান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা মন্মথ নাথ অধিকারীর নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী মহাশয় তো ছিলেনই। অক্লান্ত কর্মী এই অধ্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থার তিন স্তর, উচ্চশিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। অন্য অনেকের মতো তিনিও শিক্ষার তিনটি স্তর নির্বিশেষে সমস্ত স্তরের শিক্ষকদের একটি অবিভাজ্য সত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন ও নিজেদের দাবিদাওয়া এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন কল্পে যৌথ আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন।[১১৮] শুধু কাগজে কলমে সমর্থন নয়। ১৯৫৩-এর ১৩ ডিসেম্বর মাধ্যমিক শিক্ষকদের আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করার মানসে ভারত সভা হলে, শিক্ষার এই তিন স্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলির যৌথ সভা আহূত হল। এমনকি শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, এমন গণসংগঠন যেমন মার্কেন্টাইল ইউনিয়ন ও জীবনবিমা সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা শুরু করল নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি।

মাধ্যমিক শিক্ষকেরা জানতেন যে শাসক কংগ্রেসের অনেক ব্যক্তি শিক্ষক আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল। আসন্ন আন্দোলনে তাঁদেরও সহায়তা প্রার্থনা করল সমিতি। প্রকৃত স্বাধীন গণসংগঠনের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে বামপন্থী দলগুলির কাছে তো বটেই, জনসংঘ বা হিন্দু মহাসভার মতো দক্ষিণ পন্থী দলগুলির সমর্থন যাচ্ঞা করল তাঁরা। সমিতি নেতৃত্ব কোনো রাজনৈতিক অনুদারতারই পক্ষপাতী ছিলেন না সেদিন। এ প্রসঙ্গে শিক্ষক আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেত্রী অনিলা দেবী মন্তব্য করেছিলেন, ''বিদ্যালয়ের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সম্প্রদায়কে এতদিন ধরে ভাবতে ও দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন বিভিন্ন স্তরের কর্মজীবী মানুষ। সংগ্রামের রাজপথে এসে বসা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীকে তাঁরা নতুন চোখে দেখলেন। এগিয়ে এলেন সহযোগী যোগসূত্র রচনায়।''[১১৯]

এদিকে আন্দোলনের মশাল জ্বালিয়ে রাখবার জন্য ইন্ধন জোগাড় রাখার প্রস্তুতিও চলছিল। ৫৩-এর ২০ ডিসেম্বর, কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হল শিক্ষকদের এক মহতি জনসভা। এই সভায় আবার সমিতির সংগ্রামের 'সাম' গান উচ্চারিত হল। ৫৩-এর ২৮ ডিসেম্বর হাজরা পার্ক (যতীনদাস পার্ক)-এ অনুষ্ঠিত হল নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশন। সর্বভারতীয় শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা আধিকারিকদের এই সভায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ড. রাধাবিনোদ পাল তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন, ''আমাদের দেশের শিক্ষকগণ যে দাবি ও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন সমাজের তাহা বহুপূর্বেই পূরণ করা উচিৎ ছিল। এই দাবি পূরণের জন্য আমাদের সুসমন্বিত ও সুসংবদ্ধভাবে কাজ করার যথেষ্ট সময় হইয়াছে। উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরিয়াদের যে হারে বেতন নির্ধারিত হয়, সমস্ত শিক্ষকদের বেতনও সেই হারে নির্ধারণ করিতে হইবে।''[১২০] পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রায় তেরশো শিক্ষক ও ভারতের নানা প্রান্ত থেকে প্রায় ১৭০০ শিক্ষাশাস্ত্রী এই সর্বভারতীয় অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। স্বভাবতঃই এই সম্মেলনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের আন্দোলনের কথা দেশের সুদূর প্রান্ত সমূহে ছড়িয়ে পড়েছিল। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বাধীন এই আন্দোলনের কথা ব্যাপ্ত হয়েছিল দেশের সর্বত্র।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের উপনির্বাচন, দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতা ও নবদ্বীপ লোকসভা কেন্দ্রে। বাংলা তখন শিক্ষকদের দাবিদাওয়া নিয়ে জ্বলছে। বামপন্থীরা তাদের নির্বাচনী দাবিদাওয়াতে অন্যান্য অনেক দাবির সঙ্গে শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি, শিক্ষকদের বেতন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস এর দাবিও করেছে। শিক্ষকদের এই দাবিকে কমিউনিস্ট সহ সব বামদল সমর্থন করার ফলে, শিক্ষক ও ছাত্র সহ জনগণের এক বৃহদংশ ক্রমশঃ বামপন্থীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। পরবর্তী কালের বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা শচীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় ''সারা দেশের গণতান্ত্রিক শক্তি, ঐক্য ও সংগ্রামের নির্যাস যেন এই বিশেষ সংগ্রাম (নির্বাচন লড়াই)-এর মধ্যে সংহত হয়ে উঠেছিল।''[১২১] এই নির্বাচনে দক্ষিণ পূর্ব কোলকাতা লোকসভা কেন্দ্রে কমিউনিস্ট প্রার্থী সাধন গুপ্ত বিপুল জনসমর্থন নিয়ে জয়ী হন। নবদ্বীপ কেন্দ্রেও বামপন্থীদের ভোট বৃদ্ধি পায়।[১২২]

তৎকালীন অশান্ত অবস্থার সঠিক বর্ণনা তৎকালীন শিক্ষক আন্দোলনের সৈনিক, পরবর্তীকালের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ড. সুধীর করণের একটি কবিতায় সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছিল। আমাদের দাবি—জনতার দাবি/হাজার কণ্ঠে ওঠে/আমরা শুনেছি আহ্বান আজ/হৃদয়ের কোন থেকে/....তাই আজ তুলে ধরি/আমাদের বদ্ধমুঠির হাত/সম্মুখে আসে বাঁচবার সংঘাত।''[১২৩] শুধু শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে যে মানুষ ক্রমশঃ তৎকালীন সরকারের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল তা নয়—উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য সংকট, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি মেহনতি মানুষের কাতারে শিক্ষক সমাজকে ক্রমশঃ শামিল হতে বাধ্য করেছিল। প্রথমাবধি বিধানচন্দ্র রায়ের সরকার নিশ্চুপ ও বধির হয়ে বসেছিল। কিন্তু শিক্ষকদের চূড়ান্ত আন্দোলনের আগে তার প্রস্তুতি পর্বেই তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের হৃদকম্প উপস্থিত হল। ১৯৫৪-এর ১৬

জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী ডা. রায় শিক্ষকদের নতুন বেতনক্রম ঘোষণা করলেন এক সাংবাদিক সম্মেলনে। তার বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যুদ্ধোত্তর কালে ব্যবসায়ী ও পেশাদার লোকেরা তাদের আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলেও, এটা সত্যি যে সে তুলনায় শিক্ষকদের আয় যথেষ্ট কম। যদিও বর্তমানে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যাদির মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে তথাপি শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করতে সরকার আগ্রহী। সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী বি. এ. (সাম্মানিক) অভিজ্ঞ শিক্ষকদের প্রারম্ভিক বেতন ৯০ টাকার স্থলে ১২৫ টাকা, অভিজ্ঞতাহীন স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী শিক্ষকদের ৭৫ টাকার বদলে ১৫০ টাকা ঘোষণা করেন। এছাড়া অন্যান্য যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কে ১০ থেকে ২০ টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল সরকারের তরফে—তবে শিক্ষক সমিতির ৩৫ টাকা মহার্ঘভাতার দাবি বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো ভাবেই দেওয়া সম্ভব নয় বলে, ডা. রায় অভিমত পোষণ করেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রস্তাবিত বেতন কাঠামো কোনভাবেই মানা সম্ভব হয় বলে ডা. রায় বলেছিলেন যে জনসাধারণের বোঝা উচিত বিদ্যালয়গুলির সকল ঘাটতি সরকার বহন করে। এই ব্যয়ভারের পাশাপাশি প্রস্তাবিত বেতন কাঠামো কার্যকরী করতে ১৫/১৬ লক্ষ টাকা বাড়তি ব্যয় হবে সরকারের।[১২৪] শিক্ষক সমিতির আর্থিক দাবির ছিটেফোঁটাও এই প্রস্তাবে মান্য করা হয়নি। তদুপরি শিক্ষক সন্তানদের অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ, তাদের চিকিৎসা বিমা, গৃহ নির্মাণ খনন—প্রভৃতি প্রসঙ্গে কোনো সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি এই ঘোষণায় সরকারের তরফে দেওয়া হয়নি।

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে সমিতির তৎকালীন সম্পাদক সত্যপ্রিয় রায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে যে রিলিফ প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাতে পশ্চিমবাংলার পঁচিশ হাজার দারিদ্র্যপীড়িত মাধ্যমিক শিক্ষকের শতকরা ৯০ ভাগই প্রস্তাবিত সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবেন। উপরন্তু ৩৫ টাকা মহার্ঘভাতার দাবি অস্বীকার করিয়া সমস্ত স্তরের মাধ্যমিক শিক্ষকদের আঘাত করা হইয়াছে এবং অপর দিকে সামান্য অংশের কিছুটা বেতন বৃদ্ধি করিয়া শিক্ষক সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা হইয়াছে।''[১২৫] এমতাবস্থায় শিক্ষকরা তাহাদের সংগ্রামের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। ফেব্রুয়ারি থেকে যে কর্ম বিরতির সিদ্ধান্ত পশ্চিমবাংলার মাধ্যমিক শিক্ষকেরা গ্রহণ করেছিলেন তা অটল থাকল।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে আমরা এই প্রস্তাবের বেতন বৃদ্ধির ন্যূনতার সঙ্গে শিক্ষকদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির নীল নক্সাই দেখতে পাই। সরকারি প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে সুস্পষ্ট রূপে বোঝা যায় যে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ১৬,৯৮৮ জন শিক্ষক/শিক্ষিকার মধ্যে ৬,৫২৬ জন শিক্ষকই সরকারি সাহায্যবিহীন বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট। কংগ্রেস সরকারের প্রস্তাব মতো এই সাহায্য বিহীন বিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির কোনো ব্যবস্থাই রাখা হয়নি। অর্থাৎ শতাংশের হিসাবে মোট শিক্ষকদের ৩৮ ভাগই সরকারের এই ন্যূনতম সুযোগ থেকে বঞ্চিতই রয়ে যায়। এছাড়া সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির ১০,৪২৭ জন শিক্ষকের মধ্যে শতকরা মাত্র ১৫ জন শিক্ষক স্নাতকোত্তর বা স্নাতক শিক্ষণ প্রাপ্ত। অনুমোদিত বেতন শুধুমাত্র তাঁদের

ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, বাকি শিক্ষকদের সম্পর্কে সরকারি প্রস্তাবে সুস্পষ্ট ভাবে কিছু বলা হয়নি। মোটামুটি হিসেব করলে দেখা যায় মাধ্যমিক পর্যায়ের মোট শিক্ষকদের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ এই বেতনের হার বৃদ্ধির সুবিধা পেতে পারেন। বাকিদের জন্য সরকার কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি। আমাদের আলোচ্য আমলে শিক্ষকদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে ন্যূনতম মহার্ঘভাতা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, সেই দিকে সরকারের কোনো নজরই ছিল না। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, যে ড. রায় তাঁর প্রস্তাবের মুখবন্ধে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাস্তব সত্যকে পুরোপুরি অস্বীকার করেন। কিন্তু গড়পড়তা ৬০ টাকা মাসিক বেতনের শিক্ষকদের কাছে যে সেই 'হ্রাস মূল্যের' বাজারেও যে সংসার চালানো সুকঠিন সেই বাস্তবতাকে বিধান রায় নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার স্বীকৃতি দেয়নি। কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়-এর পশ্চিমবঙ্গের উন্নতিতে কিছু অবদান অবশ্যই ছিল। কিন্তু একদিকে শিক্ষকদের মহার্ঘভাতা দিতে অস্বীকার করে ও অন্যদিকে দরিদ্র ও সামর্থহীন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাড়ে সতেরো টাকা করে শিক্ষকদের মহার্ঘভাতা দিলে, বাকী সাড়ে সতেরো টাকা সরকার দেবে—এই প্রস্তাব এনে শিক্ষকদের সঙ্গে শুধু তঞ্চকতাই করা হয়নি—প্রকৃত সমস্যাকে ধামাচাপা দিতে প্রয়াস করা হয়েছিল। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। নিজের অপযুক্তিকে আড়াল করবার জন্য ড. রায় উত্তরপ্রদেশের উদাহরণ তুলে বলেছিলেন যে ওই রাজ্যেও শিক্ষকদের কোনো মহার্ঘভাতা দেওয়া হয়নি। তার এই অনৃত ভাষণে ক্ষুব্ধ শিক্ষক নেতা সত্যপ্রিয় রায় উত্তরপ্রদেশের শিক্ষা অধিকর্তার একটি চিঠি উদ্ধৃত করে দেখান যে, সেই রাজ্যের ৬০ টাকা মাসিক বেতনের শিক্ষকেরা সরকার থেকে পাঁচ টাকা মহার্ঘভাতা পেয়ে থাকেন।[১২৬]

এই অবস্থায় সরকারের অপপ্রয়াস প্রতিহত করে শিক্ষকদের আসন্ন আন্দোলনের প্রস্তুতি চলতেই থাকে। ১৯৫৪-এর ২৩ জানুয়ারি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মাধ্যমিক শিক্ষকদের দাবি ও প্রস্তাবিত কর্মবিরতিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। এই সমস্ত দলগুলি একটি যৌথ বিবৃতি দিয়ে জানান, ''পশ্চিম বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রস্তাবিত কর্মবিরতি সম্পর্কে পশ্চিমবাংলা সরকারের মনোভাব আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছি। শিক্ষক সমাজ মানব মনের গঠনকারী বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, শিক্ষা ও সেই শিক্ষকদের সম্পর্কিত বিষয়ে সরকার এইরূপ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন।'' বিবৃতিতে তারা আরো জানালেন, 'আমরা জনসাধারণকে শিক্ষকদের দাবির সমর্থনে তাঁহাদের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে আগাইয়া আসিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছি।''[১২৭] এই যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীরা ছিলেন জ্যোতি বসু (সি.পি.আই), সুবোধ ব্যানার্জী (এস. ইউ. সি. আই), সত্যেন্দ্রনাথ বসু (জনসঙ্ঘ), নীহার দাশ (হিন্দু মহাসভা), সত্য গুপ্ত (বি.ভি.), মাখন পাল (আর. এস. পি.), নানু ঘোষ (ফরওয়ার্ড ব্লক)। শিক্ষক আন্দোলন এতদিনে যেন ক্ষুদ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেড়াজালের বাইরে বৃহত্তর রাজনীতিতে একটি 'প্রেসার গ্রুপ' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হল। যে কোনো সুস্থ বুদ্ধির নাগরিকই মনে করতে লাগলেন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের ন্যূনতম বেতন বৃদ্ধির দাবি যথেষ্ট যুক্তি সংগত এবং এর জন্য অর্থের অভাবের সরকারি বাহানা কোন মতেই মানা যায় না।

সরকারের কাছে শেষ আবেদন নিষ্ফল হবার পরে শিক্ষকেরা আবার আন্দোলনের ময়দানে ফিরে গেলেন। ১৯৫৪-এর ২৫ জানুয়ারি হাজরা পার্ক (অধুনা যতীনদাস পার্কে) সত্যপ্রিয় রায়ের পৌরোহিত্যে একটি জনসভা আহ্বান করা হল। প্রবীণ নাগরিক সত্যেন দত্ত, অভিভাবকদের পক্ষ থেকে শিক্ষকদের আন্দোলনে পূর্ণ সহযোগিতা করার আশ্বাস দিলেন। সভার সভাপতি হিসাবে শিক্ষক নেতা শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওই সভায় অভিভাবকদের এই আন্দোলনকে সমর্থন জানাবার আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন, ''আপনাদের সন্তানদের কল্যাণের জন্য শিক্ষকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আপনারা আপনাদের সন্তানদের গঠনের দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। কিন্তু জীবনযাত্রার ক্ষতবিক্ষত পঙ্গু শিক্ষক দ্বারা কি এই গুরুদায়িত্ব বহন সম্ভব।''[১২৮] এই সভায় প্রথম ছাত্ররা শিক্ষকদের আন্দোলনকে সমর্থন করে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ছাত্রেরা ধ্বনি দিল, 'নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি জিন্দাবাদ এবং শিক্ষকদের দাবি মানতে হবে' ইত্যাদি। এরপরে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন নেতারা ২৭ জানুয়ারি, ৫৪তে একটি যুক্ত বিবৃতিতে বললেন, বাংলার ছাত্র সমাজ শিক্ষকদের দাবির সমর্থনে এবং বাজেটের শতকরা ২০ ভাগ শিক্ষা খাতে বরাদ্দের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলে কংগ্রেসি সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতি পর্যুদস্ত করে তুলবে। অনিচ্ছুক কংগ্রেসি সরকারকে দাবিগুলি মানতে বাধ্য করা হবে। ছাত্রকংগ্রেস, এস. আর ছাত্র ব্যুরো, ভি. ভি. শাখা, সমাজবাদী ছাত্রসংগঠন ও ছাত্র ফেডারেশনের নেতারা এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। এই ঘটনার সাক্ষী সেদিনের আগুন খেকো ছাত্রনেতা হীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কলম থেকে আমরা জানতে পারি—''বেশ কিছুদিন ধরে পশ্চিমবাংলার মাধ্যমিক শিক্ষকরা নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে শিক্ষকদের বাঁচার মতো বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করে চলেছিলেন। মাধ্যমিক শিক্ষকদের এই দাবির সমর্থনে ছাত্ররা, ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার কার্য শুরু করে।... বিভিন্ন জেলায় বিরাট বিরাট ছাত্র জমায়েত সংগঠিত হয়। এমনকি শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা শান্তিনিকেতন এলাকায় সভা করতে না পারলেও বোলপুরের মাঠে বিশাল ছাত্র শিক্ষক সম্মিলিত জমায়েতে যোগ দেয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ রবীন্দ্র জীবনীকার ও শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক প্রয়াত শ্রদ্ধেয় প্রভাত মুখোপাধ্যায়। প্রধান বক্তা ছিলেন প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হীরেন দাশগুপ্ত। এই ধরনের অসংখ্য ছাত্র সভা, কলকাতার নানা অঞ্চলে, রাজ্যের সমস্ত জেলায় অনুষ্ঠিত হল।''[১২৯] আমরা আন্দোলনের দিনগুলি যখন পর্যালোচনা করব তখনও দেখব ছাত্ররা সংগঠিত ভাবে তো বটেই, এমনকি অসংগঠিত ভাবেও তাঁদের প্রিয় মাস্টারমশাই ও দিদিমণিদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। শিক্ষকদের সংগ্রামের শক্তি হয়েছিলেন তারা—সে কথা কিছু পরে।

এদিকে ৫৪-এর ফেব্রুয়ারির আন্দোলনের কাল যত সন্নিকটস্থ হতে থাকল, তত শিক্ষকেরা তাঁদের সংগ্রামের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি করছিলেন। সেই সময় যে সমস্ত জায়গায় সভা সমাবেশ হয়েছিল, তার সংখ্যা এত বেশি ছিল যে একটি সারণিতে তাদের লিপিবদ্ধ করাই সুবিধাজনক। সভাগুলি ছিল নিম্নরূপ।

সারণি—৫[১৩০]

তারিখ	সভার স্থান	বক্তা/সভাপতি
২০।০১।৫৪	ইনটালি বেনিয়াপুকুর	মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত
২১।০১।৫৪	উত্তর কোলকাতা গুণদা চক্রবর্তী, মদনমোহন বিদ্যাভূষণ ও হীরেন রায়	
২১।০১।৫৪	বালিগঞ্জ লেকভিউ স্কুল	—
২৪।০১।৫৪	আড়িয়াদহ	অধ্যাপক সীতাংশু মৈত্র
—	বেলগাছিয়া মনোহর একাডেমি	হীরেন রায় ও কালীপদ কুণ্ডু
—	যাদবপুরের ২২টি বিদ্যালয়ের সম্মিলিত সভা	—
—	খিদিরপুর মিলনী হাইস্কুল	—
—	তীর্থপতি ইনস্টিটিউশন	—
—	ঢাকুরিয়া ময়দান	ডা. সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, সত্যপ্রিয় রায় ও অনিলা দেবী
—	সাউথ সুর্বাবান স্কুল	—
—	যাদবপুর টালিগঞ্জ	আইনজীবী নলিনাক্ষ চট্টোপাধ্যায়
—	লিন্টন স্ট্রিট (শিক্ষিকাদের সভা)	অনিলা দেবী
—	মধ্যকলকাতা রানী রাসমণি স্কুল	—
—	উত্তর কলকাতা জুবিলী স্কুল	ধুমন সিং
—	বড়বাজার সত্যনারায়ণ পার্ক	স্বামী স্বরূপানন্দ
—	আমতা (হাওড়া) বাজার	কৃষ্ণধন সিংহ, অনিলা দেবী, হীরেন রায় ও অধ্যাপক শিবপ্রসাদ সিংহ
—	সাত্রাগাছি	অধ্যাপক নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অনিলা দেবী
—	বেলঘরিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	হীরেন রায়
—	বসিরহাট টাউন হল	—
—	ঘাটাল মহকুমা শিক্ষক সম্মেলন	—
—	রাজনগর স্কুল	—
—	তারকেশ্বর জাংগীপাড়া উচ্চবিদ্যালয়	—
—	মুর্শিদাবাদ লালবাগ মিউনিসিপ্যাল ময়দান	—
—	কৃষ্ণনগর সদর মহকুমা	সুধীরচন্দ্র মল্লিক এবং অনিলা দেবী
—	শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী	—
—	বাঁকুড়া বঙ্গবিদ্যালয়ে ৩৫টি স্কুলের সম্মিলিত সভা	—
—	বালুরঘাট (তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুর)	সুশীল ঠাকুর ও সরোজ চট্টোপাধ্যায়
৩১।০১।৫৪	বিদ্যাসাগর হল, মেদিনীপুর	ঈশান মহাপাত্র, অনিলা দেবী
৩১।০১।৫৪	কালনা টাউন হল	—
৩১।০১।৫৪	ডায়মন্ডহারবার করঞ্জলি বিদ্যাপীঠ	—
৩১।০১।৫৪	বহরমপুর গান্ধী ময়দান	ত্রিদিব চৌধুরী

আন্দোলনের একেবারে দ্বারপ্রান্তে ১৯৫৪-এর ২৮ জানুয়ারি এক বিশাল জনজমায়েত হল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (অধুনা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার)। সভাটিতে সভাপতিত্ব করেন বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। সত্যপ্রিয় রায় ও অনিলা দেবী ছাড়াও ড. জানকী বল্লভ ভট্টাচার্য, অমূল্য ভট্টাচার্য, মনোজ বসু প্রভৃতি এই সভায় বক্তব্য রাখেন। বড়বাজার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক সত্য নারায়ণ মিশ্র অবধি তাঁর স্বদলীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে বলেন, ''শিক্ষা ব্যবস্থার দাবি টাকার অজুহাতে উপেক্ষিত হওয়া গুরুতর অন্যায়। শিক্ষার প্রসার ভিন্ন স্বরাজ মূল্যহীন।'' এই সভার প্রধান বক্তা ছিলেন বিখ্যাত বামপন্থী ইতিহাসবিদ অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি শিক্ষকদের প্রতি সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, শিক্ষকদের দাবি মেটাতে মোট ব্যয় হবে ৩৫ লক্ষ টাকা। দেশে লোহা ও ইস্পাত কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনায় কনসালটিং ফি বাবদ সরকার খরচ করেছে ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। টাটা কর্তৃপক্ষ বলছে এ টাকা বৃথাই খরচ করা হয়েছে। এভাবে দেশের অর্থ কম ব্যয়িত হচ্ছে না। অথচ সরকার শিক্ষার স্বার্থে ব্যয় করতে ইচ্ছুক নন। টাকার অভাবের জন্য শিক্ষকদের দাবি মেটানো হয় না এটা সত্য নয়। সরকারের এ অজুহাত ভুয়া।''[১৩১] সভায় এছাড়াও শিক্ষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য সরকারের কূট প্রচেষ্টা, ছাত্র বেতন বৃদ্ধির বিরোধিতা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বেতন সরকার কর্তৃক মান্যতা না দেওয়ার, তীব্র সমালোচনা করে আগামীর আন্দোলনে দলমত নির্বিশেষে সকলকে সোচ্চার হতে আহ্বান জানান হয়। এছাড়া রাজ্যকে শিক্ষাখাতে মোট আয়ের ২০% ব্যয় বরাদ্দ করার দাবি তোলা হয় এই সভায়।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের উপান্তে, দলমত নির্বিশেষে শিক্ষক আন্দোলনের যৌথ মঞ্চ নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি থেকে বিযুক্ত হয়ে একদল সরকার ঘেঁষা প্রধান ও সহকারী প্রধান শিক্ষক, 'প্রধান শিক্ষক সমিতি' নামক একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সাধারণ শিক্ষকদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক প্রায় ছিল না বললেই চলে। আসন্ন শিক্ষক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের কাগুজে অস্তিত্বকে অস্বীকার করার তাগিদে এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষকদের দাবিদাওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসে। তারা নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দাবির সঙ্গে একমত হয়েও কর্মবিরতি সহ প্রত্যক্ষ আন্দোলনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে। আসলে শিক্ষকবৃন্দের ন্যায্য দাবিকে উপেক্ষা করলে যে শিক্ষক সমাজের সঙ্গে যেটুকু যোগাযোগ তাদের ছিল, তাও ছিন্ন হয়ে যাবে, সেটা প্রধান শিক্ষক সমিতি অনুধাবন করেছিল। অন্যদিকে সরকারি পার্টির দলদাস হিসাবে তাঁদের পক্ষে দাবি আদায়ের আন্দোলনে যোগদান করা কোনোমতেই সম্ভব ছিল না। যাইহোক ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি তাদের সংগঠনের একটি প্রতিনিধিদল তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। এই প্রতিনিধি দলে বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কামিনীকুমার ঘোষ, বঙ্কিম বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, মনীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং সম্পাদক ধরনী মোহন মুখোপাধ্যায় শামিল হয়েছিলেন। তারা শিক্ষকদের বেতন স্কেল ও মহার্ঘভাতার মূল দাবিকে ঘুলিয়ে দিতে, তৎকালের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় অসম্ভব ভবিষ্যনিধি ও পেনশনের দাবি তুলে শিক্ষকদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু সরকার না মানলে কীভাবে তা আদায় করা হবে তার কোন দিশা দেখাতে ব্যর্থ হন। এই প্রেক্ষাপটে ৫৪-এর ৬ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী ড. রায় এই প্রতিনিধি

দলের মনোভাবের প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'I had since the issue of the last statement, interviewed a deputation consisting of Head masters of Secondary schools as also the members of another deputation from the Board of Secondary Education. I was glad to meet them because they gave me an opportunity of exchanging ideas and discussing all the pionts raised by the representatives of the All Bengal Teachers Association.'[১৩২]

এটা যে পরস্পর গা চাটা চাটির বিষয় এই বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। পরবর্তীতে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আন্দোলন চলাকালীন তাদের দ্বৈত চরিত্রের আরো প্রকাশ আমরা দেখতে পাব। যথা সময়ে তা আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু এইটুকুই উল্লেখ করা যথেষ্ট হবে, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দাবির বিপরীতে প্রধান শিক্ষক সমিতি তাদের মেমোর‍্যান্ডামে বলেছিল, 'We recommend the following scales of pay for Head masters and teachers : Head masters.... 250/- to 500/- with efficiency bar at 400/- Teachers 80/- (for I.A untrained), 100/- (for B.A. untrained), 120/- (for B.A., B.T.), 130/- (for Good M.A. or Good Hons and Good B.T.)'।[১৩৩] স্বপ্নেই যদি খেতে হয়, তবে পোলাও- এ বেশি ঘি ঢালা যেতেই পারে। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে কীভাবে সেই দাবি মিটবে তা সম্বন্ধে কোনো দিশা সেই সময় প্রধান শিক্ষক সমিতি, সাধারণ শিক্ষকদের সামলে তুলে ধরতে সক্ষম হয়নি। বরঞ্চ তৎকালীন প্রগতিশীল ছাত্ররা যে, শিক্ষক আন্দোলনকে সমর্থন করছিলেন তার তীব্র বিরোধিতা করে এই মেমোর‍্যান্ডামে বলা হয়েছিল, 'The Association (H.M.A.) has repeatedly deplored the practice of using school students in propaganda and canvassing work at the time of political elections, in favour of this or that political party, which encourages indiscipline in schools and held that the practice should be stopped by suitable legislation][১৩৪] পরবর্তীকালে আমরা আলোচনার আলোকে দেখব অরাজনৈতিকতার ঘোমটা টেনে পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি মূলতঃ সরকারের ধামাধরা হিসাবে কাজ করেছে। শিক্ষকের স্বার্থ কখনোই প্রাধান্য পায়নি তাদের কার্যকলাপে। সে কথা পরে, বাংলার সবচেয়ে বড় শিক্ষক সংগঠন এ.বি.টি.এ-র কথায় ফিরে যাই।

আমরা দেখি, ১৯৫৩-এর জানুয়ারিতেই অন্যান্য গণসংগঠনের পাশাপাশি শ্রমিক শ্রেণিও শিক্ষকদের সমর্থনে সভা করতে থাকে। সত্যিই শ্রমিকশ্রেণি ও মধ্যবিত্ত শিক্ষক সমিতির আদর্শগত মেলবন্ধন ঘটে এই সময়ে। ৫৩-এর ৩০ জানুয়ারি বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও হিন্দ্ মজদুর সভার যৌথ সভা হয় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (অধুনা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) নিজেদের দাবি দাওয়ার পাশাপাশি লড়াকু শ্রমিকেরা শিক্ষকদের দাবির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। প্রবীন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মৃণাল কান্তি বসুর সভাপতিত্বে এই সমাবেশ হয়। এই প্রসঙ্গে, শ্রমিক নেতা মনোরঞ্জন রায়ের স্মৃতিচারণা থেকে আমরা জানতে পারি, 'প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলনে মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রতি শ্রমিক শ্রেণি তথা গণতান্ত্রিক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং এখানেই যুক্ত আন্দোলনের পটভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়।'[১৩৫]

শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরাও এই সময় শিক্ষকদের আগামী আন্দোলনের সমর্থনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। প্রগতি লেখক সংঘ, গণনাট্য সংঘ, ক্রান্তি পরিষদের বুদ্ধিজীবী সদস্যেরা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা এক যৌথ আবেদনে শিক্ষকদের আন্দোলনকে সমর্থন করে, জনগণের মধ্যে পৌঁছে দিলেন। এই সব আবেদনকারী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন হাজরা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জনাব পারভেজ, আবদুল ওদুদ, শম্ভু মিত্র, ধীরেন সেন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে আন্দোলন চলাকালীন ব্যক্তিগতভাবে শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষকদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে জনমত গঠন করতে এগিয়ে এসেছিলেন, তাও আমরা দেখব।

আন্দোলন শুরুর অব্যবহিত পূর্বে, শিক্ষকরা ৫৪-এর ১ ফেব্রুয়ারি মনুমেন্ট (শহীদ মিনার)-এর ময়দানে এক সভায় সমবেত হলেন। সংগ্রাম সেদিন আর শুধু শিক্ষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সভায় শিক্ষকদের কাতারে আজ শামিল ছাত্র-যুব-শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবীদের গণসংগঠনগুলি। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য। সভামুখী শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন শিক্ষক আন্দোলনের প্রাণপুরুষ সত্যপ্রিয় রায়। ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবক ঐক্যের ধ্বনি উঠেছিল সেই মিছিলে। ছাত্ররা শিক্ষকদের কর্মবিরতিকে সমর্থন করে, আন্দোলন শুরুর দিন অর্থাৎ ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করবেন বলে সেই সভায় ঘোষণা করলেন। সভার সভাপতি অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য বলেন যে, 'শিক্ষকদের কর্মবিরতির ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তার ফলভোগ জনসাধারণকেই করতে হবে। এ কারণে জনস্বার্থে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার জন্য বিধানসভা ডাকা দরকার।'[১৩৬] ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা অধ্যাপক হীরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় সভায় তার ওজস্বীনি ভাষণে বলেছিলেন, শিক্ষকদের এই নগণ্য দাবিকে অগ্রাহ্য করবার স্পর্ধা পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাখে। দেশবাসী এই কলঙ্কের উপযুক্ত জবাব দেবে।"[১৩৭] সভায় শিক্ষক সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত মানুষকে শিক্ষকদের পাশে এসে দাঁড়াবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, ''সংগ্রামের পথ আমাদের অপরিচিত। অজানা পথে অগ্রসর হতে আশংকা নিয়ে আমরা ১০ ফেব্রুয়ারির পথে অগ্রসর। কিন্তু আজ জনতার এই জাগ্রত সমর্থন আমাদের নতুন পথের নিশানা দিয়েছে। আমাদের বিপুল ভরসা দিয়েছে।'[১৩৮]

এদিকে শিক্ষকদের বিরোধী পক্ষ ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের কেউ কেউ শিক্ষকদের অর্থনৈতিক দাবি, শুধুমাত্র তাঁদের ব্যক্তিগত লাভালাভের গণ্ডীতে আবদ্ধ বলে, জনগণের মধ্যে প্রচার করছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষকে শিক্ষকদের পাশ থেকে সরিয়ে আনা। স্বভাবতই সমিতির নেতৃত্ব এই অপপ্রচারকে একেবারে প্রাথমিক অবস্থাতেই রুখে দিতে চেয়েছিলেন। সমিতির নেতৃত্বের পক্ষে সত্যপ্রিয় রায় এই মিথ্যা কুৎসার বিরুদ্ধে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন (১৭.০১.৫৪)। সেখানে তিনি বিশ্লেষণ করে দেখান যে শুধু শিক্ষকদের মাইনেকড়ির দাবিতে নয়, মাধ্যমিক শিক্ষার সামগ্রিক এলোমেলো অবস্থার অবসান কল্পেই তারা প্রস্তাবিত আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়েছেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির রূপরেখা নির্দিষ্ট করার জন্য সরকারের

কোনো চেষ্টা নেই। প্রতি শ্রেণিতে সর্বাধিক কত ছাত্রকে ভর্তি করা হবে, সে সম্বন্ধেও কোনো সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণেও সরকার অপারগ। বিদ্যালয়গুলির সামগ্রিক সুপরিচালনার জন্য সরকার সুনির্দিষ্ট 'স্কুল কোড' প্রণয়নে ব্যর্থ। এই রকম নানা বিষয়েই সমিতি সরকারের সুনির্দিষ্ট জবাব চেয়ে ব্যর্থ হবার ফলেই শিক্ষকেরা আন্দোলনে নেমেছেন। এই আন্দোলনের সঙ্গে তাই শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক সাধারণ মানুষ, সবারই স্বার্থ জড়িয়ে আছে। এর পাশাপাশি শিক্ষকদের বেতনক্রম, অবসর নেবার বয়স নির্ধারণ, পেনশন, শিক্ষাগত যোগ্যতার পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জটিলতাও শিক্ষকদের সংগ্রাম সচেতন করে তুলেছে। তাঁর ভাষায় ''এ.বি.টি.এ. কর্মসমিতি এসব বিভ্রান্তিকর কাজকর্ম মেনে নেওয়া অসম্ভব মনে করে।''[১৩৯]

শিক্ষকদের মানুষ চিরদিন তাঁদের শান্ত সৌম্য রূপেই দেখেছে। তারা স্বভাবগত ভাবেই নিরুপদ্রব ও নিজেদের দাবি দাওয়া নিয়ে সেভাবে কোনোদিনই রাস্তায় নামেনি। সেই শিক্ষকদের সংগ্রামী মনোভাবকে বজায় রাখার স্বার্থে, চূড়ান্ত আন্দোলনের আগে অবধি তাদের সংগ্রামী চেতনাকে জাগ্রত রাখবার প্রয়োজন আছে বলে শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ মনে করেছিলেন। শিক্ষকদের মানসিকভাবে সংগ্রামমুখীন রাখবার জন্য 'রাস্তাই একমাত্র রাস্তা' এটা নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করে, সমিতি ১০ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের পূর্বরাত অর্থাৎ ৯ ফেব্রুয়ারি ৫৪ অবধি 'শিক্ষা সংগ্রাম সপ্তাহ' পালনের ডাক দিলেন। এই বিশেষ সপ্তাহের সূচনা হয়েছিল ২ ফেব্রুয়ারি থেকে। এই সপ্তাহে সমিতির আঞ্চলিক স্তরের নেতারা তাদের অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দের সঙ্গে আসন্ন আন্দোলনের গতি প্রকৃতি কেমন হবে, সে বিষয়ে যেমন আলোচনা করবেন, তেমনি শিক্ষা সংগ্রাম সপ্তাহে পরবর্তী দুই দিন অনুষ্ঠিত হবে আঞ্চলিক এবং মহকুমা ভিত্তিক শিক্ষক সম্মেলন। ৫ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন অঞ্চলে স্কোয়াড-এর কর্মসূচি রাখা হয়েছিল। পরের দিনটি ধার্য করা হয়েছিল মহকুমা ভিত্তিক জনসভা। উদ্দেশ্য বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সংগ্রামের ময়দানে সাথী হবার আহ্বানকে ছড়িয়ে দেওয়া। ৭ ফেব্রুয়ারি অঞ্চলে অঞ্চলে পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। ৮ ফেব্রুয়ারি সারাদিন মাইক যোগে প্রচারের জন্য স্থিরিকৃত করা হল। এই শিক্ষা সপ্তাহের শেষ দিন বা ৯ ফেব্রুয়ারি ৫৪ শিক্ষকদের 'ঘর গুছানোর দিন' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। শিক্ষকরা সেদিন আগামীর আন্দোলনের কর্মসূচি, বিশেষ করে আসন্ন পিকেটিং ইত্যাদি সম্বন্ধে পরিকল্পনা রচনার কাজে ব্যস্ত থাকলেন। এই সাপ্তাহিক সংগ্রামে ব্যাপক ভাবে আন্দোলনের ব্যয় নির্বাহের জন্য কুপনের সাহায্যে চাঁদা সংগ্রহ ও সংগ্রামের সমর্থনে গণ স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজও চলেছিল। এই সংগ্রাম সপ্তাহে শিক্ষকদের মধ্যে থেকে 'স্বেচ্ছাসেবক' সংগ্রহের জন্যও সমিতির নেতা ও কর্মীরা সবিশেষ সচেষ্ট হয়েছিলেন। ঠিক হয়েছিল শিক্ষকদের সংগ্রামে বাধা না দিলে, বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি বা প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে কোনো রকম সংঘর্ষে যাওয়া হবে না। বরঞ্চ তাদের আন্দোলনের সহযোগী হিসাবে শিক্ষকদের পক্ষে টেনে আনবার প্রয়াস জারি থাকবে।[১৪০]

এদিকে পশ্চিমবাংলার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি, আন্দোলনের পূর্ব মুহূর্তে শিক্ষকদের পাশে থাকার শপথ নিলেন। এটা ঠিকই এর পিছনে, তাঁদের কংগ্রেস সরকার বিরোধী মনোভাব

অনুঘটকের কাজ করেছিল। তবে তার পাশাপাশি এই সমস্ত দলের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং সেই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত, শিক্ষক অধ্যাপকদের সংখ্যা ছিল অনেক। তারাও তাদের নিজ নিজ পার্টির মধ্যে একটি প্রেসার গ্রুপ হিসাবে কাজ করে, স্ব স্ব পার্টিকে শিক্ষক আন্দোলনের পাশে সক্রিয় ভাবে দাঁড় করাতে প্রায় সর্বতোভাবে সফল হয়েছিলেন।[১৪১] এদিকে আসন্ন আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ৫৪-এর ২ ফেব্রুয়ারি জ্যোতি বসু সহ বারো জন বিরোধী নেতা এক যৌথ বিবৃতি প্রচার করেন। আসন্ন শিক্ষক সংগ্রামকে সমর্থন করে তাঁরা বলেন, ''রাজ্যের জনসাধারণের দীর্ঘ দিনের দাবি বাজেটের শতকরা ২০ ভাগ শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে। অথচ বর্তমান সরকার এ দাবির প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা দেখিয়ে আসছেন। ফলে শিক্ষক সমাজ অপরিসীম আর্থিক দুর্গতি ও দুঃসহ অবস্থার মধ্যে দিন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।''[১৪২] নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-ছাত্র এবং অভিভাবকদের ঐক্য ধ্বংস করবার সরকারি প্রচেষ্টাকেও নিন্দা করেন। দশটি ছাত্র সংগঠন সেই দিনই শিক্ষক আন্দোলনকে সমর্থন করে একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষে ললিতকুমার সিংহ আসন্ন আন্দোলনকে সমর্থন করে একটি বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, ''আসন্ন সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গের সকল প্রাথমিক শিক্ষক, বিশেষ করে সকল আঞ্চলিক প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে অনুরোধ করছি। সর্বস্তরের শিক্ষকদের ঐক্যকে বলিষ্ঠতর করতে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষকগণ যে অন্য কারো পশ্চাতে থাকিবে না, একথা আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি।'[১৪৩]

ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমেই স্টুডেন্টস হলে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, হিন্দ্ মজদুর সভা, সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, প্রাদেশিক কৃষাণ সভা, নিখিল ভারত ব্যাংক কর্মচারী সমিতি, নিখিল বঙ্গ কলেজ কর্মচারী সমিতি, ডক মজদুর ইউনিয়ন, পোর্ট ট্রাস্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি সংগঠনের নেতারা কীভাবে শিক্ষক আন্দোলনে সহায়তা প্রদান করা যায় তার নীল নক্সা প্রণয়ন করতে সমবেত হলেন। এই সমস্ত সংগঠনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হল 'সমন্বয় কমিটি'। সভায় নেতৃত্বকারী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন চক্রবর্তী, পরিতোষ চট্টোপাধ্যায় এবং আবদুল্লা রসুল। শিক্ষকদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও সত্যপ্রিয় রায়। শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে অন্যান্য খেটে খাওয়া মানুষের সংযোগ সাধনের ক্ষেত্রে শিক্ষক নেতা সত্যপ্রিয় রায় একটি বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন বলে সেই আমলের বিশিষ্ট কৃষক নেতা আবদুল্লা রসুল মনে করেন। 'তাঁর ভাষায়, 'তিনি (সত্যপ্রিয় রায়) ও তাঁর নেতৃত্বে তাঁর সহকর্মীরা সিদ্ধান্ত নিলেন এ.বি.টি.এ এবং তার আন্দোলনকে আর বিচ্ছিন্ন রাখা চলবে না। সে জন্য শুধু অন্যান্য স্তরের শিক্ষকদের আন্দোলন ও সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক কায়েম করাও যথেষ্ট হবে না। ছাত্র সমাজের আন্দোলনের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সভা প্রভৃতি লড়াকু গণসংগঠন ও তাদের আন্দোলনের সঙ্গেও তাকে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আন্দোলনকে সেই দিক থেকে প্রয়োজনীয় খাতে পরিচালনা করার কাজ শুরু হয়েছিল, অগ্রসরও হচ্ছিল।''[১৪৪]

ফেব্রুয়ারি মাসেও শিক্ষক আন্দোলনের পক্ষে বড় বড় মহতি জনসভা অনুষ্ঠিত হতে থাকল। কলকাতার পাশাপাশি মফঃস্বল বাংলায়ও আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। এই পর্যায়ের সভা সমিতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সেটি হল শিক্ষকদের পাশাপাশি জনগণের বিভিন্ন অংশের গণসংগঠনগুলি, শিক্ষকদের পাশে প্রত্যক্ষভাবে দাঁড়িয়ে আন্দোলনের অংশভাক্-এ পরিণত হলেন। মফঃস্বলে সেই চূড়ান্ত মুহূর্তে যে সমস্ত সভাসমিতি হয়েছিল তা নিম্নরূপ ঃ

কোচবিহার, রানাঘাটের গয়েশপুর, জলপাইগুড়ি, ২৪ পরগণার বুড়ুল, মহিরামপুর, রায়পুর, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, ট্যাংরাখালি ও ক্যানিং, সোনারপুর, হাওড়া শ্যামপুর, বালী, হাওড়া টাউনহল, শ্রীরামপুর, আসানসোল প্রভৃতি অঞ্চলে। জনপ্রতিনিধিরাও পিছিয়ে থাকলেন না। কোলকাতা পৌরসভার বারো জন পৌর প্রতিনিধি শিক্ষক স্বার্থের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটি বিবৃতি দিয়ে এই সমস্যার সদর্থক সমাধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। চুঁচুড়া পৌরসভার ত্রিশ জন প্রতিনিধি শিক্ষক সংগ্রামকে জোরালো ভাবে সমর্থন করে একটি বিবৃতি দেন। সরকারের সঙ্গে সমঝোতার শেষ চেষ্টা হিসাবে, ফেব্রুয়ারি ৫৪তে বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, অধ্যাপকের একটি প্রতিনিধি দল, মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ছিলেন অধ্যক্ষ জে. এম. সেন, ডা. নলিনাক্ষ সান্যাল, হরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. ফুলরেণু গুহ, মীরা দত্তগুপ্ত। সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে এঁদের সঙ্গে যোগ দেন বামনদাস মণ্ডল এবং অনিলা দেবী। তারা ৫ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। ড. রায় পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে আবার বললেন, যে মহার্ঘভাতার অর্ধেক যদি স্কুল কমিটিগুলি দিতে পারে, তবে বাকী অর্ধেক সরকার দিতে প্রস্তুত। বেশির ভাগ বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি যে আর্থিকভাবে এই দায়িত্ব পালনে অপারগ তা জেনে বুঝেও, কথার প্যাঁচে তিনি শিক্ষকদের মহার্ঘভাতার দাবি পুনরায় অগ্রাহ্য করেছিলেন। মূল বেতনের ক্ষেত্রেও কোনো পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয় বলেও ডা. রায় অভিমত প্রকাশ করলেন। অবস্নাতক শিক্ষকদের যে সরকার বেতন বৃদ্ধি জনিত কোনো সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন না, প্রতিনিধি দল সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, ডা. রায় জবাব দিয়েছিলেন যে, এই ধরনের শিক্ষকদের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে চলে যাওয়াই ভালো। বুদ্ধিজীবী প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রীর দফ্তর থেকে খালি হাতেই ফিরে আসলেন। শিক্ষকেরাও বুঝলেন, সংগ্রাম ছাড়া আর কোনো ভাবেই তাদের দাবি পরিপূরিত হবে না।[১৪৫]

আন্দোলন শুরু হবার শেষ প্রহরেও শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে সভা—সভা আর সভা। রাজ্যের সমস্ত প্রান্তের শিক্ষকদের সক্রিয়ভাবে এবার কোলকাতার বুকে সংহত করবার সাধনা। ল্যান্সডাউন (শরৎ বসু রোড) এর সাউথ সুবারবান স্কুল, ভবানীপুরের রামরিক স্কুল, মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজে ছাত্রসভা, চেতলায় বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা মণি সান্যালের নেতৃত্বে সভা, বিডন স্কোয়ারে, শ্যামপুকুরে, ঝামাপুকুরে একের পর এক ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকদের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছিল, আনুষ্ঠানিক আন্দোলন শুরু হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। মেটিয়াবুরুজ,

বিজয়গড়, তালতলায় হল বড় সভা। সরকারি প্রতিষ্ঠানের তকমা থাকলেও, সরকারি রক্ত চক্ষুকে অগ্রাহ্য করে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের ছাত্র শিক্ষকরা আন্দোলনের স্বপক্ষে সভা আহ্বান করলেন কলেজ প্রাঙ্গণে।[১৪৬]

সেই সময়কার অন্যতম শক্তিশালী রাজনৈতিক দল প্রজা সমাজতন্ত্রী পার্টির সভাপতি ডা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে বললেন, ''দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার উন্নয়ন এবং এতদুদ্দেশ্যে শিক্ষক সাধারণের অবস্থা উন্নতি বিধানের দাবি সার্বজনীন। পশ্চিমবঙ্গের মোট রাজস্বের দিক বিবেচনা করলে শিক্ষাখাতে যে ব্যয় করা হয়, অপরাপর প্রদেশের তুলনায় তা মোটেই সন্তোষজনক নহে। শিক্ষকেরাই আমাদের মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মেরুদণ্ড স্বরূপ। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের কাছে আমার সনির্বন্ধ আবেদন, তাঁরা দুর্ভাগ্যজনক শিক্ষক সমাজের পাশে এসে দাঁড়ান এবং আসন্ন সংগ্রামে তাঁদের সর্বতোভাবে সাহায্য করুন।''[১৪৭] একই সুরে SUCI দলের নেতা শিবদাস ঘোষ শিক্ষক আন্দোলনকে সমর্থন করেন।

গণসংগঠনের মধ্যে সম্মিলিত বাস্তুহারা পরিষদের সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখ নেতা পুনরায় শিক্ষক আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে বিবৃতি দেন। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিও শিক্ষক আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করে। তাঁদের সাবেক নেত্রী মণিকুন্তলা সেনের লেখায় পাই, 'ইংরেজ আমলে আমাদের দেশে যে শিক্ষানীতি বা পদ্ধতি চালু ছিল, তা দেশের লোককে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়নি.....জনসাধারণের একটা অংশকে যতটুকু শিক্ষিত করে নেবার প্রয়োজন, সেইটুকুই শুধু চালু করেছিল ব্রিটিশ সরকার। এদেশের শিক্ষাবিদগণ এই সংকটের সূত্রপাত থেকেই সংকট সমাধানের নানা উপায় চিন্তা করেছেন।....এই নিয়ে নানা পরিকল্পনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালানো হচ্ছে।....দেশে শিক্ষক সমাজও এই সমস্যা নিয়ে চিন্তিত। কারণ প্রত্যক্ষ দায়িত্বে তো তাঁরাই আছেন।.....শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থান সমস্যা, ভর্তি সমস্যা, সিলেবাস সমস্যা, পরীক্ষা সমস্যা, ছাত্রদের বেতন সমস্যা, বিদ্যালয়ের খরচ সংকুলান সমস্যা এবং সর্বোপরি শিক্ষকের বেতন সমস্যার সঙ্গে তারা জড়িত।' মণিকুন্তলা দেবী এই প্রসঙ্গে আরো বলেছিলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক প্রতিষ্ঠান, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে, সরকারের সঙ্গে স্কুল পরিচালনা...সমস্যা নিয়ে বহু লেখালেখি ও আলাপ আলোচনা করেছেন'—কিন্তু কোনো ফল হয়নি। 'শিক্ষকদেরও যে সংসার আছে। সন্তান সন্ততির শিক্ষা ও ভরণপোষণের দায় আছে, তাদেরও যে ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের রাজারে অন্যদের মতন একই মূল্যে জিনিসপত্র কিনতে হয়...এসব যেন সবাই ভুলেই বসেছিল।'[১৪৮] আমরা দেখবো শুধু বিবৃতি বা লেখনীর মধ্য দিয়ে মণিকুন্তলা সেনরা শিক্ষক আন্দোলনকে সমর্থন করে ক্ষান্ত হননি, রাস্তায় আইনসভা ও কারাগৃহে তারা শিক্ষকদের পাশেই দণ্ডায়মান হয়েছেন। পরবর্তীতে আমরা সেই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করব।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির তরফ থেকে পুনরায় মাধ্যমিক শিক্ষকদের দাবি সমর্থনে সোচ্চার ভাবে বলা হয় Considered letter No 307 dt 1st Feb, 1954 from ABTA asking for help in their struggle. Resolved that help be extended to the

All Bengal Teachers' Association by (i) Selling their coupns (ii) Sending representatives to their meetings.[১৪৯] এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নেতারা শুধুমাত্র মাধ্যমিক শিক্ষকদের আন্দোলনের সমর্থনে বিবৃত দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তাঁরা প্রত্যক্ষ ভাবে, মাধ্যমিক শিক্ষকদের সঙ্গে পথে নামার অঙ্গীকার করেছিলেন। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক বন্ধুদের সঙ্গে অধ্যাপক সমিতির সম্পর্ক কতটা জোরালো ছিল, তা তাঁদের ১৬।০২।৫৪-এর এক্সিকিউটিভ কমিটির একটি সভায় গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যেই খুঁজে পাই। গৃহীত সিদ্ধান্তের তিন নম্বর পয়েন্টে বলা হয়েছিল, 'This meeting calls upon all College & University teachers all over West Bengal to observe Secondary Teachers Day on the 20th Feb, 1954, by holding meetings of Teachers Councils in support of the just cause of Secondary teachesrs, by contribution to the ABTA fund and urged upon them to be prepared to signify their sympathy by a token cease work for one day, if ncessary'.[১৫০] এইভাবে অধ্যাপক সমিতি, মাধ্যমিক শিক্ষকদের আন্দোলনে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল—যাকে আমরা ঐক্যবদ্ধ শিক্ষক সংগ্রামের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে মনে করতে পারি।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষকেরাও তাদের সমিতির মাধ্যমে, মাধ্যমিক শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রতি তাঁদের সক্রিয় সমর্থন জ্ঞাপন করেন। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ১৯৫৩-৫৪-এর সম্পাদকীয় কার্যবিবরণী থেকে আমরা জানতে পারি, 'একদিকে যেমন মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে এবং জনগণের ও আমাদের পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সক্রিয় সমর্থনে মাধ্যমিক শিক্ষকগণের কর্মবিরতি আন্দোলন...দুর্বার শক্তি সঞ্চয় করেছিল', তা শ্লাঘার বিষয়।[১৫১]

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিও মাধ্যমিক শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রতি কাগুজে সহানুভূতি জানিয়ে ক্ষান্ত হয়নি। ঐতিহাসিক '১২ দিনের আন্দোলনের' আগেই ১৯৫৩-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি, রাজ্য সরকার যাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ায়, সেই দাবি নিয়ে, মাধ্যমিক শিক্ষক বৃন্দের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিধানসভার উদ্দেশ্যে যৌথ পদযাত্রায় শামিল হয় তাঁরা। প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষক এই মহামিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তৎকালীন কার্যবিবরণী থেকে আমরা আরো জানতে পারি 'এই শোভাযাত্রায় যাহাতে কোনো প্রাথমিক শিক্ষক যোগদান না করেন, তাহার জন্য সরকার পক্ষ কোনো ত্রুটিই রাখেন নাই। স্কুল বোর্ডের শাসানি, জেলা পরিদর্শকের ধমকানি, পেটোয়া কমিটির অনুরোধ-উপরোধ, খয়ের খাঁ দিগের বিবৃতি—ইহার কোনোটিই বাদ ছিল না। কিন্তু জাতির কল্যাণে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও শিক্ষকের দাবি প্রবল করার উদ্দেশ্যে যে শোভাযাত্রার আয়োজন তাহা রোধ করিতে সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয় এবং সেদিনকার শোভাযাত্রা দলমত শ্রেণি ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রায় তিন হাজার প্রাথমিক ও আড়াই হাজার মাধ্যমিক শিক্ষক যোগদান করিয়া, জাতীয় ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় রচনা করেন।'[১৫২] এই মাত্র নয়, বাংলার এই পশ্চিম ভাগে, মাধ্যমিক শিক্ষকদের আন্দোলন যতই শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষকেরা

তার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ৫৪-এর বিখ্যাত আন্দোলনও তার ব্যতিক্রম ছিল না।

আন্দোলনের পূর্ব মুহূর্তে ৬ ফেব্রুয়ারি ৫৪ তে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনগুলোর যৌথ উদ্যোগে একটি সভা আহ্বান করা হয়। মোহিতকুমার মৈত্রর সভাপতিত্বে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সত্যপ্রিয় রায় ছাড়াও জ্যোতি বসু (কমিউনিস্ট পার্টি), বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (আর এস পি), রমেন দে (বি ডি), নীহার দাস (হিন্দু মহাসভা), সত্যেন বসু (জন সংঘ), বিমলানন্দ মুখার্জী (আর. সি. পি. আই), তারা দাস (বলশেভিক পার্টি) ও অজিত সেন (ডেমোক্র্যাটিক ভ্যানগার্ড পার্টি)। এই সভায় সত্যপ্রিয় রায় বলেন যে ভারত সরকার বি. জি. খেরের নেতৃত্বে শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যের ও কেন্দ্রের কি ভূমিকা হবে তা বিবেচনার জন্য খের কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারকে তার মোট বাজেটের ১০% ও রাজ্য সরকারকে ২০% ব্যয় করতে বলা হলে, পশ্চিমবঙ্গ মাত্র ৭% শিক্ষাখাতে ব্যয় করে। দেশের আশি শতাংশ মানুষ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। সরকার অভিভাবকদের কাছ থেকে ছাত্র বেতন হিসাবে উচ্চহারে টাকা আদায়ের যে ফিকির করছে তাতে গরিব লোকদের কাছ থেকে শিক্ষাধারা আরো দূরে চলে যাবে। তাই শ্রীরায় শিক্ষার ধারাকে অব্যাহত রাখতে সরকারকেই শিক্ষার সমস্ত ব্যয় ভার গ্রহণ করতে হবে এই মত ব্যক্ত করেন। সমাবেশে সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''শিক্ষকদের আন্দোলন আজ শুধু তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি জনগণের আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। কারণ সমস্যাটি শিক্ষক সমাজের নয়। এটা জাতির সমস্যা।''[১৫৩]

সমাবেশের প্রধান বক্তা বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা জ্যোতি বসু এই মহতি সভায় উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বলেন, ''বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী শিক্ষায় বিস্তার করে যদি সত্যিই দেশকে সমৃদ্ধিশালী করতে চান, তাহলে শিক্ষার দাবিকে অবিলম্বে মেনে নিতে হবে।....শিক্ষকেরা অতি সামান্য দাবি উত্থাপন করেছেন। বৃটিশ শাসনের সময়ও শিক্ষকেরা কোনোদিন দাবি আদায়ের জন্য রাস্তায় বের হননি। আর আজ কংগ্রেস আমলে তাও হচ্ছে। ..... শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের লাঞ্ছনা না দেবার ইচ্ছা থাকলে সরকার এখনই এ ব্যাপারে মীমাংসা করতে পারেন।''[১৫৪] সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক মোহিত মৈত্র বলেন, সরকার শিক্ষার দায়িত্ব অস্বীকার করবার ফলেই আজকের আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে। শিক্ষা ও শিক্ষকদের প্রতি ঔদাসীন্যের ফলে আজ তাঁদের অবস্থা চরমে উঠেছে।

সরকারপক্ষীয়দের পক্ষ থেকে কোনো কোনো কাগজে খবর প্রকাশ করা হয় যে, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সুপারিশ কার্যকর করা হলেও, শিক্ষকেরা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাবে হরতাল ও বিশৃংখলার কাজ চালিয়ে যাবেন। একথার প্রতিবাদ করে শিক্ষক সমিতির মুখ্য নেতা সত্যপ্রিয় রায় এক বিবৃতিতে বলেন, ''কলকাতার কতগুলি সংবাদপত্রে খবর যে সমিতির সব দাবি মেনে নিলেও ধর্মঘট হবে। কারণ সরকার বিরোধীরা এই ধর্মঘটের উদ্যোক্তা। এ প্রচারের মধ্যে কোনো সত্য নিহিত নাই। সমিতি তাঁদের দাবি দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ করে আসছে। এর

জন্য যথারীতি সরকারের কাছে দাবিপত্র পেশ করেছে। দীর্ঘকাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষার পর তাঁদের চূড়ান্ত কর্মসূচী নিতে বাধ্য করা হয়েছে।" তিনি আরো বলেন, ''আমরা সকলের সমর্থন কামনা করি। সরকারে অধিষ্ঠিত দলটিকেও সঙ্গে পাইলে আমরা খুশী হইতাম। শিলিগুড়ি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত পরিহার করিয়া পর্ষদের সুপারিশ অনুসারে বেতন ও মহার্ঘ ভাতার দাবি করিয়া সমিতি প্রমাণ করিয়াছে যে কোনোরূপ সংঘাত এড়াইতে তাহারা কত ব্যগ্র। এই সামান্য দাবি প্রত্যাখ্যান করিয়া সরকার ইহাই প্রমাণ করিলেন যে শিক্ষার প্রতি তাঁহারা কত উদাসীন। আমরা ঘোষণা করিতেছি যে পর্ষদের সুপারিশ মানিয়া লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কর্মবিরতির কর্মসূচী প্রত্যাহার করিব।"[১৫৫]

শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রতি জনগণের বিভিন্ন অংশের বিপুল জনসমর্থনে কিছুটা বাধ্য হয়েই সরকার ৫ ফেব্রুয়ারি ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের বৈঠকে শিক্ষকদের দাবি দাওয়া নিয়ে আলোচনা করে। আর্থিক দায়দায়িত্ব না নিতে চাইলেও শিক্ষক সন্তানদের বিনা মূল্যে শিক্ষা গ্রহণ ও চিকিৎসার সুযোগ সরকার দিতে আগ্রহী বলেও মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শিক্ষণ বিহীন শিক্ষকদের শিক্ষক-শিক্ষণ লাভের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের কথাও বলা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, (১) যে সব শিক্ষক শিক্ষণ প্রাপ্ত নন তাঁদেরকে তিন বছরের জন্য বিশেষ ভাতা দেওয়া হবে। তিন বছরের জন্য তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য বেতন ও ভাতার অতিরিক্ত মাথা পিছু প্রতি মাসে পাঁচ টাকা বাড়তি পাবেন। এই সময়ের মধ্যে অবশ্যই তাদের শিক্ষক-শিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। (২) সাহায্য বিহীন বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকেরাও ঘোষিত মহার্ঘভাতার সুযোগ পাবেন। অবশ্য যে সাহায্য বিহীন বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা সাড়ে সাতশোর অধিক তাদের এই সুবিধা দেওয়া হবে না। মুখ্যমন্ত্রী ডা. রায় বলেন এই সব আর্থিক সুবিধা দেওয়ার জন্য সরকারকে বছরে ত্রিশ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে বর্ধিত হারে মহার্ঘভাতা দেওয়া সরকারের পক্ষে অসম্ভব একথাও বলা হয় সরকারি বিবৃতিতে।[১৫৬]

স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষক সমিতির পক্ষে এই অপর্যাপ্ত 'মুষ্ঠিভিক্ষা' দানের প্রস্তাব মেনে নেওয়া সম্ভবপর ছিল না। শিক্ষকদের পক্ষে সত্যপ্রিয় রায় মত প্রকাশ করেন, যে সরকার শিক্ষকদের দাবিদাওয়া নিয়ে রাজনৈতিক বাকচাতুর্য চালাচ্ছেন। তাঁর মতে সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা তাঁদের মোট সংখ্যার দশ শতাংশ মাত্র। বিদ্যালয়গুলিতে চল্লিশ শতাংশ গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকই ট্রেনিংপ্রাপ্ত নন। এদের জন্য পর্ষদ কর্তৃক যে সুপারিশ করা হয়েছে তা কিছুই সরকার মেনে নেননি। তদুপরি বিদ্যালয়ের পঁয়তাল্লিশ শতাংশ যে শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির কোনো রূপরেখাও ডা. রায়ের মন্ত্রীসভা দিতে পারেনি। এই রকম পরিস্থিতিতে সত্যপ্রিয় রায়ের মতে, 'আমরা বলিতে চাই যে ডা. রায় যদি সহানুভূতি ও বোঝাপড়ার মনোভাব লইয়া এ সম্পর্কে ব্যবস্থা না করেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষে নিজেদের সিদ্ধান্ত অটল থাকা ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না।"[১৫৭]

শিক্ষকদের এইসব দাবির প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয় ''শিক্ষকদের সংগ্রামের সমর্থনে বহু খ্যাতিসম্পন্ন কংগ্রেসী কর্মকর্তাগণও মুখর হইয়া

উঠিয়াছেন। বড় বাজার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের প্রকাশ্য জনসভায় ভাষণ, পশ্চিম দিনাজপুরের কংগ্রেসী কর্মকর্তাদের দ্বিধাহীন সমর্থন ঘোষণা প্রভৃতি দেখিয়াও কংগ্রেসী শাসকেরা যদি হাওয়া চিনিতে না পারেন, তবে ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলনের বিপুল ধাক্কায় তাহাদের দাম্ভিক ঔদ্ধত্যের সম্পূর্ণ পরাজয়ের মধ্য দিয়েই প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হইবে।"[১৫৮]

এই পত্রিকাতেই ৮ ফেব্রুয়ারি ৫৪-এর সম্পাদকীয়তে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের শিক্ষকদের প্রতি সহানুভূতি তো নয়ই বরঞ্চ তাঁদের প্রতি যে দমনমূলক মনোভাব সরকার গ্রহণ করেছে তার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের মতো আজীবন কংগ্রেস সেবকও ৫৪-এর ৩ ফেব্রুয়ারি, বোলপুরের এক শিক্ষক সমাবেশে সভাপতির আসন থেকে বলেন যে, তিনি কংগ্রেস রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন এবং অন্য কোনো দলের লোক নন। তা সত্ত্বেও তাঁর শিক্ষকদের দাবি ও শিক্ষার যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। আন্দোলনের গতি প্রকৃতি অলোচনায় আমরা পরে দেখব আইনসভার মধ্যেও জে. সি. গুপ্তের মতো কংগ্রেসি জনপ্রতিনিধিরাও শিক্ষকদের দাবির প্রতি সমর্থনমূলক মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। এই বিষয়টি আমরা পরে আলোচনা করব। এদিকে আন্দোলনের পূর্বাহ্নেও বিভিন্ন স্তরে শিক্ষকরা জোরে শোরে তাঁদের দাবি দাওয়ার সমর্থনে প্রচার করতে থাকলেন। আপামর জনতারও সহায়তা পেলেন তাঁরা। কলকাতার পাশাপাশি এর সন্নিহিত জেলাগুলি যেমন হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান এবং অবিভক্ত ২৪ পরগণার মাটি শিক্ষকদের রণহুংকারে আবিল হয়ে গেল। আসানসোলে ছাত্র যুবক শ্রমিকদের সম্মিলিত মিছিল বের হল। হাওড়ার শিবপুরে ষোলটি গণ সংগঠনের ডাকে, শিক্ষকদের সমর্থনে বিরাট মিছিল হল। ২৪ পরগণার সোনারপুর ও ইছাপুরে, হুগলীতে ভদ্রেশ্বর, চুঁচুড়া ও কোন্নগরের সভায় মানুষের উপছে পড়া ভীড় সমর্থন জানাল শিক্ষকদের প্রতি। ছাত্র-যুব-কৃষক শ্রমিকেরা শিক্ষকদের দাবির সমর্থনে পৃথকভাবে সভা সমাবেশে শামিল হতে থাকল। ছাত্র যুব শ্রমিকদের পাশাপাশি তথাকথিত 'অল্প শিক্ষিত' কৃষকরাও শামিল হল জনতার এই কাতারে। কৃষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ একটি বিবৃতিতে জানালেন, ''পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিল শিক্ষক সমাজের এই সংগ্রামের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানাইতেছে এবং সংগ্রামী শিক্ষকদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ ও সংগ্রামের সাফল্য কামনা করিতেছে।"[১৫৯] রাজ্যের কোনো কোনো স্থানে যেমন তারকেশ্বরে শিক্ষক আন্দোলনের সমর্থনে কৃষক আন্দোলন দুর্বার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। প্রায় ষোলো শত কৃষক এখানে সংঘবদ্ধ হয়ে গুরু প্রণামী দিয়েছিল সম্মানিত শিক্ষকদের।

যাইহোক, আন্দোলন শুরু হবার দুই দিন আগে ৮ ফেব্রুয়ারি ৫৪তে, ইতোমধ্যে গঠিত সর্বদলীয় শিক্ষক সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিশাল সমাবেশ সংগঠিত হয়। সেই সভায় মাধ্যমিক শিক্ষকদের দাবি সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রীর মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করা হয়। সভার সভাপতি ছিলেন বড়বাজার হিন্দি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভুবন মোহন সিংহ। সভায় সত্যপ্রিয় রায় বলেন, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ইন্টারমিডিয়েট ও ম্যাট্রিক পাস শিক্ষকরা যে স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য অপরিহার্য—এই মত প্রকাশ করা সত্ত্বেও ডা. রায় এদের

কোনো আর্থিক সুবিধা দিতে রাজী নন। এর ফলে তিনি রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে রসাতলে পাঠানোর বন্দোবস্ত করছেন। তিনি আরো বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর অভিরুচি অনুযায়ী সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত প্রারম্ভিক বেতন, ১৯৫৮ থেকে বকেয়া ধরে দেওয়া হবে। এর ফলে শিক্ষকেরা তাদের নিয়োগের সময় থেকে যে বেতন হারের অধিকারী হতেন, তা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হবে। বিশেষ করে অনেক বয়োবৃদ্ধ অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা চূড়ান্ত রূপে আর্থিক দিক থেকে বঞ্চিত হবে বলেও সত্যপ্রিয় বাবু মত প্রকাশ করেন। এই সভায় শিক্ষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিক্ষক নেতা শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা তাঁদের ভাষণে শিক্ষকদের প্রতি সরকারের বিমাতৃসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির তুমুল সমালোচনা করেছিলেন। সভাপতির ভাষণে ভুবন মোহন সিং বলেন, 'স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও এই দেশে কোনো সার্থক শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে কোনো ক্রমেই শিক্ষা বলা চলে না। স্বাধীন সরকারের সর্বপ্রথম কর্তব্য ছিল শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক করা অথচ এই কাজ করা হয়নি।' তিনি আরো বলেন, 'গত ১০/১২ বছরের মধ্যে ছাত্রদের বেতন তিন/চার গুণ বেড়েছে। অথচ শিক্ষকদের বেতন বাড়েনি। শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতির জন্য শিক্ষকদের বেতনক্রম ও সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত ছিল। বার বার আবেদন নিবেদন করেও এইসব দাবির প্রতি সরকারের সহানুভূতি লাভ করা যায়নি।"[১৬০]

৫৪' এর স্মরণীয় বারো দিন ঃ এসো সমিতির সাম্যে ও ঐক্যে

এবার এসে পড়ল সেই মহাসমরের সন্ধিকাল। ১০ ফেব্রুয়ারি ৫৪ চূড়ান্ত আন্দোলনের চূড়ান্ত প্রস্তুতির জন্য কোনো সভা সমাবেশ না করে সাংগঠনিক প্রস্তুতির কাজে লিপ্ত রইলেন শিক্ষকেরা। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁরা জানতেন শুধু আবেগের স্রোত দিয়ে কোনো আন্দোলনকে সফলতার সিংহ দরজায় পৌঁছে দেওয়া যায় না। প্রয়োজন হয় সাংগঠনিক শক্তি ও নির্দিষ্ট পরিকল্পনার। গোটা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকেরা তখন সরকারি আচরণে ক্ষুব্ধ। জেলার নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তারাও মূল আন্দোলনে যোগ দেবার মানসে কোলকাতায় এসে পড়েছিলেন। কোলকাতার স্থানীয় কর্মী ও মফঃস্বলের অনেক কর্মীদের কোলকাতার কেন্দ্রীয় আন্দোলনের সাহায্য ও পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। কোলকাতার বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে কর্মবিরতি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মীরা চট্টোপাধ্যায়, নীলিমা সেন ও মায়া চক্রবর্তীর মতো অগ্রণী শিক্ষিকারা। এছাড়া কোলকাতায় আন্দোলন পরিচালনার সামগ্রিক সাংগঠনিক দিকটি দেখার দায়িত্ব পড়ল অজিত দাস, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন চক্রবর্তী এবং ফুলরেণু গুহ-র উপর। অন্যান্য জেলায় আন্দোলনের জন্য কর্মীদের দফায় দফায় কোলকাতায় প্রেরণ করা ছাড়াও অন্যান্য সাংগঠনিক দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন ঃ

(ক) হাওড়ায়—বিজয়রত্ন বক্সী, বীণা মজুমদার, অসীম হালদার, দ্বিজেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ঋষিকেশ চক্রবর্তী ও গোষ্ঠ চট্টোপাধ্যায়।

(খ) হুগলীতে—বলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায়, ষষ্ঠীচরণ সেন, অনিল বসু, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য, চন্দন শূর, সুহাসিনী সেন, মদন চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায় ও পঞ্চানন বেনিয়াল।

(গ) অবিভক্ত ২৪ পরগণায়—নির্মল গুপ্ত এবং বামনদাস মণ্ডল।

(ঘ) মেদিনীপুর—কালোবরণ চট্টোপাধ্যায় ও জগদীশচন্দ্র দাস।

(ঙ) বর্ধমান—তারাকুমার মিশ্র, ধীরেন পতি, তাপস নাগ, ধর্মদাস চৌধুরী ও অম্বুজাভূষণ বসু।

(চ) মুর্শিদাবাদ—সুশীল ঠাকুর এবং সন্তোষ ভট্টাচার্য।

(ছ) নদীয়ায়—বীরেন আচার্য।

(জ) জলপাইগুড়ি—চুনীলাল সাহা, সুরেন্দ্রনাথ সাহা।

(ঝ) সাবেক পশ্চিম দিনাজপুর—ধীরেন ভট্টাচার্য, হেমপ্রসন্ন চক্রবর্তী এবং অমলেন্দু চক্রবর্তী।

(ঞ) মালদহে—রাণু দাস, রেণু লাহিড়ী ও কমলা চৌধুরী।

(ট) বীরভূমে—শরৎচন্দ্র প্রামানিক।

(ঠ) বাঁকুড়ায়—ভোলানাথ ঘোষ ও তারাপদ শিকদার।

আর সামগ্রিক ভাবে রাজ্যস্তরের আন্দোলনের রাশ রইল সত্যপ্রিয় রায়, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, অনিলা দেবী, হীরেন রায়, সুধা রায়, কালীপদ কুণ্ডু প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উপর। এছাড়া এই সময়ে কোলকাতার দুই তরুণ কর্মী রথীন্দ্র কৃষ্ণ দেব ও গোলকপতি রায় ও 'মাঠকর্মী' হিসাবে মুখ্য নেতাদের প্রভূত সহায়তা করেছিলেন।[১৬১] উল্লিখিত নেতাদের দায়িত্বে আসন্ন কর্মবিরতি সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সাংগঠনিক তৎপরতাকে একটি চূড়ান্ত রূপ দেওয়া গেল। অনুপ্রাণিত একটি কর্মী বাহিনীকেও সংগঠিত করা সম্ভব হল।

অবশেষে উৎকণ্ঠিত অপেক্ষার পর এসে গেল সেই দিনটি। ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪। সকাল থেকে শিক্ষক/শিক্ষিকারা নিজ নিজ স্কুলের সামনে পিকেটিং করে কর্মবিরতির সূচনা করলেন। শিক্ষকেরা আজ অবশ্য একা নন—বশিষ্ঠ থেকে বুনো রামনাথ দের একাকিত্ব ভেঙে তাঁরা আজ আমজনতার সারিতে শামিল। শিক্ষকেরা তাদের নিজ নিজ স্কুলে কর্মবিরতি করতে তৎপর। সমিতির সংগ্রামী নেতৃত্বও অংশ নিয়েছিলেন এই পিকেটিং-এ। অনিলা দেবী তৎকালীন নেতা গোলকপতি রায়ের পিকেটিং করবার সময়ের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তার জবানীতে 'উত্তর কোলকাতার একটি স্কুলে গোলকপতিকে পিকেটিং-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ঐ স্কুলের ছাত্রদের সাথে স্কুল কর্তৃপক্ষের মধ্যে ধর্মঘট আর নো ধর্মঘট নিয়ে বচসা ও গোলমাল চলছিল। তখন হঠাৎ গোলকপতি একটা উঁচু জায়গায় উঠে 'আই ডিক্লেয়ার হলি ডে' বলে চিৎকার করে বক্তৃতা শুরু করে দিল। সেই স্কুলে ধর্মঘট হয়ে গেল।' অনিলা দেবী আরও লিখছেন 'মনে হবে এটা একটা মজার ও হাসির ঘটনা। কিন্তু আমার কাছে এই ঘটনার তাৎপর্য আরো গভীরে। যখন সবে মাত্র শিক্ষক সমাজ পুরানো মূল্যবোধ ভেঙে মর্যাদা ও জীবন জীবিকার স্বার্থে মুখ খুলছেন, পথে নামছেন, তখনতো নানান বাধা আসতেই পারে। আসল মূল লক্ষ্যে সফল হবার জন্য কত রকমের বাস্তবতার মুখে মোচড় দিয়ে সাফল্যকে ছিনিয়ে আনতে হয়, গোলকপতি সেদিন তাই আমাদের শিখিয়ে ছিল।'[১৬২] সমিতির তদানীন্তন উত্তর কোলকাতা শাখার

সম্পাদিকা, তাদের অঞ্চলে ৫৪-এর আন্দোলনের স্মৃতি রোমন্থন করে বলেছেন, 'গোলকদা, রথীনদা, সমরেশ আর আমি। আমাদের কাজ ছিল সারা অঞ্চল টহল দিয়ে বেড়ানো। ভোর হতে হতেই পৌঁছে যেতাম সকালের স্কুলের গেটে গেটে। স্কুলে স্কুলে কর্মবিরতি সফল করতেই হবে। .... আবার সকালের স্কুল থেকে ডে-স্কুলের দরজায় পৌঁছে যেতাম। প্রত্যেক স্কুলে স্বেচ্ছাসেবক পাঠানো, পিকেটিং করতে হতো। আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখতে হতো।'[১৬৩] দক্ষিণ কোলকাতাও আন্দোলনে পিছিয়ে ছিল না। সেই অঞ্চলের মহিলা নেত্রী নীলিমা সেনের লেখনী থেকে আমরা জানতে পারি, ''আন্দোলন চলাকালীন স্কুলে স্কুলে যাওয়া, ভলেন্টিয়ার সংগ্রহ করা এই সব আমরা করে যাচ্ছিলাম। তারপর যখন অবস্থান ও Cease work শুরু হয়ে গেল আমরা তো এসপ্ল্যানেড ইস্টেই বসে থাকতাম। সেই সঙ্গে সকালে মরনিং স্কুল এবং তারপরই ডে স্কুলগুলিতে পিকেটিং-এর জন্য ছুটতে হত।''[১৬৪]

আন্দোলনের প্রথম দিনে স্কুলে স্কুলে কর্মবিরতি সফল হবার পর জেলা ও মফঃস্বলের শিক্ষকেরা স্ব স্ব এলাকায় সভা সমাবেশ করে জনমতকে আরো বেশি করে শিক্ষকদের পক্ষে আনবার কাজ করবেন এরকমটাই স্থিরিকৃত হয়েছিল। কোলকাতায় ওই দিন বেলা ২.০০ টায় হাজরা পার্ক (যতীনদাস পার্ক), শ্রদ্ধানন্দ পার্ক ও দেশবন্ধু পার্কে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে জনসভা আহ্বান করা হয়েছিল। আন্দোলনের পরবর্তী কার্যসূচী হিসাবে ঠিক হয়েছিল যে ৫৪-এর ১১ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ আন্দোলনের দ্বিতীয় দিনে দুপুর ২টার সময়ে সংগ্রামী শিক্ষকেরা ময়দানে সমবেত হবেন এবং সেখানে একত্রিত হয়ে সরকারের প্রধান কেন্দ্র রাইটার্স বিল্ডিংস বা মহাকরণ অভিযান করা হবে। সমিতির নেতৃবৃন্দ বারংবার বলেন যে ওই শোভাযাত্রা হবে সম্পূর্ণ ভাবে অহিংস ও শান্তিপূর্ণ।[১৬৫]

যাইহোক ১০ ফেব্রুয়ারির কথায় ফিরে যাই। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে কোলকাতার উত্তর ও দক্ষিণ উভয় প্রান্তেই ধর্মঘট সফল করতে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া যথাযথ ভাবে করা হয়েছিল। প্রাতঃকালীন ও দিবা বিভাগের বিদ্যালয়গুলিতে আন্দোলন প্রায় সফল হয়েছিল। দক্ষিণ কোলকাতার কয়েক শত শিক্ষক ও শতাধিক শিক্ষিকা পিকেটিং-এর পর একটি দীপ্ত মিছিল নিয়ে পথ পরিক্রমা করেছিলেন। এই মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তর কোলকাতার অনুরূপ মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন প্রবীণ শিক্ষক রামাশীষ মিশ্র ও শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্ররাও তাদের প্রিয় শিক্ষকদের পাশাপাশি এই সব মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁরা জানতেন যে এই আন্দোলন শুধু শিক্ষকদের বৃত্তিগত চাহিদার পক্ষে নয়—বরঞ্চ সামগ্রিক উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের লক্ষ্যে নিয়োজিত। তাই শিক্ষক ও ছাত্রর সম্পর্ক শুধু গুরু শিষ্যের প্রথাগত সম্পর্কে আজ আর সীমাবদ্ধ নয়। সত্যিই তারা আজ পরস্পরের সংগ্রামী পথের বন্ধু—কমরেড। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় কোলকাতার ১৩০টি বিদ্যালয়ে ধর্মঘট প্রায় সফল হয়। ম্যানেজিং কমিটি ও সরকারের পরোক্ষ প্ররোচনায় কিছু স্কুলে শিক্ষকদের প্রহৃত ও অপমানিত হতে হয়েছিল। এই বিদ্যালয়গুলির মধ্যে বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী স্কুল, তালতলা গার্লস স্কুল, বউবাজার মেট্রোপলিটন স্কুল প্রভৃতির নাম আমরা করতে পারি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত প্রায়

সব ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে কর্মবিরতিকে সফলতার সিংহদুয়ারে পৌঁছে দেন শিক্ষকবৃন্দ এবং তাঁদের প্রিয় ছাত্ররা।[১৬৬]

শুধুমাত্র কোলকাতায় নয় শহরের প্রান্তিক অঞ্চল এমনকি দূর মফঃস্বল থেকেই সংগ্রামী শিক্ষকবৃন্দের কর্মবিরতির সফল সংবাদ আসতে থাকল। টালিগঞ্জ, বরাহনগর, বেহালা, কাশীপুরের স্কুলগুলিতে কর্মবিরতির সার্বিকভাবে সফল হয়েছিল। দমদম, বাগুইআটি, বেলঘরিয়া, পানিহাটি, সোদপুর আগরপাড়া ব্যারাকপুরের প্রায় সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গেট বন্ধ ছিল। নৈহাটি ও ভাটপাড়া, ইছাপুর, শ্যামনগর, ডায়মণ্ডহারবার, বজবজ, মহেশতলা, হাবড়া, জয়নগর, সোনারপুরেও বিদ্যালয়গুলিতে সর্বাত্মক কর্মবিরতি হয়। সালকিয়া ও রিষড়া সহ হাওড়া জেলার সর্বত্র শিক্ষকেরা কাজ বন্ধ করার ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেন। চুঁচুড়া সহ হুগলী জেলায় ও মেদিনীপুরেও কর্মবিরতি করতে শিক্ষকেরা সফল হন। জেলার খড়্গপুর, তমলুক, মহিষাদলে কর্মবিরতিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করে। বর্ধমানে আসানসোল, কালনা, কাটোয়া, মেমারী, গলসী, পূর্বস্থলী ও নাদনঘাট সহ অনেক অঞ্চলেই কর্মবিরতি সম্পূর্ণ সফল করার কাজে শিক্ষকবৃন্দের পাশাপাশি সাধারণ জনতাও অংশ নেয়। বীরভূম জেলার কর্মবিরতি সফল হয়। নদীয়ার কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বেথুয়াডহরি, রাণাঘাট, শান্তিপুর, বগুলাতেও শিক্ষকদের কর্মবিরতি সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়।

পশ্চিম দিনাজপুরে বালুরঘাট, রায়গঞ্জ ও কালিয়াগঞ্জে কর্মবিরতি চরমভাবে সফল হয়েছিল। অন্যান্য অঞ্চলের বিপরীতে বালুরঘাট হাইস্কুলে পরিচালন সমিতি কর্মবিরতিকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সাধারণ শিক্ষকদের পাশে এসে দাঁড়ান। জলপাইগুড়িতেও ধর্মঘট সফল হয়েছিল। মালদহের ইংরাজবাজারে ধর্মঘট সাধারণ ধর্মঘটের চেহারা নেয়। মুর্শিদাবাদ জেলায়ও বহুলাংশে শিক্ষক ধর্মঘট সফলতার মুখ দেখতে সক্ষম হয়। কোচবিহারের নেতৃবৃন্দের প্রেরিত রিপোর্ট অনুযায়ী, সেখানকার সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দরজা ওই দিন বন্ধ ছিল। দার্জিলিং জেলার বিশেষ করে শিলিগুড়ির স্কুলগুলি সেদিন ছিল নিঃশব্দ ও ছাত্রবিহীন।[১৬৭] আমাদের মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র শিক্ষকেরা এই কর্মবিরতিতে অংশ নেননি। ছাত্র-যুব-শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্ত কর্মচারীরাও দলে দলে নানা অঞ্চলে শিক্ষকদের পাশে দাঁড়িয়ে ধর্মঘটকে সফল করে তুলেছিলেন।

সংবাদপত্রসমূহ যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে প্রথম দিন থেকেই শিক্ষক সংগ্রামের সালতামামি তাদের নিজ নিজ কাগজে প্রকাশ করে। গণতন্ত্রের 'চতুর্থ স্তম্ভ' হিসাবে নিজেদের তুলে ধরতেও বহুলাংশে সফল হয়েছিল তাঁরা। ধর্মঘটের পূর্বাহ্নে সমিতির বিবৃতি, সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য, কর্মবিরতির কর্মসূচি তুলে ধরে, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও শিক্ষক আন্দোলনের বার্তা প্রেরণ করার ক্ষেত্রে তারা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। একটি সংবাদপত্র তার Lead news হিসাবে লিখেছিল, ''পশ্চিমবঙ্গের দু হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২৩ হাজার শিক্ষক আজ বুধবার (১০/০২/৫৪) থেকে ৩৫ টাকা মহার্ঘভাতা এবং বোর্ড নির্ধারিত বেতন হারের দাবি করে ধর্মঘট শুরু করেছেন।' অমৃতবাজার তার ১০/০২/৫৪ এর সম্পাদকীয় কলামে শিক্ষকদের দাবি দাওয়া সম্বন্ধে সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে 'পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার ইতিহাসে ১০ ফেব্রুয়ারি

ভাগ্য পরিবর্তনের দিন হিসাবে চিহ্নিত হবে।' তবে পুরোপুরি কংগ্রেস সরকার ঘেঁষা এই পত্রিকা জনমতের প্রতিফলন হিসাবে এই কথা লিখতে বাধ্য হলেও সম্পাদকীয় কলমের শেষ ভাগে বলে যে ধর্মঘট ভারতীয় ঐতিহ্য ও ভাবধারা বিরোধী—এ.বি.টি.এ.-র এখনো লাগাতার আন্দোলনের রথে লাগাম পরাতে পারে।[১৬৮] শিক্ষক সংগ্রামের অবিসংবাদী নেতা সত্যপ্রিয় রায় এই প্রসঙ্গে বলেন, ''কর্মবিরতির বিরুদ্ধে কেহ কেহ মর্যাদার প্রশ্ন তুলিয়াছেন। যে শিক্ষকদের পক্ষে জীবন ধারণই কষ্টকর তাহার সম্পর্কের মর্যাদার প্রশ্ন নিরর্থক। মর্যাদার জন্য গত কয়েক বছর আমরা আমাদের ধৈর্যের অনেক প্রমাণ দিয়েছি। পর্ষদের সুপারিশ কার্যকর করার জন্য আমরা সরকারকে এক বছরের নোটিশ দিয়াছিলাম। ইহা সত্ত্বেও যদি সরকার নিষ্ক্রিয় হন, তবে অচল অবস্থার দায়িত্বও তাহাদের। কারণ আমরা অসম্ভব কোনো দাবি করি নাই।''[১৬৯]

ডা. বিধান রায় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই ধর্মঘটের বিরোধিতা করে মন্তব্য করেছিলেন যে শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার সময়েই শিক্ষকদের জন্য সরকার কতটা সুযোগ সুবিধা দিতে পারে, তা জানানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও এই ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে সরকার উদ্বিগ্ন। একটি প্রেসার গ্রুপ' হিসাবে শিক্ষকরা যে গণসংগঠনসমূহ সহ রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছিল তার প্রতি তীর্যক দৃষ্টি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ''প্রস্তাবিত ধর্মঘটের উদ্যোগ আয়োজন শিক্ষকদের হাত হইতে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক দলের হাতে চলিয়া গিয়াছে মনে হয়।''[১৭০] এটা ঠিকই প্রেসার গ্রুপ হিসাবে শিক্ষক সমিতি যেমন রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন আদায়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তেমনি রাজনৈতিক দলগুলি অবশ্যই চেয়েছিল, এই আন্দোলনে মদত দিয়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে। তৎকালীন বিধানসভার বিরোধী নেতা ও কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু তাঁর এক স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন, শিক্ষক আন্দোলনের পরিচালনার রাশ যাতে কমিউনিস্টদের হাতে থাকে, তার জন্য পার্টি থেকে তাকে ও নিরঞ্জন সেনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।[১৭১]

অন্যান্য দল ও গণসংগঠন সম্পর্কেও কমবেশি এটা সত্য। অবশ্য এর পাশাপাশি মনে রাখতে হবে যে রাজনৈতিক দলগুলি একদিকে যেমন শিক্ষক সমিতির আন্দোলনকে স্ব প্রভাবিত রাখতে সচেষ্ট হত তেমনি সমিতির অভ্যন্তরে তথাকথিত দলবিহীন নেতারা, যাদের মধ্যে সমিতির শীর্ষ নেতা মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও স্বয়ং সত্যপ্রিয় রায়ও ছিলেন, সমিতিকে কোনো পার্টির প্রভাবাধীন করতে কখনোই চাননি। যাইহোক, বিধান বাবুর এমত উক্তির তীব্র বিরোধিতা করে নিজের প্রতিক্রিয়ায় সত্যপ্রিয় বাবু জানান, ''ডা. রায় আসল সমস্যা এড়াইয়া শিক্ষক ধর্মঘটের পিছনে রাজনৈতিক উস্কানীর কথা বলিয়াছেন। শিক্ষকগণের পরিণত বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি কটাক্ষ অপমানকর এবং সর্বৈব মিথ্যা। আমাদের দাবি সর্বতোভাবে শিক্ষার দাবি। ডা. রায় ভালোভাবেই জানেন, আমরা সুদীর্ঘকাল ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করিয়াছি।..... তাহার সরকারের সুপরিকল্পিত ঔদাসীন্যই আমাদের এই চূড়ান্ত পর্যায়ে আনিয়া ফেলিয়াছে।''[১৭২] সরকার পক্ষ যদিও স্বাভাবিক নিয়মে শিক্ষকদের কর্মবিরতি অসফল এমত বক্তব্য রাখে।

যাইহোক আবার আন্দোলনের কথায় ফিরে যাই। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি ধর্মঘটের প্রথম দিনে সফল পিকেটিং করে, শিক্ষকেরা অঞ্চলভেদে কোলকাতার তিনটি স্থানে মহতি

জনসভায় মিলিত হন। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের জনসভায় নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় সত্যপ্রিয় রায় সংগ্রামের খতিয়ান পেশ করে জানান যে, বিভিন্ন স্থানে সংগ্রাম সংগঠিত করার জন্য ষোলো জন আন্দোলনকারী গ্রেফ্‌তার হয়েছেন। দেশবন্ধু পার্কের জনসভায় রমণীমোহন বসু সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় ভাষণ দেন সমিতির কোলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক মদনমোহন চক্রবর্তী, মৃন্ময় বাগচী এবং অধ্যাপক মোহিত মৈত্র। দেশপ্রিয় পার্কেও একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাওড়ায় একটি বড় সভায় ড. কানাইলাল ভট্টাচার্য সভাপতি হন। সভাশেষে কোলকাতার রাজপথে শিক্ষকেরা পদযাত্রাও করেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেয় শত শত জনতা। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায় শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের মধ্যে যে 'স্বদেশী সরকার' বিরোধী ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছিল তার চরম প্রকাশ ঘটেছিল আপাত নিরীহ শিক্ষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। মনে রাখতে হবে স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকেই পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক আন্দোলন দুর্বার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সুতাকল, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, চটকলের এবং উত্তরবঙ্গে চা শ্রমিকেরা নিজেদের হক আদায় করতে আন্দোলন সংগ্রামের পথই বেছে নিয়েছিল। বাস শ্রমিক, ট্রাম মজদুর, ছাঁটাই বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি কৃষক, যুব, ছাত্র, মহিলা, উদ্বাস্তুদের অধিকার বুঝে নেবার সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে উঠেছিল শিক্ষক আন্দোলন শুরু হবার অব্যবহিত পূর্বে। স্বভাবতই এই সব আন্দোলনই শিক্ষকদের এতদিনকার ক্ষোভের আগুনে ইন্ধন যুগিয়ে দাবানলের সৃষ্টি করেছিল। ১৯৫৪-এর শিক্ষকদের যুগান্তকারী আন্দোলনে, সেই সময়কার জনতার সরকার বিরোধীমনস্কতা চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেছিল। তাদের ক্ষোভের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছিল, শিক্ষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। নিছক শিক্ষকদের নিজস্ব আন্দোলন হলে, তা হয়তো এতটা জঙ্গীরূপ ধারণ করত না। তার প্রভাবও হত না এতটা সুদূরপ্রসারী। শ্রমিকনেতা মনোরঞ্জন রায়, সেদিনের সেই অগ্নিঝরা দিনগুলির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, ''প্রকৃত পক্ষে ১৯৫৪ সালের এই আন্দোলনে মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রতি শ্রমিকশ্রেণি তথা গণতান্ত্রিক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং এখানেই যুক্ত আন্দোলনের পটভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়।''[১৭৩]

আন্দোলনের দ্বিতীয় দিন কর্মবিরতিরও দ্বিতীয় দিন, সকালে ও দুপুরের স্কুলগুলিতে প্রথম দিনটির মতোই সফল পিকেটিং এর পর, মনুমেন্ট বা শহীদ মিনারের সংলগ্ন ময়দানে সমবেত হলেন শিক্ষককুল। শিক্ষকদের পাশাপাশি সেদিনকার সংগ্রামী শোভাযাত্রায় শামিল, সমাজের সব অংশের মানুষ। এদের মধ্যে ছাত্রদের জমায়েতের বিশালত্ব সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। শুধুমাত্র কোলকাতা নয় সংলগ্ন অবিভক্ত ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী থেকে শত শত শিক্ষক এসেছিলেন সেদিনের সমাবেশে। সুদূর বাঁকুড়া, বীরভূম, অবিভক্ত মেদিনীপুর থেকেও শিক্ষকেরা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যা অধুনা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার নামে পরিচিত, সেখানে সমবেত হয়েছিলেন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা। এ লড়াই যে তাদেরই সহকর্মী কিংবা গুরুপ্রতীম মাধ্যমিক শিক্ষকদের লড়াই।

শেষ পর্যন্ত শহীদ মিনারে সবাই জমায়েত হয়ে মহাকরণ অভিযানের সূচনা করেন। সুশৃংখল এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন সত্যপ্রিয় রায়, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়,

বামনদাস মণ্ডল ও অনিলা দেবীর মতো পোড় খাওয়া নেতৃত্ব। স্বভাব লাজুক শিক্ষকেরা তাঁদের ছাত্র ও সহকর্মী প্রতীম বন্ধুদের সঙ্গে একসাথে সেদিন শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ বিদীর্ণ করে দিলেন। 'বোর্ডের সুপারিশ মানতে হবে।' '৩৫ টাকা মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে', 'পুলিশী জুলুম চলবে না', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনির প্রবল প্রতাপে সব ব্যবধান ঘুচিয়ে গুরুতুল্য শিক্ষকদের পাশে তখন সব অংশের মানুষ দণ্ডায়মান। শোভাযাত্রা চৌরঙ্গীকে পিছনে ফেলে এসপ্ল্যানেড ইস্ট (আজকের সিধু কানহো ডহর)-কে পাশে রেখে ওল্ডকোর্ট হাউস স্ট্রিটে পৌঁছাল। ডালহৌসী স্কোয়ার (বিবাদীবাগ)-এ জমায়েত না হবার অধ্যাদেশ বা ১৪৪ ধারা আগে থেকেই ঘোষণা করেছিল সরকার। কার্জন পার্কে (সুরেন্দ্রনাথ পার্ক) আন্দোলনকে প্রয়োজন হলে গুঁড়িয়ে দেবার অভিসন্ধিতে মোতায়েন করা হয়েছিল ঘোড়সওয়ার পুলিশ। শোভাযাত্রা এক সময় পুলিশ ব্যারিকেডের সামনে এসে পড়ল। আরক্ষা বাহিনীর বাধা পেয়ে শান্তিপূর্ণ ও অসহযোগ আন্দোলন করার প্রতিজ্ঞা বজায় রেখে শিক্ষকরা উন্মুক্ত রাজপথে বসে পড়লেন। আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্বে জনৈক কবির লেখা যেন মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করল সেই দিন। চির উপবাসী দ্রোণাচার্যেরা রাজ শিষ্যের কাছে/দাবি করে আজ গুরুদক্ষিণা/দিতে হবে, দিতে হবে/"[১৭৪]

যাইহোক এই শান্তিপূর্ণ জন জমায়েতে একের পর এক বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের দাবির সমর্থনে ভাষণ দিতে শুরু করলেন। মাইক ব্যবহার করবার অনুমতি নেই। খোলা গলায় সেই বক্তৃতা হয়তো সব মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। তবু সবাই শান্ত অথচ দৃঢ়। প্রতিজ্ঞার ছাপ তাঁদের চোখে মুখে। বিভিন্ন গণ সংগঠনের ডাকে বিকেলে ডালহৌসীর অফিসপাড়া উজাড় করে মানুষ ছুটে এলেন আন্দোলনে সহমর্মিতা জানাতে।

অনেক দিনের বঞ্চনার প্রতিবাদে সেদিন রাজপথের অ্যাসফল্টের অবস্থানে শামিল মাধ্যমিক শিক্ষকেরা। আজ তারা তাদের গুরুর উচ্চাসন ত্যাগ করে সবার মাঝে, সবহারাদের মাঝে আসীন। একদিনেই যেন এতদিনকার ঐতিহ্যসম্পন্ন শিক্ষকদের ঠুনকো মর্যাদাকে তাঁরা মেহনতি মানুষের অন্তহীন লড়াই-এর যজ্ঞাগ্নিতে বিসর্জন দিয়েছিলেন। শিক্ষিকারা সেদিন প্রচুর সংখ্যায় সমবেত হয়েছিলেন। এই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম জানাচ্ছে প্রায় দশ হাজার মানুষ এই জন জমায়েতে শামিল হয়েছিলেন।[১৭৫]

রাত বেড়ে চলল। শিক্ষক ও তাদের সহযোগীবৃন্দ কিন্তু অটল—অচল। তাদের অবস্থানে মহিলা শিক্ষিকারা সহ অবস্থান আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা। অচঞ্চল কোলকাতার রাজপথে এ এক যুগান্তকারী দৃশ্য। শিক্ষক সংগ্রামের প্রত্যক্ষ শরিক সলিল চৌধুরীর কথায় ও সুরে শিক্ষকেরা তখন সমবেত সঙ্গীতে মগ্ন। আমরা জেনেছি মিত্র, শত্রু চিনেছি/জেনেছি তাদের ভয়/আর জেনেছি এবার মোদের সবার/মৃত্যু হবার নয়/কিংবা, 'তাই গ্রামনগর মাঠ পাথার/বন্দরে তৈরী হও/কার ঘরে জ্বলেনি দীপ চির আধার/তৈরী হও/.... এই মিছিল সবহারার/সব পাওয়ার এই মিছিল/ ইত্যাদি। সলিল চৌধুরী এই সময় শিক্ষক আন্দোলনকে উদ্দেশ্য করেই লিখেছিলেন, 'পথে এবার নামো সাথী/পথেই হবে/এপথ চেনা, ...অনেক তো দিন গেল বৃথা এ সংশয়ে/এসো এবার দ্বিধার বাধা পার হয়ে....' ইত্যাদি। আমরা জানি শিক্ষক সমাবেশে প্রথম

এই গানটি গীত হয়েছিল বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী শ্যামল মিত্রের কণ্ঠে।[১৭৬] সেদিনই রাত্রিতে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সত্যপ্রিয় রায়, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রমুখেরা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে খোলা একটি চিঠি প্রকাশ করলেন—তাতে বলা হল, ''জনসাধারণের পক্ষ থেকে আমরা দাবি করি অনতিবিলম্বে পথের উপর থাকা শিক্ষকদের কাছে আপনি মীমাংসায় আসুন অথবা আপনার সঙ্গে আলোচনার জন্য রাইটার্সে তাঁদের যেতে দিন।''[১৭৭]

সেদিনের সেই অমারাত্রির অবসান অন্তে এসে পড়ল ১২ ফেব্রুয়ারি ৫৪। আন্দোলনে পা দিল তৃতীয় দিনে। আগে থেকেই শিক্ষক আন্দোলনকে সমর্থন করে বিভিন্ন সরকার বিরোধী দল ও গণসংগঠন সেদিন 'বাংলা বন্ধ'-এর ডাক দিয়েছিল। সরকারের শিক্ষা নীতির প্রতিবাদে এই হরতাল কোলকাতা এবং হাওড়ায় আংশিক ভাবে সফল হয়েছিল। এই হরতালকে সমর্থন করে জেলাগুলির বিশেষ করে সদর শহরগুলির দৈনন্দিন জীবনে স্তব্ধতা নেমে এসেছিল। দোকান বাজার, হাট, প্রায় সবই ছিল বন্ধ। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের পাশাপাশি এই দিনে স্কুলের পঠন-পাঠন বর্জন করেছিল। বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, মালদহ, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়িতে বন্ধ ছিল সর্বাত্মক। বর্ধমান শহরে মৃত্যুঞ্জয় মাইতির সভাপতিত্বে সেই দিন বিকালে শিক্ষকদের সমর্থনে এক মহতি সভা হয়। এখানে সুবোধ চৌধুরী ও দাশরথি তা ভাষণ দেন। বাঁকুড়াতেও এক মহতি জনসভা হয় ওই দিন। কানাইলাল দে এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। বক্তব্য রাখেন রাখহরি চট্টোপাধ্যায় ও তারাপদ শিকদার। কৃষ্ণনগরে অনুরূপ সভায় বক্তৃতা রাখেন সুধীর চন্দ্র মল্লিক ও বীরেন্দ্র নাথ আচার্য। মালদহ জেলার গাজোল ও পশ্চিম দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে হরতাল উপলক্ষ্যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। হরতালের দিনে কোলকাতার ময়দানে শিক্ষক আন্দোলনকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে সমাবেশ হয়। আর. সি. পি. আই. দলের শান্তিলাল গুপ্তের সভাপতিত্বে এই সভায় বক্তৃতা দেন বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (সি. পি. আই), অমল রায় (আর. এস. পি.), জ্যোতিষ জোয়ারদার (এস. আর. পি), সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় (এস. ইউ. সি. আই) এবং অধ্যাপক মনীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সভা শেষ হবার পর জনতা বিশাল মিছিল করে, শিক্ষকদের জমায়েতে উপস্থিত হন। ব্যক্ত করেন নিজেদের সমর্থন ও সহমর্মিতা।[১৭৮]

এদিকে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে অভূতপূর্ব এই ম্যারাথন অবস্থানের অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের তৃতীয় দিনেও মনোবল সম্পূর্ণ অটুট। শীতের দিনেও আন্দোলনকারীদের মনোভাবের শরীক হয়ে প্রকৃতি আকস্মিক ভাবে রুক্ষ। শিক্ষকদের ধর্ণা অবস্থানে ছাত্র যুবদের উৎসাহে ক্যানভাসের কাপড়, বাঁশ ইত্যাদির সাহায্যে গড়ে তোলা হল অস্থায়ী শিবির। শিক্ষকেরা তখন অর্দ্ধভুক্ত—অনাহারি। তাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য অফিস পাড়ার' কর্মীরা রুটি, মিষ্টান্ন, কমলালেবু, লেমনেড প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করলেন। সেদিনকার আন্দোলনের অন্যতম কর্মী মায়া চক্রবর্তীর বয়ানে, ''নানা ধরনের শুকনো আহার্য পাঠাতেন বিভিন্ন অফিস থেকে, সংগঠন থেকে আবার ব্যক্তিগত ভাবেও, ... কমলালেবু, আপেল, আঙ্গুর, বেদানা, ডাব, কলা, বিস্কুট, শুকনো মিষ্টি, পাউরুটি, হরলিকস্, ওভালটিন, কোকো, কফি, চা পাতা, মধু, আমসত্ব, পাঁপড়, কোল্ড ড্রিঙ্ক আরো কত কি?''[১৭৯] খাদ্যদ্রব্য যা জনতার ভালোবাসায় ভরা, দরিদ্র শিক্ষকেরা

তা মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বামনদাস মণ্ডলকে। শিক্ষক সংগ্রাম তহবিলেও সংগঠিত ও অসংগঠিত ভাবে অর্থদান বহাল ছিল। জীবন বিমা করপোরেশন সংগঠিত ভাবে অর্থ সাহায্য করলেন। রাস্তায় চাদর পেতে ওই দিনে সংগৃহীত হল দেড় হাজার টাকা। সেদিনের সাপেক্ষে যার মূল্য বড় কম নয়। সন্ধ্যা ছয়টায় ছুটির পর অফিসপাড়ার কর্মীরা দলে দলে, শিক্ষক সত্যাগ্রহের স্থানে ছুটে চলেছিলেন সেদিন। শিক্ষকদের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করার জন্য আর্ট কলেজের ছাত্রদের একটি দল আন্দোলন স্থলে আসলেন। ধর্ণার তৃতীয় দিনেই তাদের পেনসিল ও তুলিতে বাঙ্ময় হয়ে উঠল সমাবেশের সংগ্রামী মেজাজ। এই 'হোয়াইট কলার জবার' দেব পাশাপাশি ট্রাম শ্রমিকেরাও পুনরায় সমর্থন জ্ঞাপন করলেন শিক্ষক আন্দোলনের প্রতি। আইনজীবীদের বার অ্যাসোসিয়েশনও চুপ করে থাকল না এই ক্রান্তিকালে। শিক্ষক সংগ্রামে সহমর্মিতা জানাল তারা। নিজ নিজ জেলায় সফল পিকেটিং ও ধর্মঘটের পর আন্দোলনের তৃতীয় দিনে কোলকাতার শিক্ষকদের পাশে এসে দাঁড়াতে শুরু করলেন দূর মফঃস্বলের শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ। হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি কোলকাতা সন্নিহিত জেলাগুলির শিক্ষকেরা তো 'ব্যাচে ব্যাচে' আসছিলেনই এবার তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালেন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদা, মুর্শিদাবাদের শিক্ষকেরা। অবশ্যই প্রতিনিধিত্বমূলক ভাবে, কেননা নিজেদের মাটিতেও যে তাঁদের লড়াই জারি রাখতে হয়েছিল।

এল ১৩ ফেব্রুয়ারি, আন্দোলনের চতুর্থ দিন। দিনটি শনিবার। প্রায় ছুটির দিনই বলা যেতে পারে। সেদিন শিক্ষকদের পাশে এসে দাঁড়াল শহরের প্রায় সব প্রান্তের মানুষ। বুভুক্ষু শিক্ষকদের জন্য তাদের হাতে খাদ্যদ্রব্য, শুকনো ফল, মিষ্টি ছাড়াও রান্নাকরা খাবারও নিয়ে এলেন অনেকে। ছাত্র নেতৃত্বের তত্ত্বাবধানে কোলকাতার বেশ কিছু ছাত্র হোস্টেল থেকে নিয়ে এল, একশোজন শিক্ষকের দুপুরের খাবার। যাদবপুর টালিগঞ্জের লড়াকু উদ্বাস্তুরা নিয়ে এল হাতে তৈরি রুটি। সেই সামান্য দ্রব্যই আজ শিক্ষকদের কাছে অমৃতোপম। উপহার পাওয়া খাবারের আধিক্যে বিব্রত শিক্ষক নেতারা। বারে বারে সহমর্মী সাধারণ মানুষকে আর খাবার আনা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করলেন তাঁরা। এদিকে শিক্ষক সংগ্রাম তহবিল গড়ার লক্ষ্যে সেদিন দুপয়সার কুপনে সংগৃহীত হল দু হাজার টাকা। মাড়োয়ারী ছাত্ররাও অর্থ সাহায্য করলেন। ব্যাংক কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব এক থোকে দিলেন ছয়শত টাকা। একজন বেকার প্রাথমিক শিক্ষক তাঁর শেষ সম্বল হাতের সোনার আংটি এবং অবস্থানকারী জনৈক শিক্ষিকার বৃদ্ধা মা একটি গিনি দান করলে, সমাবেশে এক আবেগরঞ্জিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করতে ডক মজদুর ইউনিয়ন এবং বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃত্বে দুটি শোভাযাত্রা শিক্ষক সমাবেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই দিন। আন্দোলনকারী শিক্ষক কবি দীনেশ দাসের কলমে ফুটে উঠেছিল সেদিনের কথা, ''রাজভবনের চারিদিকে/ঘোরে ফেলে আলোর মানুষ সব/যারা আলো জ্বেলে রাখে ছোট ছোট প্রাণের প্রদীপে।/.....সমবেদনার অনুরাগে/বাংলার পুরাতন হৃদপিণ্ড জাগে/অকস্মাৎ/ তোমার আমার হাতে হাত দেয় লক্ষ লক্ষ হাত।"[১৮০]

আন্দোলনের বহু বছর পরে বিপ্লব দাশগুপ্তের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জ্যোতি বসু এই আন্দোলনের প্রভাব পরবর্তীকালে কীভাবে পড়েছিল তা বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, '(এই

আন্দোলনের ফলে) এবিটিএ তো ভীষণ বেড়ে গেল। গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং আমাদের পার্টিও (কমিউনিস্ট পার্টি) শক্তিশালী হল। অবশ্য সত্যপ্রিয় বাবুরা বলতেন এবং আমরাও বলতাম যে এই আন্দোলন শুধু শিক্ষকদের মাইনা বাড়াবার জন্য নয়। আমরা চেয়েছি শিক্ষার মান উন্নত হোক, শিক্ষার বিস্তার হোক এবং সর্বজনীন হোক। শিক্ষা যেন সামান্য কিছু মানুষের প্রিভিলেজ না হয়। এটা শিক্ষকদের আধপেটা রেখে সম্ভব নয়।'[১৮১] জ্যোতি বসু এই প্রসঙ্গে আরো বলেছিলেন, যে প্রথম দিকে আধপেটা খেয়েও কুলিমজুরদের মতো ধর্মঘট করতে সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যে একটা অনীহা ছিল। অথচ সেই শিক্ষকেরাই জীবনের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে ৫৪' এর ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে, সামিয়ানা টাঙিয়ে রাজপথে বসে পড়লে, স্বাভাবিক ভাবেই তাতে আলোড়ন শুরু হল। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত মানুষদের মধ্যে এই অবস্থানের একটা এ্যাপিল পড়েছিল বলে জ্যোতি বাবু এই সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন। এদিকে অবস্থান সংগ্রামের দুই দিন দুই রাত্রি অতিবাহিত। শিক্ষকেরা অনেকেই পীড়িত। উদ্বেগে পরিবারের সদস্যরা তাঁদের দেখতে আসতেন সমাবেশ স্থলে। তাঁদের চোখের জলকে উপেক্ষা করেই শিক্ষকেরা দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন সেদিন।

শিক্ষক সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এগারো জন সদস্য এই অচলাবস্থা কাটাবার লক্ষ্যে ওইদিন মুখ্যমন্ত্রী ডা. রায়ের সঙ্গে কথাবার্তা চালান। এই আলোচনার পরে সেইদিন অপরাহ্ণে শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাদের দাবিদাওয়ার প্রশ্নে আলোচনা করতে মুখ্যমন্ত্রী রাজী হন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার জন্য সংগ্রামী শিক্ষকদের প্রতিনিধি হিসাবে সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্বে একদল শিক্ষক মহাকরণে আসেন। এই দলের অন্য সদস্যেরা ছিলেন অনিলা দেবী, তারাকুমার মিশ্র, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, সুশীল ঠাকুর প্রমুখ। তবে এই আলোচনা সুফলপ্রসূ হল না। ধর্ণাস্থলে ফিরে এসে তারা এই বিফল আলোচনা সম্বন্ধে শিক্ষকদের অবহিত করলেন। আন্দোলন চলার পক্ষেই রায় দিলেন সমবেত শিক্ষকমণ্ডলী। ওই দিন অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদের কাছে তারবার্তা প্রেরণ করে, শিক্ষক ধর্মঘট সংক্রান্ত অচলাবস্থা কাটাবার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। একই দিনে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসু শিক্ষক ধর্ণামঞ্চে এসে শিক্ষকদের সমর্থনে বক্তব্য রেখেছিলেন। রাতে সত্যপ্রিয় রায় বক্তব্য রাখার সময় সারাদিনের পরিশ্রমের ফলে তাঁর গলা ভেঙে পড়ে। অবস্থানকারীদের সবাইকে স্পষ্টভাবে তাঁর বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করাবার মানসে—যুবক শিক্ষকেরা তার বক্তব্য নিজেদের গলায় গলায় পুনঃপ্রচার করতে শুরু করে। চারিদিকে পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। এদের একজনের দিকে তাকিয়ে জনৈক শিক্ষিকা চিৎকার করে উঠেছেন, ''কিরে তুই অনিল না, তুই আমাদের অ্যারেস্ট করবি? তিনি চিনতে ভুল করেননি প্রাক্তন ছাত্রকে।'[১৮২] সেদিন সারারাত শিক্ষকদের ধর্ণামঞ্চে সহমর্মিতা জানাতে উপস্থিত ছিলেন কবি গোলাম কুদ্দুস এবং বিশিষ্ট চিত্র শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী। তাদের লেখনীতে ও চিত্রে অমর হয়ে আছে, সেদিনকার সেই দুর্দান্ত জেদী আন্দোলনমুখী শিক্ষকেরা। রাত প্রায় শেষ হতে চলল। নতুন ঊষাকে সঙ্গী করে অনিলা দেবীর কণ্ঠ বলে উঠল, ''বন্ধুগণ একটু

পরেই নতুন দিনের শুরু হবে। আপনারা রাতের অন্ধকার জয় করেছেন। আপনারা ডালহৌসী স্কোয়ারে স্থাপন করেছেন এক নতুন বিদ্যালয়। কাল সকালে সেখানে নতুন ছাত্র আসবে নতুন শিক্ষা গ্রহণ করতে। আপনাদের সংগ্রামের খবর ছড়িয়ে পড়েছে সারা দুনিয়ায়। মুখ্যমন্ত্রীকে নেমে এসে দিতে হবে গুরু দক্ষিণা।"[১৮৩] পৃথক ভাবে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন মাধ্যমিক শিক্ষকদের দাবি দাওয়া সমর্থন করে বিবৃতি দিলেন। দেশ-বিদেশ থেকে সমর্থনমূলক বিবৃতি ও টেলিগ্রাম শিক্ষকদের ধর্ণা মঞ্চে পঠিত হল সে দিন।

ব্যতিব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায়, সেইদিন রাজ্যের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষকদের আর্থিক দাবিদাওয়া নিয়ে তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ঠিক হল এই তদন্ত কমিশনের প্রধান হবেন কলকাতা উচ্চন্যায়ালয়ের একজন বিচারপতি ও অন্য দুই সদস্যকে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীদের মধ্য থেকে মনোনীত করা হবে। তিন মাসের মধ্যেই কমিশন তার রিপোর্ট প্রকাশ করবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। মুখ্যমন্ত্রী তার আগের বিবৃতির পুনরুল্লেখ করে বলেছিলেন, যে ম্যানেজিং কমিটিগুলি সমপরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করলে, সরকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাসিক সাড়ে সতেরো টাকা মহার্ঘভাতা দেবেন। এই কূট কৌশল শিক্ষকেরা ধরে ফেললেন—কেননা স্কুলগুলির ম্যানেজিং কমিটিগুলির পক্ষে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক এই পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করা কখনোই তৎকালীন পরিস্থিতিতে সম্ভব ছিল না। সেইদিনই সাংবাদিকরা শিক্ষা সচিব ডি. এম. সেনের কাছে শিক্ষক আন্দোলন সম্বন্ধে সরকারের বক্তব্য তুলে ধরার সময় জনৈক সংবাদিক প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, ''মহাকরণের একজন চাপরাশীও মাসে ৩৫ টাকা মহার্ঘভাতা পান।" এর উত্তরে দাম্ভিক শিক্ষা সচিব বলেছিলেন যে, 'শিক্ষকেরা এই চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে পারেন। তাদের আবেদন বিবেচনা করা হবে। শিক্ষকদের প্রতি এই অপমানজনক উক্তি করেই তিনি থাকেন নি। তার ব্যক্তিগত ক্ষোভের কথা প্রকাশ করে শ্রীসেন আরো বলেন, 'ডাঃ রায় বার বার প্রত্যক্ষ বিক্ষোভের সময় বিক্ষোভকারীদের লাই দিয়ে এই অবস্থায় নিয়ে গিয়েছেন।"[১৮৪] কতদূর স্পর্ধা হলে সাধারণতঃ চতুষ্পদ প্রাণীদের প্রতি প্রযোজ্য 'লাই দেওয়া'কে শিক্ষকদের সম্বন্ধে বলেছিলেন তিনি তা কল্পনা করাও যায় না। শিক্ষা সচিবের মতে, তাঁর নিজের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকলেও শিক্ষকেরা ওখানে মরে গেলেও তিনি পরোয়া করতেন না। স্বভাবতঃই স্বাভিমানী শিক্ষকদের মনে এই মন্তব্য চূড়ান্ত আঘাত হানে।

সেইদিনই (১৪/০২) বিকেলে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে শিক্ষকদের উদ্যোগে একটি মহতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট নেতা সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা দেন অধ্যাপক মোহিত মৈত্র ও নিরঞ্জন সেনগুপ্ত। সভায় প্রস্তাব নেওয়া হয় ''জনপ্রিয় সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জনতার সামনে, এমনকি শ্রদ্ধেয় ধর্মঘটী শিক্ষকদের কাছে আসতে নারাজ। ডা. রায় আপস মীমাংসার কোনো পথ খোলা রাখেন নি। তিনি চান একটা গোলমাল হোক, তিনি দম্ভ নিয়ে আছেন। শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করতে দৃঢ় সংকল্প। এই অবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আর নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারেনা।"[১৮৫] সভায় দুইদিনের মাথায় অর্থাৎ ১৬ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা অভিযানে সর্বস্তরের জনতাকে যোগদান করতে অনুরোধ করা হয়।

এদিকে সরকার কর্তৃক শিক্ষা ও শিক্ষক সমস্যার সমাধান কল্পে 'কমিশন' গঠনের প্রস্তাব এর ফলে শিক্ষক আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাবে বলে অনেকে মনে করেছিলেন। ৫৪-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় সাংবাদিকরা এই বিষয়ে সত্যপ্রিয় রায়ের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে, তিনি বলেন, ''এই বিবৃতিতে নতুন কিছুই নাই। ভাষার মারপ্যাঁচ করে তিনি (ডা. রায়) কেবল বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন। কমিশন যে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করবে বলা হয়েছে সে সকল বিষয়ে অনুসন্ধান করার ক্ষমতা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের রয়েছে। পর্ষদ একটা স্বয়ংশাসিত সংস্থা। আর গভর্নমেন্ট যে কমিশন গঠন করতে চান তাতে তাদের নিজেদের বাছাই করা লোক থাকছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুসন্ধান করলে তাদের অভিমত যে রকম নির্ভরযোগ্য; সঠিক ও নিরপেক্ষ হবে কমিশনের অভিমত সে রকম হবে না। গভর্নমেন্ট এই স্থির উদ্দেশ্য নিয়ে কমিশন গঠন করতে চান। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ শিক্ষকদের পক্ষে রায় দিয়েছেন এবং জনমতের চাপই সরকারকে শিক্ষকদের দাবি মানতে বাধ্য করবে। যতদিন তা না হচ্ছে, তাঁরা সমস্ত কষ্ট স্বীকার করে সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। কারণ পরিণামে তাদের জয় সুনিশ্চিত।''[১৮৬]

ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখ রবিবারে, শতশত মানুষের সমর্থনে শিক্ষকেরা অভিভূত। অশীতিপর বৃদ্ধ শিক্ষক রামাশীষ মিত্রকে, পুষ্প চন্দন সজ্জায় সজ্জিত করে—তাঁকে পুরোভাগে রেখে শিক্ষকরা ধ্বনি দিচ্ছেন। ''শিক্ষকদের দাবি জাতীয় দাবি—জাতীয় দাবি মানতে হবে,'' সঙ্গীত ও বাচিক শিল্পীরা গান ও কবিতায় সভাস্থল মাতিয়ে রেখেছেন। ভূপতি নন্দী, সুরপতি নন্দী, অমর মুখোপাধ্যায়, মন্টু ঘোষ, দিলীপ সেনগুপ্ত প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞরা সময় উপযোগী গান ধরেছেন। উপস্থিত সলিল চৌধুরী। শিক্ষক আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে তাঁর রচিত ও সুরারোচিত 'পথে এবার নামো সাথী/পথেই হবে যে পথ চেনা' আজকের সভায় শুধু সঙ্গীত নয়—সাম গানের পবিত্রতায় হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে। কে নেই সে সভায়! হেমাঙ্গ বিশ্বাস, লোক কবি গুরুদাস পাল, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী স্বনামধন্য সুচিত্রা মিত্র, বেলা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সঙ্গীতের ডালি নিয়ে যেন গুরু দক্ষিণা দিতে হাজির হয়েছিলেন সেদিনের ধর্ণাস্থলে। ছাত্ররা প্রবল উৎসাহে ওই দিন শ্লোগান তুলেছিল, ''....আমরা চিনেছি মিত্র/শত্রু চিনেছি/জেনেছি তাদের ভয়/আর জেনেছি এবার/মোদের সবার/মৃত্যু হবার নয়/''[১৮৭]

১৫ ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিক শিক্ষকদের এই স্মরণীয় সংগ্রামের পঞ্চম দিন। ভোরের রেশ মিলাবার আগেই বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ২৫০ জন শিক্ষক শিক্ষিকা এসে ধর্ণায় যোগ দিলেন। এদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতিকূল। রাতের ঠাণ্ডা ও দিনের গরমে অনেক শিক্ষকই অসুস্থ। মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক ছাত্ররা এই অবস্থায় সমাবেশস্থলেই সাময়িক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করলেন। প্রায় ত্রিশ জন শিক্ষকের চিকিৎসা হল সেখানে—আরো অনেকে কমবেশি শারীরিক অসুবিধার জন্য ওষুধ নিলেন। কলেরার টিকাও দেওয়া হল মেডিক্যাল ছাত্রদের দ্বারা। শিক্ষকদের ধর্ণাস্থল কদিনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আরো সুবিন্যস্ত—বিভিন্ন উদ্দেশ্য পরিপূরণের স্বার্থে তৈরি করা হয়েছে প্রচার বিভাগ, অর্থবিভাগ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও অগণিত জনতার শ্রদ্ধার দান, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য গঠিত হয়েছে 'স্টোর'। সেদিনও অনেক সংস্থা ও

ব্যক্তিগত ভাবেও অনেকে, শিক্ষক মহাশয়দের ক্ষুৎ নিবৃত্তির জন্য খাদ্যদ্রব্যের ডালি সাজিয়ে সমাবেশ স্থলে এসেছিলেন। পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্র কয়েকটা লুচি দিলে, এক আবেগময় দৃশ্যের সৃষ্টি হল। সংগ্রাম তহবিলে সেদিন সংগৃহীত হল প্রায় আড়াই হাজার টাকা। আবালবৃদ্ধবনিতা আজ শিক্ষকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এরই জ্বলন্ত প্রমাণ স্বরূপ হাওড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক ছাত্র আন্দোলনের স্বপক্ষে পত্র লিখে, সঞ্চয়ের তিন টাকা 'গুরু-দক্ষিণা' হিসেবে পাঠিয়ে ছিল সেদিন। এটা ঠিকই নেতৃত্ব ও সংগঠন ছাড়া কোনো আন্দোলন হয় না। কিন্তু প্রকৃত আন্দোলন তখনই সফল হতে পারে যখন সর্বস্তরের জনতা সেই আন্দোলনে শামিল হয়। এর আগে ডাক ও তার দপ্তরের ও ট্রাম শ্রমিকদের আন্দোলনকে যথা উচিত গুরুত্ব দিয়েও, আমরা বলতে পারি যে স্বাধীনোত্তর বাংলায় মাধ্যমিক শিক্ষকদের আন্দোলনই সর্বতোভাবে প্রথম গণআন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল।[১৮৮]

যাইহোক সরকারি টালবাহানা সত্ত্বেও তৎকালীন শাসকশক্তি ১৯৫৪-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন আহ্বান করতে বাধ্য হল। শিক্ষক সমিতিও বিধানসভার এই অধিবেশনে যাতে তাদের দাবিসমূহ আলোচনা হয় সেই উদ্দেশ্যে এবং নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের শিক্ষকদের দাবি দাওয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করবার প্রয়োজনে, সেদিনই বিধানসভা অভিযানের ডাক দিয়েছিল। অবস্থান স্থলে স্থায়ীভাবে ধর্ণারত শিক্ষকদের সঙ্গে সেদিন রাজ্যের প্রায় সমস্ত স্কুল থেকে ন্যূনতম দুইজন করে শিক্ষক/শিক্ষিকা, এই অভিযানে যোগ দিতে ওই দিন কোলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। কোলকাতার উপকণ্ঠে বাঘাযতীন, বিদ্যাসাগর, নেতাজীনগর প্রভৃতি উদ্বাস্তু অঞ্চলের শিক্ষকদের পাশাপাশি, একটু দূরের বনগাঁ, শান্তিপুর, কাটোয়া, জনাই, মাহেশ, আসানসোল, কোলাঘাট অঞ্চল থেকেও বিধানসভা অভিযানে অংশ নেবার জন্য শিক্ষকরা কোলকাতার বুকে তাঁদের দৃঢ়পদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। ঠিক বেলা তিনটার সময় নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ব্যানারকে সামনে রেখে অভিযান শুরু হল। বঞ্চিত শিক্ষকদের প্রতীক স্বরূপ বৃদ্ধ শিক্ষক রামাশিষ মিত্রকে সামনে রেখে, শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল ঠাকুর ও অনিলাদেবীর মতো সংগ্রামের আগুনে পোড় খাওয়া নেতারা। শিক্ষকদের সঙ্গে সঙ্গে অগণিত ছাত্রযুব-অভিভাবক শুভানুধ্যায়ীরাও সেইদিন হাজির ছিলেন, বিধানসভা অভিমুখী মিছিলে। বিধানসভার সন্নিকটে এই মিছিলের গতিরোধ করল পুলিশবাহিনী। বাধা পেয়ে শিক্ষকেরা শান্তিপূর্ণ ভাবে রাজপথেই অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা এই ভাবেই অতিবাহিত হল। এই পর্যায়ে শিক্ষক নেতারা সমাবেশকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা করে যেতে থাকলেন।

বেলা চারটেয় রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের (যিনি নিজেও একজন শিক্ষক) উদ্বোধনী বক্তৃতার মধ্য দিয়ে সূচিত হল বিধানসভার অধিবেশন। তাঁর দুপাশে স্পীকার শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় এবং অধুনালুপ্ত বিধান পরিষদের চেয়ারম্যান জাতীয় শিক্ষক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আসন গ্রহণ করলেন। রাজ্যপালের বক্তৃতা শুরু হবার অব্যবহিত পূর্বে বিশিষ্ট জননেতা হেমন্ত কুমার বসু উঠে দাঁড়িয়ে বলতে থাকলেন। 'আপনার ভাষণ আরম্ভ করবার

আগে দরিদ্র শিক্ষকদের দূরদৃষ্টের প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। তাঁরা আপনার বাসভবনের পাশেই অবস্থান ধর্মঘট করছেন। আপনি ভাষণ দেবার আগে আসুন আপনি এবং আমরা সকলে একত্রে তাঁদের কাছে যাই। তাঁদের দাবির সম্পর্কে একটা মীমাংসার চেষ্টা করি।"[১৮৯] রাজ্যপাল অবশ্য আইনসভার বিধির উল্লেখ করে এই প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। জ্যোতি বসু এই সময় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বিধি নিষেধের বেড়াজাল ভেঙে, রাজ্যপালের উচিৎ ধর্ণাকারী শিক্ষকদের কাছে যাওয়া এবং তাদের দাবিদাওয়া সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। বিধানসভায় প্রায় সব বিরোধী দলের নেতৃত্ব যথা বিভূতি ঘোষ, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল ভট্টাচার্য, হেমন্ত ঘোষাল, মনিকুন্তলা সেন প্রভৃতিরা জ্যোতি বসুর প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন জানান। সরকারপক্ষ তাদের দাবি মানতে রাজী না হলে, বিরোধীরা বিধানসভা থেকে 'ওয়াক আউট' করে, বিধানসভার সন্নিকটে শিক্ষকদের সভায়, তাদের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন।[১৯০] সেই সময় ডক মজদুর ইউনিয়ন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের দুটি বড় মিছিল শিক্ষকদের সমর্থনে অবস্থানস্থলে আসে। এমনকি ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন, সুরেন্দ্র নাথ কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজের পাশাপাশি, সাধারণ ভাবে রাজ্যের রাজনীতির থেকে দূরে থাকা খালসা হাইস্কুলের শিখ ধর্মাবলম্বী শিক্ষক শিক্ষিকারা মিছিল করে এসে আন্দোলনকারীদের পক্ষে সংহতি প্রকাশ করেন। অবস্থানের পাশাপাশি আন্দোলন পরিচালনার খরচ হিসাবে অর্থ সংগ্রহ করা হয় সেদিনও। বেঙ্গল পটারী মজদুর ইউনিয়ন, চটকল মজদুর ইউনিয়ন, পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন থেকে অর্থ সাহায্য আসে সেদিন। বঙ্গীয় প্রকাশক সমিতিও একলপ্তে একহাজার টাকা শিক্ষক সংগ্রাম তহবিলে সাহায্য হিসাবে দেয়।

এদিকে নেতৃবৃন্দ দুইপা এগনোর জন্য এক পা পিছনে যাবার রণনীতি মেনে সেদিনের মতো বিধানসভা ভবনের সামনে থেকে অপসৃত হয়ে, পুনরায় রাজভবনের সামনে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেন। শিক্ষক ও জনতার যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠা সংগ্রাম পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয়, যে ১৬ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার শিক্ষকরা একটি বড় মিছিল সংগঠিত করবেন তাঁদের দাবির সমর্থনে। আরো ঠিক হয় সরকার দাবি না মানলে, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা অমান্য করে, তারা পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করবেন। অর্থাৎ বিধানসভায় সরকারি পক্ষের ঔদাসীন্যতাকে উপেক্ষা করে, শিক্ষকেরা আন্দোলনকে আরো সংগ্রামমুখী করবার সিদ্ধান্ত নিলেন।[১৯১] সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য এই সংক্রান্ত এক বিবৃতিতে শিক্ষক সমিতির সম্পাদক সত্যপ্রিয় রায় প্রতিদলে চারজন করে শিক্ষক, একেক ধাপে এই আইনঅমান্য কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন বলে ঘোষণা করেন। তিনি আরো বলেন, ''নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি মনে করে জনমতের কাছে নতি স্বীকার করেও সরকার গণআন্দোলন এড়িয়ে চলছেন। শিক্ষকদের দাবির প্রতি গত ছয়দিন ধরে জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা যদি ঘটে তাহলে সরকারই জনসাধারণকে এই আন্দোলনের মুখে ঠেলে দেবেন এবং যে কোনো প্রকার হাঙ্গামার জন্য সরকারই দায়ী হবেন।'[১৯২] সরকারও এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে নিশ্চুপ থাকল না। সেই রাতেই কোলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিধানসভা এলাকায় সভা ও শোভাযাত্রাকে বেআইনি ঘোষণা করে এক আদেশনামা জারি করলেন।

সরকার মুখে বিক্ষোভরত শিক্ষকদের সঙ্গে আপোস মীমাংসার লোকদেখানো চেষ্টা করলেও, আসলে তাদের উদ্দেশ্য ছিল অন্য। তারা বলপ্রয়োগের পরিকল্পনারই খসড়া প্রস্তুত করেছিল। ১৬ তারিখ রাত ২.০০, পাঁচশো পুলিশের এক বিশাল বাহিনী শিক্ষকদের অবস্থানস্থল ঘিরে ফেলল। পুলিশ অবস্থানকারী শিক্ষকদের অনতিবিলম্বে ওই স্থান ত্যাগ করতে নির্দেশ দিল। সংগ্রামী শিক্ষকেরা তখন অন্য মেজাজে, অবস্থানরত একজন শিক্ষক/শিক্ষিকাও অবস্থানস্থল থেকে অপসৃত হতে রাজী হলেন না। এসপ্ল্যানেডের আকাশ আবার 'শিক্ষার দাবি জাতীয় দাবি/জাতীয় দাবি মানতে হবে শ্লোগানে ভরে উঠল। অবস্থানস্থল খালি করতে অপারগ পুলিশ তখন আন্দোলনকারীদের নেতৃত্বকে গ্রেফতার করে, আন্দোলন অচল করবার সিদ্ধান্ত নিল। সত্যপ্রিয় রায় সহ ২৪৩ জন শিক্ষক/শিক্ষিকাকে গ্রেফ্তার করল পুলিশ। অন্য যারা গ্রেফ্তার হলেন তাদের মধ্যে অনিলা দেবী ছাড়াও ছিলেন, শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিপদ কুণ্ডু, ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়, অবিনাশ চন্দ্র গুহ, তারাকুমার মিত্র, প্রফুল্ল বক্সী, প্রফুল্ল সেনগুপ্ত ও সুধা রায়। লালবাজার এবং তালতলা থানায় নিয়ে যাওয়া হল তাঁদের।[১৯৩] এরপরে আপাতভাবে নেতৃত্বহীন শিক্ষকদের শিবির ভেঙে ফেলল পুলিশ। জমায়েত আপাতত ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। ১৬ ফেব্রুয়ারি সকালে সংবাদপত্রের মাধ্যমে রাজ্যবাসী জানতে পারল, সরকারের এই অগণতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের কথা। এবার পথে নামল ছাত্ররা—আজ তাঁদের গুরুদক্ষিণা দেবার দিন। সারা কোলকাতা ভেঙে তারা জমায়েত হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে। এই ছাত্র জমায়েত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পথযাত্রা করে মনুমেন্ট (শহীদ মিনার) এর পাদদেশে সমবেত হল। অন্যান্য গণ সংগঠনের মানুষেরাও একা বা দলবদ্ধ ভাবে হাজির সেখানে। বিকেল চারটায় ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে প্রতিবাদী সভা শুরু হল। সভা শেষে কুড়ি হাজার লোকের সুবিশাল সেই মিছিল বিধানসভা অভিমুখে রওয়ানা হল। নেতৃত্বে সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। গত রাতে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া শিক্ষকেরাও হতোদ্যম না হয়ে নতুন উৎসাহে বহুলাংশে শামিল হলেন এই মিছিলে।[১৯৪]

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ—সেদিনকার তরুণ, সত্যপ্রিয় বাবুর প্রত্যক্ষ ছাত্র ড. শুভঙ্কর চক্রবর্তী ওই আগুন ঝরা দিনগুলির স্মৃতিচারণে লিখছেন, ''আমরা তখন উঁচু ক্লাসের ছাত্র। প্রায়ই দেখতাম নানান ইস্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা আসছেন স্যারের কাছে।....কেমন মনে হত একটা কিছু হতে চলেছে। স্যার চিন্তিত, কর্মব্যস্ত। বাবাকে জিজ্ঞেস করতে বললেন, বড়ো রকমের শিক্ষক আন্দোলন হতে চলেছে—আইন অমান্য করবেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।....১৯৫৪ সাল, ১৬ ফেব্রুয়ারি। এস্প্ল্যানেড ইস্টে শিক্ষকদের জমায়েত। ১৪৪ ধারা তাঁরা ভাঙবেন। আমি ঠিক করলাম, শিক্ষকদের আন্দোলন দেখব—যাব। ছাত্রের স্বার্থের কথা আছে এ আন্দোলনে। দেখবার অধিকার আছে আমারও। দূর থেকে সত্যপ্রিয় রায়কে দেখতে লাগলাম। আমার শিক্ষক বাবাও রয়েছেন। কতো শত মান্য শিক্ষক। তাঁদের মধ্যে আমার ইস্কুলের অনেক শিক্ষক। বুকটা কেমন করতে লাগলো। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। সহসা লাঠি উঁচিয়ে ছুটে এল পুলিশ। পুলিশ মারছে শিক্ষকদের....গুলি চলছে, কাঁদানে গ্যাস। আমি স্যারকে খুঁজছি, বাবাকে খুঁজছি। ক্ষুব্ধ

মন, দারুণ শঙ্কিত। শিক্ষকের আর্তনাদ বাতাসে, শিক্ষকের রক্ত ঝরছে রাজপথে। এ কেমন দেশ! আমি ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ, মারমুখো হয়ে উঠলাম। চিৎকার করে বললাম—এই, স্যারদের মারছ কেন?'[১৯৫] উদ্ধৃতি হয়তো একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। তবু সেদিন এক বিদ্যালয় বালকের মনেও প্রশ্ন উঠেছিল, জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ শিক্ষকেরা কেন ফুলমালার বদলে লাঠি ও গুলি দ্বারা আক্রমিত হবেন। শিশুদের মনও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের অপরিণত মনেও সরকারের হিংস্র ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল।

এদিকে বিধানসভার অধিবেশনে বিরোধী দল নেতা জ্যোতি বসু বললেন, প্রায় এক সপ্তাহ শিক্ষকেরা তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে আন্দোলন করছিলেন। সেই শান্তিপূর্ণ সভা থেকে শিক্ষক নেতৃত্বকে গ্রেফ্‌তার করা সরকারের পক্ষে অতীব গর্হিত কাজ হয়েছে। প্রতিউত্তরে শিক্ষকদের 'প্রাইভেট টিউশনি' করার কথা বলে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। বর্ষিয়ান বিপ্লবী গণেশ ঘোষ বলেন এর সঙ্গে শিক্ষকদের গ্রেফ্‌তারের কি সম্পর্ক আছে? মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় আরো আক্রমণাত্মকভাবে বলেন শিক্ষকদের রাজপথ আটকে রাখবার কোনো অধিকার নেই। এটা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ। হায় বিধানচন্দ্র—গান্ধীজীর অসহযোগ/আইন অমান্যের একদা সৈনিক আজ ব্রিটিশ আইনের অজুহাতে শিক্ষক দমনে অগ্রসর হয়েছেন। ইতিহাসের প্রহসন আর কাকে বলে। সব বিরোধী সদস্যই শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ পরিষ্কার হওয়ার জন্য শিক্ষক নেতাদের আশুমুক্তির দাবি জানান। কংগ্রেস দলেরও কিছু বিবেকবান বিধায়ক দেবেন দে ও জে. সি. গুপ্ত, হেমন্ত বসু ও বঙ্কিম মুখ্যোপাধ্যায়ের মতো বাম নেতাদের সঙ্গে শিক্ষক মিছিলের সামনে ছুটে যান। কিন্তু শিক্ষকবৃন্দ ও জনতা তখন মরিয়া। তাই নেতৃবৃন্দের কথা অগ্রাহ্য করে মিছিল তখন ধাবমান জল স্রোতের মতো ছুটে চলেছে। উপায়ন্তর না দেখে পুলিশ সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকা চক্রবর্তী, দাশরথি তা, নির্মল সিংহ, সমর গুহ প্রভৃতি নেতাকে গ্রেফতার করে। আর ঘোড়সওয়ার পুলিশ এনে মিছিল ছত্রভঙ্গ করার প্রয়াস নেয়। কিন্তু জনতা আজ উদ্‌বেল। কিছুটা পিছু হটেও, কাঁদুনে গ্যাসকে অগ্রাহ্য করে, পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ শুরু করে তাঁরা। প্রচণ্ড পুলিশি আক্রমণে শত মানুষ আহত হন। এরপর সন্ধে নেমে আসলে চৌরঙ্গীর মোড়ে অবস্থান শুরু করে জনতা।[১৯৬]

বিধানসভার বিরোধী নেতারা, বিশেষ করে বামপন্থীরা সরকারের এই অসহনীয় অত্যাচারের বিরোধিতায় সোচ্চার হন। প্রবীণ বিপ্লবী গণেশ ঘোষ প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে, পুলিশি অত্যাচারের খতিয়ান তুলে ধরেন সেখানে। জে. সি. গুপ্ত ও দেবেন দের মতো শিক্ষকদের প্রতি নমনীয় নীতি নেওয়ার পক্ষপাতী বিশিষ্ট কংগ্রেস বিধায়করা কীভাবে তাঁদের শান্তির দৌত্য প্রতিহত হয়েছে—সবিস্তারে তার ব্যাখ্যা দেন।

১৬ ফ্রেব্রুয়ারির সন্ধেবেলা চৌরঙ্গীতে আবার গণ্ডগোলের সূচনা হল। ট্রাম, বাস সমস্ত বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল চৌরঙ্গী ও ধর্মতলা অঞ্চলের সমস্ত দোকানপাট। পুলিশ ও জনতার খণ্ডযুদ্ধ আবার শুরু হয়ে গেল। সরকার যদি শিক্ষক নেতৃত্বকে গ্রেফতার না করত তবে এই বিশৃংখলাকে রাশ পড়াতে পারতেন তারাই। কিন্তু অপরিণামদর্শী সরকার সেই প্রজ্ঞার

প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়নি। যাইহোক কোলকাতার প্রাণকেন্দ্র তখন জ্বলছে—আমেরিকান সেন্টার ভাঙচুর হয়েছে। সাধারণ মানুষের ক্রোধে নিউমার্কেটের প্রধান ফটক ভেঙে পড়ে। ট্রাম বাসে ভাঙচুর শুরু হয়ে যায়। শিয়ালদহ স্টেশনে গোলমাল হয়। রাতে হ্যারিসন রোড, বৌবাজার, মীর্জাপুর, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, ওয়েলিংটন, কলেজ স্ট্রিট, সার্কুলার রোডে প্রচণ্ড ভাঙচুর এমনকি অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে। শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জ সমস্ত অঞ্চলে বৈদ্যুতিক সংযোগ ছিন্ন হবার ফলে অকাল অমাবস্যা নেমে আসে কোলকাতার বুকে। পুলিশও নিশ্চুপ থাকেনি। কোলকাতা পৌরসভা চত্বরে, জগুবাবুর বাজারে, দমদমে গুলি বর্ষণ করে তারা। সমস্ত মধ্য কোলকাতা পুলিশ জনতার রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। দক্ষিণ কোলকাতার নাকতলা স্কুলের একজন শিক্ষক এবং রসারোডের ডাক এবং তার বিভাগের কর্মী অজিত দে কে হত্যা করে পুলিশ। নিউমার্কেটের সামনে নারায়ণ স্বামী নামে এক দিনমজুরকে হত্যা করা হয়। গুলিতে নিহত হন মন্মথ বর্ধন নামে এক শ্রমিক। ভবানী দত্ত লেনে পুলিশের এলোপাথাড়ি গুলিতে নিহত হন প্রৌঢ়া প্রভাদেবী, মেটিয়াবুরুজে পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে হত্যা করে রবীন্দ্রনাথ সরকার, ইয়াসীন প্রমুখ সাধারণ মানুষকে। বিখ্যাত ডাক্তার সহায়রাম বসুর পুত্র সুশীল বসুও প্রয়াত হন পুলিশি আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাতে।[১৯৭]

এদিকে শীর্ষ স্থানীয় শিক্ষকদের গ্রেফ্তারের পরও পুলিশি জুলুম হ্রাস প্রাপ্ত হয়নি। ওই দিনই ১৬৭ জন রাজনৈতিক কর্মীকে সরকার কারাবন্দী করে। খানাতল্লাসী করা হয় বহু সমাজসেবী ও রাজনৈতিক কর্মীর গৃহে। বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রাবাসে হয় পুলিশি হামলা। হাসপাতাল সূত্রে সেই রাতেই সাতান্ন জন গুরুতর আহতের খবর পাওয়া যায়। তাঁদের বেশির ভাগের দেহেই পুলিশ কর্তৃক বিক্ষিপ্ত গুলির চিহ্ন দেখা গিয়েছিল। লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস ও ঘোড় সওয়ার পুলিশের আক্রমণে অসংখ্য মানুষ আহত হন অল্প বিস্তর। সেদিনকার সেই শিক্ষক আন্দোলনের ঔজ্জ্বল্যে ও পুলিশের অত্যাচারের বিবরণ পাওয়া যায় তখনকার ছাত্র আন্দোলনের কর্মী ও পরবর্তী কালের বিখ্যাত অভিনেতা সৌমিত্র চট্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি চারণায়। তিনি বলছেন, ‘‘...কলেজে ভর্তি হয়েই ছাত্র রাজনীতি করতে শুরু করে দিলাম। সেই সময় ছাত্রদের সব আন্দোলনে অংশ নিয়েছি। শিক্ষক আন্দোলনে মাস্টারমশাইদের পাশে থাকতাম.... ওঁদের সঙ্গে রাত্তিরেও থাকতাম। পাহারা দিতাম। বেশ মনে পড়ছে আমি একদিন যাইনি। সেই দিনই রাতে পুলিশ মেরে ধরে সক্কলকে তুলে দেয়। থানায়ও ধরে নিয়ে যায়। পরের দিন পার্টি থেকে আহ্বান ছিল বিধানসভা অভিযানের। বেশ সক্রিয় ভাবেই অংশ নিয়েছিলাম। পুলিশ লাঠি চালালো, কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ল’’।[১৯৮]

বিধানসভায় যা শিক্ষক আন্দোলনের সমর্থনে কোনো জোরালো কণ্ঠস্বর যাতে ধ্বনিত হতে না পারে, তাই জন্য জ্যোতি বসুকে গ্রেফ্তার করার মানসে পুলিশ তার হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে হানা দিলেও, তাকে সেখানে পায়নি। জ্যোতি বসু তখন সরকার এর কাছে ধরা না দিয়ে বিধানসভায় শিক্ষকদের বেদনার্ত কণ্ঠস্বর তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেন। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পুলিশের চোখ এড়িয়ে তিনি বিধানসভায় প্রবেশ করেন। সরকার সিদ্ধান্ত নেন বিধানসভা

মুলতুবি হলেই তাঁকে গ্রেফ্তার করা হবে। শিক্ষক ও গণ আন্দোলনের কথাকে বিধানসভায় তুলে ধরবার জন্য তিনি এক অভিনব পরিকল্পনা করেন। বাকিটা জ্যোতি বসুর জবানিতেই আমরা শুনব। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলছেন। 'এদিন বিধানসভার প্রশ্নোত্তরের পরেই অধ্যক্ষ শৈল মুখার্জির অনুমতি নিয়ে আমি স্বাধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন করি ঃ অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি বলি ঃ আজ ভোর ৪টের সময় তল্লাশির একটি পরওয়ানা নিয়ে পুলিশ আমার বাড়িতে হামলা করে—পুলিশ আমাকে নিবর্তনমূলক আটক আইনে গ্রেপ্তার করার জন্য একটি পরওয়ানা সঙ্গে নিয়ে যায়।.....আমার সৌভাগ্য এবং সরকারের দুর্ভাগ্য, গতকাল আমি আমার নিজের বাড়িতে ছিলাম না, তাই পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। আমি জানি আজকের অধিবেশন শেষ হওয়ার পরই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমাকে নিবর্তনমূলক আটক আইনে গ্রেপ্তার করা হবে।

অধ্যক্ষ—এই সভা গৃহে?

আমি (জঃ বঃ) না, যখন আমি সভাগৃহ ত্যাগ করব। আপনি জানেন, শ্রীমতী মণিকুন্তলা সেন, ড. কানাইলাল ভট্টাচার্য এবং জ্যোতিষ জোয়ারদারকে একই আইনে.....গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এই পরিস্থিতিতে কয়েকদিনের জন্য বিধানসভা কম্প্লেক্স-এর মধ্যে সভাগৃহে আশ্রয় নেওয়ার অনুমতি আপনার কাছে চাইছি। এটা বাজেট অধিবেশন। বিধায়ক হিসাবে জনগণের প্রতি এবং আমার নির্বাচনী এলাকার প্রতি আমি কর্তব্য পালন করতে চাই। যতদিন আমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা প্রত্যাহৃত না হচ্ছে, ততদিন যাতে আমি এখানে থাকতে পারি, তার জন্য আপনি অনুমতি দেবেন আশা করি।

অধ্যক্ষ (শৈ.মু) আমি মাননীয় সদস্যদের আশ্বাস দিতে পারি, এই সভাগৃহ অধ্যক্ষের নয়, সদস্যদের। অন্য সদস্যদের যে অধিকার আছে, আপনারও সে অধিকার আছে। যদি কোনো সদস্য আমার আশ্রয় চান, তাহলে তিনি গ্রেপ্তারের হাত থেকে নিরাপদ থাকবেন"![১৯৯] এই ভাবে অসাধারণ প্রত্যুপন্নতার সাহায্যে জ্যোতি বসু শিক্ষক সহ সাধারণ মানুষের আন্দোলনকে বিধানসভার অলিন্দে তুলে ধরবার পথ প্রশস্ত করে নেন। ড. বিধানচন্দ্র রায় তা সত্ত্বেও জ্যোতি বাবুকে বিধানসভার অভ্যন্তরেই গ্রেফতার করা যায় কিনা—সে বিষয়ে তৎকালীন অ্যাডভোকেট জেনারেলের সঙ্গে আলোচনা করলে, অ্যাডভোকেট জেনালের, ড. রায়কে জানান যে তিনি আইনগতভাবে তা করতে পারলেও, তা অসমীচিন হবে। এই ভাবে জ্যোতি বসু বিধানসভার অভ্যন্তরে শিক্ষা ও শিক্ষকের স্বার্থ তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। অনুরূপভাবে রণেন সেন ও হেমন্ত ঘোষালও বিধানসভায় আশ্রয় নেন।[২০০]

এদিকে ১৬ ফেব্রুয়ারি ৫৪-এর ন্যক্করজনক শিক্ষক নিগ্রহের উপর পুলটিশ দেবার প্রয়োজনে ও সামগ্রিক পরিস্থিতির পর্যালোচনার জন্য সরকারের ধামাধরা পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সরকার মহাকরণে ''আলোচনার'' জন্য আহ্বান করে, ১৬ ফ্রেব্রুয়ারি ৫৪'তে। প্রধান শিক্ষক সমিতি আপাত ভাবে অরাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিলেও এর নেতৃস্থানীয় সদস্যরা ছিলেন শাসক কংগ্রেস ঘেঁষা। আপামর শিক্ষকবৃন্দের ন্যায্য

দাবিকে অস্বীকার না করতে পারলেও, তারা নীতিগত ভাবে 'ধর্মঘটের' বিরোধিতা করে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে দাবি আদায়ের জন্য কোনো ভিন্নপথ দেখাতে তারা অপারগ হয়। প্রথম থেকেই নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের সর্বতোভাবে বিরোধিতা করলেও, সাধারণ শিক্ষক মানসিকতা অনুধাবন করে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ধর্মঘটি শিক্ষক নেতাদের পুলিশি হেফাজৎ থেকে মুক্তি দানের জন্য আবেদন করেন তাঁরা। এই সংগঠনের প্রতিনিধি দলে ছিলেন জ্যোতি বিকাশ মিত্র, কামিনী কুমার ঘোষ, ধরনীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রধান শিক্ষক সমিতির অনুরোধে মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষকদের প্রধান দাবিগুলি মেনে নেন বলে বলা হয়। সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেন, 'The Government have carefully considered this suggestion (for giving non graduate teachers a starting salary of Rs. 60/-) of the teacher members of the Assembly and of West Bengal Head masters Association.'[২০১]

ওপরে সহানুভূতির এই হাওয়া দিলেও, শিক্ষকদের তপ্ত কটাহে দগ্ধ করার মতলবে সরকার শিক্ষক আন্দোলনকে তীব্র ধীক্কার জানিয়ে বলেন যে, এই নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনের ফলে, বারোটি সরকারি বাস ও ট্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পৌরসংস্থার কার্যালয় এবং চৌরঙ্গীর কংগ্রেস ভবনে আক্রমণ সংগঠিত করার চেষ্টা হয়েছে। প্রায় ষাট জন সরকারি কর্মচারী আহত হয়েছে বলেও সরকার জানায়। এই তথাকথিত 'নিয়মভঙ্গের আন্দোলনকে' সরকার তার দানবীয় পুলিশ প্রশাসনের আক্রমণ দ্বারা দমন করে, শিক্ষক সংগ্রামকে দাবিয়ে দেবার আশা করেছিলেন। তৎকালীন মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে বত্রিশ জন বিধানমণ্ডলীর সদস্য ও কিছু সরকার ঘেঁষা শিক্ষাবিদেরা একটি বিবৃতি দিয়ে জানালেন যে, শিক্ষক আন্দোলনকে কখনই রাজনীতির সঙ্গে জড়ানো উচিত নয়। এই ভাবে পরোক্ষে শিক্ষকদের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ক্রীড়নক বলে তাদের দাবিদাওয়া, সংগ্রাম আন্দোলনকে চরম ভাবে অপমান করেছিলেন কংগ্রেস ঘেঁষা বুদ্ধিজীবীরা। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ কিন্তু তা সত্ত্বেও দমলেন না। তাঁরা বললেন যে শিক্ষক আন্দোলন তাঁদের গণ্ডীর বাইরে জনতার আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। তাই শিক্ষকেরা এককভাবে আজ আর কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত ধৃত শিক্ষকদের মুক্তি না দেওয়া হচ্ছে এবং শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়া হচ্ছে—ততক্ষণ তাঁরা সংগ্রামের পথ থেকে সরবেন না।

নেতৃত্ব বিহীনতা সত্ত্বেও আন্দোলন কিন্তু থামল না। পরের দিনই কলেজ স্ট্রিটের বই পাড়ায় অবস্থিত সমিতির রাজ্য কার্যালয়ের সামনে শত শত শিক্ষক/শিক্ষিকা আন্দোলনের নতুন দিশার অনুসন্ধানে জমায়েত হলেন। হঠাৎ করে বরানগরের এক শিক্ষিকা বীণা চৌধুরী আবেগ মথিত ভাষায় বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। এর আগে কখনো কোনো সভায় তিনি বক্তৃতা দেননি। তিনি সগর্বে সজোরে বলে উঠলে, ''এক অনিলা দেবীকে ওরা অ্যারেস্ট করেছে, ভয় নেই আমরা এখনও শত শত অনিলা দেবী রয়েছি। আসুন আমরা এখনই আবার অবস্থান করি।''[২০২] ওই স্থানেই শিক্ষকেরা সিদ্ধান্ত নিলেন আন্দোলনের প্রতীক বৃদ্ধ শিক্ষক রামাশিষ মিশ্রের নেতৃত্বে,

পরিত্যক্ত অবস্থান স্থলেই নতুন করে অবস্থান চলবে। সেই অনুযায়ী শিক্ষক মিছিল বিধানসভার কিছুদূর অবধি আসলে, পুলিশ তাদের গতিরোধ করে। স্বভাব শান্ত শিক্ষকেরা পুলিশ ব্যারিকেড না ভেঙে সেখানেই শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলেন। এদিকে শহরের প্রাণকেন্দ্র ডালহৌসী (বি-বা-দী বাগ) ও এস্‌প্ল্যানেড অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ চলছে। ওই অঞ্চলে পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ হয়ে গেছে। এই অবস্থায়ও শিক্ষকেরা খাদ্যহীন শিবির বিহীন অবস্থায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অবস্থান করে চলেছেন। ওই সময়েই অবস্থান স্থল থেকে তিনজন শিক্ষিকা সহ পঞ্চাশ জনকে পুলিশ জেলে নিয়ে গেল। অবস্থান শান্তিপূর্ণ ভাবে স্থগিত হলেও, সাধারণ শিক্ষকেরা নেতৃত্ব বিহীন অবস্থায় যে সংগ্রামী শৌর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন—স্বাধীন ভারতের তথা বাংলার ইতিহাসে তাকে বিরলের থেকেও বিরলতম বললে ভুল বলা হয় না।[২০৩] এদিকে বিধানচন্দ্র রায় বুঝেছিলেন আপাতভাবে আন্দোলনকে খানিক দাবিয়ে দেওয়া হলেও, শিক্ষকের দাবি আজ জনতার দাবিতে পরিণত হয়েছে। শিক্ষকদের মুষ্ঠিভিক্ষা দিয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে সরকার ম্যানেজিং কমিটি নিরপেক্ষ হয়ে মাসে সাড়ে সতের টাকা হিসাবে মহার্ঘভাতা দেবে, শিক্ষক-শিক্ষণ বিহীন শিক্ষকদেরও বেতন পাঁচ টাকা নয়—দশটাকা বৃদ্ধির প্রস্তাবও তিনি করলেন, যা শিক্ষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হল না।

অন্যদিকে সরকারের অমানুষিক হত্যা, লাঞ্ছনা ও অবমাননার প্রতিবাদে, পরদিন অর্থাৎ ১৭ তারিখ, বিদ্যালয় সমূহ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট আহূত হল। ১৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গত দুদিনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বর্ষীয়ান শিক্ষক নেতা মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। তিনি তীব্র কণ্ঠে গত দুদিনের সরকারি দমন পীড়নের তীব্র নিন্দা করে নিহত ও আহত ব্যক্তিবর্গের পরিবারকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ক্ষতিপূরণ দেবার দাবি জানালেন। তিনি আরো বলেন, বিনাশর্তে আন্দোলনের নেতৃত্বকে কারামুক্ত না করলে, সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। সেই সময় আন্দোলন বিরোধীরা, এই কর্মবিরতি ও ধর্ণা কার্যকলাপের জন্য ছাত্রছত্রীদের পঠন-পাঠন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে, প্রচার করতে শুরু করেছিল। এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে মনোরঞ্জন বাবু বলেন যে গরম ও পূজার ছুটির মতো দীর্ঘ অবকাশে ক্লাস নিয়ে ছাত্রদের পঠন-পাঠনের যেটুকু ক্ষতি হচ্ছে তা পরিপূরণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একদিকে শিক্ষকদের দাবিদাওয়া সম্বন্ধে, বিধানচন্দ্র রায় অন্ততঃ মুখে কিছু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন, অন্যদিকে তাঁর সরকার—পুলিশ এমনকি মিলিটারি নামিয়ে আন্দোলন দমন করতে সচেষ্ট হয়েছিল। আন্দোলনের অন্যতম নেতা শচীন্দ্রকুমার মজুমদার, এপ্রসঙ্গে বলেছেন যে, ''সেদিন সকাল থেকে খোলা গাড়ীতে মিলিটারী রাস্তায় টহল দিচ্ছিল। তারা রাইফেল উদ্যত করে লোকজন এবং বাড়িগুলির দিকে তাক রেখে চলছিল। ব্রিটিশ শাসনেও একমাত্র আগস্ট বিপ্লবের সময় ছাড়া ইতিপূর্বে কোনো দিন এমন সামরিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি''।[২০৪] সত্যিই স্বাধীনতা পূর্ব ভারতে ৪২-এর আন্দোলনের সঙ্গে তুলনীয় ছিল—শিক্ষকদের এই আন্দোলন। এদিকে শিক্ষকনেতৃত্ব সহ বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফ্‌তার করার সরকারি প্রয়াস অব্যহত ছিল। এঁদের মধ্যে মোহিনী দাস, নন্দ শ্রীমানী, বিমলানন্দ মুখোপাধ্যায়ের প্রমুখের

নাম আমরা উল্লেখ করতেই পারি। বিভিন্ন দলের কার্যালয়ের উপর আক্রমণ হেনেছিল বিধান রায়ের সরকারের পুলিশ। পরবর্তীতে মোহিত মৈত্র, সুহৃদ বসু মল্লিক, শিবদাস ঘোষ, অরুণ প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, হীরেন দাশগুপ্ত, বিভূতি ঘোষ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে অন্তরীণ করে পুলিশ।

শুধু কোলকাতা নয়—এই অসহনীয় অত্যাচার ও গ্রেফ্‌তারের প্রতিবাদে সারা রাজ্য ফুঁসে উঠেছিল। ১৭ তারিখ ৫৪-এ শিলিগুড়িতে সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল, সরকারি ''শাসন'' এর বিরুদ্ধে। বাঁকুড়া শহরেও প্রবল প্রতিবাদ হয়, পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে। হুগলি বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষক আন্দোলন তীব্ররূপ পরিগ্রহ করে। জেলার নেতা সুধাংশু শেখর ভট্টাচার্য, বিজয় রতন বক্সি ও নৃপেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।[২০৫] হাওড়াতে আন্দোলনে ত্বরণের সৃষ্টি হয় এই সময়ে। লাগাতার কর্ম বিরতির সময় তৎকালীন জেলার তরুণ সদস্যদের অংশগ্রহণের কথা এক স্মৃতিচারণায় জানিয়ে ছিলেন, শিক্ষক নেতা কল্যাণ ঘোষাল।[২০৬] উত্তরের জেলাগুলির মধ্যে তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুরেও ৫৪'-এর আন্দোলন তীব্র রূপ-এ প্রকাশিত হয়। এই সময় বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ সর্বত্র, এমনকি জেলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের স্কুল শিক্ষকেরা জনসভা ইত্যাদির মাধ্যমে আন্দোলনকে শক্তিশালী করেন। ধীরেন ভট্টাচার্য, হেমপ্রসন্ন চক্রবর্তী ও অমলেন্দু চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সমিতির আন্দোলন আদতে একটি গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। আন্দোলনের জনমুখিনতা আরো বৃদ্ধি পায় যখন জেলার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা সরোজরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষকদের দাবিদাওয়ার পাশে এসে দাঁড়ান। ১৯৫৪-এর ৬ ফেব্রুয়ারি 'স্বাধীনতা পত্রিকায় সম্পাদকীয় কলমে লেখা হয়, ''....পশ্চিম দিনাজপুরের কংগ্রেসী কর্মকর্তাদের দ্বিধাহীন সমর্থন ঘোষণা প্রভৃতি দেখিয়াও কংগ্রেসী শাসকেরা যদি হাওয়া চিনতে না পারেন, তবে ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলনের বিপুল ধাক্কায় তাঁহাদের দাম্ভিক ঔদ্বত্যের সম্পূর্ণ পরাজয়ের মধ্যে দিয়েই প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হইবে।''[২০৭] এমনকি সাধারণ ভাবে রাজ্যের অন্যান্য অংশের বেশির ভাগ কংগ্রেস পরিচালিত স্কুল পরিচালন সমিতি ধর্মঘটের বিপুল বিরোধিতা করলেও, কংগ্রেসপন্থী হওয়া সত্ত্বেও বালুরঘাট হাইস্কুলের পরিচালকমণ্ডলী প্রকাশ্যে শিক্ষক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। ১২ ফেব্রুয়ারি শিক্ষক আন্দোলনের সমর্থনে রাজ্যবাসী সাধারণ ধর্মঘটের দিন এই জেলার জনজীবন ছিল সম্পূর্ণ স্তব্ধ। পশ্চিম দিনাজপুরে শাসক-বিরোধী সবাই শিক্ষকদের সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছিলেন বলে এখানে আন্দোলন কিছুটা অন্যমাত্রায় পরিচালিত হয়েছিল। তাই এই জেলার সম্বন্ধে দু'কলম বেশি লিখতে হল।

৫৪-এর আন্দোলনকে জনগণের আন্দোলনে পরিণত করতে, শুধু সামনের সারির নেতৃবৃন্দ নয়, দ্বিতীয় সারির নেতৃস্থানীয় কর্মীরাও যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন। কোলকাতার কর্মীদের মধ্যে আমরা এই রকম কয়েক জনের নাম করতে পারি। এঁরা হলেন বিমল দত্ত, উৎপল রায়, প্রভাস ঘোষ, অমর মজুমদার, শচী মজুমদার প্রমুখ। এছাড়া বাগবাজার বিদ্যালয়ের দেবেন্দ্র বিজয় গঙ্গোপাধ্যায়, পাইকপাড়া হাইস্কুলের উপেন্দ্র নাথ মজুমদার, খিদিরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সুশীল মুখোপাধ্যায়ের নাম এই প্রসঙ্গে যুক্ত হওয়ার দাবি রাখে। অবস্থান শিবিরে সংগৃহীত

অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রীর রক্ষণ ও বন্টনের গুরু দায়িত্বে ছিলেন নেতাজী নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রঞ্জিত গুহ এবং সুরেশ মৈত্র।[২০৮] আন্দোলন চলাকালীন সংগ্রাম সংক্রান্ত খবর সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবার জন্য যে 'বুলেটিন' প্রকাশিত হত তার দায়িত্বে ছিলেন কাশিম বাজার স্কুলের হরিনারায়ণ চক্রবর্তী এবং অশোক নগর হাইস্কুলের ননীগোপাল বিশ্বাস। বেহালা হাইস্কুলের শিক্ষক প্রফুল্ল রক্ষিত, অবস্থান শিবিরে শ্লোগান দেবার মূল দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সমিতির দুই কর্মী সন্তোষ ভাওয়াল এবং উমেশচন্দ্র সরকারের কথা বলতেই হয়। তারা সমিতির 'অর্থ'-এর হিসাব রাখবার কাজ করতেন। সেন্ট পলস্ স্কুলের ধীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

জেলায় জেলায় ৫৪-এর সংগ্রাম

শুধু কোলকাতায় নয়, রাজ্যের সর্বত্র এই আন্দোলন ঐতিহাসিক রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আমরা লেখার অন্যত্র তা চুম্বকাকারে বর্ণনা করেছি। তবু এই আন্দোলনে মফঃস্বলের যে সব শিক্ষক বিশেষ ভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাদের নাম যথা সম্ভব উল্লেখ করার চেষ্টা করছি। না হলে এই বিশেষ অধ্যায়টির অঙ্গহানি হবে, অবিভক্ত ২৪ পরগণা জেলার বিজয় কুমার বসু এবং নির্মল চন্দ্র গুপ্তের নেতৃত্বে, সুনীল ভট্টাচার্য, মদনমোহন নাথ, ভোলানাথ ভট্টাচার্য, বিমল সেন, সত্যগোপাল লাহিড়ী, হরিমোহন সাহার পাশাপাশি মনোরঞ্জন সাহা, সুনীল সেনগুপ্ত প্রমুখ, আন্দোলনের তরঙ্গসঙ্কুল পথে সাফল্যের সঙ্গে সমিতির তরীখানি বেয়ে নিয়ে গেছিলেন। এই জেলার শ্রমিক নেতৃত্ব যেমন নীরেন্দ্র নাথ ঘোষ, নিতাই সুর প্রমুখেরাও সাধ্যমতো শিক্ষক সংগ্রামে সহায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন।[২০৯]

কৃষি প্রধান বর্ধমান জেলায় কৃষক সভার নেতৃত্ব শিক্ষকদের সহযোগী সাথী হিসাবে উল্লেখযোগ্য ভাবে সংগ্রামে শামিল হয়েছিলেন। হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিনয় চৌধুরী, সুবোধ চৌধুরী প্রভৃতি প্রবাদপ্রতীম কৃষক নেতাদের নাম এই প্রসঙ্গে আমরা করতেই পারি। বর্ধমানে শিক্ষক সমিতির রথের রশি ছিল তারাকুমার মিশ্রের হাতে। এছাড়া প্রশান্ত কুমার গাঙ্গুলি, লোকানন্দ মজুমদার, আমোদ বিহারী বসু প্রমুখের নাম উল্লেখ করতেই হয়।[২১০]

মেদিনীপুর জেলায়ও ৫৪'-এর শিক্ষক আন্দোলন-এর ভিত দৃঢ় ভাবে গাঁথবার ক্ষেত্রে জগদীশ ভট্টাচার্য ও শ্যামল দত্তের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এদের আন্দোলনের রণতুর্যর সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করেছিলেন জগদীশ চন্দ্র দাস, কালোবরণ চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ রায়, রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী, প্রফুল্ল কুমার জানা প্রভৃতি। এখানে ছাত্ররাও বহুল সংখ্যায় শিক্ষকদের পাশে এসে দাঁড়ায়—ছাত্রদের নেতা ছিলেন পঞ্চানন সাহা ও প্রশান্ত লাহা।[২১১]

শিক্ষকদের সংগ্রাম, পুষ্পময়ী বসু, গৌরীচরণ ভট্টাচার্য এবং বিশেষ করে সন্তোষ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে, মুর্শিদাবাদ জেলায়, ৫৪ সালে বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহের কথা এর আগেই প্রসঙ্গক্রমে এসেছে, এখানে সুধীর কুমার ঘোষ ও ভবানী তলাপাত্রের মতো আঞ্চলিক নেতাদের সংগ্রামশীল মনোভাবের কথা আমরা স্মরণ করতে পারি।

মালদহে রেণু লাহিড়ী ছাড়াও প্রফুল্ল চন্দ্র চক্রবর্তী এবং সুধাংশুভূষণ রায় আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

জলপাইগুড়ি জেলাতেও সমসময়ে শিক্ষক আন্দোলনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। শিক্ষক সমিতির কাজে ওই সময়ে জেলার যে সমস্ত শিক্ষকরা অগ্রদূতের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন, সুরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, সুহৃদ সেন, মহেন্দ্র মৈত্র, অসিতানন্দ ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রনাথ সিংহ, রবি দত্ত প্রমুখ। শিক্ষিকা শ্রীমতী তারা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদানও এক্ষেত্রে ভুলবার নয়। হুগলি জেলার শিক্ষক আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন বলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া শশীমোহন ভট্টাচার্য ও চন্দন সুরও ৫৪'-এর আন্দোলনের আগে পরে, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।[২১২]

নদীয়া জেলায়ও ৫৪'-এর অব্যবহিত পূর্বেই শিক্ষক আন্দোলন জোরে শোরে তার অস্তিত্ব জানান দিয়েছিল। এখানকার প্রথম সারির নেতা ছিলেন, বীরেণ আচার্য ও সরোজ মোহন গোস্বামী। এঁদের সহযোগী হিসাবে কার্যরত ছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, সুনীলকৃষ্ণ মৈত্র, তারাপদ বসু, নিবারণ চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, কালীপদ মুখোপাধ্যায়, করুণাময় ভট্টাচার্য এবং কানাই প্রসাদ চক্রবর্তী। এই জেলায় শিক্ষক আন্দোলন বিপুল ভাবে ছাত্রদের সহায়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। ছাত্রদের নেতৃত্বে ছিলেন অজিত সান্যাল, সুনীল বিশ্বাস এবং কানাইলাল আচার্য।

হাওড়া জেলাতেও শিক্ষক আন্দোলন যথেষ্ট দৃঢ়মূল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বিজয় রতন বক্সী, দ্বিজেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বীণা মজুমদার প্রভৃতির নাম আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই পারি। বাঁকুড়া জেলায় ৫০-এর দশকে যে সমস্ত শিক্ষক নেতা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে তারাপদ শিকদার ও দীনবন্ধু মহান্তির সঙ্গেই আমরা উমাদেবীর কথা উল্লেখ করতে পারি। বীরভূম জেলায়ও আন্দোলন যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং এই আন্দোলনের জলতরঙ্গে সাংগঠনিক তরণীকে স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাধাবল্লভ রায়, শিশির হাজরা, কানাইলাল দাস এবং অরুণ চৌধুরীর নাম আমরা সবিশেষ উল্লেখ করতে পারি।[২১৩]

এবার আমরা এমন একটা জেলার আন্দোলন সংক্রান্ত আলোচনা করব। যেটা আমাদের রাজ্যের অংশ হলেও, সেখানে বাঙালিরা সংখ্যালঘু। সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হল নেপালী ভোটিয়া এবং লেপচা জাতীয় মানুষেরা। অবশ্য জেলার অন্তর্গত সমতল, শিলিগুড়ি অঞ্চলে, শিক্ষক আন্দোলন যথেষ্ট শক্তিশালী রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এখানে সংগ্রামের ময়দানের সারথী ছিলেন, শচীন্দ্রনাথ সরকার ও বীরেশ্বর মজুমদার। তবে জেলার পাহাড়ী অঞ্চলের পরিস্থিতি একটু ভিন্ন ছিল। পাহাড়ী দার্জিলিং-এ নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রতিপক্ষ ছিল দেওপ্রকাশ রাইয়ের গোর্খা লীগের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ইউনিয়ন। তবে পাহাড়ে বামপন্থী নেতৃত্ব যেমন রতনলাল ব্রাহ্মণ, গণেশলাল সুব্বার পরিচালনায়, বাম আন্দোলন শক্তিশালী হচ্ছিল ধীরে ধীরে। তার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী রূপে শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনেও পড়েছিল। পাহাড়ী দার্জিলিং-এ টার্নবুল হাইস্কুল ছিল এ.বি.টি.এ.-র সূতিকাগার। এখানকার প্রবীণ শিক্ষক হেমচন্দ্র প্রধানের স্মৃতিচারণায়

জানা যায় যে, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দেই শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত সমিতির রাজ্য সম্মেলনে পার্বত্য এলাকা থেকে বেশ কয়েকজন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছিলেন। সমিতির সাম্প্রতিক সময়ের নেতা তমাল চন্দ্রের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, '১৯৫৪-এর ঐতিহাসিক আন্দোলনের জন্য গঠিত সংগ্রাম তহবিলে সমতলের পাশাপাশি পাহাড়েরও অনেকেই আর্থিক সহায়তা করেছিলেন সরাসরি মানি অর্ডারের মাধ্যমে। সংগঠিত ভাবে মহারাণী গার্লস হাই স্কুলের ১৪ জন শিক্ষিকা পাঠিয়েছিলেন ৭০.০০ টাকা।'[২১৪] পরবর্তীকালে, ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে দলমত নির্বিশেষে দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ী শিক্ষক শিক্ষিকা একটি সভায় মিলিত হন। সভার মুখ্য আলোচ্য ছিল, এখানকার শিক্ষকের আঞ্চলিক গোর্খা লীগের শিক্ষক সংগঠনে থাকবেন, নাকি আন্তর্জাতিক পরিচিতি সম্পন্ন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিতে যোগ দেবেন, শেষ পর্যন্ত সেন্ট রবার্টস স্কুলে জগৎছেত্রী, কালিম্পং-এর পঞ্চরত্ন প্রধান এবং দার্জিলিং সদরের টার্নবুল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এন কুমারের চেষ্টায় পাহাড়ের শিক্ষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বাংলার শিক্ষক সমিতির সঙ্গে একযোগে কাজ করতে আগ্রহান্বিত হন। এক্ষেত্রে জেলা শিক্ষা আন্দোলনের দুই অগ্রজ সৈনিক বদ্রীনারায়ণ প্রধান এবং সুশীলচন্দ্র কুণ্ডুরও বিরাট অবদান ছিল। যাক সে অন্য প্রসঙ্গ।[২১৫]

সংগ্রামের সাথী

এবার আবার কোলকাতায় ফিরে আসা যাক। শিক্ষকদের উপর ড. বিধান রায় সরকারের এই ন্যক্করজনক আচরণের তীব্র প্রতিবাদ ওঠে দেশ ও বিদেশে। তৎকালে শ্রমজীবী মানুষদের সবচেয়ে বড় সংগঠন অলইন্ডিয়া ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেস-রাজ্য সরকারের এই ধরণের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করে একটি তারবার্তা প্রেরণ করে, শিক্ষক সমিতির উদ্দেশ্যে। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি তাঁদের সহকর্মীদের উপর এই আক্রমণে নীরব থাকেনি। ১৫ ফেব্রুয়ারির নিশংস পুলিশি অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করে, অধ্যাপক সমিতি। ১৮ ফেব্রুয়ারির ৫৪-হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী অধ্যাপক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটি শুধুমাত্র শিক্ষকদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান ভেঙে দেওয়া ও শিক্ষক নেতাদের গ্রেফ্তারের প্রতিবাদ করেনি, তার পাশাপাশি তাঁরা, শিক্ষক বিরোধী বলে চিহ্নিত করে, তৎকালীন শিক্ষা সচিব ডি. এম. সেনের পদত্যাগও দাবি করেছিল। এছাড়া তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'Observance the Secondary Teachers Day on the 20th February by College and University teachers all over West Bengal by holding meetings of Teachers councils, contributing to the ABTA fund and preparing themselves for a taken cease work, if necessary to signify sympathi'।[২১৬] এছাড়াও অধ্যাপক সমিতির তৎকালীন সম্পাদক কেশবেশ্বর বসু, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে শিক্ষক গ্রেপ্তারের ফলে যে সঙ্কট সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানাইয়া..শ্রী নেহরুর নিকট তারবার্তা পাঠাইয়া দেন।[২১৭]

অধ্যাপক সমিতি ছাড়াও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন, ট্রাম মজদুর ইউনিয়ন এই ক্রান্তি কালে শিক্ষকদের আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়ান।[২১৮] অ্যাসোসিয়েশন অব সায়েন্টিফিক্ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষে প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক ড. সুশীল মুখোপাধ্যায়, ড. মনীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, হীরেন বসু, ড. সুশীলকুমার বসু শিক্ষকদের উপর অত্যাচারের তীব্র

বিরোধিতা করেন। শিক্ষকদের আন্দোলনের পাশে তখন সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্গের মানুষেরা দাঁড়িয়েছিলেন। তেমনি তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষেরা নিঃশর্ত সমর্থন জানাতে দ্বিধাবোধ করেনি। শুধুমাত্র তৎকালীন শাসক পক্ষের কিছু আমলা ও মন্ত্রী বাদে শিক্ষকদের আন্দোলনের পাশে সমাজের সব অংশের মানুষ সমবেত হয়েছিলেন।

যাইহোক ঘটনাক্রমে ফিরে আসি। আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে শিক্ষক আন্দোলনের সমর্থক জনতা, মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখবর্তী ট্রামলাইন উপড়ে তুলে দেয়। পুলিশ জোর করে রাস্তা অবরোধ তুলতে গেলে, শ্যামবাজার ও ভবানীপুরে বোমা পড়ে। সরকারও অবশ্য ১৪৪ ধারা জারি করে, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী জন-প্রবাহকে স্তব্ধ করতে সচেষ্ট হয়। এদিকে শিক্ষকদের সমর্থনে যে সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়েছিল তারা ১৭/০২-এ দুপুর তিনটেয় সরকারি দমন নীতির প্রতিবাদে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) একটি মহতি জনসভা আহ্বান করে। সাধারণ মানুষ আইন অমান্য করেই এই সভা সফল করার উদ্দেশ্য নিয়ে স্কোয়ারে প্রবেশ করতে চাইলে, পুলিশ কিছু মানুষকে গ্রেফ্তার করে। এর প্রতিবাদে শুরু হয় জনতা-পুলিশ খণ্ড যুদ্ধ। ইষ্টক বৃষ্টি এবং কাঁদুনে গ্যাসের লড়াই শুরু হয়ে যায়। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে জনতা-পুলিশের গেরিলা লড়াই চলার পরে অবস্থা শান্ত হয়।

১৭ তারিখেই শিক্ষক সমিতি তাদের পূর্ব ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিবাদী বাগ বা তৎকালীন ডালহৌসী স্কোয়ারে, শ্লোগান দিতে দিতে অগ্রসর হন। ঐ দিন এভাবেই ১৪৪ ধারা অমান্য করে ত্রিশ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা কারাবরণ করেন। এদের মধ্যে শান্তি রায়, অঞ্জলি গাঙ্গুলি, অনিমা দত্ত, ছায়া বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলা ভট্টাচার্য, তারা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লড়াকু মধ্যমসারির নেত্রীরা অশেষ সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি, ৫৪তেও একই ভাবে ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে শিক্ষকেরা আইন অমান্য আন্দোল কর্মসূচি চলমান রাখেন। সেদিন সকাল ১০টার সময় 'শিক্ষকদের দাবি মানতে হবে', 'বিনা শর্তে শিক্ষকদের মুক্তি দিতে হবে' শ্লোগান তুলে পাঁচজন সত্যাগ্রহী শিক্ষক মহাকরণের দিকে এগিয়ে গেলে, পুলিশ তাদের গ্রেফ্তার করে। তাঁদের পদক্ষেপ অনুসরণ করেই বেলা পাঁচটায় আরেক দল সত্যাগ্রহী একই স্থান মহাকরণের সামনে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে শুরু করলে, পুলিশ তাদেরও গ্রেফ্তার করে। ওইদিন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব টিচার্স অর্গানাইজেশন, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক আন্দোলনকে অভিনন্দন জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকায় ১৭।০২।৫৪ এর সংস্করণের প্রথম পাতায় 'লিড' নিউজে 'Calcutta police Fire on Rioters and Die as Red Fan' শীর্ষনামে খবর প্রকাশিত হয় যে, 'The poliec fired on rioters to day following open communist participation in a strike of school teachers. The police attacked the mobs with tear gas and guns. Four persons were killed and sixty five injured in the rioting, Reuters reported.' আমেরিকার পুঁজিবাদী চরিত্রের সংবাদপত্রতে শিক্ষকদের সমর্থনে গণআন্দোলনকে দাঙ্গা হিসাবে চিহ্নিত করার প্রবণতা আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি না করলেও, সংবাদ পত্রটি নিম্নলিখিত কথাগুলিও

লিখতে বাধ্য হয়েছিল, "In the afternoon, the police tried to breakup a demonstration out side the legistative Assembly, which was in session. They threw tear gas bombs at the crowd..."[২১৯]

শান্তিপূর্ণ জনতার উপরে পুলিশি অত্যাচারের ক্ষীণ আভাস দিলেও, সংবাদপত্রটি এই আন্দোলনে কমিউনিস্টদের ষড়যন্ত্র হিসাবেই চিত্রিত করেছিল। সংবাদপত্রটিতে লেখা হল, 'Calcutta, February 17 (AP) Three communist leaders of West Bengal State restored to Parliamentary immunity to day to evade arrest in connection with two days mobviolence in Calcutta. The three are Jyoti Basu, Bengali Communist leader and his lieutenants Ranen Sen and Hemant Ghosal."[২২০]

বেশির ভাগ স্বদেশি সংবাদপত্র অবশ্য কমবেশি শিক্ষকদের আন্দোলন ও তার দাবিদাওয়ার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। এই অবস্থায় শিক্ষক সংগ্রামের নৈতিক বল যে বৃদ্ধি পেয়েছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষ করে, আন্দোলন সংগ্রামের কাহিনি, মিটিং মিছিলের কথাগুলি সংবাদপত্রগুলি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করেছিল।

এদিকে ১৮ তারিখেই ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে, শিক্ষক আন্দোলনের পক্ষে একটি মহতি সভা আহূত হল। মূলতঃ অধ্যাপক সমিতির সদস্যরাই এই সভার আহ্বায়ক ছিলেন। সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী। এছাড়া ফুলরেণু গুহ, রাজকুমার চক্রবর্তী, নির্মল ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রমুখ সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন। সভায় শিক্ষকদের উপর পুলিশি সন্ত্রাসের তীব্র বিরোধিতা করার পাশাপাশি আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। সেদিনও সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে শিক্ষক আন্দোলনের সমন্বয়কারী সংস্থার ডাকে হাজরা পার্ক ও আজাদ হিন্দ বাগে, দুটি সমাবেশ আহ্বান করা হয়। পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে সভা বানচাল করতে উদ্যোগী হলে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। দুটি সভা মিলে ১৩ জনকে আইন ভঙ্গকারী হিসাবে গ্রেফ্তার করা হয়। তখন বিধান রায়ের সরকার শিক্ষক আন্দোলনে 'কমিউনিস্ট জুজু' দেখতে শুরু করেছে। তারা উত্তরবঙ্গের নামকরা কংগ্রেস নেতা ডা. চারুচন্দ্র সান্যালের শিক্ষক আন্দোলনকে সমর্থন ছাড়াও বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা জে. সি. গুপ্ত কর্তৃক শিক্ষকদের মুক্তিদানের দাবি সত্ত্বেও, সমস্ত আন্দোলনকে একটি কমিউনিস্ট চক্রান্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। তৎকালীন সরকার ভুলে গিয়েছিল শুধু কমিউনিস্টরা নয়—আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সমাজতন্ত্রী, অন্যান্য বিভিন্ন মতের দল ছাড়াও, জনসংঘের মতো দক্ষিণপন্থী দলও। এই সার্বিক জনজাগরণকে অস্বীকার করে বাস্তব বিমুখতারই পরিচয় দিয়েছিল বিধানচন্দ্র রায়ের সরকার।[২২১]

যাইহোক, পরদিন ১৯ ফেব্রুয়ারি '৫৪ কোলকাতার জনজীবন অনেকটা স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসে। তবু মহাকরণের সামনে তিন জন শিক্ষিকা ও দশ জন শিক্ষক আইন অমান্য করেন। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে শিক্ষকেরা ১৪৪ ধারা অমান্য করে জনসভা করতে উদ্যোগী হলে পুলিশি বাধায় প্রায় ১২ জন আহত হন। মীর্জাপুর স্ট্রিটে অবরোধ করার কারণে পুলিশ ১৯ জনকে

গ্রেফ্‌তার করে। ওই দিন মোট ৭৫ জনকে গ্রেফ্‌তার করা হয়। ওই দিন রাজ্যের সমস্ত মতের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মতো শিক্ষকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা। চিত্র পরিচালক বীরেন্দ্র নাথ লাহিড়ী, নাট্যকার নিতাই ভট্টাচার্য, অভিনেত্রী শোভা সেন, মঞ্জু দে, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শব্দযন্ত্রী অনিলবরণ ও বিখ্যাত অভিনেতা উত্তমকুমার এক যৌথ বিবৃতিতে জানান, ''বাংলা দেশের শিক্ষকদের আন্দোলন অত্যন্ত গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই অবস্থায় কোনো শিক্ষিত লোকই নীরব থাকতে পারে না। শিক্ষকগণ গত পাঁচ দিন ধরে কোন বিশৃংখলা সৃষ্টি না করে যে সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন তার প্রতি কোনো নাগরিক আর উদাসীন থাকতে পারে না। সরকার সম্প্রতি তাদের গ্রেফতার করে যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে তা আর কখনো ঘটেনি।''[২২২]

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে—একমাত্র শোভা সেন ছাড়া এই যৌথ বিবৃতির অন্যান্য কোন স্বাক্ষরকারীই কোনো ভাবেই বামপন্থী ছিলেন না। আসলে তাঁদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। সেইদিন কোলকাতা পৌরসভার অধিবেশনেও বিরোধী সদস্যরা শিক্ষকদের গ্রেপ্তার ও পুলিশের গুলি চালনার প্রতিবাদ করেন। এবং অধিবেশনে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চান। তাঁদের দাবি না মানার ফলে, অধিবেশনে চূড়ান্ত বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়েছিল।

২০ ফেব্রুয়ারি ৫৪' কোলকাতার জনজীবন ক্রমশঃ নিজের জীবন ছন্দে প্রত্যাবর্তন করতে শুরু করে। শিক্ষক ও সাধারণ জনতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ও বেলেঘাটা সুভাষ পার্কে জনসভা করার চেষ্টা করলেও, পুলিশের বাধা দানের ফলে তা আর সম্ভবপর হয়নি। মোট নয় জনকে এই জন্য গ্রেফ্‌তার করা হয়। শিক্ষকদের সহায়তা করার অপরাধে সুধীর মুখোপাধ্যায়, রবীন মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ মজুমদার, ধীরেশ সান্যাল ও বরদা মুকুটমণির মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে আটক করে পুলিশ। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্ব বিহীন সাধারণ সদস্যরা তখনো কিন্তু আন্দোলনের প্রবাহকে বেগবান রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছিলেন। ওই দিনও দশ জন শিক্ষক আইন অমান্য করে গ্রেফ্‌তার হন। ২১ ফেব্রুয়ারি শিক্ষকেরা আন্দোলনে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে শহীদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এদিকে রাজ্যের অধ্যাপককুলও তাদেরই সহকর্মীদের উপর এই সরকারি জুলুম মুখ বুজে সহ্য করেনি। স্টুডেন্টস হলে অধ্যাপকদের এক সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের সাবেক সভাপতি এবং অধ্যাপক আন্দোলনের তৎকালীন নেতা রাজকুমার চক্রবর্তী। পরের দিনের যুগান্তর পত্রিকায় খবর বার হয়—''কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতির উদ্যোগে শনিবার (২০/০২) মাধ্যমিক শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্টুডেন্টস হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে মাধ্যমিক শিক্ষকগণ যে আন্দোলন চালাইতেছেন, তাহার প্রতি সমর্থন জানান হয় এবং 'কর্মবিরতির' আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের অবিলম্বে মুক্তি দিয়া শিক্ষকদের সঙ্গে মীমাংসা করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়। অধ্যাপক সমিতি তাঁহাদের মতামত জানাইবার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এক প্রতিনিধি দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করিয়াছেন।'[২২৩] আনন্দবাজার পত্রিকা ওই দিনই লেখে, ''সভায় রাজ্য সরকারের শিক্ষা সচিব শ্রী ডি. এম. সেন শিক্ষকদের সম্পর্কে যে সকল ঔদ্ধত্যপূর্ণ এবং অসম্মানজনক' উক্তি করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তজ্জন্য তীব্র নিন্দা করিয়া অবিলম্বে তাহাকে শিক্ষা সচিবের পদ হইতে অপসারণের দাবি জানান হয়।" আনন্দবাজার সেদিনের রিপোর্টে আরো উল্লেখ করে, ''সভাপতি অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী শিক্ষক আন্দোলন সম্পর্কে যাঁহারা নিহত হইয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশে শোক প্রকাশ করেন। তিনি উচ্ছৃঙ্খল কার্যকলাপের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের নিন্দা করিয়া বলেন, উহার সহিত শিক্ষকদের কোনো সম্পর্ক ছিল না।"[২২৪]

শিক্ষক আন্দোলনে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন, গবেষক নীলেন্দু সেনগুপ্ত তার একটি তালিকা তৈরি করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, বিখ্যাত ডা. সহায় রাম বসুর পুত্র সুনীল বসু প্রথম মৃত্যু বরণ করেন। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার ১৮/০২/৫৪ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী পুলিশের গুলিতে নিহত ব্যক্তিদের একটি তালিকা দিয়েছেন ড. সেনগুপ্ত। তাঁরা হলেন (১) রবীন্দ্রনাথ সরকার—রাণী ভবানী বিদ্যালয়ের ছাত্র, (২) অজিত দে—ডাক-তার কার্যালয়ের কর্মচারী, (৩) ইয়াসীন—জাহাজের শ্রমিক, (৪) মন্মথ বর্মণ—কাঁসা/পিতল শিল্পের শ্রমিক।[২২৫]

সংসদীয় লড়াই

এখানে মনে রাখতে হবে শিক্ষক আন্দোলনের ঢেউ শুধু মাত্র রাজপথকে প্লাবিত করেছিল তাই নয়—দেশের এবং রাজ্যের আইনসভায়ও তার প্রতিফলন ঘটেছিল। আন্দোলন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে তখনই পশ্চিমবঙ্গের কতিপয় সাংসদ রেণু চক্রবর্তী, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ভূপেশ গুপ্তের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দফতরের উপমন্ত্রী কে. ডি. মালব্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অবিলম্বে শিক্ষক আন্দোলন ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে শিক্ষকদের দ্বন্দ্বের নিরসন করার জন্য হস্তক্ষেপ করার আবেদন জানান। শুধুমাত্র বিভিন্ন দলের নেতৃত্ব নয়—রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ্ ড. কালিদাস নাগ ও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেন।

১৭ ফেব্রুয়ারি ৫৪ রাজ্যসভায় কমিউনিস্ট নেতা পি. সুন্দরাইয়া, সভায় পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষকদের সমর্থনে একটি নোটিশ উত্থাপন করেন। চেয়ারম্যান সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন আইন শৃংখলা ও শিক্ষা রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় বলে চিহ্নিত করলেও, এই বিষয়ে এক ঘণ্টা আলোচনার জন্য নির্ধারিত করেন। বিখ্যাত সাম্যবাদী নেতা ভূপেশ গুপ্ত আলোচনার সূচনা করে শিক্ষক আন্দোলনের কারণ, সূত্রপাত ও সাম্প্রতিক আন্দোলনের সুচারু বিশ্লেষণ করেন। প্রচুর সাধারণ কংগ্রেস সদস্য এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল তাই একে 'বিরোধীদের চক্রান্ত' বলা একেবারেই অনুচিত বলেও তিনি মন্তব্য করেছিলেন। আবেগময় ভাষায় তাঁর বক্তব্য ছিল, ''মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখানে বসে আছেন, তিনি এখনও আদেশ দিতে পারেন। তিনি সমস্ত আটক ব্যক্তিদের ছেড়ে দেওয়ার অনুকূলে মনোভাব প্রকাশ করতে পারেন।..... আমরা কলকাতার শিক্ষকদের প্রতি সুবিচার করি সেই সঙ্গে ঐ নগরজীবনের স্বাভাবিকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ দেব প্রসাদ ঘোষ এই সম্পর্কিত তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে 'ABTA

বা নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি এক রাতে গজিয়ে উঠা ব্যাঙের ছাতার মতো সঙ্ঘ বা সমিতি নয়। দুবার এর সভাপতি পদে থেকে আমি সম্মানিত।'[২২৬] তাই যে ভাবে ড. রায় পুলিশ নামিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা করেছে, তার তীব্র নিন্দা করেন তিনি। রাজ্যসভার আরেকজন সদস্য অধ্যাপক জি. রঙ্গ প্রধানমন্ত্রীকে বাংলায় গিয়ে সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার অনুরোধ করেন। জবাবি ভাষণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কৈলাশ নাথ কাটজু শিক্ষকদের দুরবস্থার কথা উচ্চারণ করেও সমাজবিরোধীদের গুণ্ডামির নিন্দা করেন। রাজ্যসভার আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় গুণ্ডামির নিন্দা সব পক্ষ করলেও শিক্ষকদের দাবিদাওয়াগুলোকে কেউই অস্বীকার করতে পারেন নি।

রাজ্যের বিষয় হলেও এই বিশেষ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের দাবি জানান ড. কালিদাস নাগ। ড. রাধাকৃষ্ণন তখন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এবং উপরাষ্ট্রপতিও বটে। তার উদ্দেশ্যে ও ড. কালিদাস নাগ কলকাতার সঙ্গে শিক্ষকতা সূত্রে তার যোগাযোগের উল্লেখ করেন এবং ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকে এই সমঝোতা কাজে হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানান। জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষিত নেতৃত্বের সম্পর্কটা তিক্ত হল কি করে সে বিষয়েও তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। শিক্ষকদের দুরবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে ড. নাগ বলেন, 'they (teacher) are our kith and kin and all of you know how responsible the humble teachers are, but we have refused them even the barest needs of life. We can not maintain our independence by keeping millions of teachers in this condition.....Indias future is linked up with the ametioration of the teachers condition. Let justice be done and let truth alone triumph.'[২২৭]

ড. নাগের এই শিক্ষক সহমর্মিতা অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভঙ্গীতে খুব একটা পরিবর্তন এনেছিল তা মনে হয় না।

১৭ ফেব্রুয়ারি ৫৪ লোকসভায় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং রেণু চক্রবর্তী শিক্ষকদের কর্মবিরতির প্রেক্ষাপটে একটি মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অধ্যক্ষ শ্রী মবলংকর অবশ্য বিষয়টি রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার অধীন বলে, এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কোলকাতার অচলাবস্থার উল্লেখ করে, বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনার দাবি জানান। স্পীকার এই দাবি না মানলে, শ্রী মুখোপাধ্যায় সহ তাঁর দলের সদস্যরা কক্ষ ত্যাগ করেন। তাঁদের সহযোগী হন ড. মেঘনাদ সাহা এবং এস. বি. খারে। পরদিন ১৮ তারিখ ডা. লঙ্কাসুন্দরম অধিবেশনের শুরুতে আবার এক মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কলকাতার সমস্যা আলোচনায় প্রস্তাব উত্থাপন আপত্তিকারী সরকারের ব্যর্থতা' নামে পরোক্ষভাবে শিক্ষক আন্দোলন জাত সমস্যা নিয়েই আলোচনা করার তাগিদে এই প্রস্তাব তোলা হয়। শেষ পর্যন্ত স্পীকার উক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার অনুমতি প্রদান করেন।

প্রথমেই ডা. লঙ্কাসুন্দরম রাজ্যসভায় আলোচনা হলেও, লোকসভায় শিক্ষক আন্দোলন সম্পর্কে সরাসরি আলাপ-আলোচনার সুবিধা না দেবার জন্য শাসক দলের সমালোচনা করেন। আলোচনায় সাংসদ রঘুরামাইয়া, এস. এস. মোরে, মহাবীর ত্যাগী এস. ভি. রামাস্বামী এবং

জনসংঘের সদস্য এন. সি. চ্যাটার্জী অংশগ্রহণ করেন। শ্রী চট্টোপাধ্যায় কলকাতার অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সারা দেশের উদ্বিগ্ন অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরেন। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শিক্ষক আন্দোলন সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের অনীহাকর ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেন। তাঁর অগ্নিস্রাবী ভাষায় তিনি বলেন, '.....আমি কেবল মাত্র এই কথা বলতে চাই সরকার দেশের জনতার কণ্ঠস্বরের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে বধিরতা অবলম্বন করছেন। বিশেষ করে আমরা যেখানকার প্রতিনিধি সেই বাংলার লোকদের দারুণ মনস্তাপের প্রতি।"[২২৮] যাইহোক শেষ পর্যন্ত মুলতুবী প্রস্তাবটি ৬৫-২৫৯ ভোটে বাতিল হয়ে যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠের স্টীম রোলারে বাংলার মানুষের চাওয়া-পাওয়াকে এইভাবে অগ্রাহ্য করে কেন্দ্রীয় সরকার। সংবাদপত্রে সংসদের কার্যাবলীর যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায়, 'The Congress party government under prime minister Jawharlal Nehru defeated to day the first motion of censure debated by parliament since India became independent in 1947. The motion was on a technical point relating to a discussion off the riots of last two days in Calcutta. The Government won by 259 votes to 66. The opposition complained that Mr. Nehru.....had ignored the feelings of the House of the people or lower house which was really the representalive body of the people.'[২২৯]

স্বাভাবিক ভাবেই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা শিক্ষক আন্দোলনের সূত্র ধরে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। আমরা আগেই বিধানসভার বিরোধী পক্ষের নেতা জ্যোতি বসু কিরকম ভাবে, গ্রেফ্‌তারি এড়িয়ে বিধানসভার অধিবেশনে অংশ নিয়েছিলেন তাঁর বিস্তৃত বর্ণনা করেছি। ১৪ ফেব্রুয়ারি রাতে শিক্ষক নেতাদের গ্রেফ্‌তারের প্রতিবাদে, ১৫ ফেব্রুয়ারি ৫৪তেই বিধানসভায় জ্যোতি বসু এবং হেমন্ত বসু মুলতুবি প্রস্তাবের নোটিশ উত্থাপন করেন। বিধানসভার স্পীকার অধিবেশনের পরবর্তী তিন দিন ঐ বিষয়ে আলোচনা হবে বলে জানান। ১৭ ফেব্রুয়ারি জ্যোতি বসু পুনরায় এই সম্পর্কে মুলতুবী প্রস্তাব তোলেন। এই প্রস্তাবে শান্তিপূর্ণ শিক্ষক আন্দোলনের উপর পুলিশি নির্যাতন ও শিক্ষক নেতাদের গ্রেফ্‌তারের বিরোধিতা করেন তিনি। তার মতে এই কদিন কোলকাতায় যে হাঙ্গামা হয়েছে তা সরকারি পক্ষের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। এই বিষয়ে সভাকক্ষে আলোচনার জন্য জ্যোতি বসু দাবি তোলেন।[২৩০] কংগ্রেসের চিফ্ হুইপ দেবেন দে জ্যোতিবাবুর বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্পীকার শেষ পর্যন্ত ১৯ ফেব্রুয়ারি ৫৪তে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানান। আলোচনা প্রসঙ্গে বিধানসভার কমিউনিস্ট সদস্য বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় শুধুমাত্র শিক্ষকদের উপর নয়—পুলিশ মাননীয় নেতৃবর্গ সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকা চক্রবর্তী, ডা. সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সমর গুহ, নির্মল ঘোষ প্রমুখের উপর পুলিশ প্রশাসনের নির্মম অত্যাচারের কথা সভায় তুলে ধরেন। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় আরো বলেন, ''চারপাঁচ দিন পর্যন্ত তাঁরা যে অবস্থায় ছিলেন হঠাৎ সেই অবস্থার পরিবর্তন করা হল। সেদিন ১৪৪ ধারা জারি করা হল যাতে এর অজুহাত দিয়ে তাঁদের আন্দোলনকে ভেঙে দেওয়া যায়। আমি স্বচক্ষে দেখেছি আঘাত করবার পূর্বে তাঁদের এরেস্ট করা হয়নি। আমি জিজ্ঞাসা করি যারা ১৪৪ ধারা ভাঙল তাঁদের কেন মারা হল?"[২৩১] এই প্রসঙ্গে তিনি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ

পুলিশের উত্তরাধিকার যে স্বদেশি সরকারের পুলিশ বহন করে চলেছে তা বলেন। দাশরথী তা তার স্বভাব সিদ্ধ ভাবে ছড়ার মাধ্যমে সরকারি দমন নীতির বিরুদ্ধে বিধানসভায় ছড়া কাটেন—'(মোদের) জনপ্রিয় মন্ত্রীদল/যেরূপ হয়েছে হাল/কথায় কথায় চালাইছেন গুলি/শুধু গাঁজায় নাহি হবে/আফিং মিশাতে হবে/তবে গাঁজা হতে পারে 'গুলী'।' মুলতুবি প্রস্তাব এর পক্ষে জ্যোতি বসু বলেন '.....সুখের কথা ন্যূনপক্ষে বিরোধী সদস্যরা আজ একতাবদ্ধ। আটদিন ধরে শিক্ষা ব্যবস্থা অচল হয়ে আছে.....ব্যক্তি স্বাধীনতা এখানে ধুলিসাৎ হয়ে গিয়েছে।"[২৩২] জ্যোতিবাবু শিক্ষকদের সুবিধা দেবার নামে যে লোক ঠকানো প্রস্তাব সরকার দিয়েছেন তারও তীব্র নিন্দা করেন। ড. রায়ের সরকার পুলিশকে শিক্ষক ও কলকাতার নাগরিকদের উপর লেলিয়ে দিয়েছেন এই অভিযোগও আনেন তিনি। তিনি কংগ্রেস সরকারকে অপরাধী ও ঘাতক বলে চিহ্নিত করলে স্পীকার শৈল মুখোপাধ্যায় এই শব্দবন্ধকে অসংসদীয় হিসাবে চিহ্নিত করেন। জ্যোতি বসু অবশ্য সে রায় মেনে নিতে অস্বীকৃত হন। জ্যোতিবাবুর পরে শংকর প্রসাদ মিত্র, জে. সি. গুপ্ত প্রভৃতি কংগ্রেস সদস্য এই বিষয়ে আলোচনার সুযোগ পান। একই দলের সদস্য হয়েও জে. সি. গুপ্ত, শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পক্ষেই মত প্রকাশ করেন। বিধানসভার অন্যতম সদস্য তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষকদের সরকার ঝাড়ুদার, আর্দালীর থেকে কম বেতন দিচ্ছেন এই কথা বলে সরকারি নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। হেমন্ত বসু শিক্ষকদের শান্তিপূর্ণ আইন অমান্য কর্মসূচি বানচাল করার লক্ষ্যে তাদের বন্দী করার তীব্র নিন্দা করেন। পুলিশ মন্ত্রী কালি মুখোপাধ্যায় অবশ্য শিক্ষকদের গুণ্ডামির কথা তুলে, আন্দোলনের তীব্র নিন্দা করেন। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মত প্রকাশ করেন যে, শিক্ষক নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনার পথ প্রশস্ত করার জন্য সরকারের চেষ্টা করা উচিত।

জ্বালাময়ী ভাষায় শিক্ষক আন্দোলনের উপর সরকারি সন্ত্রাসের নিন্দা করে বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় বলেন যে, সরকার যদি শিক্ষকদের আন্দোলন সম্পর্কে আরেকটু নমনীয় হত তাহলে এই অচলাবস্থার মধ্যেও মীমাংসার পথ খুলে যেতে পারত। তিনি সরকারকে এই স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে খেলতে বারণ করেন। পুলিশমন্ত্রী কালিপদ মুখার্জী আন্দোলন চলাকালীন রাজনৈতিক দলগুলির নিন্দা করে বক্তব্য রাখলে, তার পালটা বঙ্কিমবাবু বলেন যে ''আমরা রাজনৈতিক দল হিসাবে কর্তব্যচ্যুত হবো যদি দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর যে সমস্ত অভিযোগ সেগুলিকে রূপায়িত না করতে পারি, যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করি।...প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই এটা কাজ..... আমরা বিরোধী পক্ষ, আমাদের বিশেষ করে এটা কর্তব্য।"[২৩৩]

বঙ্কিমবাবুর বক্তব্যের কিছু পরে জবাবি ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধান চন্দ্র রায় বলেন যে দেশের সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব সরকারের, গুণ্ডাবাহিনী তা ধ্বংস করছিল। তাই বাধ্য হয়েই সরকারকে ১৪৪ ধারা জারি করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য পুলিশ নামাতে হয়েছিল। জ্যোতি বসু সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন এই গুণ্ডারা শিক্ষকরা নন, সরকার পোষিত সমাজ বিরোধী। শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্রত্যাশিত ভাবেই ৫৪-১১৮ ভোটে মুলতুবি প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়ে যায়।[২৩৪]

বিধানসভায় শিক্ষক আন্দোলন সম্বন্ধে সদস্যদের কি রকম মনোভাব ছিল, তা নিয়ে তৎকালীন বিশিষ্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেন, তাঁর আত্মজীবনীতে বিস্তারিত লিখেছেন। তার জবানিতে, শিক্ষক আন্দোলনের বিস্তৃতি তাঁদের রাজপথে অবস্থানের পাশে। সেদিনের সংস্কারবদ্ধ সমাজে নারী ও পুরুষ শিক্ষকদের একত্রে আন্দোলনের মাঠের অবস্থানের একটি জীবন্ত চিত্র তিনি উপস্থিত করেছেন। তিনি তার স্মৃতিকথায় বলছেন, 'জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল শিক্ষকদের প্রতি। সকাল থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত জনসমাগমের চেহারায় তা প্রকাশ পেত। কিন্তু সরকারের মনোভাব বোঝা যাচ্ছিল না। এরপর ছাত্ররাও শিক্ষকদের সমর্থনে রাস্তায় নামল।....আইনসভায় একদিন খবর এলো—স্কুলের ছেলেদের পেটানো হয়েছে। খবর শুনে আমাদেরও রক্ত মাথায় উঠল।.....সেদিন আমিও একটা জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে ফেললাম। কিন্তু আশ্চর্য, পুলিস মন্ত্রী অযথাই জোরে জোরে হাসতে লাগলেন। আমাদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল। জ্যোতি বাবু জুতো দেখালেন, আমি জুতো ছুঁড়লাম। তারপর বই খাতা যার হাতে যা ছিল.....ছোঁড়াছুঁড়ি হতে লাগল। অধ্যক্ষ মহাশয় সভা স্থগিত রাখলেন।'[২৩৫] অবশ্য প্রতিশোধ মনোভাবের বশবর্তী হয়ে মণি কুন্তলা সেনকে দু'চার দিন পরেই সরকার গ্রেফ্‌তার করেছিল—সরাসরি শিক্ষকতা বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও, শিক্ষক আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্যই সরকার তাঁর বিরুদ্ধে এমত পদক্ষেপ নিয়েছিল।

অধুনালুপ্ত রাজ্য বিধান পরিষদেও প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের নেতা দেবেন সেন, শিক্ষকদের ন্যায় সংগত দাবি, ১৬/০২-এর গুলি চালনা ও মানুষের উপর গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে একটি মুলতুবি প্রস্তাব আনেন। চেয়ারম্যান সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রয়োজনীয় সমর্থনের অভাব জনিত কারণ দেখিয়ে এই প্রস্তাব তুলতে না দিলে, বিরোধীরা অন্য কৌশল অবলম্বন করে। তারা বাজেট অধিবেশনে প্রদত্ত রাজ্যপালের ভাষণের উপর প্রতিক্রিয়া জানানোর ফাঁকেই শিক্ষক আন্দোলনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেন। ১৮ ফেব্রুয়ারি বিধান পরিষদের অধিবেশনে সরকার সমর্থিত শিক্ষক প্রতিনিধি মহিতোষ রায় চৌধুরী, রাজ্যপালের ভাষণে শিক্ষকদের জন্য যে তথাকথিত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল তার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান। সদস্য ডা. বিজন বিহারী ভট্টাচার্য, শিক্ষকদের দাবির সারবত্তা অস্বীকার না করলেও সরকারের সহানুভূতিশীল মনোভাবের প্রশংসা করেন। সেখ মহম্মদ জান নামক আরেকজন সদস্যও শিক্ষক আন্দোলনে সরকারের ভূমিকাকে সদর্থক বলেই চিহ্নিত করেন। প্রখ্যাত ব্যারিস্টার কংগ্রেস সদস্য শংকর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্রভাবে শিক্ষক আন্দোলনের প্রতি বিদ্বেষ উগরে দেন। শিক্ষকদের রাজপথ আটকে দিনের পর দিন অবস্থান করার নিন্দা করে তিনি বলেন, ''কোলকাতা শহর কি শুধু শিক্ষকদের—সমানভাবে আমারও।''[২৩৬] তিনি শিক্ষক আন্দোলনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপেরও তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। আসলে এই অধিবেশনে বিধানসভার সদস্যরা প্রায় কেউই শিক্ষকদের ন্যায্য দাবিদাওয়ার বিপক্ষে বলতে পারেন নি—জনমতের চাপে। বিধান রায়ের পদক্ষেপের সমর্থক বিধায়করা শুধুমাত্র আন্দোলনের পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন। বিরোধী সদস্যরা রাজ্যপালের ভাষণে শিক্ষক ধর্মঘট সম্বন্ধে কোন কথা না থাকার প্রতিবাদ করেন বিধান পরিষদে। তাঁদের মতে এই আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের জনতার এক বৃহদংশ

অংশগ্রহণ করেছেন বলে নয়, এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের মধ্যবিত্ত সমাজের পুঞ্জীভূত দৃঢ়বদ্ধ ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে। সাধারণ শ্রমিক ধর্মঘটের সঙ্গে এই কর্মবিরতিকে এক সারিতে বসানো উচিত নয় বলেও তাঁরা মত প্রকাশ করেন।

১৯ ফেব্রুয়ারি বিধানসভার বরিষ্ঠ সদস্য ডা. চারুচন্দ্র সান্যাল সরকারি দমননীতির তীব্র নিন্দা করে, বলেন যে এই সরকারি অত্যাচারের ফলেই নিরীহ, শান্ত এবং নির্বিরোধী শিক্ষকেরা আজ নিজ অধিকার বুঝে নেবার লড়াই এ রক্ত দিতেও পিছু পা নন। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য আবদুল হালিম পুলিশি তাণ্ডবের ঘোরতর প্রতিবাদ করে বলেন—যে এর জন্য জনগণ কিছুতেই কংগ্রেস সরকারকে ক্ষমা করবে না। এটা এক ধরনের সরকারি সন্ত্রাস বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। ডা. মনীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী এই তীব্র শিক্ষক আন্দোলনকে ভুইফোঁড় আন্দোলন নয় বলে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন এর আগেই তাঁরা বারে বারে শান্ত ভাবে সরকারের কাছে নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছিল। সরকারি দম্ভের ফলেই এ সম্বন্ধে কোনো সুরাহা হয়নি। মনীন্দ্র বাবুর জ্বালাময়ী ভাষণে বিরক্ত ডা. রায় তাঁর উদ্দেশে বিরক্ত হয়ে বলেন, 'আপনার ভূমিকা রিসার্চ করা। সেইটে করুন গে'—প্রত্যুত্তরে ড. চক্রবর্তীও বলে ওঠেন, 'আপনার কাজও ডাক্তারী করা। সেই কাজটা করলেই তো পারেন।' কংগ্রেস সদস্য রবীন্দ্র লাল সিং সরকারি পদক্ষেপের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে বলেছিলেন, ''ধর্মঘট করে, আমি বলব, ভারতবর্ষের শিক্ষকদের পবিত্র আদর্শের উপর কলঙ্ক কালিমা লেপন করা হয়েছে।''[২৩৭] জবাবি ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় বলেন যে রাজ্যের মাত্র ৩৩% শিক্ষক নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সদস্য তাই তাদের দাবি দাওয়ার প্রতি সমধিক গুরুত্ব দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। এছাড়া তিনি এই আন্দোলনের ধ্বংসাত্মক চরিত্রের কঠোর সমালোচনা করেন।[২৩৮]

আইনসভা বহির্ভূত আন্দোলনকে কীভাবে আইনসভার অভ্যন্তরে তুলে ধরা যায়—সে বিষয়টি আমরা শিক্ষক আন্দোলনের উপান্তে এসে, বাংলার সংসদীয় রাজনীতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ সত্যব্রত দত্তের ভাষায় বলতে পারি, শুধুমাত্র শিক্ষক আন্দোলনের ক্ষেত্রেই নয়, ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন, বঙ্গবিহার সংযুক্তকরণ বিরোধী আন্দোলনেও সরকারে আসীন কংগ্রেসকে পরাহত করার প্রয়োজনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বিধানসভায় অলিখিত ভাবে হলেও, একটি শক্তিশালী মোর্টা গড়ে ওঠে। তবে বিধানসভায় উত্তাল সক্রিয়তার পাশাপাশি দুই পক্ষই সভার নিয়ম বিধি ও বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে সচেষ্ট ছিলেন। সরকারি নীতি ও কর্মসূচি বিষয়ে বিরোধী সদস্যরা সমালোচনায় মুখর হলেও, সেই সমালোচনা ছিল গঠনমূলক।[২৩৯]

আদালত ও সংবাদপত্রের চোখে শিক্ষক আন্দোলন

শুধুমাত্র রাজপথে কিংবা আইনসভার সীমায় বাধা না থেকে শিক্ষক আন্দোলনের সংগ্রামী চেতনা আদালতের আঙ্গিনায়ও ছড়িয়ে পড়ে। অবস্থান কালে ধৃত শিক্ষক নেতাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সরকারের পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৮৩ নম্বর ধারা এবং কোলকাতা পুলিশের ৬২'এ'

ধারায় অভিযোগ আনয়ন করে। ৫৪-এর ১৬ ফেব্রুয়ারি মোট চুয়াল্লিশ জন ধৃত শিক্ষককে আদালতের সমীপে উপস্থিত করা হয়। 'আসামী' পক্ষের আইনজীবী ওই সব ধারার বিরোধিতা করেন ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগকে অস্বীকার করেন। শিক্ষকেরা এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত জামিনের জন্য আবেদন করতে অস্বীকার করেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অনিলা দেবী সহ তেতাল্লিশ জন মহিলা নেত্রীর শুনানি শুরু হয়। অভিযুক্ত মহিলাদের পক্ষে এডভোকেট অশোককুমার মুখোপাধ্যায়, ভূপেন মুখোপাধ্যায়, বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনাথ সেন প্রভৃতি আইনজীবীরা সওয়াল করেন। তারা শিক্ষকদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কথা উল্লেখ করে বলেন সরকারই পুলিশ বেষ্টনী তৈরি করে, জনমানুষের গতায়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। মহিলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ভুয়া অভিযোগ আনা হয়েছে। তা সর্বতোভাবে মিথ্যা। এই দাবি করে আইনজীবীরা বলেন যে কোনো ভাবেই এই নেত্রীরা কোনো অপরাধমূলক কাজ করেন নি। ৫৪-এর ২০ ফেব্রুয়ারি পূর্বোক্ত আদালতেই সত্যপ্রিয় রায় সহ ৬৩ জন শিক্ষককে ২৮৩ ধারা মতে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হয়। পুলিশের অভিযোগ অস্বীকার করে তাঁরাও বলেন যে ট্রাম বাস পোড়ান সহ কোনো আইনবিরুদ্ধ কর্মের সঙ্গে তারা যুক্ত ছিলেন না। আপাতত যথাক্রমে ২৪ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রায়দান স্থগিত হবার কথা বলে, বিচারকরা তখনকার মতো বিচার মুলতুবি রাখেন।[২৪০]

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে আন্দোলন শুরু হবার অব্যবহিত পূর্বেই মাধ্যমিক শিক্ষার হাল, হকিকৎ জ্ঞাপনকারী মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। এবং সেই রিপোর্টে শিক্ষাকাঠামোর বিভিন্ন দুর্বলতার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক ভাবে শিক্ষকদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরা হয়েছিল।[২৪১] ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি টাইমস্ অব ইন্ডিয়া মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টও পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক আন্দোলনের সম্পর্কে এক সম্পাদকীয়তে লেখে—'কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ শিক্ষকদের উন্নত বেতন দেবার বিষয়টি যে সপ্তাহে সোচ্চার করেছে, সেই সপ্তাহেই রাজ্য সরকারের কাছে বেতন ভাতার দাবি এক বছর ধরে জানিয়ে ব্যর্থ হয়ে অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষকদের নিদারুণ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। বেসরকারি বিদ্যালয়ের এই শোষিত শিক্ষকদের প্রতি শাস্তিদান নিতান্ত অযৌক্তিক।'[২৪২] শিক্ষক আন্দোলনের প্রতি সরকারি মনোভাবের তীব্র নিন্দা করে যুগান্তর পত্রিকা। এই সংবাদপত্রের মালিক তুষারকান্তি ঘোষ কংগ্রেসি মনোভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও, পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, 'এমন কোনো বিবেকমান লোক নাই যিনি এই হতভাগ্য লোকদের জন্য গভীর মর্মবেদনা অনুভব না করিবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন শিক্ষকদের প্রতি সহানুভূতির দাবি করিয়া থাকেন এবং তাহাদের বেতন ও ভাতার প্রশ্ন মীমাংসা করিতেই প্রস্তুত, তখন অকস্মাৎ গভীর রাত্রে সত্যাগ্রহী শিক্ষকদিগকে গ্রেফ্তারের কি দরকার ছিল। .....আমাদের বিশ্বাস যদি ধর্মঘটী শিক্ষকদের গ্রেফ্তার না করিয়া মুখ্যমন্ত্রী তাঁহার নতুনতম প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য পেশ করিতেন, তবে সমস্ত অবস্থার পরিণতি এত শোচনীয় হইত না।"[২৪৩] লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত কংগ্রেসি মনোভাবাপন্ন 'ন্যাশনাল হেরাল্ড-এর সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল, যে এই ধর্মঘট হঠাৎ করে শুরু হয়নি। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ও পশ্চিমবঙ্গ

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বেতন সম্পর্কে যে সুপারিশ করেছিল তার ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী ডা. রায় পাঁচদিন আগেই তার নতুন প্রস্তাব পেশ করলে, মঙ্গলবার (১৪/০২) যে কুৎসিৎ ঘটনা ঘটেছিল, তা নিবারণ করা যেত।[২৪৪]

আন্দোলনের চূড়ান্ত মুহূর্ত থেকেই কংগ্রেসের একদল প্রগতিবাদী নেতা, শিক্ষকদের সঙ্গে সরকারের একটি সমঝোতা করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এই প্রসঙ্গে ওই দলের চিফ হুইপ দেবেন সেন এবং মীরা দত্তগুপ্তের সৎ চেষ্টার কথা উল্লেখ করতেই হয়। বিধান রায় ও এই সময় শিক্ষক আন্দোলনের তীব্রতার সম্মুখে কিছুটা নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যাইহোক পূর্বোক্ত নেতারা শিক্ষক সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও সমিতি নেতা তারাকুমার মিশ্র সমভিব্যাহারে প্রেসিডেন্সী জেলে গিয়ে সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী ও শৈলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করেন। দিনটি ছিল ১৭ ফেব্রুয়ারি ৫৪। ১৮ ফেব্রুয়ারি যুগান্তর পত্রিকায় লেখা হল, ''শিক্ষক সমাজ পূর্বাপর তাহাদের ন্যায্য দাবি কার্যকরী করিবার জন্য শান্তি ও শৃঙ্খলাকারেই আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছে। এই দাবি সময় থাকিতে মানিয়া লওয়া, অবস্থা স্বাভাবিক করিয়া তোলাই হইত সুবুদ্ধির কাজ। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে চেষ্টা হয় নাই। উপরন্তু উত্তেজনা প্রশ্রয় পাইতে পারে এমন সমস্ত ঘটনাই অবিবেচনা বশেই পরপর ঘটানো হইয়াছে। এখনো শান্তি ও শৃঙ্খলার সমস্যার সমাধান হইলে শুধু আজিকার পক্ষেই তাহা শুভ হইবে না। (এই) অভিজ্ঞতা লাভজনক হইবে।'[২৪৫] সেই সময় যুগান্তর ছিল পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক বিক্রিত পত্রিকা—সম্পাদক ছিলেন শিক্ষকদের অতি সুহৃদ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। তাই কংগ্রেসি শিশির ঘোষ, তুষারকান্তি ঘোষদের মালিকাধীন হলেও এই পত্রিকা শিক্ষকদের পক্ষে দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করতে পিছুপা হয়নি।

শুধুমাত্র সাধারণ জনতার বিভিন্ন গণসংগঠন নয়। দেশের শক্তিশালী বণিক সংগঠন ভারত চেম্বার অব কমার্স ও শিক্ষকদের দাবির যৌক্তিকতার পক্ষে মত প্রকাশ করে। তারা এক বিবৃতিতে জানায়, 'শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের। এঁরা অবশ্যই উচ্চ বেতন পাবার অধিকারী। এজন্য তাঁরা নিশ্চয়ই দাবি দাওয়া করতে পারেন।"[২৪৬] তবে এর পাশাপাশি তাঁরা আন্দোলনের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংশ্রবের বিরোধিতাও করেছিলেন। যা তাদের শ্রেণি চেতনার সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করেছিল। এদিকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তৎকালীন সভাপতি অপূর্বকুমার চন্দ, আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষক ও সরকারের মধ্যে সমঝোতার পক্ষে সওয়াল করে চলেছিলেন। তিনি কোলকাতা ও আশপাশের বিভিন্ন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে তাঁর আলোচনার ভিত্তিতে পুলিশি অত্যাচারকে অনভিপ্রেত বলে ঘোষণা করেন এবং শিক্ষক নেতাদের অবিলম্বে কারামুক্তির পক্ষে রায় দেন। অবশ্য এর পাশাপাশি অপূর্ববাবু নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে আন্দোলন প্রত্যাহার করে, আলোচনার টেবিলে বসবার জন্যও আহ্বান জানিয়েছিলেন।[২৪৭]

দেশের বিভিন্ন স্থানের তৎকালীন ছোট ছোট শিক্ষক সংগঠনগুলিও ৫৪-এর সংগ্রামকে সমর্থন করে বিবৃতি পেশ করেছিল। এর মধ্যে দিল্লী টিচার্স ডেমোক্রেটিক পার্টি, আহমেদনগর

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি, মধ্যপ্রদেশ মাধ্যমিক শিক্ষক ফেডারেশন, অল আসাম এইডেড সেকেণ্ডারী টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন, রাজস্থান টিচার্স ফেডারেশন, পাঞ্জাব সাবঅর্ডিনেট এডুকেশন্যাল সার্ভিসেস ইউনিয়ন, দ্য অল ত্রিবাংকুর প্রাইভেট সেকেণ্ডারী স্কুল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধ্যপ্রদেশে তখন সেই প্রদেশের শিক্ষকদের একটি সম্মেলন চলছিল। সেখান থেকে কোলকাতায় বার্তা দেওয়া হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার খুব অন্যায় ও অযৌক্তিক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে এ.বি.টি.এ.-র সঙ্গত দাবিগুলিকে উপেক্ষা করে চলেছেন। প্রকৃতপক্ষে ৫৪-এর সংগ্রামে, শিক্ষক সমিতির মরণপণ লড়াই এর পরেই, সমিতি সর্বভারতীয় শিক্ষক আন্দোলনের স্বাভাবিক নেতায় পরিণত হয়েছিল। অবশ্য শুধুমাত্র সংগঠন নয়—সংগঠনের নেতা সত্যপ্রিয় রায়ের অসাধারণ সংগ্রাম মুখী 'ক্যারিস্মা' এই নেতৃত্ব লাভের ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সংগ্রাম—সমঝোতা—সংগ্রাম

এদিকে শিক্ষকদের সংগ্রাম মূলতঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে হলেও ভারত সরকারের শিক্ষক বিরোধী মনোভাবও, 'কান টানলে মাথা আসের' মতো প্রতিভাত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতিও সেই সময় শিক্ষক বান্ধব ছিল না। মুদালিয়র কমিশনের (১৯৫৪) ছত্রে ছত্রে সেই সময়কার সরকারের শিক্ষানীতির ব্যর্থতা প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। রাজ্যসভা ও লোকসভায় কেন্দ্রীয় কংগ্রেস দলের প্রকাশিত মনোভাবেও শিক্ষক সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। সবদিক থেকেই পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে, কেন্দ্রীয় সরকার তৎকালীন রাজ্য সরকারকে শিক্ষকদের সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসতে অনুরোধ করে। শিক্ষক সংগঠনও আন্দোলন খুব বেশিদিন চললে, শিক্ষকদের মনোবলে চিড় ধরবে, এটা অনুধাবন করে সরকারের সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসবার জন্য ব্যাগ্র হয়ে ওঠে। সংগ্রাম-সমঝোতা-সংগ্রাম'—এই নীতিতেই তারা বিশ্বাস করতেন। এই রকম পরিস্থিতিতে কমিটির সদস্যরা কীভাবে সভায় যোগ দেবেন তা নিয়ে (শীর্ষ নেতারা অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও) ১৯ এবং ২১ ফেব্রুয়ারি সমিতির মুষ্টিমেয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা দুই দফা আলোচনা করেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি বোঝাপড়া করবার জন্য সমিতি জেলবন্দী শিক্ষক নেতাদের মুক্তি দাবি করে সরকারের কাছে। সভাপতি মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এই জন্য ব্যক্তিগত ভাবে মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধান রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতের সময় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ও সহসভাপতি যথাক্রমে অপূর্ব চন্দ্র ও ত্রিগুণা সেন উপস্থিত ছিলেন। বিধান রায় কিন্তু তখনো শিক্ষক নেতাদের মুক্তিদানের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বিকল্প প্রস্তাবে বললেন অন্যত্র না করে জেলের মধ্যেই শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক হোক। এর ফলে কার্যনির্বাহী কমিটির জেলবন্দী সদস্যরা অর্থাৎ সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী, শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিপদ কুণ্ডু ও সাগরিকা ঘোষ সহজেই সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারবেন। দীর্ঘ আলোচনার শেষে, শেষ পর্যন্ত সমিতি সরকারের এই প্রস্তাব গ্রহণ করে। একদিক দিয়ে এই ঘটনা শিক্ষক সমিতির জয় বলেই মনে করা হয়। জেলবন্দী ও কারাগারের বাইরে থাকা

নেতাদের যুক্ত মিটিং এর অনুমতি দিয়ে বিধান রায় সরকার নমনীয়তার পরিচয়ই দিয়েছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[২৪৮]

যাইহোক প্রেসিডেন্সী জেলের অভ্যন্তরে এই মিটিং-এ প্রায় ষাট জন কর্মসমিতির সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এই মিটিং-এ কতকগুলি প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছিল। এই প্রস্তাবগুলি ছিল (১) আন্দোলনে ধৃত সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। (২) শিক্ষকদের সম্পর্কে কোনোরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া চলবে না। (৩) সরকার পক্ষ থেকে আন্দোলনকারীদের প্রতি কোনোরকম শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা চলবে না। (৪) সরকার ও নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির মধ্যে শিক্ষকদের দাবির ব্যাপারে আলাপ আলোচনার দরজা খোলা রাখতে হবে। সরকার পক্ষের চিফ হুইপ দেবেন দেকে সঙ্গে করে এই প্রস্তাব নিয়ে সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, ড. বিধানচন্দ্র রায় সমীপে উপস্থিত হন। ডা. রায় তাকে আশ্বস্ত করেন যে, কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নিলে, হিংসামূলক কর্মে অভিযুক্তদের ছাড়া বাকী কারাবন্দী শিক্ষকদের মুক্তি দেওয়া হবে ও কর্মবিরতির জন্য কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে না। ম্যানেজিং কমিটিগুলিও যাতে শিক্ষকদের কোনোরূপ শাস্তি না দেয় সে জন্য সরকার সচেষ্ট থাকবে।

বিধান রায়ের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে সমিতির সাধারণ সদস্যদের মনোভাব জানার জন্য সেই দিনই ভারত সভা হলে শিক্ষকদের এক সাধারণ সভা আগে থাকতেই আহূত হয়েছিল। সরকারি এই মীমাংসা সম্বন্ধে সমিতির অনেক সদস্যই সন্দিহান ছিলেন। হীরেন্দ্রনাথ রায় সহ অনেক সদস্যই মনে করেছিলেন, আন্দোলন আরো কিছুদিন দীর্ঘায়ত করলে, শিক্ষকদের সব দাবি সরকার মেনে নিতে বাধ্য হবে। আসলে আপোসের কথা বললেও সেদিন পর্যন্ত সরকারি দমননীতি কিন্তু বন্ধ হয়নি। সভা চলাকালীনই খবর আসে আন্দোলনকে সমর্থন করার অপরাধে ওই দিনও আর এস পি এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের কিছু কর্মীকে সরকার গ্রেফ্‌তার করেছে। তাছাড়া শিক্ষক আন্দোলনের সহায়ক, 'শিক্ষক সংগ্রাম কমিটি' ও 'শিক্ষক সংকট প্রতিবোধ' কমিটির এক যুগ্ম সভা থেকে ওই দিনই সরকার প্রায় ১৮ জনকে কারাবন্দী করার ফলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়েছিল। আসলে সরকার তখন এক পরস্পর বিরোধী মনোভাবের দ্বারা চলনশীল ছিল। একদিকে জনমতের চাপে সরকার শিক্ষকদের সঙ্গে একটি সমঝোতায় উপনীত হতে চাইছিলেন। অন্যদিকে বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার 'হাভাতে' শিক্ষকদের কাছে নৈতিক পরাজয়কে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। এই দ্বৈধতা স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষকদের এক বৃহদংশকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। যাইহোক শেষ পর্যন্ত ভারত সভা হলের সাধারণ সভায় একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। শিক্ষক নেতা সুরেশচন্দ্র মৈত্র, অন্নদা ভট্টাচার্য, বীনা দাশগুপ্ত, অজিত দাস প্রমুখ এক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছিলেন।

যাইহোক সমাবেশের শেষে ওই দিন রাতেই (২১/০২) সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মবিরতি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এছাড়া নিজেদের বেতন বৃদ্ধির জন্য কোনো ভাবেই ছাত্রদের মাস মাইনে বাড়াবার ছাত্রস্বার্থ বিরোধী সরকারি ইচ্ছাকে সমিতি কোনো ভাবেই মেনে নেবে না বলেও ওই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করেন।[২৪৯]

ড. রায়ের হিসাব মতো, স্কুলের পরিচালন কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের মাথাপিছু সাড়ে সতেরো টাকা মহার্ঘভাতা দিলে ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। সরকারি হিসাব মতো এই বেতন বৃদ্ধি মাথাপিছু দুই/তিন আনার বেশি হবে না এটা বলা হলেও, সমিতির মতে তা কমপক্ষে পাঁচ আনা হবে। এই অবস্থায় ছাত্র স্বার্থেই সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ছাত্র বেতন বৃদ্ধির তুমুল বিরোধিতা করে পুনরায় শিক্ষকদের প্রাপ্য মহার্ঘভাতার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে, এই মত প্রকাশ করেন। যাইহোক সরকার ও শিক্ষক সমিতির মধ্যে সমঝোতা হয় শেষ পর্যন্ত। সংবাদ সংস্থা পি. টি. আই. খবর করে—'পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির মধ্যে সম্পাদিত এক চুক্তি অনুসারে গত ১০ ফেব্রুয়ারি (১৯৫৪) হইতে যে কর্মবিরতি আন্দোলন করা হইয়াছিল তাহা ২২ ফেব্রুয়ারি হইতে প্রত্যাহার করা হইয়াছে।"[২৫০] সংবাদ সংস্থাটি আরো জানায়, সরকার ধৃত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করতে রাজি হয়েছেন। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতিও আন্দোলনের অংশ ভাগী সকলকে এই প্রসঙ্গে সাধুবাদ জানায়। এছাড়া তাদের বকেয়া দাবিদাওয়া সমূহ আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়েই সুরাহা করা যাবে বলে সমিতি আশা প্রকাশ করে। মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ও সামগ্রিক সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ''আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি.....পুনরায় কর্তব্যভার গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করায় ব্যক্তিগতভাবে আমি শিক্ষকদের পুনরায় ধন্যবাদ জানাইতেছি।"[২৫১] এর পাশাপাশি অবশ্য শিক্ষকদের বিশৃঙ্খলা আন্দোলনকে কিছুটা বক্রভাবে সমালোচনা করতেও ছাড়েননি তিনি। সেদিনেই মুখ্যসচিব এস. এন. রায়ের সরকারি আদেশ অনুসারে সরকারি নির্দেশনামা তৈরি হয় এবং এই আদেশনামা অনুযায়ী ১৪৪ ধারা অমান্য করার জন্য ধৃত ৩২১ জন শিক্ষক এবং নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী গ্রেফ্তার হওয়া শিক্ষক সহ স্বেচ্ছাসেবকদের মামলা তুলে নেওয়া হয়। এর ফলে আংশিকভাবে হলেও শিক্ষকদের জয় সূচিত হয়। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২২ ফেব্রুয়ারি ৫৪তে জেল থেকে প্রথম মুক্তি পান সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী প্রমুখ শিক্ষক নেতারা। তারপরে ক্রমশঃ দফায় দফায় অন্যান্যরা মুক্তি পান। বিধানসভায় বিরোধী নেতারাও সরকারি এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। ওই দিনই সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির মুলতুবী সভা মহাবোধী সোস্যাইটি হলে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মুক্তিপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সম্বর্ধনা জানানোর পাশাপাশি শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, তাঁদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করার জন্য 'শহীদ তহবিল' গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যে সমস্ত ব্যক্তি সরকারি লাল ফিতের ফাঁসে আবদ্ধ হয়ে তখনো মুক্তিপ্রাপ্ত হননি তাদের দ্রুত মুক্তিদানের জন্য সরকারের কাছে অনুরোধও করে সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটি। ২৩ ফেব্রুয়ারি 'ধর্মঘট' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা প্রকাশ হয়, ''দেশের সমস্ত সংবাদপত্র এক বাক্যে শিক্ষক সমাজকে সমর্থন করিয়াছেন। জনসাধারণ শিক্ষকদের প্রতি তাঁহাদের অকুণ্ঠ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির বর্তমান সিদ্ধান্ত উহার উদ্যোক্তাগণ যথেষ্ট দৃঢ়তা ও কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে শিক্ষক সমাজ ও শিক্ষক সমিতির মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হইয়াছে।"[২৫২] যদিও আমরা অমলেন্দু দের লেখা থেকে জানি যে শিক্ষক আন্দোলনের পরিসমাপ্তিতে ডা. রায় কয়েকটি দাবি মেনে নেন এবং এই আন্দোলনে ধৃত সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দেন। তবু সমঝোতার শর্ত অনুযায়ী

আর্থিকভাবে শিক্ষকেরা খুব একটা লাভবান হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। শুধুমাত্র আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়ার সিদ্ধান্তেই শিক্ষক সমিতিকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।[২৫৩]

তবে এই আন্দোলনের ফলে শিক্ষকদের কিছুই আর্থিক লাভ হয়নি এটা বলাও অনৃতভাষণ হবে। এ প্রসঙ্গে ১৯৫৪-এর আন্দোলনের বেতন কাঠামোর সঙ্গে আন্দোলনের পরবর্তীকালে পরিবর্তিত বেতন কাঠামোর তুলনামূলক একটি সারণি দেওয়া যেতেই পারে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পদ	১৯৫৪ খ্রিঃ পূর্ববর্তী বেতনক্রম	পরিবর্তিত বেতনক্রম ০১-০৪-৫৪ থেকে বলবৎ অপরিবর্তিত
প্রধান শিক্ষক	২০০-২০/২-৪০০/-	শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন + বিশেষ ভাতা
সহকারী প্রধান শিক্ষক	শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন + অতিরিক্ত ভাতা	১২৫-৫/২-১২০-১০/২-১৫০/১২৫-৫/২-১৩০-১০/
সহকারী শিক্ষক—		
(ক) স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী (অনার্সসহ), বি.টি./ বি.এড অথবা স্পেশাল অনার্স	৯০-৫/২-১২০-১০/২-১৫০	২-১৫০/১০৫-৫/২-১৩০-১০/২-১৫০ ১০০-৫/২-১২০-১০/২-১৫০
(খ) স্নাতক ডিগ্রি (বিটি অথবা বি-এড সহ)	৭৫-৫/২-১২০-১০/২-১৫০	অপরিবর্তিত
(গ) ইন্টারমিডিয়েট ডিগ্রি অথবা দশ বছরের অভিজ্ঞতা	৬০-৫/২-১০০	

* [উৎস ঃ বাংলার হেড মাস্টার্স ম্যানুয়েল, স্কুল পরিচালনা সংক্রান্ত সহায়ক গ্রন্থ, অনুবাদ ও সম্পাদকীয় ঃ ড. ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য, কোল। ১৯৯৭ (পৃঃ ৫৩০-৫৫১)[২৫৪]

উপরোক্ত তথ্য থেকে একথা বলা যেতেই পারে যে ১৯৫৪ এর বিদ্যালয় শিক্ষকদের আন্দোলনের অভিঘাতে সরকার কিছুটা হলেও বেতন ক্রমে স্বল্প পরিবর্তন আনয়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে সমস্ত স্তরের শিক্ষকদের চাহিদার প্রতি সরকার নজর দেয়নি এ অভিযোগ করা যেতেই পারে।

শিক্ষকদের আন্দোলন ও বিশৃংখলতা

এবার আমরা একটু অন্য বিষয়ে আসব। ৫৪-এর আন্দোলনের তুঙ্গ মুহূর্তে সারা শহরব্যাপী যে তাণ্ডবের সৃষ্টি হয়েছিল তার দায়িত্ব নিতে একদিকে যেমন শিক্ষকেরা অস্বীকার করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনই সরকার এই ভাঙচুর তাণ্ডবের দায় যে নৈতিকভাবে শিক্ষকদের উপরই বর্তায় তা বারংবার দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন। যে বা যারাই এই বিশৃংখলা সৃষ্টি করে থাকুক না কেন শিক্ষকেরা এর দায়িত্ব অবশ্যই পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে পারেন না। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রণক্ষেত্রে রাজপথ' শীর্ষক গ্রন্থে আমরা দেখি শিক্ষক আন্দোলনে জনসাধারণের বৃহদংশ শিক্ষক আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। ১৯৫৪-এর ১৭ ফেব্রুয়ারি শিক্ষক ও জনগণের বিভিন্ন অংশ যে বিশাল মিছিল সংগঠিত করেছিলেন, তাতে পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারের কথা

স্বীকার করেও মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ যে আগে থেকেই 'অস্ত্র' নিয়ে পুলিশের আক্রমণ প্রতিহত করতে তৈরি হয়েই এসেছিল সে সম্বন্ধে তিনি কিছু আলোকপাত করেছেন। তাঁর ভাষায়, '....পুলিশের দিকে ঢিল পাথর ছোঁড়া শুরু হল। লাঠি চালিয়েও অবস্থা সামাল দিতে না পেরে পুলিশ যখন ঘোড়সওয়ার বাহিনী নিয়ে এসেছে, তখন তাদের লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয় আলুতে ব্লেড গেঁথে এক বিশেষ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র।.....বিক্ষোভের সময় ঘোড়ার পা লক্ষ্য করে ওই জিনিসটা ছোঁড়া হতো, যাতে ঘোড়া পড়ে যায়।'[২৫৫] অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যায়, পুরোপুরি নিরস্ত্র মিছিল সেদিন রাস্তায় নামেনি। তাই বলে কোন ভাবেই পুলিশ প্রশাসনের 'পৈশাচিক তাণ্ডব'কে এর মাধ্যমে লঘু করা যায় না। আর 'স্বভাবশান্ত' শিক্ষকেরা কখনোই সরাসরি এই তথাকথিত গুণ্ডামির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিল না—এটা বলা যেতেই পারে। আসলে সমসাময়িক সময়ে আন্দোলনের যে স্রোতধারা বহমান হয়েছিল তা, ট্রাম শ্রমিকদের আন্দোলন বা উদ্বাস্তু আন্দোলন বা খাদ্যের জন্য আন্দোলন, যাই হোক না কেন, তার একটি সাধারণ সামান্য লক্ষণ বা প্যাটার্ন আমরা খুটিয়ে খুঁজলেই দেখতে পাই। মাধ্যমিক শিক্ষকদের আন্দোলনও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এইসব আন্দোলনের নেতৃত্ব বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত গণসংগঠনের হাতে থাকলেও, আন্দোলনের পুরোভাগে সব সময়ই ছিল মধ্যবিত্ত ছাত্র যুবরা। কিন্তু আন্দোলন যখনই সংঘর্ষমুখী হয়ে পড়ছে, তখনই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আর এক ধরনের যুব সমাজ এই আন্দোলনে মিশে যাচ্ছে। তারা হল তথাকথিক রাস্তা বা বস্তির ছেলে যাঁদের আমরা সচরাচর লুম্পেন বলে আখ্যা দিই। কীভাবে বাসট্রাম সুচারুরূপে অগ্নিদগ্ধ করা যায়, ব্যারিকেড কীভাবে তেলের ড্রাম বা জঞ্জালের টিন দিয়ে সহজ দাহ্য করে তোলা যায়, রাস্তার ইঁটকে কীভাবে ক্ষেপণাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে হয় সেগুলিতে তারা স্বাভাবিক ভাবেই দক্ষ ছিল। আসলে সারা জীবন তাদের ক্ষোধ, জ্বালা, ঘৃণা, সব বঞ্চনার জ্বালা মিটাতো এই সব কার্যকলাপের দ্বারা। তবে অবিশ্বাস্য হলেও এটা সত্যি যে এই অপরিণামদর্শী ক্ষোধান্ধ যুবকদের সম্ভাব্য কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত হলেও আন্দোলনের নেতৃত্ব কখনোই এদের দূরে ঠেলে দেননি। বরঞ্চ মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদের জায়গা থেকে তাদের ব্যবহার করেছেন।[২৫৬] চাঁদেরও কলঙ্ক থাকে তাই এই তথাকথিত 'লুম্পেন'দের এই বিচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ড ৫৪-এর মাধ্যমিক শিক্ষকদের গৌরব উজ্জ্বল সংগ্রামকে কখনোই কালিমালিপ্ত করতে পারে না—এটা বলতেই হয়।

বিশ্বের শিক্ষক সংগঠনগুলির প্রতিক্রিয়া

সংগ্রাম, সমঝোতা, সংগ্রাম, এই নীতি নিয়েই শিক্ষক আন্দোলন চলছিল এবং ক্রমশঃ তাঁদের সমিতি পশ্চিমবঙ্গের এক বৃহৎ 'প্রেসার গ্রুপে' পরিণত হয়েছিল এবং ১৯৫৪-এর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শোষিত শ্রেণিগুলির সহায়তা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। এতদিনকার গুরু মহাশয়ের টিপিক্যাল ভাবমূর্তিকে এই আন্দোলন অস্পষ্ট করে, শ্রমিক-কৃষক, মেহনতি মানুষের শ্রেণি মিত্রতে পরিণত হয়েছিলেন তারা। এটা ঠিকই ৫৪-এর আন্দোলনের

ফলে শিক্ষকবৃন্দের সব দাবিদাওয়ার পরিপূর্তি হয়নি। কিন্তু শাসকশ্রেণির কাছে তার 'ভদ্র মোরা শান্ত বড়' মাস্টারমশাই-এর, প্রতিমূর্তি ভেঙে রাস্তাই একমাত্র রাস্তাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে, তারা শ্রমজীবী মানুষের কাতারে শামিল হয়েছিলেন। আন্দোলনের পর্যালোচনা করতে গিয়ে অন্যান্য দেশের শিক্ষকদের সংগ্রাম ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে তারা সচেষ্ট হয়েছিলেন এই পর্বে। ৫৪-এর আন্দোলন চলাকালীন কিংবা তার অব্যবহিত পূর্বে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষক সংগঠন এই সংগ্রামের প্রতি ভ্রাতৃত্বমূলক সহানুভূতি মিশ্রিত বাণী প্রেরণ করেছিলেন। বাংলার শিক্ষক সমাজের কাছে সেগুলি প্রেরণা স্বরূপ হয়ে আছে। ব্রিটেনের 'Moathly Labour' পত্রিকার সম্পাদক বিখ্যাত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক রজনী পাম দত্ত শিক্ষক সমিতিকে প্রেরিত এক পত্রে লেখেন ''আমরা বৃহত্তম উৎসাহ ও লক্ষ্য দিয়ে এই চিত্তাকর্ষক সংগ্রামের দিকে তাকিয়ে আছি।'[২৫৭] বুদাপেস্ট থেকে হাঙ্গেরিয়ান টিচার্স ইউনিয়ন এক তারবার্তায় বলে, হাঙ্গেরির শিক্ষকেরা নিম্ন বেতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক ধর্মঘটকে ভ্রাতৃত্বের উষ্ণ শুভেচ্ছায় ভূষিত করছে। দুঃখ ও ধ্বংসের মধ্য দিয়ে যারা অধিকতর মুনাফা লাভ করতে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে বিষময় করে তুলছে তাদের বিরুদ্ধে শান্তির জন্য এটা হচ্ছে বিশাল প্রতিরোধ। আমাদের সৌভ্রাতৃত্ব ও সমর্থন গ্রহণ করুন। আমরা বরাবর অক্ষত সাংস্কৃতিক ও শিক্ষকদের সুখী জীবনের পক্ষে আমাদের কণ্ঠস্বরকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরব।"[২৫৮] জাকার্তা থেকে ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষক সমিতি তারবার্তা প্রেরণ করে, 'আপনাদের দাবির প্রতি সহমত পোষণ করছি। যারা বলিগ্রস্ত তাদের পরিবারের প্রতি শোক জ্ঞাপন করছি। সংগ্রাম জয়যুক্ত হবে।"[২৫৯] পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক সংগ্রামের উপর সরকারি বিষ দৃষ্টিকে নিন্দা করে বিশ্বের শিক্ষকদের যৌথ মঞ্চ ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব টিচার্স ইউনিয়ন জানায়, ''বন্দী সহকর্মীদের পাশে থাকলাম এবং জীবনযাত্রার মান বাড়াতে বাংলার শিক্ষকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পূর্ণ সাফল্য কামনা করছি।"[২৬০]

নানা দেশে শিক্ষা ও শিক্ষক ঃ বাংলায় প্রভাব

শুধু ভারতে বা বিশেষ করে বাংলায় নয়—সারা পৃথিবী জুড়েই যে ন্যূনতম আর্থ-সামাজিক অধিকার রক্ষার দাবিতে শিক্ষক সমাজ লড়াই চালাচ্ছেন সে সম্বন্ধে ৫৪-এর আন্দোলনের পরেই সচেতন হতে শুরু করেন বাংলার শিক্ষকেরা। সেইসব দেশেও সমাজের অন্যান্য খেটে খাওয়া মানুষদের সহযোগী হিসাবে শিক্ষক সংগ্রাম শক্তিশালী হচ্ছে, সে সম্বন্ধেও তাত্ত্বিকভাবে অবহিত হতে শুরু করেন, আমাদের রাজ্যের শিক্ষকেরা বা বিশেষ করে আমাদের আলোচ্য মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকেরা। তারা জানতে পারলেন সোভিয়েত রাশিয়ায় বছরে শিক্ষা খাতে মাথাপিছু ব্যয় করা হয় তিনশো রুবল। চোদ্দো বছর বয়ঃক্রম অবধি বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থাও সেখানে বহুদিন হল চালু হয়ে গেছে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী লুনাচারস্কির লেখা হাতে আসবার পর তাঁরা দেখল, তিনি প্রথম সর্ব রাশিয়া শিক্ষা কংগ্রেসে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে বলছেন যে 'আপনাদের কাছে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, মুক্তি ও কল্যাণের জন্য জনগণের সংগ্রাম স্পষ্টতই ত্রিধারার অনুসারী। উৎপাদনে উপায়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের

মালিকানাও আয়ত্ত করলেই জনগণের সর্বক্ষমতার অধিকারী হিসাবে মানুষ নিজেকে জয়ী ভাবতে পারে। এই সব শর্তের একটি অবশ্যই অন্যটির পরিপূরক। এটা কেবল আমাদের মতো বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীরাই নয়, মোটামুটি সুস্থির গণতন্ত্রীও বোঝেন। নজির হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাই বলছি। স্বাধীনতা লাভের পর তার প্রথম রাষ্ট্রপতি এটা লক্ষ্য করেন যে, জনগণের হাতে জ্ঞান লাভের যথেষ্ট সুযোগ না থাকলে গণতন্ত্রের মুক্তি অসম্ভব হবে।'[২৬১] এই লেখায় যখন আমাদের বাংলার শিক্ষক নেতৃত্বের গোচরে আসলো, তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন, সমাজতান্ত্রিক দেশে তো বটেই, এমনকি ঔপনিবেশিক শাসন মুক্ত গণতান্ত্রিক দেশে সরকার ইচ্ছা করলেই জনগণের ক্রমমুক্তির জন্য একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেন। জনগণকে শিক্ষার মাধ্যমে কর্মদক্ষ ও আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার আদর্শের কথা তো মহাত্মাগান্ধী তাঁর সৃষ্ট বুনিয়াদী শিক্ষা ক্রমের মধ্যেই বলে গিয়েছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের স্বদেশি শাসকেরা সোভিয়েত দেশের 'শিক্ষাই শক্তি' এই নিদানের কথা তো শোনেনই নি, উপরন্তু ঔপনিবেশিক শিক্ষা তাদের চোখে এমন একটি রঙিন চশমা পরিয়ে দিয়েছিল, তাতে গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শ ও তাদের চোখে প্রায় অদৃশ্য হয়ে পড়েছিল।

ইঞ্জিনীয়ার বা টেকনিশিয়ানদের মতো শিক্ষকেরা বেতন পাচ্ছেন। পাঁচ বছর অন্তর অন্তর বেতন হার সংশোধিত হচ্ছে তাদের। চিকিৎসা বা বাসস্থানের সুবিধাও ভোগ করছেন তার নিখরচায় বা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে। সকলের জন্য শিক্ষার নীতি গৃহীত হয়েছে সেখানে। এখানে দীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাসকে পিছনে ফেলে শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতেও যথেষ্ট পরিমাণে সচেষ্ট হচ্ছে সরকার।[২৬২] তাদের চল্লিশ বছর চাকুরি করবার অধিকার দেওয়ার কথাও বলা হচ্ছে। অবসরকালে শ্রম আইন অনুযায়ী শিক্ষকেরা সেবা নিবৃতি ভাতা (পেনশন) ও বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগও ভোগ করতে পারেন। এছাড়া অতিরিক্ত ক্লাসের বোঝা থেকেও তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় শিক্ষকদের এই সফল অবস্থানের পাশাপাশি পুঁজিবাদী দুনিয়ায়, শিক্ষক শোষণ ও তার প্রতিরোধ শিক্ষক সংগ্রামের কাহিনি সম্বন্ধেও বাংলার শিক্ষকেরা সচেতন হয়ে ওঠেন ধীরে ধীরে।

পুঁজিবাদী বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষকদের প্রবল আন্দোলনের কাহিনি আমাদের শিক্ষকদের কাছে পৌঁছে যায়। আমেরিকাতে ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকেই শিক্ষকরা নিয়মতান্ত্রিক পথে সরকারের অনিচ্ছুক হাত থেকে নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে সচেষ্ট ছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে এখানকার সর্ববৃহৎ শিক্ষক সংগঠন হিসাবে ন্যাশনাল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়েছিল। সেই সময় থেকেই বেতন বৃদ্ধি ও পেনসনের দাবিতে তারা নিয়মতান্ত্রিক পথে দাবি জানাতেন। Robert J. Braun-এর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, পূর্বোক্ত শিক্ষা সংগঠনের উত্তরসূরি American fedaretion of teachers, ওখানকার শিক্ষক আন্দোলনের তুঙ্গ মুহূর্তে 'Again and again, in New York, pennsylvania, Vermont, Georgia, Rhode Island, teachers struck, demanding salaries..... In May, 1951, teachers in

pawtucket, Rhode Island, walked out with a demand for a $410 cost of living bonus and a meximum salary of $5.000; they won their demands.[২৬৩] স্বাভাবিক ভাবেই বাংলার সমসময়ে আমেরিকার এই শিক্ষক আন্দোলনের কথা, আমাদের এখানকার শিক্ষক নেতাদের অবশ্যই প্রভাবিত করেছিল—করেছিল অনুপ্রাণিত।

আমেরিকার পার্শ্ববর্তী আরেকটি দেশ মেক্সিকোর শিক্ষক আন্দোলন সম্পর্কে এই প্রসঙ্গে দুই/চার কথা আমরা বলব। অবশ্য মেক্সিকান টিচারস ইউনিয়ন, দেশের শাসকশক্তির সঙ্গে মোটামুটি সমঝোতা করেই চলত। নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত। বলা যেতে পারে 'The tremendous size, extension and cultural signifance of the teachers union continue to grant it an unusially important role in national politics. This importance of the union in political, ideological, and numerical terms has led twentieth century Mexican governments to enlist teachers as political allies and to try to curbs the expression of dissent that emerged from them.[২৬৪] একটি মোটামুটি সহমর্মী সরকার ক্ষমতায় আসীন থাকলে তথাকথিত বিপ্লব না হলেও, যে শিক্ষকদের দাবিদাওয়ার পরিপূরণ সম্ভব তা মেক্সিকোর শিক্ষকদের সংগ্রাম থেকে বাংলার শিক্ষক নেতৃবৃন্দ শিক্ষা নিয়ে ছিলেন। তাই ৫৪-এর বাঁধভাঙা আন্দোলনের অভিজ্ঞতার পরে তাঁদের শাসক কংগ্রেস দলের প্রতি মোহভঙ্গ হয়েছিল এবং ৬৬-এর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেই মোহভঙ্গ সরকারের চরম বিরোধীতে পরিণত করেছিল তাদের। শ্লোগান উঠেছিল, 'Oust this antipeople Government' এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরে করব। তার পূর্বে আবার কিছু বিদেশি শিক্ষাধারার আলোচনা—

শুধুমাত্র সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা মেকসিকোর শিক্ষা পরিবেশ নয়, এর পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত রূপে আমরা বৃটেন, জাপান ও চিনের শিক্ষা পরিবেশের একটি সংক্ষিপ্ত বয়ানও এই প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করতে চাই। বিশেষ করে আমাদের দেশে অন্যান্য স্তরের শিক্ষার মতো মাধ্যমিক শিক্ষা ধারা বৃটেনের শিক্ষা ধারা থেকেই গৃহীত হয়েছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। ঔপনিবেশিক বৃটিশ সরকার, আমাদের দেশে শিক্ষা গ্রহণকারী ছাত্রদের উপর শিক্ষার জন্য যে ব্যয় হয়, তা বৃহদংশে ছাত্র বা অভিভাবকদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। অথচ নিজেদের দেশে তারা অন্ততঃ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছিল—করে তুলেছিল আবশ্যিক। অবশ্য সেখানকার 'পাবলিক স্কুল'গুলি ছিল ব্যয়বহুল। শুধুমাত্র ধনীদের দুলালরাই এখানে পড়াশোনার সুযোগ লাভ করতে সক্ষম হতো। তবে সাধারণ ভাবে সেখানে যে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল, তা আমাদের দেশের শিক্ষকদের প্রভাবিত করেছিল। এবং বৃটেনের উপনিবেশ হিসাবে এদেশেও শিক্ষক সমিতি প্রথম থেকেই অবৈতনিক শিক্ষার দাবি তুলেছিল।[২৬৫] বৃটেনে স্কুল শিক্ষা স্থাপনের প্রথম যুগে শিক্ষা বহুলাংশে 'চার্চ'-এর অধীনস্থ থাকলেও, পরবর্তীকালে তা সরকারি নিয়ন্ত্রণে বা বলা ভালো একটি 'শিক্ষা বোর্ডের দ্বারাই পরিচালিত হত। ফলতঃ 'মাথাভারী' বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এ বিষয়ে মাথা ঘামাতে হত না—সুষ্ঠুভাবে একটি বোর্ডের মাধ্যমেই তা পরিচালিত হত। এই বিষয়টিও বাংলার মাধ্যমিক

শিক্ষক সমিতির অবগত ছিল। তাই এই দেশে বিশেষতঃ আমাদের আলোচ্য বাংলায় একটি বোর্ডের অধীনে মাধ্যমিক শিক্ষা ধারাকে পরিচালিত করবার দাবি ক্রমশঃ জোরদার হয়ে উঠছিল। বৃটেনের শিক্ষা ব্যবস্থার অনুকরণেই যেহেতু আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার 'মুখোস' তৈরি হয়েছিল, তাই এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা কিছুটা অপ্রয়োজনীয়। তবু বলতেই হয়—বৃটিশ মুখোসের আড়ালে আমাদের দেশের শিক্ষার প্রকৃত 'মুখ'টি ছিল রক্তাল্পতায় ভোগা এক জীর্ণ চরিত্রের। শিক্ষকবৃন্দও দিনে দিনে তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন ও তাঁদের আন্দোলন ছিল শিক্ষা কাঠামোর এই রক্তাল্পতা অবস্থাকে সজীব করে তোলার আন্দোলন।[২৬৬]

আমাদের প্রতিবেশী চীনেও এক এক পর্যায়ে শিক্ষা ধারার চড়াই-উৎরাই এর সৃষ্টি হয়েছিল। বিপ্লবপূর্ব যুগে চিনে কনফুসীয় ধরনের যে প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা ছিল পুরনো ও সামন্ততান্ত্রিক ধরনের। অবশ্যই বিশেষ করে ১৯৪৮ এর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে, চিনের শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বিশাল রূপান্তকরণের সূচনা হয়েছিল। এতদিনের অভিজাততান্ত্রিক শিক্ষা ধারার ভাঙন এনে, চিনে 'সবার জন্য সম শিক্ষা' ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। আমাদের দেশে সাধারণ ভাবে, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের বিভিন্ন নব নব শিক্ষান্নোতির জন্য গবেষণা কাজের সুযোগ দান, ঔপনিবেশিক যুগে তো নয়ই, এমনকি স্বাধীনোত্তর যুগেও দুর্লভ। বিপ্লব পরবর্তী চিনে কিন্তু তথাকথিত 'নিম্ন পর্যায়ের' শিক্ষাধারার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের একদিকে যেমন গবেষণায় উৎসাহিত করা হত, তেমনি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় শিক্ষকরা তাদের একাকিত্বের আভিজাত্য ভেঙে সাধারণ খেটে খাওয়া জনতার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশে যেতে পারে, সেই বিষয়েও মনযোগ দেওয়া হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে খগেন্দ্রনাথ সেনের গবেষণাধর্মী পুস্তকে উদ্ধৃত Lu-Ting-Yi এর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করতেই পারি। তাঁর মতে, 'The cultural revolution means that the masses, workers and peasants become intellectuals and the intelleetuals become labouring people.'[২৬৭] এটা ঠিকই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরিচালনা ও পরিনাম নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। তবু অন্ততঃ তাত্ত্বিক স্তরে এই বিপ্লব যে তথাকথিত অভিজাত ও দরিদ্রকে একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার প্রচেষ্টা করেছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য এই শ্রেণিহীন শিক্ষাধারা প্রচলনের চেষ্টা প্রতিবেশী ভারতের তথা আমাদের বাংলার শিক্ষা সংগঠকদের যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল।

এবার আসি জাপানের কথায়। জাপান অষ্টাদশ শতক থেকেই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা কাঠামোর সর্বস্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান চর্চার জন্য সচেষ্ট ছিল। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের এক আইন বলে, সেখানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের পাশাপাশি সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা কায়েম করবার প্রচেষ্টাও শুরু হয়ে গিয়েছিল।[২৬৮] সেখানে মাধ্যমিক শিক্ষাকে দুটি পৃথক প্রশাখায় বিভক্ত করে পরিচালনা করা হত। একটি ছিল প্রথাগত পড়াশোনার সাধারণ শিক্ষা ধারা, এবং অন্যটি হল শিল্প শিক্ষণ কেন্দ্রিক মাধ্যমিক শিক্ষা ধারা। এই দুধরনের শিক্ষা ধারা প্রচলনের মাধ্যমে জাপানে তাত্ত্বিক ও হাতেকলমে শিক্ষার মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হত। এছাড়া মাধ্যমিক স্তরে প্রত্যের ছাত্রকেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক ধাঁচের সমর

শিক্ষা দেবারও বন্দোবস্ত ছিল।[২৬৯] এছাড়া মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের মাধ্যমে জাপান ইউরোপকেন্দ্রিক শিক্ষা ধারার দেশীয়করণ করতে যথেষ্ট সফল হয়েছিল। জাপানের মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষা প্রচলনের পন্থা দ্বারা আমাদের শিক্ষককুল যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল এবং শিক্ষার জন্য যে আন্দোলন, স্বাধীনোত্তর যুগে দেশে, বিশেষ করে বিভক্ত বাংলার পশ্চিমাংশে দুর্বার রূপ লাভ করেছিল তার একটি মূল শ্লোগানই ছিল 'মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষা চালু করতে হবে।

সূত্র নির্দেশ

১. দত্ত, সীমা (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, শিক্ষক সমিতির শতবর্ষ সংখ্যা, ২০২১, প্রবন্ধ ঃ ইতিহাসের পাতায় যুক্ত হোক নতুন সাহস, উৎপল রায়, পৃঃ ২৪৯
২. দত্ত, সীমা (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য শতবর্ষ, কলকাতা, ২০২০, Presidential Address, 1946, Dr. Meghnad Saha, পৃঃ ৫১৬
৩. তদেব, পৃঃ ৫১৭
৪. তদেব, পৃঃ ৫১৭
৫. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, চুয়ান্নর স্মরণীয় বারো দিন, কলকাতা, সাল হীন, পৃঃ ১০
৬. চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার—প্রান্তিক মানব, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃঃ ৫২
৭. দত্ত, দেবব্রত—বিজয় গড়, একটি উদ্বাস্তু উপনিবেশ, কলকাতা, ২০০১, পৃঃ ২৭-২৯
৮. চক্রবর্তী, প্রফুল্ল কুমার—প্রান্তিক মানব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৪
৯. মণ্ডল, মৃত্যুঞ্জয়—বৃহত্তর পূর্বস্থলীর ইতিহাস, নবদ্বীপ, ১৯৯৮, পৃঃ ১১
১০. ভট্টাচার্য, জ্যোর্তিময় (সং), নতুন চিঠি, বর্ধমান, ২০১৯, প্রবন্ধ ঃ 'বিদ্যানগর স্কুলের জন্মকথা', প্রবাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৮৭-৮৮
১১. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু, উত্তাল চল্লিশ ঃ অসমাপ্ত বিপ্লব, কলকাতা, ১৯৮৯, প্রবন্ধ ঃ 'বিদ্যাসাগর স্কুলের জন্মকথা', পৃঃ ১৭৩-৭৪
১২. কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক কর্মচারী সমিতি সমূহের কো-অডিনেশন কমিটি, পঃ বঃ, পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস, কলকাতা, ২০০৮, পৃঃ ০৩-০৪
১৩. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু, উত্তাল চল্লিশ...., প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৬৩
১৪. কেন্দ্রীয় সরকারী....পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃঃ ০২
১৫. বসু, অঞ্জন—বাংলায় বামেরা (১৯২০-২০১১), কলকাতা ২০১৭, পৃঃ ১৭৬
১৬. সেনগুপ্ত, নীলেন্দু—বিধান চন্দ্র ও সমকাল, কলকাতা, ২০১০, পৃঃ ১৫১
১৭. বাগ, অজিত (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৯৬, প্রবন্ধ ঃ বহু সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী আমাদের এই সংগঠন', অরুণ চৌধুরী, পৃঃ ৬১৫-১৬
১৮. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর...বারো দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০-১১
১৯. তদেব, পৃঃ ১৬

২০. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং)—শিক্ষা ও সাহিত্য, সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, কলকাতা, ১৯৭১, সাক্ষাৎকার ঃ মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, পৃঃ ৯০-৯১
২১. বাগ, অজিত (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ অরুণ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১৬
২২. অধিকারী, অশোক (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, অনিলা দেবী শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা, কলকাতা ২০১৩, প্রবন্ধ ঃ 'সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্ব আমাদের আদর্শ হোক'—অনিলা দেবী, পৃঃ ৯৮৪
২৩. দত্ত, সীমা (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির শতবর্ষ সংখ্যা, কলকাতা, ২০২১, প্রবন্ধ ঃ 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির চলার পথে একশ বছর—দু'চার কথা—শান্তিরাম ভট্টাচার্য, পৃঃ ২৫৬
২৪. Mondal. Ajit (Ed) Edulight, Kalyani, 2018, Review of grfanisation & movement of secondary school teachers of Bengal in the Pre-independece period, p. 21-46, Prabal Sengupta, p. 415-416
২৫. মণ্ডল, বিকাশ (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, সত্যপ্রিয় রায় জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা, কলকাতা, ২০০৭, প্রবন্ধ ঃ নেতৃত্বের শিকড় সন্ধান—লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, পৃঃ ৩২৭
২৬. মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ ও অন্যান্য (সং), সত্যপ্রিয় রায় ও উত্তরাধিকার, কলকাতা, ২০০৮, প্রবন্ধ ঃ অমিতাভ সেন, জন্ম শতবর্ষে আমাদের শপথ—চিরসাথী হোন সত্যপ্রিয় রায়—অমিতাভ সেন, পৃঃ ৪৯
২৭. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.... ১২ দিন, কলকাতা, সাল লেখা নেই, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩-১৪
২৮. সেন, সুকোমল—ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (১৮৩০-২০০০), কলকাতা, ২০০৩, পৃঃ ৩৪৭
২৯. মুহম্মদ রসুল আবদুল্লা—'কৃষক সভার ইতিহাস', কলকাতা, ১৯৯০, পৃঃ ১৩৭
৩০. আচার্য, স্নেহাংশু—জেলখানার দিনলিপি, কলকাতা, ২০০০, ভূমিকা ঃ জ্যোতি বসু—পৃষ্ঠা চিহ্নিত নয়।
৩১. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, সুবর্ণ জয়ন্তি স্মরণিকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩
৩২. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.... ১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭
৩৩. তদেব, উদ্ধৃতি স্টেট্‌সম্যান, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮
৩৪. মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ ও অন্যান্য (সং), সত্যপ্রিয় রায় ও উত্তরাধিকার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০
৩৫. বসু অঞ্জন—বাংলায় বামেরা (১৯২০-২০১১), প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৫-০৬
৩৬. চন্দ্র, বিপান—ভারতের জাতীয় আন্দোলন ঃ দীর্ঘমেয়াদী গতিসূত্র—কলকাতা, ১৯৯০, পৃঃ ২৫
৩৭. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, কলকাতা, সাল দেওয়া নেই, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭

৩৮. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং), এ.বি.টি.এ, সুবর্ণ জয়ন্তি স্মরণিকা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ সুনীল ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১

৩৯. শিক্ষা ও সাহিত্য, মার্চ, ২০০৮, প্রবন্ধ ঃ মাধ্যমিক শিক্ষা আন্দোলন—ধারাবাহিকতা ও রূপান্তর—প্রবাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ৪১৫-১৬

৪০. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং), এ.বি.টি.এ সুবর্ণ জয়ন্তি স্মরণিকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১

৪১. তদেব, পৃঃ ৭২

৪২. Dutta, Mrinal Kanti–The Origin and development of the West Bengal Board of Secondary Education, Kolkata, 1988, p. 22

৪৩. তদেব, পৃঃ ২২

৪৪. তদেব, পৃঃ ৪২

৪৫. মজুমদার শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, কলকাতা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫

৪৬. তদেব, পৃঃ ২৬-২৭

৪৭. চক্রবর্তী, বীরেন্দ্রনাথ (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৫১ সংখ্যা, পৃঃ ১২৭

৪৮. তদেব, পৃঃ ২৮৯-২৯১

৪৯. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫

৫০. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, তদেব, পৃঃ ২৭

৫১. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং), এ.বি.টি.এ, সুবর্ণ জয়ন্তি স্মরণিকা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭২

৫২. তদেব, পৃঃ ০২

৫৩. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮-২৯

৫৪. Dutta, Mrinal Kanti–The Origin and development of the West Bengal Board of Secondary Education, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫-৪৬

৫৫. Dutta, Mrinal Kanti–The Origin and development of the WBBSE, তদেব, পৃঃ ৪৬

৫৬. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭

৫৭. Roy, Satyapriya Selected writings and speeches of Satyapriya Roy, Kolkata, 1999, p. 02

৫৮. দাশগুপ্ত, হীরেন ও অধিকারী হরিনারায়ণ—ভারতীয় উপ মহাদেশের ছাত্র আন্দোলন, কলকাতা, ২০০৮, পৃঃ ১৭৫-৭৬

৫৯. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮

৬০. দাশগুপ্ত, হীরেন ও অধিকারী হরিনারায়ণ—ভারতীয় উপ মহাদেশের ছাত্র আন্দোলন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৬

৬১. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯

৬২. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং), নিঃ বঃ শিক্ষক সমিতি, সুবর্ণ জয়ন্তি স্মরণিকা, কলকাতা, ১৯৭১, প্রবন্ধ ঃ নিঃ বঃ শিক্ষক সমিতির পঞ্চাশ বছর—সুনীল ঘোষ, পৃঃ ৭২-৭৩

৬৩. Report of the Secondary Education Commission, Oct 1952–June 1953, 1st Edition, Sept 1953, Seventh reprint, New Delhi, Dec. 1972, p. 151

৬৪. তদেব, পৃঃ ১৫৭-৫৮

৬৫. তদেব, পৃঃ ১৫৯

৬৬. Roy, Satyapriya, Selected writings and speeches of Satyapriya Roy, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭-৩৮

৬৭. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২

৬৮. মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ ও অন্যান্য (সং), সত্যপ্রিয় রায় ও উত্তরাধিকার, কলকাতা, ২০০৮, প্রবন্ধ ঃ স্মৃতির মণিকোঠায় যাঁকে রেখেছি'—অরুণ চৌধুরী, পৃঃ ৬২

৬৯. তদেব, পৃঃ ৬৩

৭০. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩-৩৪

৭১. তদেব, পৃঃ ৩৪

৭২. তদেব, পৃঃ ৩৪

৭৩. নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি—চুয়ান্নর সংগ্রামী ঐতিহ্য ও তার উত্তরাধিকার, কলকাতা-২০০৫, পৃঃ-৩৬

৭৪. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১-৪২

৭৫. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

৭৬. বসুমতী পত্রিকা, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

৭৭. যুগান্তর, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

৭৮. স্বাধীনতা পত্রিকা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩

৭৯. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং), এ.বি.টি.এ, সুবর্ণ জয়ন্তি স্মরণিকা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ সুনীল ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭২

৮০. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮

৮১. তদেব, পৃঃ ৪৮

৮২. দত্ত, সীমা (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির শতবর্ষ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'শতবর্ষের শপথ—শিব প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৪০

৮৩. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃতি, পৃঃ ৪৯

৮৪. অধিকারী, অশোক (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, অনিলা দেবী শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'সমিতির মতাদর্শগত ভিত তৈরির অন্যতম কারিগর অনিলাদি—শিব প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৯৪৪

৮৫. শিক্ষা ও সাহিত্য, আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩৬০, ৩২তম বর্ষ, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা, পৃঃ ০১

৮৬. ভট্টাচার্য, সূর্য্যাংশু (সং), পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৯৯, প্রবন্ধ ঃ 'শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের প্রতীক পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি', সুধীর অধিকারী, পৃঃ-০৭

৮৭. তদেব, পৃঃ ০৯

৮৮. বসু, অঞ্জন—বাংলায় বামেরা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৯

৮৯. তদেব, পৃঃ ২১৪

৯০. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১

৯১. তদেব, পৃঃ ৫২

৯২. তদেব, পৃঃ ৫৫

৯৩. তদেব, পৃঃ ৫৩

৯৪. তদেব, পৃঃ- ৫৩-৫৫

৯৫. বাগ, অজিত (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ ইতিহাস অনুসন্ধান—হাওড়া জেলা'—কল্যাণ ঘোষাল, কলকাতা-১৯৯৬, পৃঃ ৫৯৯ এবং ৬০৪

৯৬. তদেব, প্রবন্ধ 'আন্দোলন ও সংগঠনের বিকাশের ধারায় এ.বি.টি.এর হুগলী জেলা শাখা—কালিপদ সেনগুপ্ত ও সমীর বড়াল, পৃঃ ৫৯৪ এবং ৫৯৬

৯৭. তদেব, প্রবন্ধ 'সমিতির পুরুলিয়া জেলার ইতিহাস—দিলীপ কুমার গোস্বামী, পৃঃ ৫৮৪ এবং ৫৮৫

৯৮. তদেব, প্রবন্ধ 'বর্ধমান জেলা শিক্ষক সমিতি (এ.বি.টি.এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—দেবেন্দ্র কুমার লাহিড়ী, পৃঃ ৫৯১-৯২

৯৯. তদেব, প্রবন্ধ 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি ও বাঁকুড়া জেলা—মুক্তি দাশগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮৭

১০০. তদেব, সাক্ষাৎকার 'রমেশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার'—সাক্ষাৎকারী অজিত বাগ, পৃঃ ৫৫৩

১০১. তদেব, প্রবন্ধ 'জলপাইগুড়ি ও শিক্ষা আন্দোলনের গোড়ার কথা—সুবোধ মিত্র, পৃঃ ৫৭৫

১০২. তদেব, প্রবন্ধ 'সংগ্রামী উত্তরাধিকার (উত্তর দিনাজপুর জেলা শাখার ইতিহাস)—নৃপেন্দ্র নাথ মহন্ত, পৃঃ ৫৭৮

১০৩. তদেব, প্রবন্ধ, তদেব, পৃঃ ৫৭৯-৫৮০

১০৪. তদেব, স্মৃতিচারণা—নীলিমা সেন, পৃঃ ৫২০

১০৫. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা পরিশিষ্ট 'ট'।

১০৬. বাগ, অজিত (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'অতীত দিনের কথা—মায়া চক্রবর্তী, পৃঃ ৫৩৭

১০৭. তদেব, প্রবন্ধ, তদেব, পৃঃ ৫৩৭

১০৮. তদেব, সাক্ষাৎকার 'প্রশ্নের উত্তরে আমার শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতার কথা—শশিমোহন ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫১৬

১০৯. দত্ত, সীমা (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, গোলোক পতি রায় জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যা, জুলাই, ২০১৯, প্রবন্ধ ঃ সৈনিক থেকে সেনাপতি ঃ সমকালীন নেতৃত্বের চোখে গোলোক পতি রায়—বেদ ব্যাস মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৩৩

১১০. অধিকারী, অশোক (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, অনিলা দেবী শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'কমরেড রথীন্দ্র কৃষ্ণ দেব'—অনিলা দেবী, পৃঃ ৯৯৩

১১১. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭

১১২. তদেব, পৃঃ ৫৭

১১৩. অধিকারী, অশোক (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, অনিলা দেবী শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৩১

১১৪. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০

১১৫. Hindusthan Standard, 8th Dec, 1953, উদ্ধৃত, অধ্যাপক সমিতির ইতিহাসের উপাদান (প্রথম খণ্ড), অনিল ভট্টাচার্য (প্রধান সম্পাদক), কলকাতা, ২০০২, পৃঃ ২৯৬

১১৬. আনন্দ বাজার পত্রিকা, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪, উদ্ধৃত, তদেব, পৃঃ ২৯৮

১১৭. বিশ্বাস, প্রদীপ (সং) সংগ্রাম আন্দোলনে নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (১৯৩৫-২০০৫), প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ২০০৭, কার্যবিবরণী ঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন (১৯৫৩-৫৫), পৃঃ ১৫৮-১৫৯

১১৮. বাগ, অজিত (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, মার্চ ১৯৯৬, প্রবন্ধ ঃ অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী—ননী গাঙ্গুলী, পৃঃ ১৩৯

১১৯. শিক্ষা ও সাহিত্য, মার্চ-এপ্রিল, ১৯৭৯, প্রবন্ধ ঃ '১৯৫৪ এর ১০ই ফেব্রুয়ারী'—অনিলা দেবী

১২০. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯

১২১. তদেব, পৃঃ ৬১

১২২. বসু, অঞ্জন—বাংলায় বামেরা (১৯২০-২০১১), প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৬

১২৩. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১-৬২

১২৪. সেনগুপ্ত, নীলেন্দু—বিধানচন্দ্র ও সমকাল, কলকাতা, ২০১০, পৃঃ ২৩৬

১২৫. তদেব, পৃঃ ২৩৭

১২৬. তদেব, পৃঃ ২৩৮২

১২৭. তদেব, পৃঃ ২৩৯

১২৮. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ-৬৪

১২৯. দাশগুপ্ত, হীরেন, অধিকারী হরিনারায়ণ—ভারতীয় উপমহাদেশের ছাত্র আন্দোলন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮০

১৩০. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪-৬৬

১৩১. তদেব, পৃঃ ৬৫

১৩২. ভট্টাচার্য, সূর্য্যাংশু (সং), পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের প্রতীক পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি', সুধীর অধিকারী, পৃঃ ৮-৯

১৩৩. তদেব, Memorandum of the WBHA to the WBSEE Commission, Kol, Sept, 1954 p. 143-144

১৩৪. তদেব, পৃঃ ১৪৪

১৩৫. মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ ও অন্যান্য (সং), সত্যপ্রিয় রায় ও উত্তরাধিকার, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'কমরেড সত্যপ্রিয় রায় ও যুক্ত আন্দোলন—মনোরঞ্জন রায়, পৃঃ ২১

১৩৬. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬

১৩৭. তদেব, পৃঃ ৬৬

১৩৮. তদেব, পৃঃ ৬৭

১৩৯. রায়, সত্যপ্রিয়—রাষ্ট্র সমাজ শিক্ষা, কলকাতা ২০০৮, পৃঃ ১৫-১৭

১৪০. মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ ও অন্যান্য (সং), সত্যপ্রিয় রায় ও উত্তরাধিকার, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'চিরসাথী হোন সত্যপ্রিয় রায়'—অমিতাভ সেন, পৃঃ ৫০

১৪১. রায়, অর্ণব (সং), স্পন্দন, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, প্রবন্ধ ঃ পরিবর্তনশীল সামাজিক কাঠামোয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী, সমীর মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১০

১৪২. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮

১৪৩. তদেব, পৃঃ ৬৮

১৪৪. মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ ও অন্যান্য (সং), সত্যপ্রিয় রায় ও উত্তরাধিকার, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'একটি জীবনের বিকাশ ধারা, মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, পৃঃ ২৪

১৪৫. সেনগুপ্ত, নীলেন্দু, বিধান চন্দ্র ও সমকাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৯

১৪৬. চট্টোপাধ্যায়, গৌতম (সং), ইতিহাস অনুসন্ধান-১২, কলকাতা ১৯৯৮, প্রবন্ধ ঃ 'ঔপনিবেশিক ভারতে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা ও ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ—একটি পর্যালোচনা'—প্রবাল সেনগুপ্ত, পৃঃ-২৯৮

১৪৭. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৬

১৪৮. সেন, মণিকুন্তলা—সেদিনের কথা, কলকাতা ১৯৮২, পৃঃ ২৪৬

১৪৯. ভট্টাচার্য, অনিল (সং), অধ্যাপক সমিতির ইতিহাসের উপাদান, (১ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১৩

১৫০. তদেব, পৃঃ ৪১৪

১৫১. বিশ্বাস, প্রদীপ (সং), সংগ্রাম আন্দোলনে নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, (১ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৯

১৫২. তদেব, পৃঃ ১৫৮-৫৯

১৫৩. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭১

১৫৪. তদেব, পৃঃ ৭২

১৫৫. তদেব, পৃঃ ৭২

১৫৬. তদেব, পৃঃ ৭২-৭৩

১৫৭. তদেব, পৃঃ ৭৩

১৫৮. স্বাধীনতা পত্রিকা, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪

১৫৯. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪

১৬০. তদেব, পৃঃ ৭৫

১৬১. বাগ, অজিত (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জুবিলি সংখ্যা, অতীত দিনের কথা—মায়া চক্রবর্তী, পৃঃ ৫৩৮

১৬২. দত্ত, সীমা (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, গোলোক পতি রায় জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ সৈনিক থেকে সেনাপতি'—বেদব্যাস মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৩৩

১৬৩. তদেব, পৃঃ ৪৩৩

১৬৪. বাগ, অজিত (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জুবিলি সংখ্যা, প্রাগুক্ত, স্মৃতিচারণা—নীলিমা সেন, পৃঃ ৫২০

১৬৫. নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি—চুয়ান্নর সংগ্রামী ঐতিহ্য ও তার উত্তরাধিকার, কলকাতা, ২০০৫, পৃঃ ৪৫

১৬৬. তদেব, পৃঃ ৪৫

১৬৭. দত্ত, সীমা (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, শতবর্ষ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ ঐতিহ্যের ইতিহাসে পরিক্রমা—দার্জিলিং জেলা সংগঠন—তমাল চন্দ, পৃঃ ৫৯৭

১৬৮. অমৃত বাজার পত্রিকা, সম্পাদকীয়, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪

১৬৯. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৯

১৭০. তদেব, পৃঃ ৭৯

১৭১. মণ্ডল, বিকাশ (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য—সত্যপ্রিয় রায় জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'সত্যপ্রিয় রায় প্রসঙ্গে'—জ্যোতি বসু, পৃঃ ২৯৬-৯৭

১৭২. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩

১৭৩. মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ ও অন্যান্য (সং), সত্যপ্রিয় রায় ও উত্তরাধিকার, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'কমরেড সত্যপ্রিয় রায় ও যুক্ত আন্দোলন'—মনোরঞ্জন রায়, পৃঃ ২১

১৭৪. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—৫৪এর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫-৮৬

১৭৫. তদেব, পৃঃ ৮৭

১৭৬. দত্ত, সীমা (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, সমিতির শতবর্ষ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৫

১৭৭. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—৫৪এর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৬-৮৭

১৭৮. তদেব, পৃঃ ৮৮-৮৯

১৭৯. বাগ, অজিত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জুবিলি সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ অতীত দিনের কথা—মায়া চক্রবর্তী, পৃঃ ৫৩৯

১৮০. দাস, দীনেশ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা ১৯৯১, পৃঃ ৬৬

১৮১. দাশগুপ্ত, বিপ্লব (সং), 'নন্দন' কলকাতা, জুলাই, ১৯৯২, প্রবন্ধ 'জ্যোতিবাবুর সঙ্গে', বিপ্লব দাশগুপ্ত, পৃঃ ১০

১৮২. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—৫৪এর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২

১৮৩. তদেব, পৃঃ ৯৪

১৮৪. মৈত্র, ভবেশ, প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষা ও সমাজ, কলকাতা ২০০৭, প্রবন্ধ ঃ 'শিক্ষক আন্দোলনের স্মৃতি থেকে' পৃঃ ১৮৬-১৮৭

১৮৫. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, ৫৪এর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৫

১৮৬. তদেব, পৃঃ ৯৫

১৮৭. তদেব, পৃঃ ৯৫-৯৬

১৮৮. চট্টোপাধ্যায়, গৌতম (সং), ইতিহাস অনুসন্ধান, (৮) কলকাতা ২০১০, প্রবন্ধ ঃ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিঃ বঃ শিক্ষক সমিতি—ব্রততী হোড়, '১৯৫৪ সাল, একটি পর্যালোচনা'

১৮৯. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, ৫৪এর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮

১৯০. তদেব, পৃঃ ৯৮

১৯১. দত্ত, সীমা (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য-সমিতির শতবর্ষ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'দ্রোহকাল ঃ শতবার্ষিকী বৃক্ষের উতল প্রণোদনা', অশোক অধিকারী, পৃঃ ২৭০

১৯২. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, ৫৪-এর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৯

১৯৩. সেনগুপ্ত, নীলেন্দু—বিধানচন্দ্র ও সমকাল—উদ্ধৃত Home (Poll) dept. G.O.I. 1954, F.L No-SL4, Sub : Application of preventive detention Act to ded with Teachers strike, (State Archives)

১৯৪. দে, অসিত কৃষ্ণ (সং), পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলন, কলকাতা, ২০০০, প্রবন্ধ ঃ 'শিক্ষক আন্দোলন'—ড. অরুণ কুমার সেনশর্মা, পৃঃ ৯১

১৯৫. দে, বন্দনা (সং), শিক্ষা দর্পণ (শিক্ষা বিভাগের মুখপত্র), কলকাতা, জুন ২০০৫, প্রবন্ধ ঃ 'আমার শিক্ষক ঃ দেবকুমার চক্রবর্তী ও সত্যপ্রিয় রায়'—শুভঙ্কর চক্রবর্তী, পৃঃ ০৫

১৯৬. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, ৫৪-এর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১

১৯৭. স্বাধীনতা পত্রিকা, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪

১৯৮. গণশক্তি, শারদ সংখ্যা, ১৪২৬ (২০১৯), প্রবন্ধ ঃ 'আমার অল্প বয়স, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৫২

১৯৯. বসু, জ্যোতি—জনগণের সঙ্গে (১ম খণ্ড), কলকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ১৫৬

২০০. বসু, জ্যোতি—যতদূর মনে পড়ে, কলকাতা, ২০০৬, পৃঃ ১০৯

২০১. ভট্টাচার্য, সূর্য্যাংশু (সং), পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের প্রতীক পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি', সুধীর অধিকারী, পৃঃ ০৯

২০২. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, ৫৪এর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৫

২০৩. তদেব, পৃঃ ১০৫

২০৪. তদেব, পৃঃ ১০৬

২০৫. বাগ, অজিত, শিক্ষা ও সাহিত্য প্ল্যাটিনাম জুবিলি সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০৫
২০৬. তদেব, পৃঃ ৬০৪
২০৭. তদেব, পৃঃ ৫৮০
২০৮. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, ৫৪-এর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পরিশিষ্ট 'ক'
২০৯. তদেব, পরিশিষ্ট 'খ'
২১০. বাগ, অজিত, শিক্ষা ও সাহিত্য প্ল্যাটিনাম জুবিলি সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ বর্ধমান জেলা শিক্ষক সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, দেবেন্দ্র কুমার লাহিড়ী, পৃঃ ৫৯৩
২১১. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, ৫৪এর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পরিশিষ্ট 'গ'
২১২. তদেব, পরিশিষ্ট 'গ'
২১৩. তদেব, পরিশিষ্ট 'গ'
২১৪. দত্ত, সীমা (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, শতবর্ষ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'ঐতিহ্যের ইতিহাসের পরিক্রমা—দার্জিলিং জেলা সংগঠন'—তমাল চন্দ, পৃঃ ৫৯৭
২১৫. তদেব, পৃঃ ৫৯৭
২১৬. ভট্টাচার্য, অনিল (প্রধান সং), অধ্যাপক সমিতির ইতিহাসের উপাদান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০৬
২১৭. যুগান্তর পত্রিকা, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪
২১৮. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, ৫৪এর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৭
২১৯. তদেব, পরিশিষ্ট 'দ'
২২০. তদেব, পরিশিষ্ট 'ধ'
২২১. তদেব, পৃঃ ১০৯
২২২. তদেব, পৃঃ ১০৯
২২৩. ভট্টাচার্য, অনিল (প্রধান সং), অধ্যাপক সমিতির ইতিহাসের উপাদান, (১ম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১২
২২৪. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪
২২৫. স্বাধীনতা পত্রিকা, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪
২২৬. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, ৫৪এর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২০
২২৭. তদেব, পরিশিষ্ট 'ত'
২২৮. তদেব, পৃঃ ১২২
২২৯. তদেব, পরিশিষ্ট 'ন'
২৩০. বসু, জ্যোতি—'যতদূর মনে পড়ে', প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১০
২৩১. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, ৫৪-এর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৩
২৩২. তদেব, পৃঃ ১১৩
২৩৩. তদেব, পৃঃ ১১৫
২৩৪. তদেব, অ্যাসেম্‌ব্লি প্রসিডিংস, অফিসিয়াল রিপোর্ট, ভল্যুম-৯ উদ্ধৃতি, পৃঃ ১১৫
২৩৫. সেন, মণিকুন্তলা—'সেদিনের কথা'—প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৭-২৪৮

২৩৬. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, ৫৪এর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬

২৩৭. তদেব, পৃঃ ১১৮

২৩৮. তদেব, পৃঃ ১১৮

২৩৯. দত্ত, সত্যব্রত বাংলার সংসদীয় রাজনীতির ইতিবৃত্ত, কলকাতা, ২০১৭, পৃঃ ১৩১-৩২

২৪০. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, ৫৪-এর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১১

২৪১. Report of the Secondary Education Commission, Oct. 52–June 53, First Edition, Sept, 54, Reprint 1972, প্রাগুক্ত, p. 159

২৪২. Times of India, 13th Feb, 1954, বাংলা অনুবাদ, মজুমদার শচীন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৪

২৪৩. যুগান্তর, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪ (সম্পাদকীয়)

২৪৪. National Herald পত্রিকার বঙ্গানুবাদ, শচীন্দ্র কুমার মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৫

২৪৫. যুগান্তর পত্রিকা, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪

২৪৬. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, ৫৪-এর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩

২৪৭. দে, বন্দনা (সং), শিক্ষা দর্পণ, কলকাতা, সেপ্টেঃ-ডিসেঃ ২০১০, প্রবন্ধ ঃ 'শিক্ষক আন্দোলন ও সত্যপ্রিয় রায়'—প্রবাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ০৯

২৪৮. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, ৫৪এর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২-৩৩

২৪৯. তদেব, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৮

২৫০. তদেব, পৃঃ ১২৮

২৫১. তদেব, পৃঃ ১২৯

২৫২. তদেব, পৃঃ-১৩১

২৫৩. সাত দশক—সমকাল ও আনন্দবাজার (আনন্দবাজার পত্রিকা সংকলন, কলকাতা, ১৯৯৯, প্রবন্ধ ঃ 'এবার নতুন পথে, নতুন লক্ষ্যের দিকে'—অমলেন্দু দে, পৃঃ ১০৩

২৫৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুবনেশ্বর ও অন্যান্য, হেড মাস্টার্স ম্যানুয়েল, (স্কুল পরিচালনা সংক্রান্ত সহায়ক গ্রন্থ, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃঃ ৫৩০-৫৫১

২৫৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, রণক্ষেত্র রাজপথ, কলকাতা, ২০০২, পৃঃ ২৭

২৫৬. তদেব, পৃঃ ৮৪-৮৫

২৫৭. দত্ত, সীমা (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, শতবর্ষ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'আন্তর্জাতিকতার আদর্শ ও নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি—অরুণ চৌধুরী, পৃঃ ৪৪৪

২৫৮. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, ৫৪এর.....১২ দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৩

২৫৯. তদেব, পৃঃ ১৩৩

২৬০. তদেব, পৃঃ ১৩৩

২৬১. লুনাচারস্কি, আনাতোলি—'শিক্ষা', প্রবন্ধ ও বক্তৃতা সংকলন, মস্কো, ১৯৮৬, পৃঃ ১০-১১

২৬২. তদেব, পৃঃ ১৯১-৯২

২৬৩. Braun, Robert J, Teachers and Power, New York, 1973, p. 59

২৬৪. Cook, Maria Lorena, Organizing Dissent....Teachers Movement in Mexico, Pennsylvania, 1996, p. 23

২৬৫. Sen, Khagendra N, Education and the Nation, Kolkata, 1970, p. 318

২৬৬. তদেব, পৃঃ ৩২০

২৬৭. তদেব, পৃঃ ৩২৮

২৬৮. তদেব, পৃঃ ৩৩৫-৩৩৬

২৬৯. তদেব, পৃঃ ৩৩৮

পঞ্চম অধ্যায়

অর্ধ শতবর্ষের পথে সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলন ঃ সমকালীন রাজনীতির প্রভাব ও সাহিত্যে প্রতিফলন

শিক্ষক আন্দোলনে ব্যক্তির প্রভাব ঃ প্রসঙ্গ সত্যপ্রিয় রায়

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ১৯৫৪-এর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, বাংলার সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ মাধ্যমিক শিক্ষকদের সংগঠনের সঙ্গে শুধু ভারতবর্ষ জোড়া শিক্ষক আন্দোলনের সংযোগ সংগঠিত হয়নি তার পাশাপাশি বিশ্ব শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।[১] বিশেষ করে বাংলার শিক্ষক আন্দোলনের অবিংবাদিত নেতা সত্যপ্রিয় রায় সারা ভারতে এবং বহির্বিশ্বে শিক্ষক আন্দোলনের সংগ্রাম মুখর মুখে পরিণত হয়েছিলেন। এর প্রকাশ ঘটে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন শিক্ষক সংস্থা আয়োজিত কনফারেন্স বা সভায় বক্তৃতা দানের জন্য বহু আমন্ত্রণের মধ্য দিয়ে। প্রথমে দেশের কথায় আসি, এই সময় নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি সর্বভারতীয় শিক্ষক আন্দোলনের সাপেক্ষেও একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান লাভ করে। জন্মলগ্ন থেকেই এ.বি.টি.এ. ভারতের সব স্তরের শিক্ষক ও শিক্ষা সংস্থার মিলিত মঞ্চ AIFEA-এর সক্রিয় সদস্য ছিল। চিনের শিক্ষক সংস্থার আমন্ত্রণে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দেই এই সংস্থার প্রতিনিধি দল চিন সফরে গিয়েছিল। এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক আন্দোলনের অবিসংবাদী কর্ণধার সত্যপ্রিয় রায়। তবে এই মঞ্চের বার্ষিক অধিবেশনে শিক্ষার সর্বস্তরের সমস্যা সম্বন্ধে মূলতঃ তাত্ত্বিক আলোচনা চলতো। বাস্তব আন্দোলনের রূপরেখা অঙ্কন করতে এই সর্বভারতীয় সমিতির অনেক সময়ই অনীহা ছিল। এই অবস্থার প্রতিবিধানকল্পে AIFEA-এর সঙ্গে সংযোগ অব্যাহত রেখেই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের পৃথকভাবে সংগঠিত করবার উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে 'All India Secondary Teachers Fedaraation or AISFEA। এই সংস্থার প্রথম সভাপতি হন ABTA নেতা সত্যপ্রিয় রায়। সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন দিল্লীর শিক্ষক নেতা রামপ্রকাশ গুপ্তা। বিশ্ব শিক্ষক সংগঠন AISE-র নজর কাড়তে সমর্থ হল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক সমাজ। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দেই নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে বিশ্ব শিক্ষক সংগঠন সহযোগী সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে FISE-এর ডাকে শ্রীলঙ্কার শিক্ষকদের এক বৃহৎ সম্মেলনে সত্যপ্রিয় রায় উপস্থিত ছিলেন। এদিকে মাধ্যমিক শিক্ষকদের দাবিদাওয়াকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক নেতাদের মধ্যে শীর্ষতম সত্যপ্রিয় রায়, শিক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবিতে সারা ভারতে ঝটিকা সফর করতে শুরু করলেন এই সময়ে। এই রকম একটি সম্মেলনে তাঁর কণ্ঠ বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে উঠেছিল, 'The most dangerous tendency that is becoming evident.....is the fact that the increasing rise in the cost of national expenditure for education.....is going to be checked. Education, as a legacy from the dark days of British rule was

ever a neglected field of national activity in our country and even afterr 18 years of freedom more than 70 per cent of our countrymen are still illiterale'.[২] জাতীয় আয়ের মাত্র ২.৭% শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় করত। সত্যপ্রিয় রায় সর্বভারতীয় শিক্ষক নেতা হিসাবে এই ব্যয় বৃদ্ধি করে ৪½% থেকে ৮% ব্যয় বরাদ্দের পক্ষে এই সম্মেলনে মত প্রকাশ করেছিলেন। এই বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট নীতি বির্ধারণের দাবি জানিয়ে তিনি আরো বলেছিলেন, 'In order to achieve this end (development of Education) our national plans should be recast and education should be brought into their very vortex.'[৩] এই ভাবে বহুলাংশে সত্যপ্রিয় রায় এবং কিয়দংশে অনিলা দেবী দেশে/বিদেশে একদিকে যেমন বাংলার শিক্ষক আন্দোলনের সংগ্রামী চেতনাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। অন্য দিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শিক্ষক আন্দোলনের দ্বারা ঋদ্ধ হয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতাকে পরিস্রবণ করে পৌঁছে দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের লড়াকু শিক্ষকদের পাশে। এই সংগঠনের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে মূলতঃ সত্যপ্রিয় রায় এবং তাঁর সঙ্গে অনিলা দেবী সারা ভারত জুড়ে প্রচার আন্দোলনে ব্যস্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য এই সংগঠনের মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (RSS)-এর প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, সারা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল শিক্ষকেরা AISTF-এর সংশ্রব ত্যাগ করে সেকেন্ডারী টিচার্স ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া বা STFI গঠন করেছিলেন।[৪]

যাইহোক সর্বভারতীয় এই মঞ্চ সংগঠনের কাজে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে সত্যপ্রিয় রায় প্রথমাবধিই সক্রিয় ছিলেন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত AISTF-এর কনফারেন্সের সভাপতি হিসাবে সত্যপ্রিয় রায়, সারা ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষকদের দুরবস্থা পূর্ণ অবস্থার চিত্র তুলে ধরে বলেন, যে শিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারি প্রচারের নিয়ত ঢক্কা নিনাদ সত্ত্বেও এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ব্যয়বরাদ্দ দুই হাজার কোটি টাকা হলেও, শিক্ষার জন্য ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র একশো একান্ন কোটি টাকা মাত্র। মাথাপিছু মানুষের হিসাবে যা প্রতিবছর এক টাকারও কম। তিনি আরো বলেন ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে কিছু পরিবর্তন দৃশ্যমান হলেও, শিক্ষা কাঠামো পড়ে রয়েছে সেই ঔপনিবেশিক আমলে। এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের গাফিলতির জন্য জাতীয় জীবনের কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে শিক্ষার সংযোগ ঘটছে না। এক্ষেত্রে সরকারি উদাসীনতা দূর করার দাবি তুলে তিনি বলেছিলেন, 'In the changed political setup in Independent India, this sort of education must be given the go-by. Education should no longer serve narrow personal ends it should be the means of serving the people and the country. It should be integrated to real life and to the needs of the country.'[৫] মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার মধ্যে সংযোগ সাধক হিসাবে চিহ্নিত করে, এই স্তরের শিক্ষকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জরুরি ভিত্তিতে রক্ষা করা উচিত বলেও তিনি এই সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। মুদালিয়র কমিশন (১৯৫৪)-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি আরো বলেছিলেন, 'Unfortunately, however, things are very unsatisfactory. The secondary Education commission has emphasized this issue and has recommended that every state should

take immediate measures to improve the service conditions of teachers. It has recommended for them a salary scale on par with equally qualified workers in other fields of life, it has recommended for them security of service and triple benefit in the form of Insurance cum provident fund cum pension and ofher amenities.'[৬] তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারগুলির এক্ষেত্রে উদাসীনতা ও উপেক্ষার দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র সমালোচনা করে সত্যপ্রিয়বাবু এই মনোভাবের প্রতিবাদ করে তীব্র শিক্ষক আন্দোলনের কাঠামো গঠনের জন্য সারা দেশের শিক্ষকদের কাছে সুপারিশ করেছিলেন।

অনেক সময় অভিযোগ ওঠে যে শিক্ষকদের ক্রমশঃ শক্তিশালী এই সংগ্রাম সেই সময় অর্থনীতিবাদের চোরা বালিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে শিক্ষকদের যে ভূমিকা পালন করা উচিৎ তা হয়েছিল উপেক্ষিত। এটা অস্বীকার করা অনুচিত হবে যে ৫০-এর দশকে প্রথমে বাংলায়ও তার অনুরণনে সারা দেশে শিক্ষকেরা যে ভাবে জোটবদ্ধ হয়ে উঠছিলেন তার পিছনে সরকারের মুষ্টিভিক্ষা স্বরূপ দেওয়া বেতন ও ভাতার স্বল্পতা একটি অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছিল। তাই বলে শিক্ষা কাঠামোর সামগ্রিক উন্নয়ন বিধানের দিকে শিক্ষকদের কোন নজর ছিল না, একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। আমরা যদি বিভিন্ন সম্মেলনে এ.বি.টি.এ.-র পক্ষ থেকে প্রথমে সত্যপ্রিয় রায় ও পরে অনিলা দেবীর বক্তব্যের সঠিক অনুধাবন করি তাহলে দেখতে পাব—তাঁরা বারবারই ছাত্রদের বৌদ্ধিক উন্নয়ন তথা শিক্ষা কাঠামোর সামগ্রিক উন্নয়নের দিকে শাসক শক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। AISTF-১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কনফারেন্স উপলক্ষ্যে, একটি সেমিনারে সত্যপ্রিয় রায়ের মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের উন্নয়ন সংক্রান্ত ভাবনা চিন্তা অনেকটাই পরিস্ফুট হয়েছিল। সেখানে শিক্ষার পরিকাঠামো সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ১৯৫৩-এর মুদালিয়র কমিশনের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হয়ে সত্যপ্রিয় রায় বলেছিলেন, 'We recommend the following new organizational structure for secondary education after 4 or 5 years of Primary or Junior Basic Education : (i) A middle or Junior Secondary or Senior Basic stage. Which should cover a period of 3 years, (ii) A Higher Secondary stage which should cover a period of 4 years.'[৭] কিন্তু সরকার এই বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাক্রমের পরিবর্তে সেই সময় এগারো ক্লাসের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা ধারার প্রচলন করে। এই পদক্ষেপকে সত্যপ্রিয় রায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সমালোচনা করেন। মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম বা সিলেবাসের আধুনিকীকরণের দিকেও সরকারের নজর দেওয়া উচিত বলে এই সেমিনারে সত্যপ্রিয় রায় মত প্রকাশ করেছিলেন। শিক্ষাক্রমের ভাষা মাধ্যম, পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার প্রভৃতিকে যুগোপযোগী করার কথাও তিনি এই সেমিনারে তুলে ধরেন।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে ৫৪-এর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলার শিক্ষক নেতারা দেশ/বিদেশের শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে, সংযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের অবিসংবাদিত শিক্ষক নেতা হিসাবে বিশেষ করে সত্যপ্রিয় রায়, বিভিন্ন রাষ্ট্রের শিক্ষক আন্দোলনের সভাসমিতিতে সেই সময় থেকে আমন্ত্রিত হতে শুরু করেন। বিশ্বশিক্ষক

আন্দোলনের সঙ্গে এই পরিচিতি আমাদের দেশ ও রাজ্যের শিক্ষক আন্দোলনে নতুন শক্তি সংযোজিত করবে বলে আমাদের শিক্ষক নেতৃত্ব অনুধাবন করেছিলেন। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির এবং এ. আই. এস. টি. এফ.-এর সভাপতি হিসাবে অনুষ্ঠিত বিশ্বশিক্ষক সংঘ 'ফিসে' আয়োজিত একটি সেমিনারে বিশ্বশিক্ষক ঐক্যর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছিলেন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে একটি বক্তৃতায় সত্যপ্রিয় রায় আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলি বিশ্বশিক্ষক সম্মেলনের মঞ্চে তুলে ধরেন। ভারতের কোথাও কোথাও যেমন তৎকালীন উড়িষ্যায় শিক্ষক সমাজ প্রচলিত বৃত্তিগত আচরণ বিধির জন্য সংগঠন গড়ে তুলে আন্দোলনের অধিকার পেতেন না। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা শিক্ষকদের জন্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেবার কথা বলেছে, পৃথিবীর বহুদেশ তা তাত্ত্বিক ভাবে মেনে নিলেও, বাস্তবে অনেক দেশে বিশেষতঃ ভারতে তা বাস্তবায়িত হয়নি বলেও এই সম্মেলনে শ্রীরায় মন্তব্য করেছিলেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁর ভাষণে তিনি বলেছিলেন, ''বিশ্বশিক্ষক-সংঘের পক্ষ থেকে পেশ করা রিপোর্টে বলা হয়েছে দেশগুলিকে এককভাবে বা কতিপয় প্রতিবেশী দেশকে নিয়ে গঠিত একটি অঞ্চল বা এলাকাগতভাবে ইউনেস্কোর সুপারিশসমূহ কার্যকর করার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। ইউনেস্কোর সুপারিশ বর্ণিত অধিকারসমূহ কার্যকর করার জন্য সংগ্রাম অবশ্য প্রাথমিক ভাবে প্রতিটি দেশকে নিজ উদ্যোগে চালিয়ে যেতে হবে।.... কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসাবে বিশ্বশিক্ষক সংঘকে প্রয়াসী হতে হবে বিভিন্ন দেশের শিক্ষকদের দাবিদাওয়া ও সেগুলি অর্জনের সংগ্রামসমূহকে ব্যাপকতর প্রচারের আলোয় আনার জন্য। সুপারিশসমূহের এবং ঐ সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে পরিচালিত সংগ্রামগুলির স্বপক্ষে প্রগতিশীল বিশ্বজনমত গঠন করাই হবে ঐ কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।''[৮]

বিশ্বশিক্ষক সংস্থার (FISE)-এর মুখপত্র, 'Teachers of the world' পত্রিকায় সত্যপ্রিয় রায় শিক্ষা কাঠামোর সংশোধনের জন্য ও সারা বিশ্বের শিক্ষক সমস্যা নিয়ে কলম ধরেন। এই পত্রিকায় তিনি ভারতের শিক্ষক সমস্যা নিয়েও লিখেছিলেন। 'Teachers status in India' প্রবন্ধে তিনি ABTA নেতৃত্বাধীন শিক্ষক আন্দোলন ও তার প্রেক্ষাপটে ভারতের শিক্ষকদের তৎকালীন আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করেছিলেন। (Vol 3/68)। তাঁর ভাষায়, 'Education in India is in a state of total neglect.....As a result India spend only 2.7 per cent of her gross national income on education. The expenditure on education per capita of population per year in the country is only Rs. 12/-' এইভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি উদাসীনতার পাশাপাশি শিক্ষকদের আর্থ-রাজনৈতিক ও সামাজিক দুরবস্থার উদাহরণ তুলে সত্যপ্রিয় রায় উক্ত জার্নালে আরো লিখেছিলেন, 'Secondary school teachers of high academic competence are placed on a pay rate at par with unskilled labour....So far as the remuneration of teachers in India is concerned teachers are very far from the status that is commensurate with dignity of the profession and its responsebilities.'[৯] বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গেও ৫৪-এর ক্রান্তিকালীন সময়ে ও তৎপরবর্তী কালে সমিতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

৫৪-এর আন্দোলনের প্রসঙ্গক্রমে তার সামগ্রিক ফলাফল ও প্রভাব নিয়ে কিছুটা বিস্তৃত আলোচনাই করা গেল। এবার আমরা আবার ফিরব বাংলার শিক্ষকদের সংগ্রাম আন্দোলনের কথায়। আন্দোলনের অব্যবহিত পরেও শিক্ষক আন্দোলনের সদর্থক/নঞর্থক দিক নিয়ে বিদগ্ধ সমাজে ও সাধারণ মানুদের মধ্যে কাটাছেঁড়া চলতে থাকল। সরকারি তরফে প্রতিশ্রুতি থাকলেও, ধর্মঘট প্রত্যাহারের পরেও বিদ্যালয়ের পরিচালকসমূহ এমনকি সরকারি তরফেও ধর্মঘটী শিক্ষকদের প্রতি প্রতিশোধাত্মক মনোভাব নেওয়া হচ্ছিল। অবশ্য শিক্ষকদের সমবেত চাপে ৩০টি বিদ্যালয় ছাড়া বাকী বিদ্যালয়গুলির পরিচালন সমিতি, শিক্ষকদের বেতন কাটার পথ থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছিল। উপযুক্ত প্রতিরোধের ফলে এই ত্রিশটি বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছিল। সমিতির আন্দোলন কালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল তখনো অবধি জেলবন্দী প্রায় আড়াইশো ব্যক্তিকে মুক্ত করা। রাজ্যের জুনিয়র হাই স্কুল ও মাদ্রাসাগুলির শিক্ষকদের সমিতির সদস্য হবার যোগ্য বলে ঘোষণাও এই সময় শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে করা হয়েছিল।

তাত্ত্বিক দিক থেকে আন্দোলনের রেশ তখনও ছিল। শিক্ষক সংগ্রাম শেষ হবার অব্যবহিত পরে যুগবাণী পত্রিকায় অধ্যাপক দেবজ্যোতি বর্মন 'শিক্ষা সংহার নীতি' শিরোনামায় মন্তব্য করেন, ''জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষাকে সুপরিকল্পিত উপায়ে কংগ্রেসী সরকার সঙ্কুচিত করে চলেছেন।..... জনসমর্থন হারিয়ে পুলিশী রাজের উপর যখন কোন সরকারকে শাসন চালাবার কু-নীতি অবলম্বন করতে হয়, তখন তাকে সর্বপ্রথম হাত বাড়াতে হয় শিক্ষার উপর।''[১০] আন্দোলনের পরেই স্বাধীনতা পত্রিকা মন্তব্য করেছিল, ''দ্বাদশ দিবস ব্যাপী অপূর্ব সংগ্রামের পর মাধ্যমিক শিক্ষকদের কর্মবিরতির অবসান ঘটিল। কিন্তু ইহাতে মাধ্যমিক শিক্ষকদের সংগ্রামের অবসান ঘটে নাই। তাঁহাদের দাবির পিছনে আজ সমগ্র ভারতের সমর্থন ব্যক্ত হইতেছে। দেশের জনসাধারণের সহিত মাধ্যমিক শিক্ষক সমাজের মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের যে বন্ধন রচিত হইল, তাহা আজ আরও বেশী দৃঢ় হইতে চলিয়াছে।''[১১]

সেদিনের সেই শিক্ষক আন্দোলন শুধুমাত্র শিক্ষকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এটা আমরা আগেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। শ্রমিক শ্রেণি, কর্মচারী, যুব সমাজ এবং বিশেষ করে শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসা ছাত্ররা, কাতারে কাতারে এই প্রত্যক্ষ লড়াইতে যোগদান করেছিলেন। তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল দৃঢ় ঐক্য। যা আন্দোলনের পরবর্তীকালেও বজায় ছিল। ১৯৫৪-এর ৭ এপ্রিল অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা থেকে বিশ্বশিক্ষক সংস্থার সাধারণ সম্পাদক পল ভেলানউ সমিতির নেতাদের কাছে লিখেছিলেন, ''প্রিয় বন্ধু, আপনাদের পাঠানো 'টিচার্স অব দি ওয়ার্ল্ড' এবং অন্য সমস্ত নথিপত্র পেলাম। সেগুলি উৎসাহ সহকারে দেখলাম। আমাদের প্রকাশনার পরবর্তী সংখ্যায় এর আংশিক প্রকাশিত হবে। তাছাড়া পরের সপ্তাহে প্রাগে আমাদের যে এক্‌জিকিউটিভ ব্যুরোর সভা হবে তাতে ঐগুলি পরীক্ষা করে দেখা হবে এবং আপনাদের অনুরোধ অনুযায়ী এ ব্যাপারে আমাদের মতামত ও পরামর্শ দেব। আমি উল্লেখ করতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষকদের সংগ্রাম সারা বিশ্বে সাংঘাতিক সাড়া জাগিয়ে তুলেছে।''[১২]

সেই সময়কালেই চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগ্ থেকে ইউনিয়ন অব এডুকেশনাল ওয়ার্কার্স-এর পক্ষ থেকে, তাদের আন্তর্জাতিক বিভাগের সচিব জোসেফ কুটনহরস্কি জানিয়েছিলেন, ''বন্ধুগণ, সরকারের অবিবেচনার ফলে বাংলার শিক্ষকদের নিম্ন পর্যায়ের সামাজিক অবস্থা থেকে উন্নত হবার লড়াইয়ে অনুগ্রহ করে আমাদের অকৃপণ সংহতি জানুন। সকল শিক্ষকদের জানান তাঁদের প্রতিবাদ উৎসাদনের জন্য পুলিশ যে সন্ত্রাস চালিয়েছে তাকে চেকোশ্লোভাকিয়ার শিক্ষকেরা ক্ষোভ ও ক্রোধ সহকারে ধিক্কার দিচ্ছে।[১৩] আন্দোলন প্রশমিত হবার বেশ কিছু পরে, শিক্ষক সমিতির কাছে গণতান্ত্রিক জার্মান সাধারণ তন্ত্রের শিক্ষকদের মে দিবসের শুভেচ্ছা এল, ''.....জার্মান ইউনিয়ন অব টিচার্স অ্যান্ড এডুকেশনিস্ট মে দিবসের সহযোদ্ধার ভ্রাতৃত্বসূচক শুভেচ্ছা জানায়। আপনারা যার জন্য লড়াই করছেন সেই লক্ষ্যে আরও বড় রকমের সফল হোন কামনা করছি।[১৪]

৫৪' পরবর্তী শিক্ষক আন্দোলন

এদিকে ১৯৫৪-এরই আগস্ট মাসে সমিতির বার্ষিক সম্মেলনের ডংকা বেজে উঠল। এর আগেই অধুনা বিধান পরিষদের শিক্ষক কেন্দ্র থেকে সমিতির প্রার্থী হিসাবে সত্যপ্রিয় রায় ও অনিলা দেবী নির্বাচিত হয়েছিলেন। সফল শিক্ষক আন্দোলনের এই দুই নেতা তখন শিক্ষকদের নয়নমণিতে পরিণত হয়েছিলেন। এদিকে শিক্ষকদের দাবির প্রতি বাধ্য হয়ে কিছুটা নমনীয় হলেও তৎকালীন কংগ্রেস সরকার, সমিতির মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে তাকে দুর্বল করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল। সমিতির কিছু সদস্যও জেনে বা না জেনে এই ফাঁদে পা দিয়েছিল। আমরা দেখতে পাই আন্দোলনের অব্যবহিত পরে অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে, বামনদাস মণ্ডলের নেতৃত্বে কতিপয় শিক্ষক সভা বয়কট করে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি নামে একটি পৃথক সংগঠন স্থাপন করেন। প্রধান শিক্ষক সমিতির ন্যায় এই সমিতিও সরকারের লেজুড় বৃত্তি করতে শুরু করে।[১৫]

সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫৪-এরই ২১ সেপ্টেম্বর সরকারের বেতন বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দ্রুত পরিপূরণের দাবিতে কয়েক হাজার শিক্ষক/শিক্ষিকা ময়দান থেকে শোভাযাত্রা করে বিধানসভা অভিমুখে অভিযান করেন। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য তাঁর স্বভাবসুলভ ঔদাসীন্য দেখিয়ে, শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন বোধ করেননি। এদিকে ১৯৫৪-এর ঐতিহাসিক সংগ্রামের স্মরণে ১৯৫৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসে 'শিক্ষা সপ্তাহ' পালন করেন শিক্ষকবৃন্দ। ১০ ফেব্রুয়ারি ৫৫ সমিতির নিজস্ব গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হলে, সংগঠিত সংগ্রামের কাছে অতি প্রয়োজনীয় অফিসের অভাব পূরণের চেষ্টা করা হয়। এদিকে বড় একটি আন্দোলনে নৈতিক জয়লাভ করে, বিনাশর্তে মহার্ঘ ভাতা দান ও সমিতির প্রস্তাবিত বেতনহার প্রবর্তনের দাবিতে ছোটখাটো সভা সমিতি ধারাবাহিক ভাবে সংগঠিত করতে শুরু করে সমিতি।

১৯৫৫-এর এপ্রিল মাসে কোলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (অধুনা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ক্ষীতিশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। বিগত ফেব্রুয়ারির আন্দোলনের যে সরকারি প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন স্থগিত করা হয়েছিল, তা মেটানোর ক্ষেত্রে সরকারি টালবাহানার বিরুদ্ধে লড়াই-এর দাবি ওঠে এই সম্মেলনে।

সন্তানসম ছাত্রদের সুবিধার্থে ছাত্রবেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করা হয় এই সম্মেলনে। সমিতির বিভিন্ন দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় কর্মবিরতির কর্মসূচি গ্রহণে সমিতির সদস্যদের মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বিশাল ভোটাধিক্যে। ৫৪-এর আন্দোলনের ফলে সমিতির খ্যাতি শুধুমাত্র স্বদেশ ও বিদেশের শিক্ষক সংগঠনের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল তাই নয়—ভারত সরকারও পর্যন্ত এই আন্দোলনের অনুরণন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, কোলকাতায় এসে সংগ্রামী শিক্ষকদের নানা দাবি নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তবে ১৯৫৪-এর শেষের দিকে কোলকাতায় এলেও সময়াভাবে শেষ পর্যন্ত শিক্ষকদের সঙ্গে সম্মিলিত হতে তিনি পারেননি। শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে সত্যপ্রিয় রায় নেহরুজীকে জ্ঞাত করার ইচ্ছায় শিক্ষা ও শিক্ষক সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে একটি খসড়া আলোচনা পত্র রচনা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের সঙ্গে সভা করতে অপারগ হলে, তিনি এই খসড়া প্রস্তাবটি ১৯৫৪-এর নভেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরণ করেন। এই খসড়াটি গভীরভাবে অনুধাবন করলে আমরা দেখতে পাব যে সেই সময়কার শিক্ষক সংগঠন বেতন বৃদ্ধির জন্য শুধুমাত্র 'মেঠো রাজনীতি' করেনি। উপযুক্ত বেতনের পাশাপাশি ছাত্রস্বার্থে সামগ্রিক ভাবে শিক্ষা কাঠামোর উন্নয়নও তাদের অভীষ্ট ছিল। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারার্থে একটি কমিশন গঠন করলেও এই কমিশনে কোন শিক্ষক প্রতিনিধিকে ঠাঁই দেয়নি। ফলত শিক্ষা ব্যবস্থার মূল স্থপতিরাই শিক্ষার উন্নয়নের যজ্ঞে যোগ দিতে পারেননি। প্রথমেই সত্যপ্রিয় বাবু নেহরুর কাছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই অনভিপ্রেত পদক্ষেপের প্রতিবাদ করেন। শিক্ষকদের মূলতঃ 'সেবাব্রতী' হিসাবে চিহ্নিত করলেও, এই সেবার বিনিময়ে প্রকৃষ্ট রূপে তাঁদের গ্রাসাচ্ছদনের দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর সামগ্রিক উন্নয়ন স্কুল ভবন, খেলার মাঠ, গ্রন্থাগার, বিক্ষণাগার প্রভৃতির স্বল্পতার দিকেও তিনি নেহরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার মতে, ছাত্রদের পড়াশোনার খরচও সরকার কর্তৃক বহন করা উচিৎ। ন্যূনতম গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য শিক্ষকেরা বেতন বৃদ্ধির যে দাবি জানিয়ে আসছিলেন, তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সত্যপ্রিয় বাবু শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের ট্রেনিং ইত্যাদির সুসামঞ্জস্য প্রদানের জন্যও নেহরুর কাছে দাবি জানিয়েছিলেন। যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে এই মেমোর‍্যান্ডামে সত্যপ্রিয় রায় লিখেছিলেন, 'What do teachers really demand? They want to work in a better condition so that they may train up their charges, the young hope fuls of the nation into perfect manhood. They want education to spread to the poorest citizens in the country. They know the handicaps the students are now working under and they know the concrete steps may gradually remove these handicaps'.[১৬] পরবর্তী অভিজ্ঞতায় অবশ্য দেখা যায় এই মেমোর‍্যান্ডাম অরণ্যে রোদনই হয়েছিল।

১৯৫৬-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষের সভাপতিত্বে বিশেষ শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সরকার কর্তৃক শিক্ষক কল্যাণ ও শিক্ষা ক্ষেত্রের অবহেলার প্রতিবাদে এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওই বছরের ২০ মার্চ বিধানসভা অভিযানের কর্মসূচী

গৃহীত হয় উক্ত সম্মেলনে। সেই সময় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাংলা ও বিহারকে একটি একক প্রদেশে রূপান্তরিত করবার একটি পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনার কথা চাউর হবার পরে বিশেষতঃ বামপন্থী দল ও গণসংগঠনগুলি এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে। শিক্ষক সমিতি ও অন্যান্য গণসংগঠনের সঙ্গে একসুরে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তারা তাদের সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করে।[১৭]

শেষ পর্যন্ত তাদের ৫৪' খ্রিস্টাব্দের দাবিগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৫৬-এর এপ্রিল মাসে, আবার কোলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে সমিতির একত্রিশ বছরের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ডাঃ প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বছরে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের বর্ধমান বিভাগ শিক্ষাকেন্দ্রে সমিতির অন্যতম নেতা মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করে বিজয়ী হন। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বয়ংশাসন এবং স্বাধিকারের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে রাজ্য সরকারের শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ নীতি ও মাধ্যমিক শিক্ষার সর্বময় কর্তৃত্ব শিক্ষা অধিকর্তার হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৯৫৬-এর ২১ জুলাই, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, মাধ্যমিক শিক্ষকদের সমিতি ও প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির যৌথ আহ্বানে সর্বস্তরের শিক্ষকদের এক বিশাল সমাবেশ কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া সেই বছরে রাজ্যে ভয়াবহ বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে সমিতি ত্রাণকার্যেও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

সেই সময় আইনসভায় ABTA-র প্রতিনিধি হিসাবে সত্যপ্রিয় রায় ও অনিলা দেবী নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে তারা শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষকদের সামগ্রিক মতামতকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। বিধান পরিষদে এক বক্তৃতায় অনিলা দেবী ১৯৫৪-৫৫ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষা খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল, পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দে তা হ্রাস করার প্রতিবাদ জানিয়ে তীব্র ভাষায় বলেছিলেন, যে 'গ্রান্ট টু সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ডে'র ব্যয় বরাদ্দ পূর্ববর্তী বছরে ৩৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা কমিয়ে ৩০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে, যা সামগ্রিক পরিস্থিতিতে শিক্ষা সংকোচনের দ্যোতক হিসাবেই পরিলক্ষিত হয়েছে। তাঁর ভাষায় ''শিক্ষা বাজেটে দেখানো হয়েছে ৮ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার হিসাব যা গত বছরের তুলনায় ২ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা বাড়তি অর্থাৎ সামগ্রিক বাজেটের ¼ ভাগ। কিন্তু এই ৮ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার মধ্যেই আমাদের শিক্ষিত বেকারদের সাহায্য ও অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্য ২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে (১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা আসছে কেন্দ্র থেকে) অবশ্য যদি প্রকৃতই শিক্ষার ব্যাপারে এই শিক্ষিত যুবকদের নিয়োগ করা হত, তাহলে হয়তো এই টাকাটা শিক্ষাখাতের অঙ্গীভূত হতে পারত। কিন্তু সেখানে যে কত টাকা কারচুপি চলছে, সেটা আমি এখানে একটু তুলে ধরবার জন্য চেষ্টা করবো। শিক্ষিত বেকার ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য যে ২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা শিক্ষাখাতে ঐ ৮ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকার মধ্যে অঙ্গীভূত করা হয়েছে, সেখানে আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য, সমাজ জীবনের নানা প্রকার সমস্যার সমাধানের জন্য বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য, ঐ ২

কোটি ১৯ লক্ষ টাকা কেন আরও বেশি নিয়োজিত হোক আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু জনমতকে বিভ্রান্ত করে দেবার জন্য শিক্ষাখাতে এই ব্যয়ের মাত্রা যে কেন এখানে দেখানো হয়েছে, কেন ওটা এখানে ধরা হয়েছে আমরা সেটা বুঝতে পারছি না।"[১৮] এইভাবে শিক্ষা বাজেটে সরকারি কারচুপির কথা তুলে ধরে অনিলা দেবী জনসাধারণের সামনে তৎকালীন সরকারের জনবিরোধী নীতির কথা তুলে ধরেছিলেন, আইনসভাকে ব্যবহার করে। এরপর থেকে আমরা বারে বারেই দেখতে পাই আইনসভায় নির্বাচিত প্রগতিশীল শিক্ষক নেতৃবৃন্দ শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে শিক্ষক ও শিক্ষা স্বার্থে জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

সমস্ত আন্দোলনের মধ্যেই জোয়ার ভাটার মতো টানাপোড়েন থাকে। ৫৪-এর আন্দোলনের পর ৫৫ থেকে ৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছোটখাটো বিভিন্ন ধর্ণা আন্দোলন শিক্ষকেরা সংগঠিত করলেও, সেরকম বড় কোন আন্দোলন হয়নি। সংগ্রামের কৌশল হিসাবেই এটিকে আমরা ধরতে পারি। বড় কোন আন্দোলনের পর, আপামর শিক্ষক শিক্ষিকাদের পুনরায় সংগ্রামে সংযোজিত করবার জন্য সময় দিয়েই, পরবর্তী বৃহত্তর আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার এই রণকৌশল পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সংগ্রাম আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। আমাদের দেশেও জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রশস্ততর ক্ষেত্রে গান্ধীজী এই রণকৌশল গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই 'watch and wait' পর্বের পরেই নিজস্ব দাবিতেই আবার আন্দোলনে অবতীর্ণ হতে হয়।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষকরা এরকমই একটি নতুনতর আন্দোলন তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। এর অব্যবহিত পূর্বে ১৯৫৭-এর এপ্রিল মাসে বনগাঁ শহরে, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ খগেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে শিক্ষক সমিতির ৩২তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবাংলার শিক্ষা ব্যবস্থায় একাদশ এবং দশম শ্রেণির বিদ্যালয়ে একই শিক্ষাক্রম প্রবর্তন ও দশম শ্রেণি যুক্ত সমস্ত বিদ্যালয়কে একই সঙ্গে একাদশ শ্রেণি ও বহুমুখী বিদ্যালয়ে উন্নীত করার দাবিতে সম্মেলন সোচ্চার হয় ওঠে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (অধুনা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) সমিতির বিশেষ সম্মেলনে প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা যোগদান করেন। সেই সময় শিক্ষক ঐক্যের কোমর ভেঙে দেবার তাগিদে সরকার একটি তুঘলকি নিয়ম চালু করেন। ওই সময় পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠিত হয়েছে, সরকারি চাকুরি প্রার্থীদের নিয়োগের নিমিত্ত। হঠাৎ করে মূলতঃ সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষকদেরও চাকুরির স্থায়িত্বের জন্য ঐ কমিশনের সামনে যোগ্যতা পরীক্ষায় নতুন ভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে, এরকম একটি ঘোষণা সরকার কর্তৃক প্রচারিত হল।[১৮(ক)] কমিশনের এই অসম্মানজনক শর্ত এবং পূর্বের অনাদায়ী দাবিগুলির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় স্তরে এবং জেলাগত ভাবে সেই সময় তীব্র আন্দোলনের ডাক দেওয়া হল। এর আগেই ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি তাদের দাবিগুলিকে বিশ্লেষণ করে এক স্মারকলিপি পেশ করেন। এবারের আন্দোলন আঙ্গিকগত ভাবে একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করল। শুধুমাত্র আর্থিক দাবিদাওয়া নয়—মুদালিয়র কমিশনের ১০+২ শিক্ষাক্রমকে অগ্রাহ্য করে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই সময়ে ১১ শ্রেণির উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম চালু করার

চেষ্টা করলে, তৎকালীন শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ এর প্রচণ্ড প্রতিবাদ করেন। এর প্রতিবাদে ও গণতান্ত্রিক মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের দাবিকে কেন্দ্র করেই ৫৮-এর আন্দোলন শুরু হয়। ৫৪ খ্রিস্টাব্দের সংগ্রামে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় শিক্ষকেরা তাঁদের আন্দোলনে, পথ অবরোধ করে যাত্রীদের অসুবিধার সৃষ্টি করছে, তদনুযায়ী তাঁরা দণ্ডনীয়—এইসব কথা বলে, শিক্ষকদের আন্দোলনকে জনগণের বিরাগভাজন করবার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও এই কাজে তিনি সফল হননি। এই অভিযোগ যাতে পুনর্বার না ওঠে, তার জন্য শিক্ষকেরা 'আত্ম নিগ্রহের' পথে পনেরো দিনের অনশন কর্মসূচি গ্রহণ করে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে অবস্থানের পথকেই বেছে নিয়েছিলেন।

এদিকে ৫৭-এর শেষ দিকে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি তাঁদের দাবিগুলিকে বিশ্লেষণ করে সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। সরকার ওই সালেরই নভেম্বর মাসে শিক্ষকদের বেতন সংক্রান্ত একটি আদেশনামা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাতে অবস্নাতক শ্রেণির শিক্ষকদের বেতনক্রমের কোন পরিবর্তন হল না। এর ফলে শিক্ষক সমাজ অনুধাবন করলেন যে এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে সরকার শিক্ষকদের মধ্যে একটি ভেদ সৃষ্টি করতে চাইছেন। এই পরিস্থিতিতে ৫৭-এর ১৭ নভেম্বর ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে সমিতি একটি প্রতিনিধি সম্মেলন আহ্বান করল। কলকাতা ও জেলাগুলি থেকে আগত শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দ সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করলেন, এই সম্মেলনে। এর পরে শিক্ষকরা তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিলেও, শিক্ষামন্ত্রী সমিতির নেতৃবৃন্দকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন এই বিষয়ে তাঁর কিছু করণীয় নেই। সরকারের এই অপারগতার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকরা সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে পাবলিক সার্ভিস কমিশন বর্জনের ডাক দিলেন।[১৯]

এর পরে, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি সমিতির আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষানুরাগীদের একটি সভা আহূত হয়েছিল। শিক্ষা ক্ষেত্রে যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে শিক্ষাক্রম চালু করবার দাবি জানিয়েছিল এই সভা। ওই বৎসরেরই ১৯ জানুয়ারি সরকারি অনীহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ গণ অনশন সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন শিক্ষকেরা। শিক্ষকদের এই সংগ্রামের সিদ্ধান্তকে তরল করে অমানবিক ভাবে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়, এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'অনশন, অনশন আবার কোথায় হয়, লুকিয়ে লুকিয়ে তো খায় সবাই'।[২০] সমিতির সম্পাদক সত্যপ্রিয় রায় মুখ্যমন্ত্রীর এই অভব্য মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন স্বাভাবিক ভাবেই।

১০ ফেব্রুয়ারি ৫৮ শিক্ষকদের ভুখ হরতাল শুরু হল। অনশনব্রতী শিক্ষকদের কেন্দ্র করে সমিতির নেতৃবৃন্দ সরকারের শিক্ষক বিরোধী মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ করে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। শয্যাহীন ভূমিতলে বসে শতশত শিক্ষক অনশনব্রতী কর্মসূচি গ্রহণ করলেন। সমিতির তৎকালীন অন্যতম নেত্রী মায়া চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণ থেকে আমরা জানতে পারি যে কোলকাতার কেন্দ্রগতভাবে যে সমস্ত শিক্ষক- শিক্ষিকা অনশন সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে (১) সুহাসিনী সেন (হুগলী), (২) মায়া চক্রবর্তী (হাওড়া) (৩) নন্দিনী ভট্টাচার্য (মেদিনীপুর), (৪) গৌরাঙ্গ পতি (বর্ধমান) (৫) গোলক পতি রায় (কোলকাতা) (৬) রণজিৎ দত্ত (বীরভূম)

(৭) সুনীল রায় (বাঁকুড়া) (৮) ভবানী প্রসাদ তলাপাত্র (সাবেক পশ্চিম দিনাজপুর) (৯) জানকীনাথ নিয়োগী (নদিয়া) (১০) শশীমোহন ভট্টাচার্য (হুগলী) (১১) বীণা বন্দ্যোপাধ্যায় (২৪ পরগণা) (১২) অসীমবন্ধু হালদার (হাওড়া) (১৩) অচ্যুতানন্দ হালদার (২৪ পরগণা) প্রমুখ, তেত্রিশ জন শিক্ষক শিক্ষিকা। সমিতির সর্বোচ্চ নেতা সত্যপ্রিয় রায়ও এই গণ অনশন সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[২১]

কোলকাতার বাইরে জেলাগত ভাবেও এই অনশন সত্যাগ্রহ কর্মসূচি পালন করা হয়েছিল। এই সমস্ত কেন্দ্রগুলির মধ্যে বহরমপুর, তমলুক, বনগ্রাম, দিনহাটা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ির কেন্দ্রে অনশন কর্মসূচি যথেষ্ট পরিমাণে সফল হয়েছিল। এই সব কেন্দ্রে যে সমস্ত শিক্ষক নেতা বা কর্মীরা অনশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সুনীতিকুমার বিশ্বাস (বহরমপুর), পুলক রঞ্জন বেরা (তমলুক), অজিতকুমার বসু এবং বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত (বনগ্রাম), ভূপেন্দ্রচন্দ্র রায় (দিনহাটা), সবিতা মজুমদার (রায়গঞ্জ), বঙ্কিমচন্দ্র গোস্বামী (বালুরঘাট), হরিগোপাল সরকার এবং গোকুল মাহাতো (পুরুলিয়া) এবং তারা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ মিত্র, কল্যাণ দাশগুপ্ত (জলপাইগুড়ি) প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতেই পারে। জেলাগুলিতে অনশনব্রতী শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ ছুঁয়েছিল।

এই অনশন সত্যাগ্রহের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপনের জন্য, তৎকালীন বিরোধী দলের নেতা জ্যোতি বসু অনশন কর্মসূচিতে প্রায় প্রতিদিনই আসতেন। অনশন চতুর্থ দিনে পড়ার পর বিধানসভায় বিরোধী দলগুলি, এই বিষয়ে জোরালো ভাবে সরকারের হস্তক্ষেপের দাবি জানাতে শুরু করলেন। অনশনব্রতী শিক্ষক শিক্ষিকাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য কমিউনিস্ট বিধায়ক তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ নারায়ণ রায় প্রায় প্রত্যেক দিন অনশন স্থলে হাজির থাকতেন।

ওদিকে সরকার আন্দোলনের দাবি দাওয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে এক অনড় অবস্থান নিয়েছিলেন। আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, এই ছিল তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের মত। কিন্তু অনশন সত্যাগ্রহ সাত দিন না পেরোতেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। শুধু সংগ্রামের স্রোতে নয়—বিরোধী দল নেতা জ্যোতি বসু, দেবেন সেন, হেমন্ত বসু প্রমুখের চেষ্টায় সরকার তার অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়।[২২]

আমাদের মনে রাখতে হবে, সরকারের শিক্ষা জগৎ সংক্রান্ত এই দমনপীড়ন নীতির প্রতিবাদে রাজ্য আইনসভার বিরোধী দলের সভ্যরা সোচ্চার হয়ে উঠবার ফলে, বাইরের মাঠে ময়দানের শিক্ষক আন্দোলনও জোরদার হয়ে উঠেছিল। এ যেন ৫৪-এর আন্দোলনেরই প্রতিফলন। ৫ জুন ১৯৫৮ রাজ্যের শিক্ষা পরিবেশের দুর্দশা এবং শিক্ষকদের অসহনীয় দুঃখ দুর্দশার কথা তুলে ধরেছিলেন, বিশিষ্ট কমিউনিস্ট বিধায়ক সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার। তিনি সরকারকে ঔপনিবেশিক আমলে সৃষ্ট হওয়া জঞ্জাল অর্থাৎ রীতি রেওয়াজ থেকে মুক্ত হবার জন্য, সরকারকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'আমরা তো শুধু কতকগুলি যন্ত্রপাতি বা কতকগুলি কলকারখানা তৈরি করতে যাচ্ছি না। আমরা একটা নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। এবং সেই নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করবে নতুন মানুষ এবং সেই সেই নতুন মানুষ সৃষ্টি করবে

শিক্ষা।'[২৩] তার মতে শিক্ষকেরাই এই শিক্ষাতরীর দাঁড়ি/মাঝি স্বরূপ। প্রাথমিক শিক্ষকদের পাশাপাশি মাধ্যমিক শিক্ষকদের দুরবস্থার চিত্রও তিনি বিধানসভায় তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন। তাঁর মতে, 'হাইকোর্ট থেকে পরিষ্কার রায় দেওয়া হয়েছে যে শিক্ষকদের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সম্মুখে যাওয়া সংবিধান বিরোধী। সেই রায় সত্ত্বেও তাকে অমান্য করে শিক্ষাদপ্তর কীভাবে কাজ করছেন? বেতনের ব্যাপারে কি করছেন? কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৭-৫৮ সালে মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির পক্ষে অর্ধেক দিতে রাজি হয়েছেন। বাকি অর্ধেক রাজ্য সরকার দিতে রাজি হননি। তাঁরা দায়িত্ব সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়েছেন।'[২৪] এই বক্তব্যে তিনি প্রবীণ শিক্ষকদের অবসরের আগে একটি মাত্র বেতনবৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্টের) সুবিধা দেওয়াকে সেই শিক্ষকদের প্রতি পরিহাস করা বলে তীব্রভাবে সরকারের সমালোচনা করেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে আরম্ভ করে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি—সর্বত্র যে ভাবে শিক্ষকদের কোণঠাসা করবার পরিকল্পিত পরিকল্পনা করা হচ্ছে তার তীব্র নিন্দাও করেন বিধায়ক। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়ার পক্ষেও সওয়াল করেন তিনি। স্বাভাবিক ভাবেই বিধানসভায় সত্যেন্দ্রবাবুর এই বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর রাজপথের শিক্ষক আন্দোলনের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করেছিল।

আন্দোলনের অষ্টম দিনে ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে অনশন সত্যাগ্রহের অবসান ঘটল। তৎকালীন সমিতি নেত্রী মায়া চক্রবর্তী এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে সমিতির অন্যতম নেতা সন্তোষ ভট্টাচার্যের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তার কথায়, ''৫৮' সালে আমাদের অনশন আন্দোলনের সময়ে সন্তোষ দা (সন্তোষ ভট্টাচার্য) ছিলেন বিধান পরিষদের সদস্য। আমাদের এই আন্দোলন নিয়ে বিধান পরিষদে সন্তোষদা প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।''[২৫] দায়ে পড়ে তৎকালীন সরকার সমিতির কিছু দাবি মেনে নিলেও, ভেতরে ভেতরে কিন্তু সংগঠিত শিক্ষক সংগ্রামকে দমন করার পথেই তারা হাঁটছিলেন। প্রথমেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কর্তৃক বহু ব্যবহৃত 'Divide and rule' নীতি নিয়ে সমিতির মধ্যে একটি ভাঙন ধরাবার জন্য তারা সচেষ্ট হন। কংগ্রেসি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বামনদাস মণ্ডলের নেতৃত্বে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির অতিক্ষুদ্র এক অংশ 'পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি' নামে একটি ভুঁইফোড় সংগঠন স্থাপন করে যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এই বিভাজন নীতিকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে সচেষ্ট হলেও, তাদের কর্ম প্রক্রিয়া তারা কখনোই কৃতকার্য হতে পারেনি। কাগুজে এই সংগঠন তখন থেকেই পূর্বে উল্লিখিত প্রধান শিক্ষক সমিতির লেজুড় হিসাবে কাজ করতে থাকে।[২৬]

বিভাজনের এই গূঢ় মনোভাবের পাশাপাশি শিক্ষক আন্দোলনকে প্রত্যক্ষভাবে দমন করার উদ্দেশ্যে, ''ওয়েলফেয়ার ইনস্টিটিশন বিল'' পেশ করা হয়েছিল ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে। একই বছরে, শিক্ষক আন্দোলনের পাশাপাশি খাদ্য আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার অভিপ্রায়ে 'পশ্চিম বঙ্গ মিছিল ও জনসমাবেশ নিয়ন্ত্রণ বিল' ও উত্থাপিত হয় রাজ্য আইনসভায়। এদিকে ওই সব বিলের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে এবং নির্দিষ্ট ও সুসংহত বেতনক্রমের দাবিতে ৫৯'এর জানুয়ারি মাস থেকেই শিক্ষকেরা লাগাতার আন্দোলন সংগ্রামে লিপ্ত হন। ঐ বছরের ১৮ জানুয়ারি

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকেরা আগামী সংগ্রামের রূপরেখা নির্ধারণের জন্য একটি কনভেনশনে উপস্থিত হন। কনভেনশনে সিদ্ধান্ত হয়, ১০ ফেব্রুয়ারি এই সব দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিধানসভা অভিযান করা হবে। দাবিগুলির প্রতি সরকার কর্ণপাত না করলে ৩০ এপ্রিল প্রতীক কর্মবিরতি পালনের কর্মসূচিও গৃহীত হয় উক্ত কনভেনশনে। ১০ ফেব্রুয়ারি '৫৯' শিক্ষক সমাজ বিধানসভা অভিযান করলেও, সরকারের অনিচ্ছুক হাত থেকে নবতর কিছু সুযোগ সুবিধা তারা কেড়ে নিতে পারেন নি।[২৭] কিন্তু এই সংগ্রামের জন্য যে শিক্ষা আন্দোলন সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়েছিল, তা সর্বস্তরের শিক্ষকদের পরবর্তী কালের মিলিত আন্দোলন সংগ্রামকে একটি শক্তিশালী সাংগঠনিক রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিল। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এদিকে ফেব্রুয়ারি ৫৯-এ আসানসোলে সমিতির বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবী গোপাল হালদার। বাৎসরিক সম্মেলন যৌথ কনভেশনে গৃহিত প্রতীকি ধর্মঘটের ডাকের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে। ১৯৫৯-এর ৩০ এপ্রিল সারা পশ্চিমবাংলায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকেরা একদিনের প্রতীক ধর্মঘট ও অনশনে শামিল হন। ঐ বছরেরই ২৩ আগস্ট রণজি স্টেডিয়ামে, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের উদ্দেশ্যে রচিত 'Wel-fare Institution Bill' এর প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে শিক্ষক সমিতির একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক সমাজের তীব্র 'বিল' বিরোধী মনোভাবে বিব্রত সরকার শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিলটি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। সভা-সমিতি অনুষ্ঠানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে আনিত 'মিছিল ও জনসমাবেশ নিয়ন্ত্রণ বিল'-এরও তীব্র বিরোধিতা করেন শিক্ষকেরা। অন্যান্য গণ সংগঠনের সঙ্গে একত্রে তাঁরা এই বিলের বিরুদ্ধে স্বোচ্চার সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। চাপের মুখে সরকার শেষ পর্যন্ত বিলও প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। এই বছরে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক বন্যা হয়। আমাদের প্রদেশের শিক্ষকেরা শুধু মাত্র রুটি-রুজির জন্য আন্দোলন, সংগ্রাম করেননি। তাই পশ্চিমবঙ্গের এই দুর্বিপাককে অশনী সংকেত মনে করে, তারা বন্যার্তদের ত্রাণ দানের কার্যেও কায়মনোবাক্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এদিকে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর শহরে অধ্যাপক ধীরেন্দ্র নাথ সেনের সভাপতিত্বে, শিক্ষক সমিতির ৩৫তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে অবস্নাতক সহ সর্বস্তরের মাধ্যমিক, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের উপযুক্ত বেতনহার নির্ধারণের জন্য বেতন বোর্ড গঠন, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার সমন্বয় সাধনের জন্য একটি সমন্বয় কমিটি প্রতিষ্ঠা, স্বায়ত্তশাসিত গণতান্ত্রিক মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন এবং চাকুরির নিরাপত্তার দাবিতে শিক্ষকেরা স্বোচ্চার হয়ে ওঠেন। এই বছরেই কুখ্যাত মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে সমিতি তীব্র ও ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত করে। মৃণাল বসুর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, এই সমস্ত দমনমূলক আইন প্রণয়নের পিছনে শিক্ষকদের দমন করা ছাড়াও, আরো ব্যাপক উদ্দেশ্য ছিল।[২৮]

খাদ্য আন্দোলন ও শিক্ষক সমিতি

৫০'এর দশকের শেষে যে গণআন্দোলন পশ্চিমবঙ্গকে সার্বিক ভাবে উদ্‌বেলিত করে তুলেছিল সেটা হল 'খাদ্য আন্দোলন'। তুমুল খাদ্যাভাব জনিত সংকটের বিরোধিতায় সংগঠিত

হয়ে ছিল এই সংগ্রাম। সেই সময়ে বিধান রায়ের সরকার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন একটি ঔপনিবেশিক আইনের সাহায্য নিয়ে, অন্যান্য রাজ্য ও বিভিন্ন জেলার মধ্যে খাদ্য এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির স্বাধীন সঞ্চরণে বাধা সৃষ্টি করেছিল। তার ফলে উদ্‌বৃত্ত অঞ্চল থেকে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যাদির অবাধ সরণে প্রতিবন্ধকতা ও তৎজনিত খাদ্যভাব বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এদিকে সরকারের পাব্‌লিক ডিসট্রিবিউশন বা রেশনিং ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চাল সহ অন্যান্য খাদ্যের অভাব ও কেরোসিন সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংকট দেখা দিল। দেখা দিল খাদ্যে ব্ল্যাক মার্কেট ও সক্রিয় হয়ে উঠল চোরকারবারীর দল।[২৯] এই পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ জনতা ১৯৫৯-এর ১০ ফেব্রুয়ারি এক বিশাল মিছিল নিয়ে সরকারি নীতির প্রতিবাদার্থে বিধানসভা অভিযান করলে পরিস্থিতি জটিলাকার হয়ে উঠল। ক্ষুব্ধ অসংগঠিত জনতাকে নেতৃত্ব দিয়ে সুসংবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন বামপন্থীরা। পরে মার্চ মাসে ওয়েলিংটন বা সুবোধমল্লিক স্কোয়ারের এক মহতি জনতার সিদ্ধান্ত মতো গ্রাম বাংলার কৃষকেরা কোলকাতা কাঁপিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে। ২৬ জুন হল রাজ্যব্যাপী ধর্মঘট, ১৪ জুলাই থেকে শুরু-হল প্রতিবাদী সত্যাগ্রহ।[৩০]

সরকার কোনরকম আলোচনা ব্যাতিরেকে দমনমূলক ভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সচেষ্ট হন। ১৯৫৯-এর ১৮ আগস্ট সতেরো জন বিধানসভার সদস্যসহ একশো জন বাম নেতাকে গ্রেফতার করা হল। প্রতিবাদে ৩১ আগস্ট কোলকাতা জনবিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠলো। মিছিল রাজভবন অবরোধে উদ্যত হলে, পুলিশ লাঠি-গুলি চালালো প্রচুর মানুষ হতাহত হল এতে। ১ সেপ্টেম্বর ছাত্রদের প্রতিবাদ মিছিলেও রাষ্ট্রশক্তি বলপ্রয়োগ করল। শিক্ষকেরাও ব্যক্তিগত ও সংগঠনিক ভাবে এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। ৫৪'তে সমাজের অন্যান্য শ্রেণির মানুষ শিক্ষকদের সংগ্রামে সহায়তা প্রদান করেছিলেন। 'গুরুবৃন্দের' সেই আন্দোলনে কৃষকরাও সমর্থন জানিয়েছিলেন। এবার তাই প্রতিদানের পালা। বিশিষ্ট কৃষক নেতা, মহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'তিনি (সত্যপ্রিয় রায়) ও তাঁর নেতৃত্বে তাঁর সহকর্মীরা সিদ্ধান্ত নিলেন, এ.বি.টি.এ.-র আন্দোলনকে আর বিচ্ছিন্ন রাখা যাবে না। সেজন্য শুধু অন্যান্য স্তরের শিক্ষকদের আন্দোলন ও সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক কায়েম করাও যথেষ্ট হবে না। ছাত্র সমাজের আন্দোলনের সঙ্গে, ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সভা প্রভৃতি লড়াকু গণসংগঠন ও তাদের আন্দোলনের সঙ্গেও তাকে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সে সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে সত্যপ্রিয় বাবুর উৎসাহের অভাব হ'ল না।'[৩১]

শিক্ষকরা, তাদের মিথ্যা অস্মিতার বেড়াজাল ছিন্ন করে এই ভাবে সমাজের অন্য অংশের মানুষের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তারা অনুভব করতে পারেন, যে তারা অবশ্যই শিক্ষা সেবক—তার পাশাপাশি জীবন ধারণের জন্য শিক্ষকের কাজ একটি জীবিকাও বটে—যেমন জাতির অন্নদাতা কৃষকদের কাজও একই সঙ্গে সেবা ও জীবিকা। খুব ধীরে হলেও শিক্ষক আন্দোলনের একাকিত্ব ভাঙতে থাকলো। তখন থেকেই শিক্ষকেরা মনে করতে থাকে 'কৃষক খাটে খেত খামারে/মজুর খাটে কলে/আমরা খাটি বিদ্যালয়ে/সভ্যতা তাই চলে'। এই

মনোভাব পরিবর্তনের অবশ্য অন্য একটা দিক ছিল। সেটা হল স্বাধীনোত্তর যুগে ক্রমশ; বিভিন্ন পেশার গণসংগঠনগুলি বিভিন্ন দলের ছত্র ছায়ায় চলে যাচ্ছিল। ABTA ও এই 'কোন দলে তুমি?' এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে পড়ছিল—তারা মূলত বামপন্থী বা বিশেষ করে কমিউনিস্ট শিবিরের কাছাকাছি এসে পড়ছিলেন। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী থেকে কোন বিশেষ মতাদর্শে অভিষিক্ত হওয়ার যে পদ্ধতি তা অনেক 'উদার নৈতিক স্বাধীন চিন্তার' শিক্ষকের যে পছন্দ হয়নি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পরবর্তীতে বিশেষ করে, ১৯৬৫তে ১২ জুলাই কমিটির অন্তর্ভুক্ত হবার পর ABTA-র চরিত্রের যে মূলগত পরিবর্তন হয়েছিল, তা আমরা পরে আলোচনা করব।

শিক্ষক সমিতিতে বামপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধি

এটা ঠিক যে, পশ্চিমবাংলার শিক্ষক আন্দোলনে, প্রাথমিক পর্বে, এমনকি ১৯৫৪-এর বিশ্বখ্যাত 'শিক্ষক সংগ্রাম' কালীনও দক্ষিণ-বাম নির্বিশেষে কংগ্রেস সরকার বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলই সমর্থন ও প্রত্যক্ষ সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কিংবা পরবর্তী কালের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তখনো অবধি শিক্ষক আন্দোলনে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। তবে এর আভাস স্বাধীনতা উত্তর যুগেই আমরা দেখতে পাই। অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক দলের বিপরীতে, কমিউনিস্ট পার্টি শিক্ষক ও শিক্ষা জগৎ সম্বন্ধে তাঁদের নীতি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনী ইস্তাহারেই প্রথম প্রকাশ করেছিল। সেই ইস্তাহারের পাতা যদি আমরা উল্টাই তবে দেখতে পাবো, শিক্ষকদের অসহনীয় ও ছাত্রদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে তারা ইস্তেহারে লিখেছিল, '.....বহু শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, শিক্ষক, অফিস কর্মচারী, পুরুষ, রমণী এমনকি শিশু পর্যন্ত, বর্তমান সরকারের পুলিস, সেনাবাহিনী ও হোমগার্ডের হস্তে নিহত হইয়াছেন। অহিংস কংগ্রেসি শাসনের স্মারক হিসাবে সহস্র জনতা নিজদেহে লাঠি ও গুলির চিহ্ন বহন করিতেছেন।'[৩২]

এই ইস্তাহার একটু খুঁটিয়ে খুঁজলেই দেখি যে, তৎকালীন ছাত্রবৃন্দ 'শিক্ষার খরচ' বইতে সমর্থ না হবার জন্য এমনকি স্কুল কলেজ ছেড়ে যাচ্ছে, এই চিত্রও কমিউনিস্ট পার্টি তুলে ধরছিল।

১৯৫৪-এর ১২ দিনের ঐতিহাসিক শিক্ষক সংগ্রামের পরবর্তী কালে, কমিউনিস্ট দল শিক্ষাজগৎ সম্বন্ধে অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠেছিল। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে, কমিউনিস্ট দল, ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতির কাছে, দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমস্যা লিপিতে, ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে আর্থিক সহ অন্যান্য ক্ষেত্রের 'অপচয়' এবং 'অনুন্নয়ন' সম্বন্ধে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার পাশাপাশি শিক্ষক ও শিক্ষা জগৎ নিয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছিল। এই স্মারকলিপিতে শিক্ষা ব্যবস্থার তিনটি রূপ অর্থাৎ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত জনবিরোধী নীতিসমূহ সম্বন্ধে উপরোক্ত দল নিজের মতামত তুলে ধরেছিল। এখানে আমরা শুধুমাত্র আমাদের আলোচ্য মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের কথাই তুলে ধরব। তখন ৫৮ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষক আন্দোলনের

সমাপ্তি ঘটলেও, তার বেশ রয়ে গেছে। এই রকম পরিস্থিতিতে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে তৎকালীন রাষ্ট্রপতিকে বলা হয়, 'মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের কোন সামগ্রিক পরিকল্পনা নাই এবং বিভিন্ন পাঠ্যতালিকার মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য নাই.....রাজ্য মন্ত্রীসভার জনবিরোধী শিক্ষানীতির কল্যাণে সাধারণ লোকের পক্ষে শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।'[৩৩] শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার বাস্তব অবস্থার পাশাপাশি শিক্ষাঙ্গনে গণতান্ত্রিক পরিবেশের অভাবের কথাও উক্ত পার্টি তুলে ধরেছিল। স্মারকলিপিতে তাই বলা হয়েছিল, '১৯৫৪ সালের শিক্ষক ধর্মঘটের পটভূমিকায়, এই সরকারের ১৯৫৫ সালের গোড়ার দিকে সম্পূর্ণ অ-গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে.....মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে বাতিল করিয়া দিয়া রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে আনয়ণ করিলেন, এবং এই আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ এখনো চলিতেছে।'[৩৪]

রাষ্ট্রপতির কাছে প্রদত্ত এই স্মারকলিপিতে, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের ব্যাক্তি স্বাধীনতাকে লঙ্ঘন করার সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে বলা হয়, 'রাজনৈতিক কারণে, অধ্যাপক শিক্ষক প্রভৃতিদের নিয়োগ করা, চাকুরি হইতে বরখাস্ত করা, শিক্ষকদের তথাকথিত ''জনস্বার্থের খাতিরে'' দূরবর্তী স্থানে বদলির আদেশ দেওয়া।' ইত্যাদিরও তীব্র প্রতিবাদ করা হয়।[৩৫] কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে, শিক্ষকদের অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে, স্মারকলিপিটিতে বলা হয়েছিল, 'এই সরকার সমান শিক্ষা ও সমান অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকদের জন্য বেতন ও ভাতার বিভিন্ন হার নির্দিষ্ট করিয়া শিক্ষকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করিতেছেন। সর্বশেষে, এই সরকার রাজ্যের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য বাঁচার মতো বেতন ও ভাতা নির্দিষ্ট করার ব্যবস্থা গ্রহণে অস্বীকার করিয়াছেন।'[৩৬]

আমরা যখন পরবর্তীকালে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সঙ্গে বামপন্থীদের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে সদর্থক এবং নঞর্থক উভয় দিক থেকেই আলোচনা করব, তখন উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতেই বুঝতে চেষ্টা করব ১৯৫৪-এর পর থেকেই বামপন্থীরা যে রকম ভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ময়দানে প্রথমাবধিই শিক্ষকদের পাশে দাঁড়াবার পাশাপাশি, তাঁদের দলিল দস্তাবেজ নিয়ে বাংলার শিক্ষকদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তারই ফসল হিসাবে তারা পরবর্তীকালে শিক্ষকবৃন্দের সম্মিলিত সহযোগিতা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে, সে প্রসঙ্গ পরে। এখন এই দলিল শুধুমাত্র কালনৌচিত্ত দোষ কাটাবার জন্য উল্লিখিত হল।

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এবং ১৪ এপ্রিল অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে জলপাইগুড়িতে সমিতির রাজ্য সম্মেলনে প্রধানতঃ চারটি দাবিকে কেন্দ্র করে, ওই বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে লাগাতার কর্মবিরতির কর্মসূচি গৃহীত হয়। দাবিগুলি ছিল—(১) শিক্ষা সমন্বয় কমিটি গঠন, (২) গণতান্ত্রিক মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন (৩) চাকরির নিরাপত্তা কমিটি গঠন এবং (৪) বেতন, নির্ধারণ, কমিটি গঠন। দাবিগুলি একটু খুঁটিয়ে খুঁজলেই এর সারবত্তা প্রাঞ্জল ভাবে বোঝা যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাই সাধারণ ভাবে তিনটি পর্যায় অর্থাৎ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় বিভক্ত। কাজের সুবিধার জন্যই এই

বিভাজনকে বজায় রাখা হলেও, এটা মনে রাখতে হবে, শিক্ষার এই তিনস্তর ব্যবহারিক ভাবে একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষাকে একটি পিরামিডাকৃতি কাঠামো হিসাবে দেখলে, এই পিরামিডের সর্বনিম্ন স্থলে প্রাথমিক, মধ্যবর্তী স্তরে মাধ্যমিক ও সর্বোচ্চ উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা কল্পনা করতেই পারি। সর্বনিম্ন স্তর বা ভিত এবং মধ্যবর্তী স্তরের শিক্ষায় বিশৃঙ্খলা হলে, তা উচ্চশিক্ষায় অবশ্যই ছাপ ফেলবে। তাই শিক্ষকদের এই সমন্বয় কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে, অখণ্ড শিক্ষাকাঠামোর শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রস্তাব যথেষ্ট বিজ্ঞান সম্মতই ছিল।

এদিকে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে অনেক টালবাহানার পর মাধ্যমিক, শিক্ষার পরিচালক হিসাবে মাধ্যমিক বোর্ড গঠিত হলেও, তাতে মধ্য শিক্ষার মূল স্থপতি শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব স্বল্পই ছিল। এছাড়া সরকার কর্তৃক নিয়োজিত শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি ও সচিবেরা প্রায়শয়ই মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রায় অনভিজ্ঞই ছিলেন। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাঁরা বহুলাংশেই সফল হতে পারেননি। মৃণালকান্তি দত্তের গবেষণা পুস্তক থেকে আমরা জানতে পারি '...most of the time it was one man show.' তদুপরি 'The state Government superseded the Board, in 1954, placing it under an administrator.'[৩৭] স্বাভাবিক ভাবেই মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার কেন্দ্রে এই স্বৈরতান্ত্রিকতাকে শিক্ষকেরা মেনে নিতে পারেননি। ছাত্রছাত্রী সহ সমস্ত শিক্ষাকাঠামোর সুপরিচালনার জন্য ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বোর্ডের গণতন্ত্রীকরণের জন্য চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করছিলেন তাঁরা।

তখন অবধি শিক্ষকদের নিয়োগ, স্থায়ীকরণ ও বরখাস্তের মূল নিয়ন্ত্রক ছিলেন স্কুলগুলির পরিচালন সমিতির বকলমায় কমিটির সম্পাদকেরা। বেশির ভাগ সময়েই স্কুলের স্থাপনাকালীন 'Donar' দের মধ্য থেকেই তাঁরা নির্বাচিত হতেন। ৫৪'এর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাঁদের বিষ দাঁত ভেঙে দেবার চেষ্টা হলেও, প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার জোতদার, কিংবা শহুরে বড় লোকদের প্রতিনিধি ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদকবৃন্দ তখনও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিয়ামকদের সঙ্গে তাদের অনেক সময়ই সখ্যতার সম্পর্ক ছিল—তাই ৫৪'এর মহাসংগ্রামের পরেও, যখন তখন চাকুরি কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস করে, একটি নির্দিষ্ট নীতি নেওয়ার জন্য শিক্ষকেরা বারে বারেই দাবি তুলছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বেতন কাঠামোর উন্নয়ন সম্পর্কে আন্দোলনের চাপে সরকার নিমরাজী হলেও, বাস্তবে নিজ প্রতিশ্রুতি পরিপূরণে সরকারের অনীহাও শিক্ষকদের নজর এড়িয়ে যায়নি। তাই বেতন সংক্রান্ত সরকারি নীতি নির্ধারণের সহায়ক হিসাবে তারা একটি বেতন নির্ধারণ কমিটি গঠনের পক্ষে সেইসময় জোরদার সওয়াল করে চলেছিলেন।

যাই হোক এই, সমস্ত দাবি দাওয়া নিয়ে কর্মবিরতির সমর্থনে ৬১'এর ৬ সেপ্টেম্বর তিনহাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী ঝড় জল উপেক্ষা করে বিধানসভা অভিযান করেন।[৩৮] এই পরিস্থিতিতে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসু, বর্ষীয়ান নেতা হেমন্ত বসু প্রমুখ বিভিন্ন দলের নেতৃত্ব মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন, একটা মীমাংসায় আসবার জন্য, কিন্তু তা পুরোপুরি ব্যর্থ হল।

শেষ পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে সমস্ত আলোচনা ব্যর্থ হবার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকেরা ১৮ সেপ্টেম্বর '৬১ থেকে অবস্থান কর্মবিরতি সত্যাগ্রহ শুরু করে দিলেন। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এল। ১৯ সেপ্টেম্বর কর্মবিরতির কর্মসূচি অব্যহত রইল। স্বাভাবিক ভাবেই মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা অচলাবস্থার আশংকা তৈরি হয়ে ছিল। এই সময়ে মীমাংসার চেষ্টায় আবার জ্যোতি বসু, হেমন্ত বসু, দেবেন সেন, যতীন চক্রবর্তী প্রমুখ এগিয়ে এলেন। শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী আলোচনার টেবিলে একটি সমঝোতায় আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। নতুন বেতন হারের সরকারি ঘোষণা ও চাকুরির নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণের সরকারি ঘোষণার পর, ১৯ সেপ্টেম্বরের রাতে আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়েছিল। শিক্ষা সমন্বয় কমিটি তখনোই গড়ার কোন পদক্ষেপ না নেওয়া হলেও, মুখ্যমন্ত্রী নীতিগত ভাবে এই রকম একটি সংস্থাগড়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ওই বছরেরই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল; দিল্লিতে মাধ্যমিক শিক্ষকদের এক সম্মেলনে অখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষক ফেডারেশন গঠিত হয়েছিল। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রাণপুরুষ সত্যপ্রিয় রায় উক্ত সংগঠনের সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রায় সাতবছর তিনি এই পদে আসীন থেকে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষকদের আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে এই সর্বভারতীয় সংগঠনের কটক অধিবেশনের বক্তৃতা সত্যপ্রিয় রায়ের শিক্ষাদর্শন এবং শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে এক দিক্‌নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। প্রাচীনযুগের শিক্ষক-গুরুর মহৎ আদর্শের প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের 'ব্রত' ও জীবিকার ক্ষেত্রে একটি সমন্বয় সাধনের উপরই তিনি জোর দিয়েছিলেন। শুধু মাত্র শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির সংকীর্ণ পরিসরে শিক্ষা আন্দোলন আবদ্ধ হতে পারেনা, এই মত পোষণ করে, তাঁর বক্তৃতায় তিনি বলে ছিলেন, 'We have assembled here to do something of much greater importance so far as the questions of national integration and of the all round progress of the country are concrned.' ভারতের তথাকথিত দারিদ্র্য এবং শিক্ষা ধারার স্রোত বৃদ্ধি করার জন্য সরকারগুলির অনীহাতে আপত্তি জানিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'India has definitely been caught in a vicious circle between her vast illiteracy and a substandard education on the one hand and her stupendous poverty on the other.'[৩৯] তৎকালীন সময়ে ভারত সরকার বার্ষিক মাথাপিছু মাত্র ৬.৪ টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয় করত, যেখানে শ্রীলঙ্কা বা আফগানিস্তানের মতো দরিদ্র দেশগুলির শিক্ষা খাতে ব্যয় ছিল মাথাপিছু যথাক্রমে ১৯ টাকা এবং ৮ টাকা। ওদিকে সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত দেশের বাৎসরিক মাথাপিছু শিক্ষা বরাদ্দ ছিল ৬৫০ টাকা, ভারত কেন শিক্ষা কাঠামোর ব্যয় নির্ধারণের জন্য ন্যূনতম ব্যয় করতে অক্ষম, সেই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভেবে দেখার অনুরোধ করেন, সত্যপ্রিয় রায় এই বক্তৃতায়।

এদিকে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে পুরুলিয়া শহরে অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে, সমিতির বার্ষিক অধিবেশন আহূত হয়। সম্মেলনে পূর্বোক্ত সরকারি ঘোষণাগুলি কার্যকরী না হওয়ায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। মে' মাসে রবীন্দ্র শতবার্ষিক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে সমিতি কেন্দ্রীয়, জেলা ও মহাকুমাস্তরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বামপন্থী কারোর

কারোর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে যে অনীহার ভাব কখনো কখনো প্রকাশিত হত, তাকে 'আমাদের লোক' হিসাবেই স্বীকৃতি দেন আমাদের গুরুকুল। সমিতির মুখপত্র শিক্ষা ও সাহিত্যে, সংগঠনের অন্যতম প্রধান নেত্রী 'রবীন্দ্র স্মরণে' শীর্ষক একটি লেখায়, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যুক্তি ও আবেগের সমন্বয়ে লেখেন, 'তমসাচ্ছন্ন জাতির জীবনে ভাস্বর জ্যোতির মূর্ত প্রতীক রবীন্দ্রনাথ। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে স্বাধিকার বঞ্চিত ভারতের পূর্বকোণ এই বাংলাদেশে যুগ প্রকাশক ও যুগস্রষ্টা এই প্রতিভাধরের আবির্ভাব নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক ঘটনা।.... ''মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক''। রবীন্দ্রনাথের এক কামনা শূন্য হাতে যাজ্ঞা নয়। এর জন্য মানসদানের অর্ঘ্য সাজিয়ে সাধনা করেছিলেন অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি সময়। শিশুমনের প্রভাতী কাকলী থেকে আরম্ভ করে অধ্যাত্ম রঞ্জিত প্রৌঢ় বৈরাগ্যের বৈকালী সুর ধ্বনিত হয়েছে তাঁর কাব্যবীণায়। শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপ পরে যারা কাজ করে, মাটিতে ফসল ফলায়, যারা, সেই অবজ্ঞাতদের পরিচয়ও তাঁর লেখনী-মুখ এড়িয়ে যায়নি। বিশ্বজোড়া প্রাণের মাঝে তাইতো তাঁর স্থান।'[৪০]

এই সব কর্মসূচির মধ্যেও শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা, বকেয়া সরকারি প্রতিশ্রুতি পালনের দাবিতে আন্দোলন কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ৬২'এর ২৭ জুলাই প্রচণ্ড জল-ঝড় সত্ত্বেও বিশাল গণ ডেপুটেশন শিক্ষক সমাজের সংগ্রামী শপথে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শাসকশ্রেণি শিক্ষক সমাজের এই সচেতনতায় আতঙ্কিত হয়ে কি করে সমিতির মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করা যায়—সেই সংক্রান্ত নীল নকসা প্রস্তুত করতে পুনরায় প্রয়াসী হয়েছিলেন এই সময়।

চিন-ভারত সীমানা সমস্যা ঃ শিক্ষকদের ভূমিকা

ইতোমধ্যে চিন-ভারত সীমানা বিরোধ শুরু হয়ে গেছে। সমিতি মনে করেছিল, এই বিবাদ, আলোচনার টেবিলে বসেই সমাধান করা সম্ভব। এ বিষয়ে সমিতির নেত্রী অনিলা দেবী আইনসভায় ২১ নভেম্বর ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বক্তৃতায় সমিতির বক্তব্যকেই তুলে ধরে বলে ছিলেন যে, '(কংগ্রেস সদস্য) রবীন্দ্রলাল সিংহ মহাশয় বলেছিলেন শিক্ষক সমাজের যাঁরা মাতৃভক্তির পরিচয় দিতে পারেননি, যাঁরা সেই পবিত্র ভূমিকা পালন করতে পারেননি, তাঁদের স্থান নর্দমায়।...নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে দ্বিধাহীন ভাষায় একথা বলতে পারি যে, যদি দেশভক্তির পরীক্ষা দেবার প্রয়োজন হয়, নর্দমায় শিক্ষক সমাজ নাববেন, কিন্তু গায়ে পাঁক মাখার দীনতা নিয়ে নয়, আমার দেশের স্বতঃস্ফূর্ত নির্মল চেতনা যাতে কোথাও বাধাপ্রাপ্ত না হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নর্দমার পুঞ্জীভূত বদ্ধ জঞ্জালকে দুই হাতে সাফ করে যথা স্থানে নিক্ষেপ করবার প্রেরণার রূপ নিয়ে।.....কোনো চাপে পড়ে নয়, কোনো ভয়ে নয়, কোনো সমালোচনার জন্য নয়—তাঁরা বিশ্বাস করেন মাতৃ মর্যাদা সবচেয়ে বড়। অতীতে তাঁদের জীবিকা শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা সরকারের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে....কিন্তু আজ যখন সমগ্র দেশের দাবি এক। আমার মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্য, আমার প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য যখন মাতৃভূমির সমস্ত অমর্যাদা দূর করে পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা, তখন সরকারের লক্ষ্যের সঙ্গে শিক্ষক সমাজের লক্ষ্যের কোন সংঘাত নাই।"[৪১] বিধান পরিষদের মধ্যে শিক্ষক নেত্রী যে প্রতিশ্রুতি

দিয়েছিলেন, দেশ ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সাধারণ শিক্ষক সমাজ সেই বক্তব্যকে মান্য করে, এমনকি জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজেও লিপ্ত হয়েছিলেন সেই সময়ে।

আমরা পূর্বে আলোচিত অধ্যায়গুলিতে দেখেছি শিক্ষক সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক লগ্নেই এই সংগঠনের সঙ্গে বামপন্থী বিশেষ করে কমিউনিস্টদের একটি সংশ্রব আছে বলে ঔপনিবেশিক সরকার মনে করত। পরবর্তীকালে স্বাধীনোত্তর ভারতেও শিক্ষক আন্দোলনের রূপ রেখা বামপন্থী দলগুলির অঙ্গুলি হেলনে প্রস্তুত হয়—এরকম একটি প্রচার সরকারের তরফ থেকে করা হত। কিন্তু ৬২'এর চিন-ভারত সীমানা সংঘর্ষেই শিক্ষক সমিতির অবস্থান প্রমান করে দেয়, যে চিনকে নিছক আক্রমণকারী বলে ডানপন্থী কমিউনিস্টদের ব্যাখ্যা, কিংবা সমাজতন্ত্রী চিন কখনোই পরদেশ আক্রমণ করতে পারেনা—এই বামপন্থী কমিউনিস্টদের মত, এর কোনটাই শিক্ষক সমিতি অন্ধভাবে মেনে নেয়নি। ব্যক্তিগত ভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হলেও, 'শিক্ষক' কেন্দ্রের প্রতিনিধি অনিলা দেবীও তাই শিক্ষক সমিতির প্রস্তাবিত পথ, দেশরক্ষার কাজে অগ্রণী হওয়া এবং তার সঙ্গে দুইদেশের মধ্যে আলোচনার টেবিলে বসে মীমাংসার সূত্র আবিষ্কারের উপর একই সঙ্গে জোর দিয়েছিলেন। প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল যে শিক্ষক সমিতি একটি 'চাপ সৃষ্টিকারী' সংগঠন হিসাবে, সরকারের অনিচ্ছুক হাত থেকে তাঁদের অধিকার ছিনিয়ে নেবার লক্ষ্যে বামপন্থী ও ডানপন্থী বিভিন্ন বিরোধী দলের সাহায্য নিলেও, তখনো অবধি কোন দলের লেজুড়ে পরিণত হয়নি।

তা সত্ত্বেও ঈশপের গল্পে গড্ডল শাবককে যেমন নেকড়ে, বিনা দোষে মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, ঠিক তেমনি, চিন-ভারত সীমানা সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে উগ্র জাতীয়তাবাদীরা নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বকে দেশবিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করে কুৎসা করতে শুরু করে দিয়েছিল। সমিতির তৎকালীন নেতৃত্বের অন্যতম অমিতাভ সেন এই প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণা করে লিখেছিলেন, 'সমিতি যতই আন্দোলনমুখী হল, পূর্বতন শাসকদের আক্রমণও ততই সমিতিমুখী হতে থাকল। সমিতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করার পর আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলিতে সত্যপ্রিয় রায় আমন্ত্রিত হলেন। এইরকম এক আমন্ত্রণে তিনি চিনে গিয়েছিলেন। ১৯৬২ সালে ভারত-চিন বিরোধের সময় তাঁর এই চিন ভ্রমণ উপলক্ষ্য করে সমিতি বিরোধী প্রচার কাজ শুরু হয়ে যায়। প্রচার করা হতে থাকল সত্যপ্রিয় রায় 'চিনপন্থী'।[৪২] এক সময়ের এ.বি.টি.এ. কর্মী ও পরে বিরোধী প্রধান শিক্ষক সমিতির অন্যতম নেতা', এ প্রসঙ্গে সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্বের গুণপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য হলেও, তার ভাষাতেই, 'এক সঙ্গে কাজ চলছিল একটানা ১৯৬১ পর্যন্ত। চিনের ভারত আক্রমণ সব ওলট পালট করে দিল। আমরা চিনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালাম। সত্যপ্রিয় বাবুর বক্তব্য, চিন কমিউনিস্ট রাষ্ট্র, চিন ভারত আক্রমণ করতে পারেনা।'[৪৩] এই ধরনের কথা অবশ্য সত্যপ্রিয় রায় কখনোই বলেননি। তিনি শুধু দুই দেশের মধ্যেকার সমস্যার সমাধানের জন্য আলোচনার টেবিলে বসবার আহবান জানিয়ে ছিলেন। উপরোক্ত বক্তব্যের লেখক সূর্য্যাংশু ভট্টাচার্য শুধু নয়—নীহার দাস, পৃথ্বীশ বসু, হীরেন্দ্র নাথ রায়, প্রফুল্ল ভট্টাচার্য, কালী কুণ্ডু, ফনী দাস, সুধীর রায় প্রমুখ অনেক নেতাকর্মীই

এই চিন সম্পর্কিত সত্যপ্রিয় রায়/অনিলা দেবীর বক্তব্যের সার মর্ম না বুঝে, আহত জাতীয়তাবাদকে পুঁজি করে, কংগ্রেস প্রভাবাধীন প্রধান শিক্ষক সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন। এই ভাঙনের পিছনে সরকারি হস্তের প্রভাব একেবারে অস্বীকার করা যায় না। '৬১ খ্রিস্টাব্দে সমিতির আন্দোলন কালে মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট শিক্ষার দাবিগুলি পরিপূরণের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তিনি রক্ষা করেননি। স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষুব্ধ সমিতি নেতৃত্ব '৬২ সালের নির্বাচনে শাসক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। যদিও তা সংগঠনের সামগ্রিক সিদ্ধান্ত ছিল না।

এই নির্বাচনের পরেই ঘটে ভারত-চিন সীমানা সংঘর্ষ। দেশে জারি হয় 'জরুরি অবস্থা'। ভারত রক্ষা আইনে সরকার নির্বিচারে রাজনৈতিক দল ও গণ সংগঠনের নেতাদের গ্রেফ্তার করা শুরু করল। এ.বি.টি.এ.-র মতো প্রাচীন শিক্ষক সংগঠনও ছাড় পেলনা। গ্রেফ্তার বলেন সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী, গোলকপতি রায়, প্রমুখ সমিতি নেতৃত্ব। সমিতির 'মাথা'দের বন্দী করা হলেও, শিক্ষক সমাজের সংগ্রাম এবং সংগঠনকে সজীব রাখার কাজ কিন্তু থেমে থাকেনি। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, ৬২'এর ডামাডোলের মধ্যেও কিন্তু শিক্ষক সমাজ সংগ্রামী শপথে দৈনন্দিন আন্দোলনকে স্থগিত রাখেন নি, স্বভাবতঃই শাসক শ্রেণি শিক্ষক সমাজের সংগ্রামী শপথে ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে, সমিতিকে দুর্বল করার লক্ষ্যে 'ডেমোক্রেটিক টিচার্স ফ্রন্ট' নামে একটি কাগুজে শিক্ষক সংগঠন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। ৫৪' খ্রিঃতে নীলনক্সা অঙ্কন করে, ডাঃ বিধান রায় পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। সেই পথে অগ্রসর হয়েই, তৎকালীন কংগ্রেস নেতা 'বঙ্গেশ্বর অতুল্য ঘোষ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এই সংগঠন গড়ে ওঠে। তবে পরবর্তীকালের ইতিহাস প্রমাণ করেছে—এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ভাবেই ব্যর্থ হয়েছিল। নতুন সমিতি কোন ভাবেই শিক্ষক সমাজের মনে দাগ কাটতে পারেনি।[৪৪]

শুধু মাত্র চিন-ভারত সীমানা সংঘর্ষ ঘিরে তাত্ত্বিক বা সংগঠনিক স্তরে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানানো হয়েছিল, তাই নয়—পাশবিক বল প্রয়োগ করার চেষ্টা হয়ে ছিল সমিতির নেতৃত্বকে হটিয়ে দেবার জন্য। ৬২'এর ৮ নভেম্বর একদল সশস্ত্র গুণ্ডা হামলা করল সমিতির কার্যালয়ে। তারা সত্যপ্রিয় রায়কে দিয়ে সমিতির নেতৃত্বের পদত্যাগ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। তাঁকে এবং তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের কার্যালয় থেকে বলপ্রয়োগে বের করে দেওয়ার প্রচেষ্টাও তারা চালায়। রুখে দাঁড়াল উপস্থিত শিক্ষক নেতা ও কর্মীরা। সত্যপ্রিয় রায় হামলাকারীদের দাবিকে অগ্রাহ্য করে জোরে শোরে বলেন যে তাকে জীবিত অবস্থায় কার্যালয় থেকে বহিষ্কার করা যাবেনা। তাঁর মৃতদেহকেই একমাত্র সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। স্বভাব শান্ত শিক্ষকদের এই রুদ্র মূর্তি দেখে শেষ পর্যন্ত 'গুণ্ডার দল' পশ্চাৎ অপসারণ করতে বাধ্য হয়। আবার নৈতিক ভাবে জয়লাভ করেন এ.বি.টি.এ নেতৃত্ব।[৪৫] সংগঠনের সদস্য শিক্ষক সাধারণ, সমিতি অফিসে এই ন্যক্কারজনক গুণ্ডামির তীব্র প্রতিবাদ করতে মনস্থ করে এবং ওই বছরেরই ২০ ডিসেম্বর একদিকে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার আহবান জানিয়ে, অন্যদিকে নিরীহ শিক্ষকদের উপর হামলার প্রতিবাদ করে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে একটি মহতী জনসভা

আহ্বান জানানো হয়। শিক্ষক, ছাত্রসহ আপামর জনতা এই সভায় যোগদান করেছিলেন। শঙ্কিত সরকার শিক্ষকদের সমর্থনে এই গণপ্লাবণ লক্ষ্য করে, উপরোক্ত সভাও গুণ্ডাদের দ্বারা ভেস্তে দেবার পরিকল্পনা করেছিল—কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেনি। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী দেশ রক্ষায় 'রক্তদান' অনুষ্ঠান ও দেশের নিরাপত্তা তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহও করা হয়েছিল, এই সভায়।[৪৬]

শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ও নিজেদের রুটি রুজির স্বার্থে শিক্ষক আন্দোলন চলতেই থাকল। প্রাণ প্রিয় ছাত্রদের কাছে বিশেষ করে দরিদ্রতর ছাত্রদের জন্য মূলত শিক্ষক সমিতির পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিমধ্যেই 'স্টুডেন্টস্ হেলথ হোম' নামে একটি চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছিল। এই বার অর্থকষ্টে ক্লিষ্ট শিক্ষকদের চিকিৎসার জন্য ১৯৬২-এর ৩০ জুলাই সমিতির নিজস্ব ভবনে 'Teachers Health home' প্রতিষ্ঠা করা হল। এই চিকিৎসাকেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন ডাঃ অমিয় কুমার বসু। যাইহোক ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ সরকার কর্তৃক দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালনের দাবিতে সমিতি একদিনের প্রতীক কর্মবিরতির আহ্বান জানিয়েছিল। শিক্ষক আন্দোলনের তীব্রতা কতদূর যেতে পারে, ইতিমধ্যে সরকারের অভিজ্ঞতায় তা ছিল। আন্দোলনের শিরদাঁড়া ভেঙে দেবার মানসে, তাই সরকারি দলের প্ররোচনায় ১৮ মার্চ, '৬৩ বহুসংখ্যক বিদ্যালয়ের ওপর শাসক শ্রেণির গুণ্ডারা হামলা চালাল। এই বিশেষ সন্ত্রাসজনক পরিস্থিতিতে কর্মবিরতির ডাক প্রত্যাহার করা হলেও, স্বল্প সময়ের মধ্যে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে সেই সংবাদ পৌঁছালো না। সংবাদ ঠিকমতো না পাওয়ায় গ্রামাঞ্চলের বহু বিদ্যালয়ে কর্মবিরতি পালিত হল সফল ভাবেই। সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সরকারি দমননীতির সম্বন্ধে অমূলক ভয় না পেলে হয়তো সারা রাজ্যেই এই কর্মবিরতি সফল হত।

এদিকে ১৯৬৩-এর আগস্ট মাসে কোলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়িতে অধ্যক্ষ শ্রীরামচন্দ্র পালের সভাপতিত্বে সমিতির প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনকে ভেস্তে দেবার জন্য শাসক শ্রেণির ভাড়াটে গুণ্ডাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র শিক্ষক সমাজের সুদৃঢ় প্রতিরোধে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। শোভাবাজার রাজবাড়িতে যে শিক্ষক সম্মেলন হয় সেই সম্মেলন দখল করে নেবার জন্য কংগ্রেসপন্থী কতিপয় ব্যক্তি—সম্মেলনে অবৈধ ভাবে উপস্থিত থাকার মানসে জাল পরিচয় পত্র প্রস্তুত করেছিল। খুব শীঘ্রই এই খবর সমিতি নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে গেলে, অসাধারণ কর্মতৎপরতার পরিচয় দিয়ে, একদিনের মধ্যে নতুন পরিচয় পত্র তৈরি করে সমস্ত বৈধ প্রতিনিধিদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। সমিতির তৎকালীন নেতৃত্বের অংশ ভবেশ মৈত্রের বয়ান অনুযায়ী, 'বিপুল সংখ্যক শিক্ষক এই সম্মেলনে যোগ দেন। তাঁর মধ্যে শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য। উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষিকার মেজাজ ও প্রত্যয় দেখে প্রকৃত অর্থে সমাজবিরোধী ও কংগ্রেসিরা গা-ঢাকা দেয়।....এই সম্মেলনের কথা মনে করলে মনে হয়, ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের শহীদদের রক্তদান ব্যর্থ হয়নি। তা না হলে ছাপোষা শিক্ষকেরা এই সচেতনতা ও আত্মত্যাগের প্রেরণা কোথা থেকে পেলেন। সমস্ত রকম ভয়, তুচ্ছ জ্ঞান করে তাঁরা শত্রুর মোকাবিলায় সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন।'[৪৭]

সম্মেলনে উপস্থিত কয়েক হাজার প্রতিনিধি ধিক্কার জানালেন কংগ্রেসের ঔরসজাত ডেমেক্র্যাটিক টিচার্স ফ্রন্টকে। এই সম্মেলনের পর এই নবতর সংগঠন প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সংগ্রামী ঐতিহ্য ও আন্দোলনের কথা তখন সারা ভারতজুড়ে পরিব্যাপ্ত। এরই স্বীকৃতি স্বরূপ সেই বছর অখিল ভারত শিক্ষক ফেডারেশন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কোলকাতায়। এই সভার সভাপতি হিসাবে, সত্যপ্রিয় রায় সর্বভারতীয় শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুকে একটি স্মারকপত্র প্রদান করেন। এই স্মারকপত্রে তিনি শিক্ষকদের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা তো বলেই ছিলেন—তাঁর পাশাপাশি সামগ্রিক শিক্ষা পরিকাঠামোর উন্নয়নের প্রয়োজনের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে মন্তব্য করেছিলেন, ''প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত বিদ্যালয়গুলির উন্নতি সাধন।... বিদ্যালয়গুলির ঘরবাড়ি জরাজীর্ণ, শিখন সরঞ্জাম নেই বললেই চলে। প্রকৃত অর্থে কোন পাঠাগার নেই। নেই গবেষণাগার কি বা কর্মশালা.....কোন খেলার মাঠ নেই, হলঘর নেই।....পাঠ্যসূচির সহযোগী পাঠদানেরও কোনো পরিকাঠামো নেই।'[৪৮] তাঁর মতে এই হারকুলিয়ান সমস্যার সমাধানের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এবং জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের জন্য শিক্ষার দরজা উন্মুক্ত করে দিতে হবে। সাধারণ ভাবে অনেক সময়ই মনে হয় যে শিক্ষকরা অন্যান্য কর্মজীবীদের মতো শুধুমাত্র নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থের লক্ষ্যেই আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করেন। তা পুরোপুরি কেন, খণ্ডিত ভাবেও সত্য নয়। অন্যান্য শ্রমজীবী বা মেধাজীবীদের সঙ্গে শিক্ষকদের পার্থক্য এটাই যে, শিক্ষকরা কোন 'কাস্তে হাতুড়ী-কোদাল বেলচা বা কলম বা রংতুলি নিয়ে শুধুমাত্র কাজ করেন না। তাদের কাজ হল' সমাজের সর্বনিম্ন ভিত্তির একক ছাত্রদের আগামী দিনের আদর্শ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। তাই 'জীবন্ত একক' শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশ ঘটানোর দিকেও তাদের লক্ষ্য রাখতে হয়। না হলে তাদের কাজের আনন্দ তো নষ্ট হয়ই তার সঙ্গে জীবিকাও হয়ে পড়ে অনিশ্চিত।

এসে গেল ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ। এপ্রিল মাসে শিক্ষক সমিতির রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বহরমপুর শহরে। সভাপতিত্ব করলেন বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। এই সম্মেলন থেকে সমিতির সভাপতি হিসাবে পুনঃনির্বাচিত হন সত্যপ্রিয় রায়। শিক্ষক সমাজের মধ্যে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। এরই প্রতিফলন হিসাবে বিধান পরিষদের শিক্ষকদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সমিতির প্রার্থী সন্তোষ ভট্টাচর্য ও রাজকুমার চক্রবর্তী নির্বাচনে সহজেই জয় লাভ করলেন। এদিকে অত্যুচ্চ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সমিতি শিক্ষকদের মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের কাছে আরজি জানাল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিধানসভায় ঘোষণা করা হল, শিক্ষকদের মধ্যে যারা দেড়শো টাকা পর্যন্ত বেতন পান, তারা মাসিক পাঁচটাকা এবং যাঁরা দেড়শো থেকে তিনশো টাকা পর্যন্ত বেতন পান তাঁরা মাসিক দশ টাকা হারে মহার্ঘ ভাতা পাবেন। সরকার কিন্তু বিদ্যালয় পরিচালনার অন্যতম স্তম্ভ শিক্ষাকর্মীদের এই রকম কোন সুবিধা দিতে অনীহা প্রকাশ করল। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের সহকর্মীদের বঞ্চনাকে পাশে ঠেলে দেবার কথা শিক্ষকেরা ভাবতেই পারলেন না। '৬৪-এর ৪ সেপ্টেম্বর এর প্রতিবাদে সংগঠিত

করা হল এক গণ মিছিলের। সমিতি আহ্বান জানাল এই বঞ্চনামূলক মহার্ঘ ভাতা বর্জনের। আন্দোলনকে আরো জোরদার করার লক্ষ্যে ৬৪-এর ১৫ সেপ্টেম্বর একদিনের কর্ম বিরতি পালিত হল সারা পশ্চিম বঙ্গে। ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে পাঁচ অক্টোবর এই সাতদিনের অনশন সত্যাগ্রহের পথে শিক্ষক সমাজ অগ্রণী হলেন সমিতির নেতৃত্বে। সমিতির নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক অনিলা দেবীর নেতৃত্বে ত্রিশ জন সত্যাগ্রহী সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে অনশন সত্যাগ্রহ শুরু করলেন। ওই বছরের ২ অক্টোবর ত্রিশ জন অনশন সত্যাগ্রহীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের তাগিদে পাঁচশত শিক্ষক/শিক্ষিকা/শিক্ষাকর্মীবৃন্দ একদিনের প্রতীক অনশনে শামিল হলেন। সত্যাগ্রহ শিবিরে প্রতিদিন শত শত জনতা শিক্ষকদের দাবিকে সমর্থন জানানোর জন্য হাজির থাকতেন। 'দেশ' এর মতো তথাকথিত সরকারপন্থী পত্রিকাও সেই সময় সম্পাদকীয় লিখতে বাধ্য হয়েছিল, 'যাঁদের হাতে দেশের ভবিষ্যত নাগরিক গড়ে তোলার ভাব, তাঁদের সম্মান দেবার দায়িত্বও সমাজকে নিতে হয়। দারিদ্রক্লিষ্ট জীবনের সঙ্গে নিত্য সংগ্রামরত শিক্ষকদের অনন্যোপায় হয়েই, বিনানুমোদিত টিউটোরিয়াল হোম খুলতে হয়। টেক্সট বুক আর অর্থপুস্তকের ব্যবসায়ে তাঁরা প্রকাশকদের ক্রীড়ানক হয়ে পড়েন।'[৪৯]

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে মূল সমিতির বিরোধী ডেমোক্র্যাটিক টিচার্স ফ্রন্টের, শিক্ষকদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা একেবারেই ছিল না। কিন্তু সাধারণ শিক্ষকদের দমন করার অভিপ্রায়ে, কিছু প্রধান শিক্ষকের প্ররোচনায়, পূর্বেই গঠিত প্রধান শিক্ষক সমিতি বারংবার নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কাজে বাধা প্রদান করত। বিশেষ করে '৬৪ খ্রিস্টাব্দে বিধান পরিষদের শিক্ষক কেন্দ্রে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রার্থীদের কাছে পরাজিত হয়ে, ওই সমিতি আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁরা সরকারের সহায়তায় শিক্ষকদের উপর দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তৎপরতা প্রদর্শন করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। এদিকে তখন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্বাচনী দামামা বেজে উঠেছে। অনিলা দেবীর ভাষায়, 'নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির স্পষ্টবাদিতায় ও সংহত শক্তিতে ভীত শিক্ষা দপ্তর প্রধান শিক্ষক সমিতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচন বিভাগের হাতে না দিয়া, শিক্ষা বিভাগের হাতে রাখা নিতান্ত অন্যায়, অযৌক্তিক ও দুর্নীতিমূলক হইয়াছে, সন্দেহ নাই।'[৫০] যাইহোক, এই অসাধু প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ১৯৬৪-এর পর্ষদ নির্বাচনে প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকার জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রধান শিক্ষক সমিতির প্রার্থী বিষ্ণুব্রত ভট্টাচার্য ও সুপ্রীতি সান্যাল, এ.বি.টি-এর প্রার্থী সত্যপ্রিয় রায় এবং শান্তা দেবকে পরাজিত করতে সমর্থ হন। কিছু আগেই হয়ে যাওয়া বিধান পরিষদের শিক্ষক কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফলের নিরিখে যা আশ্চর্যজনক মনে হলে, সরকারের অপক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এতে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সরকারি মদতে প্রধান শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ মধ্যশিক্ষা পর্ষদে নির্বাচিত হবার পরে, প্রতিদানে তারা সরকারের শিক্ষক বিরোধী সমস্ত কর্মের মদতদাতাতে পরিণত হয়। যেসব বিদ্যালয়ে 'প্রধান শিক্ষক সমিতির সদস্য', প্রধান শিক্ষকেরা বর্তমান ছিলেন। সেখানে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সদস্য সহশিক্ষকদের উপর নানা রকমভাবে অত্যাচার নেমে আসত। সমিতি নেত্রী অনিলাদেবী প্রধান শিক্ষক সমিতির এই শিক্ষক স্বার্থ বিরোধী চরিত্রের কথা সেই সময় বিশেষ ভাবে তুলে ধরেন। যেভাবে সরকারের

প্রত্যক্ষ মদতে এবং ভোট গণনায় কারচুপি করে, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরিচালন কমিটির প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা কেন্দ্রে শিক্ষক সমিতির প্রার্থীদের হারিয়ে প্রধান শিক্ষক সমিতির প্রার্থীদের জয়ী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল তার তীব্র নিন্দা করে অনিলা দেবী বলেছিলেন, 'প্রধান শিক্ষক সমিতি আজ যে সাম্প্রদায়িক সুযোগের ব্যবহার করিয়াছেন; তাহার বীজ নিহিত রহিয়াছে ১৯৬৩ সালের মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আইনে।....এই আইনে সহকারী শিক্ষকগণের কোনো স্বীকৃতি নাই, প্রধান শিক্ষকগণ সমস্ত শিক্ষকের ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতিনিধিত্ব করতে পারিবেন ইহাই নীতিগত ভাবে গৃহীত হইয়াছে।.... এইরূপ সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের ভিত্তি রচনার জন্যই এই মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আইন রচিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে মধ্যশিক্ষা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও এই নীতি অনুভূত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।'[৫১] শুধুমাত্র শিক্ষা ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকরণই শুধু এরফলে, বাধা পাবে এমন নয়, এর পাশাপাশি মধ্যশিক্ষা পর্ষদে প্রধান শিক্ষকদের মৌরসী পাট্টা প্রতিষ্ঠিত হলে, তারা সহকারী শিক্ষকদের স্বার্থ নিয়ে খুব একটা উচ্চকিত হবেন না বলেও এক বিবৃতিতে অনিলা দেবী জানিয়ে ছিলেন। সহকারী শিক্ষকদের নিজেদের নাগ পাশে আষ্টেপৃষ্টে আবদ্ধ করার দুরভিসন্ধিতে সেই সময় প্রধান শিক্ষক সমিতি, সহকারী শিক্ষকদের উপর একটি আচরণ বিধি চাপিয়ে দেবার চেষ্টা চালিয়েছিল। এই অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা করে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে অনিলা দেবী নিম্নোক্ত বিবৃতিতে বলেছিলেন, 'প্রধান শিক্ষক সমিতি এই সম্বন্ধে সহকারীদের উপর একটি Service conduct rules চাপাইতে বদ্ধপরিকর। এই রূপ রুল পৃথিবীর কোন দেশে আছে বলিয়া নজির পাওয়া যায়নাই। প্রধান শিক্ষক সমিতির ধারণা D.P.I. হইতে এইরূপ রুল তৈয়ারি করাইয়া সহকারীদের উপর আইনগত বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি করিয়া তাহারা তাহাদিগের নিকট হইতে কাজ আদায় করিয়া লইবেন।...নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি এই সম্বন্ধে প্রধান শিক্ষক সমিতির কার্যধারায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইতেছে এবং এই বিষয়ে দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করিতেছে যে, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কোনো প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাই প্রধান শিক্ষক সমিতির এইরূপ আত্মঘাতী নীতিকে সমর্থন করিবেন না।'[৫২]

এটা ঠিকই যে সেই আমলে সব প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকা, সাধারণ শিক্ষকদের নানা ভাবে শোষণ করতেন না। বরঞ্চ এরকমটা অনেক সময়ই দেখা গিয়েছে, যে তাঁদের মধ্যে অনেকে ম্যানেজিং কমিটির করাল গ্রাস থেকে শিক্ষকদের চাকুরির নিরাপত্তা বজায় রাখবারই চেষ্টা করতেন। কিন্তু সাধারণ শিক্ষকদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে প্রধান শিক্ষক সমিতির যখন জন্ম হল, তখন এই সমিতির মুষ্টিমেয় নেতৃত্ব তৎকালীন অন্যান্য শিক্ষক বিরোধী শক্তি, যেমন সরকার থেকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ হয়ে ম্যানেজিং কমিটির ধামাধরা একটি সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। যার ফল সবসময় সাধারণ শিক্ষকদের পক্ষে সুখকর হয়নি।

কোঠারী কমিশন ঃ বাংলার শিক্ষকদের ভূমিকা

আন্দোলন সংগ্রামের তরঙ্গাঘাতে শিক্ষক সমিতি কিন্তু প্রদেশের তথা সমগ্রদেশের সামগ্রিক শিক্ষার চাল চিত্রের উন্নতি বিধানের দিকটি সম্বন্ধে উদাসীন থাকেনি। ৪৮-এ প্রধানত উচ্চশিক্ষার অবস্থা সমীক্ষার জন্য রাধাকৃষ্ণান কমিশন, এবং ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক শিক্ষার হাল হকিকৎ

জানবার জন্য মুদালিয়ার কমিশন গঠিত হলেও, সার্বিক ভাবে আমাদের স্বাধীনোত্তর স্বদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে বিশেষ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এই অভাব পরিপূরণের জন্য ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বস্তরের ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য অধ্যাপক ডি. এস. কোঠারীর নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। সাধারণ্যে যা কোঠারী কমিশন নামেই পরিচিত। এই কমিশন প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষাস্তরে যে সমস্ত সুপারিশ করেছিল, তা আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রের বহির্ভূত। প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গ থেকে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ত্রিগুণা সেন এই কমিশনের অন্যতম সদস্য হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন। মূল কমিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল বারোটি 'Task Force', এর মধ্যে 'School Education ছিল অন্যতম। এছাড়া গঠন করা হয়েছিল সাতটি 'Working group'। গঠিত টাস্কফোর্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক শিক্ষণ, ছাত্র কল্যাণ, প্রভৃতি যেমন মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল, তেমনি ওয়ার্কিং গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত, বিদ্যালয় গৃহ, সমাজ-বিদ্যালয় পারস্পরিক সম্পর্ক, বিদ্যালয় পাঠ্যক্রম প্রভৃতি বিভাগগুলির সঙ্গে ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল।[৫৩]

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি পশ্চিমবঙ্গ থেকে মূল কমিশনের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনক ও প্রথম উপাচার্য ত্রিগুণা সেন। আদ্যন্ত পুরনো ঘরানার কংগ্রেসি ছিলেন তিনি। কিন্তু শিক্ষা অন্তপ্রাণ এই শিক্ষাব্রতী শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনরকম আপোষ করেন নি কোনদিনই। কমিশনের কাজে ত্রিগুণা সেনের অংশগ্রহণ সম্বন্ধে বলা হয়, '...he was appointed as one of the seventeen members of the National Education Commission.... As a policy Triguna Sen was among the few in the commission who could draw on his immense experience of dealing directly with students. This experience guided his work in as a member of the•"Task Force on Manpower" within the commission.'[৫৪]

এছাড়া শিক্ষা প্রশাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সদস্য করা হয়েছিল, তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা সচিব ড. ধীরেন্দ্র মোহন সেনকে। প্রসঙ্গত এই সরকারি আমলা, নিজের অধিকারের বাইরে গিয়ে, ৫৪-এর আন্দোলন চলাকালীন শিক্ষকতার পেশাকে চতুর্থ শ্রেণির চাপরাশি পদের সঙ্গে তুলনা করে শিক্ষক সহ আপামর বঙ্গবাসীর বিরাগভাজন হয়েছিলেন। থাক সে কথা। ১৯৫৪-এর সময়ে এবং পরবর্তী কালে বিভিন্ন আন্দোলনের হোতা হিসাবে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নাম তখন সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত। আর এই সংগঠনের প্রাণপুরুষ সত্যপ্রিয় রায়। শুধু আন্দোলনের মাঠে ময়দানে নয়। তাত্ত্বিক স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থার সংশোধনের জন্য দেশে, বিদেশে নিজ বক্তব্য শাণিত ভাবে রেখে, শিক্ষা জগতে একটি পরিচিত নাম। এই বাস্তব পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করতে না পেরে ভারত সরকার কোঠারী কমিশন, প্রস্তাবিত, মাধ্যমিক শিক্ষার 'Sub-Group' এর অন্যতম সদস্য হিসাবে সত্যপ্রিয় রায়কে মনোনীত করতে বাধ্য হয়। প্রসঙ্গত উপরোক্ত তিনজন ছাড়া শিক্ষক-শিক্ষণ সংশ্লিষ্ট টাস্কফোর্সের সদস্য হিসাবে হেস্টিংস হাউস শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীমতী নলিনী দাসও মনোনীত হয়েছিলেন। তবে সরকারি

শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ হিসাবে তিনিও শেষ বিচারে একজন আমলাই ছিলেন। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুরে সুর মিলিয়েই তাঁকে মতামত প্রকাশ করতে হত।

শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে কোঠারী কমিশনের সেকেন্ডারি গ্রুপ'-এর সদস্য নির্বাচিত হবার পর সত্যপ্রিয় বাবু কিন্তু নৈবেদ্যর উপর অলঙ্কার শোভিত কাঁঠালীকলার মতো নিশ্চুপ থাকেননি। সামগ্রিক ভাবে সারা ভারতে তথা আমাদের রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনি, শিক্ষক সমিতির সদস্যদের সহায়তায়। কমিশনের পক্ষ থেকে সরকারি ভাবে শিক্ষাজগতের বিভিন্ন সমস্যাদি নিয়ে সত্যপ্রিয় বাবুর কাছ যে শিক্ষার সমস্যা উদ্‌ঘাটন ও সমাধানের সোপান সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী পাঠানো হয়, সেখানে মাধ্যমিক শিক্ষা কত বছর ধরে চলা উচিত থেকে শুরু করে কত বছর পর্যন্ত সার্বজনিক অবৈতনিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো উচিত, স্কুল পাঠ্যক্রমের দুর্বলতা, মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, বহুমুখী বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা, অপচয় এবং অনুন্নয়নের কারণ ও সমাধান, শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার সংস্কার, শিক্ষকদের কোয়ালিফিকেশন, শিক্ষকদের অবসরের বয়ক্রম, তাঁদের অবসরকালীন সুযোগসুবিধা, প্রাইভেট টিউশনের অবলুপ্তিকরণ, ছাত্রদের জন্য সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর উন্নতিকরণ, আদর্শ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়ে সত্যপ্রিয় রায়ের কাছে তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হয়। এই সব প্রশ্নের উত্তরগুলি বিশ্লেষণ করে প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি তাঁর উত্তর প্রেরণ করেন কোঠারী কমিশনের কাছে। তাঁর মতে মাধ্যমিক শিক্ষাকে তিন বছরের নিম্ন মাধ্যমিক, দুই বছরের মধ্যবর্তী মাধ্যমিক ও দুই বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভক্ত করা উচিত। যে সব ছাত্র উচ্চশিক্ষা নেবে না, তাদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। অবৈতনিক মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসঙ্গে তিনি দৃঢ়ভাবে নিজের মত প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'As a perliminary step to making education universal, free and compulsory till the age of 16, it is recommended that the state may provide free education to all children who seek such education. But it would give rise to insuperable financial implication. So as an immediate measure free compulsory education upto 11+ should be introduced by the first two years of the 4th Five Year plan.'[৫৫] এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে তার বাস্তবধর্মী মনোভাবের প্রতিফলনই আমরা দেখতে পাই। এর পাশাপাশি দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থিত ছাত্ররা তাদের সমস্ত ছাত্রজীবনেই যাতে অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ পায় তার পক্ষেও তিনি সওয়াল করেছিলেন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পরিমাণগত বৃদ্ধির পাশাপাশি গুণগত মান উন্নয়নের উপর এ প্রসঙ্গে শ্রী রায় গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে মাথাভারী পাঠ্য পুস্তক সম্পৃক্ত পাঠ্যসূচি বা সিলেবাস-এর বোঝা ছাত্রদের মাথা থেকে অবশ্যই সরাতে হবে। Stagnation (অনুন্নয়ন) এবং wastage (অপচয়) দূরীকরণের জন্যও তিনি বিশেষ করে দরিদ্র ঘরের ছেলেমেয়েদের দিকে নজর দিতে কমিশনের কাছে অনুরোধ করেন। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রকে বিজ্ঞান সম্মতভাবে পরিচালনার জন্য 'শিক্ষক-শিক্ষণের' প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত। এই প্রসঙ্গে সত্যপ্রিয় বাবুর মত ছিল, 'Teachers Training Institutes with the status of Universities to be setup

in every state. The institute should consist of the following departments : (1) Research Department on education-its principles and methods and curriculum etc. (2) Post graduate department to produce educational administrator and teacher educators and research schlars of highest competence, (3) Graduate training for secondary schools, (4) Under graduate training for primary schools.[৫৬] মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকদের কোয়ালিফিকেশন সম্বন্ধে মতামত দিতে গিয়ে সত্যপ্রিয় রায় তৎকালীন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ হওয়াটা জরুরি বলে মনে করেছিলেন। সাধারণভাবে এক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ শিক্ষকদের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও দেশে তাঁদের সংখ্যা যথেষ্ট কম। তাই অবস্নাতক শিক্ষকদের শিক্ষণ দিয়ে তাঁদের যোগ্য শিক্ষক হিসাবে গড়ে তোলার উপরেই সত্যপ্রিয়বাবু জোর দিয়েছিলেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতা সত্যপ্রিয় রায়, শিক্ষাক্ষেত্রে সুস্থ পরিচয় বজায় রাখবার স্বার্থে, 'The managements should be deprived of their right to dismiss or discharge, confirmed teachers arbitrarily functioning both as proscutors or judges.'[৫৭] সত্যপ্রিয়বাবু এই ভাবে সামন্ততান্ত্রিক স্বভাববাদী ম্যানেজিং কমিটির কর্তৃত্বের মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিলেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের 'প্রাইভেট' পড়ানোর প্রথা সম্পর্কিত প্রশ্নের প্রসঙ্গে তাঁর জবাব ছিল, 'The optimum class size at the primary and the secondary level should be 30 at present. The work load of a teacher should be 24 periods of class teachig per week. Of these 18 periods should be for working with the whole class and six periods should be tutorial work in smaller homogeneous groups. If there be provision for such tutorial work, private tutions will be needed for neither back ward scholars nor for more talented groups of them.'[৫৮] এ প্রসঙ্গে একটা কথা অবশ্য বলতেই হয় সত্যপ্রিয় বাবু যে আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছেন, তা তৎকালীন পরিস্থিতিতে গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব ছিল। আর ব্যক্তিগত টিউশনের পিছনে বরঞ্চ পিছিয়েপড়া গোষ্ঠীর ছাত্রদের থেকেও, বর্ধিষ্ণু বড়লোক ছাত্রদের চাহিদাই অনুঘটকের কাজ করত। আর শিক্ষকেরাও সবাই না হলেও অনেকেই প্রাইভেট টিউশনের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। অবশ্য তাঁদের অর্থনৈতিক দুরবস্থাই তাঁদের এই পথে ঠেলে দিয়েছিল। আর একথাও ঠিক সে যুগেও সব শিক্ষক যে ছাত্রগত প্রাণ ছিল, তাও ঠিক নয়—অনেকেই পেশাদারী মনোভাব নিয়ে চলতেন, হয়তো অনেকটা পারিপার্শ্বিক চাপে। সাহিত্যকে সমাজের প্রতিফলন বলে ধরে নিলে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত অনুবর্তন রচনায় আমরা শিক্ষকদের এই দ্বৈত মনোভাবের পরিচয় পাই। রচনাটিতে একদিকে আমরা যেমন নারায়ণবাবুর মতো আদর্শ শিক্ষকের চিত্র দেখি, তেমনি দেখি যদু মাস্টারের মতো শিক্ষকদের। নারায়ণবাবু যেখানে তার গৃহে আগত শিক্ষার্থীদের আক্ষরিক অর্থেই নিজের মুখের গ্রাস তুলে দিতেন। তেমনি যদুবাবু স্কুলে ছাত্রদের জন্য প্রস্তুত টিফিন চুরি করে গলাধঃকরণের সময় কোন বিবেক দংশন অনুভব করতেন না। এই উপন্যাসটি নিয়ে আমরা পূর্বেই অবশ্য বিশদ আলোচনা করেছি।[৫৯]

যাক্, ধান ভানতে মহিপালের গীত না গেয়ে, আমরা আবার শিক্ষক আন্দোলনের বাস্তব পরিবেশে ফিরে আসি। কোঠারী কমিশনে সত্যপ্রিয় রায় শিক্ষার উন্নয়ন সংক্রান্ত যে সমস্ত প্রস্তাব

প্রেরণ করেছিলেন, সেগুলিতে তার বিদগ্ধ চিন্তাশীল মনোভাবের ছাপ অবশ্যই পড়েছিল। তবে এই সমস্ত বিষয়ে তিনি তার সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়েছিলেন। আপাদমস্তক উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষটি যখন নানা টালবাহানার পর ১৯৬৬ তে কোঠারী কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল, তখন সমিতির গণেশচন্দ্র এভেন্যুর অফিসে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিক্ষক আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের নিয়ে, কোঠারী কমিশনের সুপারিশগুলি আলোচনার জন্য, একটি কর্মশালার আয়োজন করতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ওই সভায় তিনি কমিটির সুপারিশের প্রতিটি অধ্যায়ের উপর প্রারম্ভিক বক্তৃতা দেন। তার পরে উপস্থিত সমস্ত নেতৃস্থানীয় কর্মীদের আলোচনার ভিত্তিতে কমিশনের বিশাল প্রতিবেদনের উপর মন্তব্য সহ সুপারিশ রচনা করেন তিনি। এই কাজে তাঁর মূল সহযোগী ছিলেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ভবেশ মৈত্র। ভবেশ বাবুর ভাষায়, 'এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করতে পেরে এবং তাঁকে (সত্যপ্রিয়) সহায়তা করতে পেরে নিজে সমৃদ্ধ ও শিক্ষিত হয়েছি। সে সময়ে ৪/৫ দিন বাড়িতে না গিয়ে তিনি হলেই রাত্রি যাপন করেছিলেন। আমিও (ভবেশবাবু) সে সময় দিবা রাত্রি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। এই ক'টা দিন তিনি পড়া ও লেখায় মগ্ন ছিলেন। প্রতিটি কাজে তিনি যে পরিশ্রম করতেন তা সকলেরই অনুকরণীয়। মেধার সঙ্গে নিষ্ঠা ও শ্রমের সম্মিলন দেখতে পাই তার কাজে।'[৬০] এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে বিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কে কোঠারী কমিশনের সুপারিশ পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষক সমাজকে কিছুটা হতাশই করেছিল। শিক্ষক সমিতিসমূহের দাবি ছিল শিক্ষকদের অতিরিক্ত বাড়তি বেতনের শতকরা ষাট ভাগ-এর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু শিক্ষা কমিশন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য শতকরা আশি ভাগ, স্থান বিশেষে একশো ভাগই কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় বলে ঘোষণা করলেও, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য—'উদার সাহায্যের' অস্পষ্ট সুপারিশ করল মাত্র।

অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই অবশ্য অন্ততঃ তাত্ত্বিক ভাবে কোঠারী কমিশন শিক্ষক সমিতিগুলির আরজি অনুযায়ী এরকমটাই ঘোষণা করল, 'All secondary schools should be adequately staffed and equipped to provide good education, For this purpose, it is necessary to ensure that the essential standards are maintained in all new institutions. The existing trend, now often noticed, to establist secondary schools, without the needed teachers or facilities should be resisted.'[৬১] কমিশনের রিপোর্টে এরকম অনেক গালভরা কথা লেখা হলেও বাস্তবে মাধ্যমিক স্কুলগুলি 'তিমিরাচ্ছন্নই' রয়ে গিয়েছিল। আজো তার পুরো সুরাহা হয়নি।

৬৬-এর আন্দোলনের পূর্বাভাষ ঃ এসো জনতার মুখরিত সখ্যে

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শিক্ষা ক্ষেত্রে সম্পর্কে নির্লিপ্ত উদাসীনতার প্রতিবাদে ১৯৬৫-এর ১৫ জানুয়ারি সারা ভারত মাধ্যমিক শিক্ষক সংস্থার ডাকে সমস্ত দেশে একদিনের প্রতীক অনশন পালিত হল। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকেরা ওই বছরেরই ১৯ জানুয়ারি সরকারি ঔদাসীন্য ও শিক্ষা

বিরোধী নীতির প্রতিবাদে রাজভবন অভিমুখী একটি মৌন মিছিল সংগঠিত করলেন। শিক্ষকদের প্রতি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ঔদাসীন্যের প্রতিবাদে ১৬ জানুয়ারি ৬৫ থেকে তাঁরা একটানা কর্মবিরতির পরিকল্পনা করলেন। হতচকিত রাজ্য সরকার এই কর্মবিরতির ডাক বানচাল করার জন্য একটি শিশুসুলভ পদক্ষেপ গ্রহণ করল। প্রশাসন ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে সাত দিনের জন্য সমস্ত বিদ্যালয়ে ছুটি ঘোষণার ফরমান জারি করে, এই কর্মবিরতির কর্মসূচিকে বানচাল করতে চাইল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও শিক্ষকেরা সরকারি দমনমূলক নীতির প্রতিবাদে এককাট্টা হয়ে রইলেন। ৬৫'-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি যতীন দাস পার্কে একদিনের প্রতীক অনশনের মধ্য দিয়ে শিক্ষকেরা তাদের কর্মসূচির সূচনা করলেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি হাজারে হাজারে শিক্ষক সমিতির ডাকে আইনসভা অভিযান করলেন। আর ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হল কর্মবিরতি ও রাজভবনের সম্মুখে অবস্থান সত্যাগ্রহ। আতঙ্কিত সরকার পরিচালন সমিতিগুলিকে হুমকি দিয়ে সরকারি অনুদান বন্ধ করার ভয় দেখিয়ে, তারা যাতে শিক্ষকদের আন্দোলনে যোগ দানে বিরত রাখে, তার ব্যবস্থা করতে লিখিত নির্দেশ জারি করলেন। শেষ পর্যন্ত এই পদক্ষেপেও আন্দোলন স্তব্ধ করতে অপারগ সরকার শিক্ষক আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার মানসে দমনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করল। সমিতির আন্দোলনকে কিন্তু এভাবে দমন করা কিছুতেই সম্ভব হল না। ৬৫-এর ২৫ ফেব্রুয়ারি সমিতির ডাকে ময়দানে এক বিশাল সমাবেশ আহূত হল। সেখানে আন্দোলনকে তীব্রতর করবার সিদ্ধান্ত নিলেন সমিতির নেতা-কর্মী ও সাধারণ সদস্যেরা।

বাইরের মাঠ ময়দানে মিছিল মিটিং-এর মধ্যে দিয়ে আন্দোলন আরো তীব্রতর হয়ে উঠল। আইনসভায়ও শিক্ষকদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন বিধায়কদের তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। অধুনালুপ্ত বিধান পরিষদ ও বিধানসভায় তখন শিক্ষক প্রতিনিধির সংখ্যা ব্যাপক ছিল। এরা প্রায় সকলেই একযোগে শিক্ষকদের দাবিদাওয়ার প্রতি সরকারের নিস্পৃহ মনোভাবের সমালোচনায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। বিধানসভায় বিরোধীদের মুখ্য নেতা জ্যোতি বসু এই আন্দোলন সম্পর্কে সরকারের মতামত জানিয়ে একটি বিবৃতিদান করবার জন্য, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে বারংবার অনুরোধ করেছিলেন। সংসদীয় রীতি রেওয়াজ অনুযায়ী আইনসভার অধিবেশন চলাকালীন কোন গুরুতর বিষয়ে সরকার সভার বাইরে মতামত প্রকাশ করেন না। কিন্তু সাবেক মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল বাবু তাই করছিলেন। জ্যোতি বাবু ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ কংগ্রেস সরকারের এই অসংসদীয় কার্যকলাপের সমালোচনা করে বলেছিলেন, 'এখানে অনেকবার এই প্রশ্ন তোলা হয়েছে শিক্ষক শিক্ষিকারা তাঁরা রাস্তায় বসে আছেন। এইরকম একটা অবস্থা যেখানে আমরা আছি কবে যে এটা মীমাংসা হবে, কবে যে আবার লেখাপড়া আরম্ভ হবে তাও বুঝতে পারছি না। যে ১৫ তারিখ (৬৫) থেকে যে পরীক্ষা আসছে সেই পরীক্ষাগুলিই বা কী হবে? আজকে দেখছিলাম শ্রীমতী অনিলা দেবী ওদের সংগঠনের সেক্রেটারি তিনি একটা বিবৃতি দিয়েছেন যে, ওই ১৫ তারিখের মধ্যেই ওরা একটা মীমাংসা চান, যাতে করে পরীক্ষা ব্যাহত না হয় এই রকম একটা অবস্থা চলছে।..... এখানকার সদস্যরা যখন প্রশ্ন তুলেছিলেন তখন মুখ্যমন্ত্রী জোর করে বলেছিলেন যে, আমি শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করতে পারব না।

আমার কিছু বলার নেই।'[৬২] জ্যোতি বাবু প্রসঙ্গক্রমে আরো জানিয়েছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সেন এবং আন্দোলনকারী শিক্ষকদের মধ্যে মধ্যস্থতা করতেও তিনি রাজী আছেন। তাঁর মতে এইভাবে সমস্যা সমাধানের একটা দ্বার খুলে যেতে পারে। লাঠি গুলি চালিয়ে জাগ্রত শিক্ষক জনতাকে দমন করা যাবে না। একমাত্র আলোচনার টেবিলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব বলেও জ্যোতি বাবু মন্তব্য করেছিলেন। শুধুমাত্র শিক্ষকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা সম্পর্কে নয়—স্কুলগুলিকে সরকার একরূপতা না দিয়ে জুনিয়র হাইস্কুল, হাইস্কুল, হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, মালটি পারপাস স্কুল, সিনিয়র বেসিক স্কুল, জুনিয়ার ও সিনিয়ার মাদ্রাসায় যেভাবে পরিপোষণ করা হচ্ছে তার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। এ ক্ষেত্রে তিনি সমিতির এ সংক্রান্ত মনোভঙ্গিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সর্বস্তরে মাতৃভাষার প্রচলন, পাঠ্যক্রমের বিজ্ঞানসম্মত পরিবর্তনের পক্ষে জ্যোতি বাবু তার বক্তৃতায় উচ্চকিত হয়েছিলেন। শিক্ষক সমিতি রাজ্যের ত্রিস্তরীয় শিক্ষা কাঠামো, অর্থাৎ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষার সুষ্ঠুভাবে সংহত হয়ে কাজ করার জন্য বারবার 'শিক্ষা সমন্বয় কমিটি' স্থাপনের দাবি বহুদিন ধরেই তুলে এসেছিল। জ্যোতিবাবু জ্বালাময়ী ভাষায় বিধানসভার বক্তৃতায় সেই প্রসঙ্গও তুলে ধরেন। শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন নিয়ে প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বলেন যে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর বচন অনুযায়ী শিক্ষকেরা নাকি ৫০০/৬০০ টাকা এই গৃহশিক্ষকতা থেকে উপার্জন করেন। জ্যোতি বাবু শিক্ষকদের পক্ষে অপমানজনক এই উক্তির প্রতিবাদ করে বিধানসভায় বলেছিলেন এই ধরনের শিক্ষকের সংখ্যা অত্যল্প, শিক্ষকেরা শুধু নিজেদের রুটি রুজির জন্য লড়ছেন না। ভিক্ষা দেবার মতো করে, যে সামান্য মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে, সেই প্রস্তাবে বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাকর্মীদের কোন অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রসঙ্গ নেই। শিক্ষাকর্মীদের বঞ্চনা বিরোধী লড়াই-এ শিক্ষক সমাজ শামিল হয়েছেন। জ্যোতি বাবুর ভাষায়, 'এদের মধ্যে যে অশিক্ষক কর্মচারীরা আছেন, যারা ৪৫ থেকে ৬০ টাকা মাইনে পান...(এই সম্পর্কে) একটা কথাও তো শিক্ষামন্ত্রীর কাছে শুনতে পেলাম না। স্কুল কি শুধু চলবে শিক্ষক আর শিক্ষিকা দিয়ে। স্কুলের সঙ্গে কি এরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত নয়। এদের ছাড়া কি স্কুল কলেজ চলতে পারে?'[৬৩]

যাইহোক জ্যোতি বাবু সহ বিরোধী নেতাদের বিজ্ঞানসম্মত বক্তৃতার তোড়ে সরকার পক্ষ কিছুটা নমনীয় হয়। আন্দোলন শুরু হবার দুই সপ্তাহের মাথায় সরকার ঘোষণা করতে বাধ্য হল যে, যে পূর্বঘোষিত মহার্ঘভাতা সব স্তরের শিক্ষক সহ শিক্ষাকর্মী হিসাবে কর্মরতদেরও প্রদান করা হবে। দমনমূলক সার্কুলারও সরকার প্রত্যাহার করে নিল। সমিতির সব দাবি পরিপূরিত না হলেও, আসন্ন উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য, ছাত্রস্বার্থে সমিতি আপাততঃ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিল। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি সেই সময় রাস্তার আন্দোলনে সফলতার পাশাপাশি বিধান পরিষদের শিক্ষক কেন্দ্রের নির্বাচনেও পুনরায় সাফল্য অর্জন করেছিল। আমরা জানি সমিতির আদর্শ ভিত্তিক আন্দোলনের ফলে অনেক আদর্শবাদী পুরনো কংগ্রেস নেতা এ. বি. টি. এ.-র প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ৫৪-এর আন্দোলনের সময়

আইনসভার কংগ্রেসি সদস্য হলেও, জে. সি. গুপ্ত বা চারুচন্দ্র সান্যাল প্রমুখ ব্যক্তিরা শিক্ষকদের দাবির স্বপক্ষে কমবেশি সোচ্চার হয়েছিলেন। এঁদের মতোই একজন প্রাচীন কংগ্রেসি ছিলেন অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই প্রভাব বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হলেও, তখনো অবধি এ. বি. টি. এ. ছিল দলমত নির্বিশেষে সকল শিক্ষকের আন্দোলনের মঞ্চ। তাই বিভিন্ন সময়ে প্রফুল্লচন্দ্র রায় থেকে মেঘনাদ সাহার মতো বিদগ্ধ মানুষেরা সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে কোন দ্বিধা করেন নি। তাই যখন কংগ্রেসি হয়েও নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রার্থী হিসাবে রাজকুমার বাবু পশ্চিমবঙ্গের অধুনালুপ্ত বিধান পরিষদে নির্বাচিত হলেন তখন কেউই আশ্চর্যান্বিত হয়নি।[৬৪]

আমাদের মনে রাখতে হবে গত শতাব্দীর মধ্য ষাটের দশকে বামপন্থী দলের সদস্য অনিলা দেবী বা গোলকপতি রায়ের মতো মানুষেরা সমিতির নেতৃত্বে উঠে এলেও, আন্দোলনের পাদপ্রদীপের আলোর সামনে উজ্জ্বল উদারনৈতিক রাজনীতির প্রতিভূ হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও সত্যপ্রিয় রায়। সত্যপ্রিয় রায় অবশ্য বহু পরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন সে আলাদা প্রসঙ্গ—যথাস্থানে তাঁর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের ভালো মন্দ নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

'৬৫-এর ভারত-পাক যুদ্ধ ও সমিতি

এদিকে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। দুই দেশের শাসক শক্তি স্ব স্ব দেশের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান কিংবা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি করতে অপারগ হয়ে দেশের বঞ্চিত জনগণকে জাতীয়তাবাদের জোয়ারে ভাসিয়ে নিতে চাইছেন। তখনও শান্তিকামী জনতার পক্ষ থেকে সমিতি যুদ্ধবাজ দুই দেশকে সংযত হবার আহ্বান জানাচ্ছে। বামপন্থী ছাত্ররা 'যুদ্ধ নয়/শান্তি চাই' শ্লোগান তুলে, দেওয়ালে দেওয়ালে লিখছে, 'যখনই জনতা চায় খাদ্য ও বস্ত্র/সীমান্ত বেজে ওঠে, যুদ্ধের বাদ্য।'

আমরা জানি বাংলার শিক্ষকদের দেশপ্রেম সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ওঠাই উচিত নয়। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ আমল থেকে ৬২-এর চিন যুদ্ধ পর্যন্ত বারে বারে এর নজির তাঁরা রেখেছেন। তা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট দালাল বলে চিহ্নিত করে 'কমিউনিস্ট দেশ চিনের' সমর্থক বলে অন্যায় ভাবে সেই সময় শিক্ষক সমিতির নেতাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। ৬৫-এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ও সরকার শিক্ষকদের প্রতি একই রকম ভুমিকা গ্রহণ করল। এবার আর কমিউনিস্ট দালাল বলে চিহ্নিত করার কোন অজুহাত নেই। আর প্রগতিবাদী বাংলার শিক্ষকেরা সবসময়ই হিন্দু বা মুসলিম মৌলবাদীদের হাতে হাত মিলাতে ঘৃণা বোধ করতেন, তা সত্ত্বেও ১৯৬৫-এর এপ্রিল মাসে নৈহাটিতে অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে সমিতির প্রাদেশিক সম্মেলন শেষ হবার অব্যবহিত পরেই, ওই বছরেরই ২০ সেপ্টেম্বর শিক্ষক সমিতির অন্যতম নেতা গোলকপতি রায়কে 'ভারত রক্ষা' আইনে গ্রেফ্তার করা হল। সমিতির আরো তেতাল্লিশ জন নেতৃস্থানীয় কর্মীকে একই আইনে কারাবন্দী করা হলে, ক্ষুব্ধ হলেন সমিতির নেতা ও কর্মীরা। বন্দী শিক্ষক কর্মীদের মুক্তির জন্য গড়ে উঠল শক্তিশালী আন্দোলন—মিটিং মিছিলে উত্তাল তখন কল্লোলিনী

কোলকাতা। পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় এই অসহনীয় কাজ করবার জন্য সমালোচনা করে, সমিতির মুখপত্র 'শিক্ষা ও সাহিত্যে' লেখা হয়, 'গত সংখ্যায় আমরা আমাদের সমিতির সহকারী সাধারণ গোলকপতি রায়কে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে আটক রাখার তীব্র নিন্দা করিয়াছিলাম....সরকার সম্ভবতঃ আমাদের দাবির জবাব দিয়াছেন। আলিপুরদুয়ারের সমিতির অন্যতম কর্মী শ্রীসমীর চক্রবর্তী, ঘাটালের শ্রী গোষ্ঠ পলমল সহ আরো কয়েকজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়াও বিনা বিচারে আটক করিয়াছেন।'[৬৫] এই গ্রেপ্তারির পরেও সাধারণ মানুষ শিক্ষক সমিতির নেতা কর্মীদের কারোকেই দেশ বিরোধী বলে মনে করেনি। সমিতি ও দৃঢ়তার সঙ্গে মত প্রকাশ করে যে, 'সমিতির কর্মীদিগকে এই ভাবে গ্রেপ্তার করিয়া সমিতির শক্তিকে খর্ব করিয়া দিবেন.....তাঁহারা জানিয়া রাখুন, তাঁহাদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। কারণ তাহাই ইতিহাসের অমোঘ বিধান।'[৬৬]

'৬৬-এর শিক্ষক সমিতির সমর

এদিকে শিক্ষা স্বার্থ বিরোধী বিশ্ববিদ্যালয় বিল, শিক্ষা জগতে এক নতুন বিপদের সম্ভাবনা নিয়ে এল। সমিতি এই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হল। ৬০-এর দশকের শেষের দিকে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইন সংস্কারের নামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে সরকারি কর্তৃত্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় বিল বিধানসভায় উত্থাপন করল। এর আপত্তিকর ধারাসমূহের প্রতিবাদ করল অধ্যাপক সমিতি। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতিও, পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রতিনিধি হিসাবে অধ্যাপক সমিতির এই প্রতিবাদে শামিল হল। বিধান পরিষদে সমিতির প্রতিনিধিরা বিলের উপর প্রায় দুই শতাধিক সংশোধনী দিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সরকার যেমন সদস্য সংখ্যার জোরে আইনসভায় নতুন মধ্যশিক্ষা বিল পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন এবারও বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাশ করিয়ে নিল সরকার। ক্ষুব্ধ হলেন আমাদের গুরুকুল।[৬৭]

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি 'সারা ভারত শিক্ষা বাঁচাও' দিবসে সমিতির নেতৃত্বে শিক্ষকগণ বিধানসভা অভিযান করেন। ওই দিকে ঐ ফেব্রুয়ারিতে প্রফুল্ল সেন মন্ত্রীসভার ভ্রান্ত খাদ্যনীতির ফলে খাদ্যাভাব দেখা দিল সারা রাজ্যে। মানুষ খাদ্যের দাবিতে আন্দোলনে নামল। আন্দোলনরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেন, বসিরহাটের নুরুল ইসলাম এবং কৃষ্ণনগরের আনন্দ হাইত। মানুষের দাবির সঙ্গে স্বশ্রেণির দাবির মেলবন্ধন ঘটিয়ে কুড়ি হাজার মানুষের সমর্থনের স্বাক্ষর সহ হাজার হাজার শিক্ষক বিধানসভা অভিযান করলেন। ক্ষমতাগর্বে অন্ধ তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করলেন। সমিতির সভাপতি সত্যপ্রিয় রায় ও অন্যতম নেতা সন্তোষ ভট্টাচার্যকে কারারুদ্ধ করল রাজ্যের সরকার। সরকারি দমন-পীড়নের বিপরীত প্রতিক্রিয়া হিসাবে শিক্ষকদের মধ্যে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রভাব আরো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হল। ৬৫-এর ২২ মে বিধান পরিষদের কলকাতার শিক্ষক কেন্দ্রের নির্বাচনে এ. বি. টি. এ. প্রার্থী সত্যপ্রিয় রায় ও অনিলা দেবী বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করলেন। এই কেন্দ্রে সরকার লালিত ডেমোক্রেটিক টিচার্স ফ্রন্টের প্রার্থী নিহার দাস বিপুল ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন।

এ দিকে শিক্ষকদের সমিতি কিন্তু শীর্ষস্থানীয় নেতাদের এই গ্রেপ্তারেও হতোদ্যম হল না। সেই সময় সমিতির মুখপত্রে জনগণের অন্যান্য অংশের সঙ্গে খাদ্য সংকট জনিত কারণে শিক্ষক সম্প্রদায়ের দুরবস্থার কথাও সাদা-কালোয় ফুটে উঠেছিল। বলা হল, '...মানুষের জীবনে এমন এক একটা সমস্যা হাজির হয় যাহার মোকাবিলা শিক্ষকদের করিতে হয়। আমাদের রাজ্যে আজ খাদ্যসমস্যা ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সমস্যা এমন আকার ধারণ করিয়াছে যাহাতে সমস্ত জনজীবন আজ বিপর্যস্ত।'[৬৮] যাইহোক ১৯৬৫-এর ডিসেম্বর মাসে সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির একটি সভা হয়। সমিতির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক অনিলা দেবী এক সার্কুলারে জানান, ১৯৬৬-এর কোন এক সময়ে বিধানসভায় খাদ্যসংক্রান্ত সমস্যার কথা তুলে ধরতে, এক গণ প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হবে। এছাড়া সমিতির বন্দী নেতাদের মুক্ত করবার মানসে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এক শিক্ষক প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। আন্দোলন ক্রমশঃ দানা বেঁধে উঠছিল। উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী '৬৬-এর ২২ ফেব্রুয়ারি এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিধানসভায় গণ ডেপুটেশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সাধারণ সম্পাদক অনিলা দেবী খাদ্য সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এক বুলেটিনে বলেন, 'শোনা যাইতেছে ১৯৬৬-৬৭ সালের জন্য শিক্ষকদিগের ভাগ্যে জুটিবে পাঁচ টাকা মহার্ঘভাতা। এই অকিঞ্চিৎকর মুষ্টি ভিক্ষা জুটিলেও শিক্ষক বা বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মীদের এই দুর্মূল্যের দিনে ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটিবে না।'[৬৯] ১৯৬৬-এর ২২ ফেব্রুয়ারি শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে শিক্ষকদের এক গণ শোভাযাত্রা সংগঠিত হয়। নিজেদের দাবির স্বপক্ষে তারা ২০ হাজার মানুষের গণস্বাক্ষর সরকারের হাতে তুলে দিতে মনস্থ করেন।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, খাদ্য ও কেরোসিনের দাবিতে উত্তাল আন্দোলনের মধ্যেই ১৯৬৬-এর ১৭ ফেব্রুয়ারি বসিরহাটের ছাত্র নুরুল ইসলাম পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করলেন। ওই বছরেরই ৪ মার্চ কৃষ্ণনগরে পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্রে নিহত হলেন ছাত্র আনন্দ হাইত। প্রতিবাদে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির ডাকে সারা রাজ্যে সফল ধর্মঘট হয়। ১৩ মার্চ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক অনিলা দেবী তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিতে জানালেন, '....গণতান্ত্রিক খাদ্য আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য সরকার যেরূপ নির্বিচারে শিক্ষক ও ছাত্রগণকে গ্রেপ্তার করিতেছে তাহাতে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষক সমাজের মধ্যে গভীর বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। শিক্ষক সমাজের নির্বাচিত বিধান পরিষদের সদস্য শ্রীসত্যপ্রিয় রায় এবং শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্য ও সমিতির অন্যান্য শিক্ষাকর্মীগণকে বিনা বিচারে বন্দী করাতে এই বিক্ষোভ তীব্রতর হইয়াছে। এই সমস্ত ঘটনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার পক্ষে প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে।'[৭০] সমিতির কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী খাদ্য সংকট নিরসনের জন্য সরকারের অনীহা এবং সংগ্রামশীল জনতার উপর পুলিশ, প্রশাসনের অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করা হয়।

এবার আমরা দেখব এ. বি. টি. এ. যখন আন্দোলন সংগ্রামের তুঙ্গে অবস্থান করছে, তখন তাদের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি বা WBHMA কি করছে। এটা ইতিহাসের সত্য যে সত্যপ্রিয় রায় সংগ্রামের ময়দান ও আন্দোলনের তাত্ত্বিক ও রণকৌশলগত রচনায়

সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সংগ্রাম, সমঝোতা সংগ্রাম-এর তত্ত্বে বিশ্বাসী এ. বি. টি. এ., সরকারের অনিচ্ছুক হাত থেকে ধীরে ধীরে শিক্ষক স্বার্থে অনেক কিছু আদায় করে নিয়েছিলেন। এদিকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা ছাড়া প্রধান শিক্ষক সমিতি ১৯৫২-৫৩ এর অগ্নিঝরা দিনগুলিতে 'মাধ্যমিক শিক্ষাকে আরও কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করতে ভারত সরকার নিযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের আহ্বানে....মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের সূচনা করেন।'[৭১] পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকেরা তাঁদের বহুলালিত দাবির পরিপ্রেক্ষিতে, যখন কোলকাতার রাস্তায় রক্ত ও ঘাম ঝরাচ্ছেন তখন প্রধান শিক্ষকসমিতি, ১৯৫৩ তে সিমলায় অনুষ্ঠিত 'All India selected Head masters camp cum seminer'এ মগ্ন। ৫৪-এর বাংলা কাঁপানো শিক্ষক আন্দোলনের সম সময়ে তাদের ভূমিকা ছিল অনেকটাই অপ্রত্যক্ষ। হেডমাস্টার অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি সুধীর অধিকারীর লেখা থেকেই আমরা এই তথাকথিত নিস্পৃহতার প্রমাণ পাই। তাঁর ভাষায়, '১৯৫৪ সালে এ. বি. টি. এ. শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা আদায়ের দাবিতে শিক্ষক ধর্মঘটের ডাক দেয়। এ. বি. টি. এ.-র দাবির সঙ্গে সহমত পোষণ করেও, প্রধান শিক্ষক সমিতি নীতিগত ভাবে ধর্মঘটের বিরোধিতা করে কারণ শিক্ষা ক্ষেত্রে ধর্মঘট শিক্ষার ক্ষতি সাধন করে। প্রধান শিক্ষক সমিতি জনমত তৈরির মাধ্যমে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বীমা ও পেনশন স্কীম চালু করার প্রচেষ্টা চালায়।'[৭২] একটু খুঁটিয়ে খুঁজলেই প্রধান শিক্ষক সমিতির উপরোক্ত বিবৃতির ফাঁক ও ফোকর আমরা দেখতে পাই। এ. বি. টি. এ.-র দাবির সঙ্গে সহমত হয়েও, ধর্মঘটের বিরোধিতা করে প্রধান শিক্ষক সমিতি। কিন্তু আন্দোলন ছাড়া কীভাবে দাবি আদায় হবে তার কোন সুস্পষ্ট পথ তাঁরা বাতলাতে পারেননি। সরকারের ধামাধরা হবার ফলে সম্ভবতঃ বিফল আলোচনা ছাড়া তাঁদের আর কিছু করারও ছিল না।

এই পর্যায়ে একটি সদর্থক কাজ অবশ্য প্রধান শিক্ষক সমিতি সম্পন্ন করেছিল। সেই সময়ে স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে সরকার বা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কোন 'স্কুল কোড' না থাকায় রেডিমেড তথ্যের অভাবে প্রধান শিক্ষকবৃন্দকে এবং বিদ্যালয় পরিচালক মণ্ডলীকে স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে পদে পদে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছিল। এই অসুবিধা দূরীকরণের নিমিত্তে প্রধান শিক্ষক সমিতির অন্যতম নেতা বিষ্ণুব্রত ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ 'Headmasters' Manual' প্রকাশিত হয়। এটা ঠিক যে বর্তমান কাল অবধি শুধু স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবক, স্কুল পরিচালক মণ্ডলীর পেশাগত ও অধিকার সংক্রান্ত যে কোন মামলায় জেলা বিচারালয় থেকে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টে অপরিহার্য পুস্তক এটি।[৭৩]

১২ই জুলাই কমিটি ও শিক্ষক সমিতি ঃ আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি

হেড মাস্টারস অ্যাসোসিয়েশনের কথা আপাততঃ থাক। আমরা আবার মূল শিক্ষক সংগ্রামের আঙ্গিনায় প্রবেশ করি। ১৯৬৬ সালে বিখ্যাত শিক্ষক সংগ্রামের আগে আমরা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের দপ্তরগুলির ইউনিয়নসমূহ ও শিক্ষকদের আন্দোলনের মিলিত মঞ্চ 'শ্রমিক, কর্মচারী শিক্ষক যুক্ত আন্দোলন' কমিটি যা ১২

জুলাই কমিটি নামেই সাধারণ্যে বহুল পরিচিত, তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও শিক্ষক আন্দোলনে তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব। শ্রমিক কর্মচারী শিক্ষকদের যুক্ত আন্দোলন কমিটি, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই তারিখে গঠিত হয় বলে এই সংগ্রামী মঞ্চ সাধারণ্যে '১২ জুলাই কমিটি' নামে পরিচিতি পেয়েছে। গত শতাব্দীর ৫০ এবং ৬০-এর দশকে সমাজের বিভিন্ন সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন ভিত্তিক আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল। এবং কোন একটি সংগঠনের ন্যায্য দাবির প্রতি অন্যান্য সংগঠনের সহমর্মিতা ও সংগ্রামে সহায়তা করা একটি রীতিতে পরিণত হয়েছিল। সমাজের অন্যান্য জীবিকা ভিত্তিক সংগঠনের পারস্পরিক সহযোগিতা আন্দোলনকে কতটা জোরালো করে তুলতে পারে, তার অভিজ্ঞতাও শিক্ষক নেতৃবর্গের হয়েছিল। শিবশংকর রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত '১২ জুলাই কমিটির ইতিহাস' শীর্ষক পুস্তিকা থেকে আমরা জানতে পারি, 'যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ১২ জুলাই কমিটি গড়ে উঠেছিল তা হল একটি ক্ষেত্রের আন্দোলনের পাশে অন্যান্য সংগঠনগুলিকে যুক্ত করে আন্দোলনে বাড়তি শক্তি জোগান।.....বস্তুত পক্ষে স্ব স্ব ক্ষেত্রের সংগ্রামলব্ধ অভিজ্ঞতা দেখিয়েছিল ন্যায্য বেতন কিংবা মূল্য বৃদ্ধির পূর্ণ ক্ষতিপূরণ অথবা চাকরির নিরাপত্তা রক্ষার মতো বিষয়গুলির উৎস স্থল হল শ্রেণি শাসন এবং তাঁর জন্য সরকারের গৃহীত নীতি। ঐ নীতিকে পরাস্ত করার লক্ষ্য নিয়েই আক্রান্তদের সংগঠনগুলিকে একত্রিত করে লড়াই.... এ হল একক সংগঠনের স্বতঃস্ফূর্ততা ও সীমাবদ্ধতার বেড়া অতিক্রম করে শ্রেণি সত্তা বিকাশের প্রক্রিয়া। নেতৃত্বের স্তরে সচেতন ঐক্যই সংগঠনের নীচের তলায় প্রসারিত করে বৃহত্তর ঐক্যের বনিয়াদ তৈরি করতে পারে।'[৭৪] যদিও এই ঘোষণার মধ্যে একটু অত্যুক্তি আছে। ১২ জুলাই কমিটিতে যে সমস্ত মধ্যবিত্ত পেশাজীবী সংগঠন এক মঞ্চে সমবেত হয়েছিল, তাদের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে অন্ততঃ তৎকালীন সময়ে শ্রমিক-কৃষকের নেতৃত্ব মেনে, মার্কসীয় শ্রেণি চেতনার কতটুকু বিস্তার লাভ করেছিল, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। একজন বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে অনুসরণ করে আমরা বলতেই পারি power (শাসক শক্তি) Intelligentsia (পেশাগত বুদ্ধিজীবী) ও People (শ্রমিক কৃষক সহ সাধারণ জনতার) মধ্যে একটি ত্রিকোণ দ্বন্দ্ব বর্তমান। তার ভাষায় শাসক শাসন করে, জনগণ তা মেনে চলে ও বুদ্ধিজীবী এই দুই অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। কিন্তু এই ত্রিভুজের তিনটি বাহু কখনই পুরোপুরি মিলিত হয় না।..... কোন দুটি বাহু সবসময় তৃতীয় বাহুটির বিরুদ্ধে মিলিত হয়।'[৭৫] যখন বুদ্ধিজীবী ও শাসক জোট বাঁধে তখন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের দাবি ও সমস্যা উপেক্ষিত হয়, তখন শাসক শ্রেণি ও বুদ্ধিজীবীকুল নিজেদের স্বার্থেই পারস্পরিক সমঝোতা করে। আবার শাসক শ্রেণি পেশাগত বুদ্ধিজীবীদের চাহিদা মেটাতে না পারলে, বুদ্ধিজীবীকুল তাদের বিরুদ্ধে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে লড়তে চায়। আমাদের পেশাগত বুদ্ধিজীবী শ্রেণিও এই তথাকথিত দোদুল্যমানতার ব্যতিক্রম ছিল না। আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে অর্থাৎ শিক্ষক আন্দোলনের প্রারম্ভিক পর্বে, স্বাধীনতা পূর্ব যুগে শিক্ষক নেতৃত্বকে অনেক সময়ই ম্যানেজিং কমিটি বা সরকারের (শাসক) সঙ্গে আপোষ করতে দেখি—আবার অন্য দিকে স্বাধীনোত্তর কালে আশাহত শিক্ষকরা সরকারের অনিচ্ছুক হাত থেকে সুযোগ ছিনিয়ে নেবার তাগিদে সাধারণ শ্রমিক-কৃষক-উদ্‌বাস্তুদের সাহায্য প্রার্থী হিসাবে দেখতে পাই।

তাই ১২ জুলাই কমিটি শ্রেণি লড়াই-এর রক্ত ও ঘামে গড়ে উঠেছিল—এটা পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। তবে মধ্যবিত্ত এই সংগঠনগুলো এটুকু বুঝেছিল, তাদের রুটি রুজির লড়াইকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসলে আন্দোলন শক্তিশালী হবে। ভীত সরকারের কাছ থেকে দাবি দাওয়া আদায়ও হয়ে পড়বে অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য। এই সংগঠনের নিউক্লিয়াস গঠনে অবশ্যই শিক্ষক সমিতির একটি বড় ভূমিকা ছিল। বস্তুত ৫৪ থেকে শুরু করে ৬৬ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে যে জোয়ার ভাঁটা শিক্ষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলাম আমরা, তাতেই প্রথম এই সব গোষ্ঠীগুলি তাদের সাংগঠনিক দাবি দাওয়ার বাইরে গিয়ে শিক্ষকদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। এই 'কমরেডশিপ'ই ১২ জুলাই কমিটি প্রতিষ্ঠার ভ্রূণ হিসাবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি অবশ্য ১৯৫৯ এই প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উদ্‌বাস্তু প্রাথমিক ও পৌর প্রাথমিক স্কুলগুলির সমন্বয়ে, 'শিক্ষা আন্দোলন সমন্বয় কমিটি' নামে একটি মঞ্চ তৈরি করেছিল। এই প্রচেষ্টার পথ বেয়েই ব্যাঙ্ক, বিমা, কেন্দ্রীয় সরকারি ও রাজ্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়নসমূহ ১৮ নভেম্বর ৬৪ একটি যুক্ত কনভেনশনের ডাক দিয়েছিল। পঞ্চাশটি সংগঠনের চারশো প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ভারতসভা হলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ এবং উপযুক্ত মহার্ঘভাতা দেবার ও গণতান্ত্রিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রদানের দাবিতে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই সময় সংগঠিত ক্ষেত্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতোই শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির দাবি পুরোপুরি মেনে নেওয়া তো হয়নি—তার পাশাপাশি আন্দোলনরত শিক্ষকদের উপর কর্মচ্যুতি সহ নানা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হত। একই নিবর্তনমূলক মনোভাব অন্যান্য সংগঠিত ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নিত বলে তাঁদের সঙ্গে এক মিছিলের কাতারে শামিল হতে শিক্ষকদের অসুবিধা বা অস্বস্তি হয়নি। ৬৪-এর ১৮ ডিসেম্বর প্রথম 'যুক্ত কনভেনশনে' শিক্ষক সহ যে সমস্ত সংগঠন অংশগ্রহণ করেছিল, তারা কোলকাতার বুকে মহামিছিল সংগঠিত করে। এই মিছিল সম্বন্ধে বসুমতী পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে বিখ্যাত সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখনী নিঃসৃত বাক্যগুলি থেকে ওই মিছিলের গুরুত্ব সম্যক ভাবে বোঝা যায়। তিনি লিখেছেন, 'ছোট-বড় মিছিল চলিয়াছে বিরামহীন ভাবে ময়দানের অভিমুখে, ডালহৌসী স্কোয়ারের (অধুনা বি-বা-দী বাগ) মিছিলটি প্রথমে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারীগণ নিজ নিজ দপ্তরের ফেষ্টুন নিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। তাহাদের পিছনে পিছনে আসিয়াছে ডালহৌসী এলাকার কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তর, ডাক-তার বিভাগ,.....রেলওয়ে কর্মচারী, আয়কর দপ্তর প্রভৃতি সমস্ত দপ্তরের কলম পেষা'।[৭৬] বস্তুতপক্ষে এই ১৮ ডিসেম্বরের প্রেরণাতেই গঠন করা সম্ভব হয়েছিল শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক আন্দোলনের যুক্ত মঞ্চ ১২ই জুলাই কমিটি। এক অর্থে আমরা ১৮ ডিসেম্বর ৬৪-এর মিছিলকে ১২ই জুলাই ৬৫-এর কমিটি গঠনের প্রথম ধাপ বলতে পারি।

দেশে তখন এক ডামাডোলের পরিস্থিতি, পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ এর পাশাপাশি বিশেষ করে বাংলায় ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে ট্রাম শ্রমিকদের ধর্মঘট,

টানা রিকশার চালকদের ধর্মঘটের পরই—শুরু হয় ৬৫-৬৬-এর রাজ্য সরকারের কুখ্যাত খাদ্য নীতি বিরোধী খাদ্য আন্দোলন। এখানে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জায়গা নেই। তবে এই আন্দোলনেও ৫৪-এর শিক্ষক আন্দোলনের মতোই শিক্ষক, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই অংশ নিয়েছিল। স্মর্তব্য প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীরা পথে নামেন এসময়। এ প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন এমনকি কিছুটা কংগ্রেসপন্থী বলে পরিচিত মহানায়ক উত্তম কুমারও খাদ্য আন্দোলনে রত জনতার উপরে পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদ করেন। সংগ্রামের এই উত্তাল সময়ে গণ আন্দোলনের পাশে মধ্যবিত্ত কর্মচারী শিক্ষকদের দাঁড় করানোর জন্য বামপন্থীরাও সক্রিয় হয়ে ওঠে এই সময়। একদিকে মধ্যবিত্ত শিক্ষক ও কর্মচারীরা তাঁদের এতদিনকার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বুঝতে পেরেছিল যে 'জনতা' ছাড়া আন্দোলন বৃথা। আর বৃহত্তর জনতাও বুঝতে পারছিল, মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব ছাড়া তাদের আন্দোলন দিকভ্রষ্ট।

এই পরিস্থিতিতে মূলতঃ শ্রমিক নেতা মনোরঞ্জন রায়ের বিশেষ প্রচেষ্টায় মধ্যবিত্ত কর্মচারী ও শিক্ষক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ আগামী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনে ১৯৬৬-এর এপ্রিলে এক সভায় বসেন। ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলির পক্ষে অরবিন্দ ঘোষ, অমল গাঙ্গুলী, নরেন গুপ্ত ও রমেশ মিত্র; কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলের পক্ষে কে. জি. বসু, শিশির ভট্টাচার্য, বরদা ভট্টাচার্য ও দীপেন ঘোষ; এ. বি. টি. এ.-র পক্ষে ছিলেন সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী ও অমিতাভ সেন; এবিপিটি-এর পক্ষে ছিলেন মন্মথ অধিকারী, সুশীল দেবদাস ও প্রশান্ত বসু....'।[৭৭]

এছাড়াও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মচারী সংগঠন সমূহের প্রতিনিধিবৃন্দও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় মনোরঞ্জন রায়ের পরামর্শে স্থির হয় মধ্যবিত্ত শ্রমিক, কর্মচারী ও শিক্ষক সংগঠনগুলির আন্দোলনের যুক্ত মঞ্চ গঠন করে তীব্র গণ সংগ্রামের পরিস্থিতিতে সংগঠিত মধ্যবিত্তদের যুক্ত ভাবে আন্দোলন করার। এরপর '৬৬-এর ২৩ এবং ২৪ মে, ভারতসভা হলে, বিভিন্ন ক্ষেত্রের ৭১টি সংগঠনের সমাহারে একটি যুক্ত কনভেনশন হয়। এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রবাদ প্রতীম নেতা সত্যপ্রিয় রায়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন মঞ্চ গঠনের জন্য একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সদস্য ছিলেন অনিলা দেবী, কে. জি. বসু, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ। শ্রমিক নেতা মনোরঞ্জন রায়ের স্মৃতিচারণ থেকে আমরা জানতে পারি, যে ঠুনকো শিক্ষক সুলভ আভিজাত্য ত্যাগ করে, 'কমঃ সত্যপ্রিয় রায়, এ. বি. টি. এ.-র পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির সহিত যুক্ত হবার আবেদন করেন। এতদিন শিক্ষকদের আন্দোলন এবং শ্রমিকদের দাবি-দাওয়ার আন্দোলন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল। যদিও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির কোন অভাব ছিল না, কিন্তু সাংগঠনিক দিক থেকে এই আন্দোলনগুলি আনুষ্ঠানিক ভাবে যুক্ত ছিল না। অতএব শ্রমিক শ্রেণির পরিচালিত আন্দোলনে আনুষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংগঠন যুক্ত হওয়া একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলা চলে। এ. বি. টি. এ.-র এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি স্বাগত জানান।'[৭৮] যাইহোক উপরোক্ত কন্‌ভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী '৬৬-এর 'শ্রমিক-কর্মচারী শিক্ষক যুক্ত আন্দোলন কমিটি' নানা দাবিতে ওই বছরের ১২ জুলাই মিছিল ও সমাবেশের

ডাক দেয়। ওই মিছিলে দৈনন্দিন রুটি রুজি সংক্রান্ত দাবিদাওয়ার জন্য শ্লোগানের পাশাপাশি 'সরকারি দমনমূলক গ্রেফতারী আইন বাতিল করো', 'ইন্দো আমেরিকান ফাউন্ডেশন মুর্দাবাদ', 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনাম ছাড়ো' প্রভৃতি শ্লোগানে মুখরিত হয়। বিভিন্ন গোষ্ঠীর জনতার সঙ্গে মুখরিত সখ্যে শিক্ষকরা প্রথম অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার বাইরে, দেশ ও বিদেশে শিক্ষা ব্যতীত নানা ক্ষেত্রে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল, তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। এই মিছিল ও সমাবেশের মাধ্যমে যুক্ত সংগ্রামী মঞ্চের এই অবিস্মরণীয় আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল ১২ জুলাই, ১৯৬৬। তাই এই মঞ্চ পরবর্তীকালে ১২ই জুলাই কমিটি নামেই খ্যাত হয়। অনেকের মতে অবশ্য এই ১২ জুলাই কমিটির অন্তর্ভুক্তিকরণের মধ্য দিয়ে পরোক্ষ সমর্থনের রাস্তা পরিত্যাগ করে, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি বামপন্থীদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে শুরু করে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই অন্যান্য গণসংগঠনের সঙ্গে এক ছাতার তলায় আসবার ফলে শিক্ষক সংগ্রাম সামগ্রিক ভাবে শক্তিশালী হয়। কিন্তু অন্যদিকে স্বাধীন শিক্ষক সংগঠন হিসাবে পূর্বের স্বতন্ত্রতা হারিয়ে ফেলার একটি ঝোঁক এ' সময় থেকেই দেখা যায়। এর ভালো মন্দ সম্বন্ধে আমরা পরবর্তীকালে আলোচনা করব।

নতুন রণনীতি ও রণকৌশল ঃ 'রাজা' করেন তন্বিতম্বা,....'প্রজা' পেল অষ্টরম্ভা

দেখতে দেখতে এসে গেল ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ। শিক্ষক আন্দোলনের ইতিহাসে আরেকটি জল বিভাজিকা। রণনীতিগত ভাবে শিক্ষক আন্দোলনের ধারা সবসময় উগ্র সংগ্রামশীলতার পর্যায়ে উন্নিত করা সম্ভব হয় না। কোন একটি নির্দিষ্ট সময় যেমন ১৯৫৪-এর পর, আন্দোলনে একটু হাঁফ ছাড়বার সুযোগ দিতেই হয়। এই হাঁফছাড়া মানে কিন্তু আন্দোলনের আগুনে জল ঢেলে দেওয়া নয়—আন্দোলনের ভাঁটার সময় তাই সংগ্রামের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতেই থাকে। ৫৪-এর পর তাই আমরা ৫৬-৫৮ বা ৬২কে ভুলে যেতে পারি না। আন্দোলনের এই ত্বরণের শীর্ষেই আবার নবতর প্রবল সংগ্রামের সূচনা হল। ১৯৬৬ তে এরকমই একটি শক্তিশালী সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল শিক্ষক আন্দোলনে। ৬৬-এর মে মাসে বর্ধমান শহরে মাধ্যমিক শিক্ষকদের সমিতির ৪১তম অধিবেশন আহূত হল। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, এর কাছাকাছি সময়েই গঠিত হয়েছিল মধ্যবিত্ত পেশাজীবীদের সম্মিলিত মঞ্চ ১২ জুলাই কমিটি। স্বভাবতই শিক্ষকরা বর্ধমান সম্মেলনে এক নতুন উদ্দীপনা নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন।

বর্ধমান সম্মেলনের সভাপতি হলেন অধ্যক্ষ গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য। শিক্ষক সমিতি ইতোমধ্যে বৃহত্তর জনগণের সংগ্রামকে সর্বতোভাবে সমর্থন জানিয়ে ছিলেন। সেখানে এর পাশাপাশি নিজস্ব পেশাগত দাবির কথাও তুলে ধরলেন তাঁরা। সম্মেলন ঘোষণা করল যে বেতন হারের সংশোধন, ঘাটতির ভিত্তিতে নিয়মিত সাহায্য দান ও ১৯৬৫-এর সরকার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবিলম্বে কার্যকরী না হলে, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর-এর মধ্যে যে কোন তারিখ থেকেই একটানা কর্মবিরতি ও সত্যাগ্রহ শুরু হবে। ইতোমধ্যে ২২ মে কোলকাতার শিক্ষক কেন্দ্রে বিধান পরিষদের আসনে এ. বি. টি. এ. প্রার্থী সত্যপ্রিয় রায় এবং অনিলা দেবীর জয়লাভ, শিক্ষকদের শিরদাঁড়াকে আরো একটু দৃঢ়তর করার ক্ষেত্রে সফল হয়েছিল।

যাইহোক ১০ সেপ্টেম্বর ৬৬ থেকে শুরু হল কর্মবিরতি। ১৩ থেকে শুরু হল অবস্থান সত্যাগ্রহ। ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে সমিতির আহ্বানে আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠিত করা হল। প্রথম দিন সমিতির সভাপতি সত্যপ্রিয় রায় এবং অন্যতম নেতা সন্তোষ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কয়েক শত শিক্ষক শিক্ষিকা আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন। ৬ অক্টোবর ৬৬ পর্যন্ত এইভাবে দফায় দফায় আইন অমান্য চলতে থাকে। এই আইন অমান্য আন্দোলনে রথীন্দ্রকৃষ্ণ দেব, অরুণ চৌধুরী, শশী মোহন ভট্টাচার্য সহ আড়াই হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা আইন ভেঙে কারাবরণ করেন।

বর্ধমান সম্মেলন '৬৬ নানা দিক থেকেই সমিতির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ও সাহিত্যে ১৩৭৩-এর বৈশাখ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বর্ধমান সম্মেলন উপশিরোনামে লেখা হয়েছিল, 'শিক্ষক ও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাকর্মীগণের আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশঃই শক্তিশালী হইতেছে.....আমাদের ক্ষেত্রেও পট পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। আগামী বর্ধমান সম্মেলনে সমিতিকে আন্দোলনের কথা চিন্তা করিতে হইবে এই ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় ও মন্ত্রীসভাকে যৎ কিঞ্চিৎ বিচলিত করিয়াছে। ঘটনাগুলি একটি মহান সত্যকেই প্রকাশ করে যে, সক্রিয় আন্দোলন ব্যতীত অন্য কোন পথে এই সরকারকে টলানো যায় না। আগামী বর্ধমান সম্মেলনকে এই পরম সত্যটিকে স্মরণে রাখিয়া কর্তব্য ও পথ নির্ধারণ করিতে হইবে।'[৭৯] এর আগেই ১২ জুলাই কমিটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে ও খাদ্য আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবে যোগ দিয়ে সমিতি অনুধাবন করেছিল, যে সমাজের অন্যান্য শ্রেণি সকলের সাথে একত্রে আন্দোলনরত হলেই, একমাত্র শিক্ষক সমাজের দাবিগুলি পরিপূরিত হতে পারে। তাই উপরোক্ত সম্পাদকীয়তে আরো বলা হল, '.....আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিতে হইলে আজিকার পরিস্থিতিতে একক সংগ্রাম যথেষ্ট নহে, জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার যে সামগ্রিক বৃহত্তর সংগ্রাম, আমাদের সংগ্রামকে সেই বৃহত্তর সংগ্রামের সহিত যুক্ত করিতে হইবে। আমরা শিক্ষক, কৃষক-কর্মচারীর দল হইতে পৃথক সম্মানীয় এক স্তর—এই ভ্রান্ত ধারণা আজ দ্রুত ত্যাগ করা আবশ্যক। শ্রমের বিনিময়ে আমাদের ক্ষুধার অন্ন জুটে। আমরা বৃহত্তর মেহনতী জনতার একটি অংশ মাত্র। সুতরাং আমাদের সংগ্রামে তাঁহাদের সক্রিয় সমর্থন আদায় করিতে হইবে এবং মেহনতী জনতার যে বৃহত্তর সংগ্রাম, সেই সংগ্রামেও আমাদের অংশগ্রহণ করিতে হইবে।'[৮০]

এই বিবৃতির মধ্য দিয়ে সমিতির দৃষ্টিভঙ্গির এক বিরাট পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি। '৪৮-এর আন্দোলনে শ্রমিক মজুরদের মতো আন্দোলনের স্বপক্ষে পোস্টার দেওয়া নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে দ্বিধা ছিল। সমাজের খেটে খাওয়া অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে তাঁদের সংযোগ ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। '৫৪-এর আন্দোলন চলাকালীন অন্যান্য শ্রমজীবী, পেশাজীবীদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পেয়েও যাঁরা প্রতিদানে শ্রমজীবী পেশাজীবীদের সঙ্গে একই কাতারে হাঁটার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। সংগ্রামের ঝটিকা প্রবাহের সামনে পড়ে, সেই শিক্ষকেরাই কিন্তু '৬৬-এর আন্দোলন শুরু হবার আগেই সবার রঙে রঙ মেলাবার ছন্দে যৌথ আন্দোলনের সুফল সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। এক দিকে হয়তো এর ফলে শিক্ষকরা আপাত মর্যাদার স্থান থেকে চ্যুত হয়েছিলেন। চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী থেকে ক্রমশঃ তাদের পরিবর্তন হচ্ছিল গণফ্রন্টে—যদিও তখনো অবধি কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের গণফ্রন্ট হিসাবে শিক্ষক সমিতি পরিচিত ছিল

না। অন্যদিকে কিন্তু যৌথ আন্দোলনে যোগ দেবার ফলে নিরিহ শিক্ষককুলকে সরকার বা রাষ্ট্রশক্তি ভয় পেতে শুরু করেছিল। শিক্ষকরা কখনোই 'গুণ্ডার দলে নাম' লেখায়নি। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষদের তথাকথিত গুণ্ডামী' যা আসলে শ্রেণি সংগ্রামেরই নামান্তর—তার মহিমা শিক্ষকেরা মর্মে মর্মে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উদ্বাস্তু আন্দোলন, ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন ও পরিশেষে ৬৬-এর খাদ্য আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলনের গতিপথকে প্রায় ১৮০° পরিবর্তিত করে দিয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

ফিরে আসি বর্ধমান সম্মেলনের আঙ্গিনায়। সম্মেলন শুধুমাত্র দাবিসমূহ পেশ করে ক্ষান্ত হল না, ঘোষণা করা হল কংগ্রেস সরকার যদি ১৯৬৬-এর ৩০ জুনের মধ্যে শিক্ষকদের দাবি না মেনে নেয় তবে শিক্ষকেরা ১ জুলাই থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত 'অভিযান পক্ষ' সংগঠিত করবে। এই পক্ষে প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক সভা করা হবে। এর পরে ১৬ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত প্রচার পক্ষ পালিত হবে। এই উপলক্ষ্যে পথসভা, বৈঠক সভা ও প্রচারপত্র বিলি করে আন্দোলন সংগ্রামকে আরো জোরদার করা হবে। দাবি উঠল, 'পেটে আগুন মনে আগুন/দাবি না মানলে জ্বলবে আগুন'। শিক্ষকদের মুখপত্র শিক্ষা ও সাহিত্যে মন্তব্য করা হল—'আমরা গুরুকুল। বিত্ত আমাদের নাই, কিন্তু সম্মান আমাদের আছে। আমরা জানি মেশিন আমরা গড়ি না, কিন্তু মানুষ আমরা গড়ি। মানুষ গড়ার কাজে প্রবঞ্চনার কোন স্থান নেই। তাই সরকারের এই প্রবঞ্চনার আমরা যোগ্য উত্তর দেব। আমাদের সংগ্রামের গৌরবময় দিনগুলির মধ্য দিয়ে।'[৮১] এরপরে ৬৬-এর ২৯ জানুয়ারি সমিতির সম্পাদিকা অনিলা দেবী, সদস্যদের সর্বস্তরে এক সার্কুলারে জানালেন, অখিল ভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষক ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'সারা ভারতে শিক্ষা বাঁচাও দিবস' পালিত হবে। সেই সব সর্বভারতীয় দাবির সঙ্গে সমিতির বিভিন্ন দাবি যুক্ত করে ২২ ফেব্রুয়ারি ৬৬ সমাবেশ ও গণ মিছিলের পর বিধানসভা অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। এই আন্দোলনের আগে প্রকাশিত বুলেটিনে (নং ১, ১৪/০২/৬৬) অনিলা দেবীর কলম লিখেছিল, 'শোনা যাইতেছে ১৯৬৬-৬৭ সালের জন্য শিক্ষকদিগের ভাগ্যে জুটিবে পাঁচ টাকা মহার্ঘভাতা। এই অকিঞ্চিৎকর মুষ্ঠি ভিক্ষা জুটিলেও শিক্ষকের বা বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মীদের এই দুর্মূল্যের দিনে ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটিবে না, ইহা বলাই বাহুল্য।..... নতুন যে সব সুযোগ-সুবিধার দাবি আমরা করিয়াছিলাম, ত্রিশ টাকার মহার্ঘভাতার যে দাবি আমাদের ছিল, পেনশন যাহা ভারতবর্ষেই আটটি রাজ্যে শিক্ষকগণকে দেওয়া হইতেছে। বাজেটে অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন মতো বৃদ্ধি করা না হইলে এই সমস্ত দাবি পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না।'[৮২] ওই বছরেরই ২২ ফেব্রুয়ারি সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে (ওয়েলিংটন) সমিতির সদস্য শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের মিছিল সংগঠিত হল। নেতৃত্বে ছিলেন সত্যপ্রিয় রায়। শিক্ষকরা তাঁদের দাবির সমর্থনে সারা রাজ্য থেকে সংগৃহীত ২০ হাজার গণ স্বাক্ষর শিক্ষামন্ত্রীর হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঔদ্ধত্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মন্ত্রী শিক্ষকদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতে পর্যন্ত অস্বীকার করলেন। উপরন্তু সমিতির সভাপতি সত্যপ্রিয় রায় ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সন্তোষ ভট্টাচার্যকে পুলিশ প্রশাসন ভারত রক্ষা আইনে কারাবন্দী করল। খাদ্য

আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকেরা, পুলিশি দমন পীড়নের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত ছিল। তাই এই গ্রেপ্তারিতে ভয় পাওয়া দূরে থাকুক—তাঁরা বর্ধমান সম্মেলনের দাবিগুলি আদায় করার জন্য আরো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে অনিলা দেবী বললেন, 'মহাশয়, গণতান্ত্রিক খাদ্য আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য সরকার যেরূপ নির্বিচারে শিক্ষক ও ছাত্রগণকে গ্রেপ্তার করিতেছে.....তাহাতে স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষক সমাজের মধ্যে গভীর বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। শিক্ষক সমাজের নির্বাচিত বিধান পরিষদের সদস্য শ্রী সত্যপ্রিয় রায় এবং শ্রী সন্তোষ ভট্টাচার্য ও সমিতির অন্যান্য শিক্ষাকর্মীগণকে বিনা বিচারে বন্দী করাতে এই বিক্ষোভ তীব্রতর হইয়াছে। এই সমস্ত ঘটনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার পক্ষে প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি দৃঢ় ভাবে এই অভিমত পোষণ করে যে, অবিলম্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা নিতান্ত প্রয়োজন।'[৮৩] শিক্ষা ও সাহিত্য-এর ১৩৭২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লক আউট' শীর্ষনামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হল। তাতে বলা হয়েছিল, যে রাজ্যে খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চরম অভাব দেখা দিয়েছে। রাজ্য সরকার জরুরি ভিত্তিতে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা না করে, খাদ্যর দাবিতে যে গণ আন্দোলন গড়ে উঠছিল, তাকেই দমন করতে সচেষ্ট হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যব্যাপী এক অশান্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সমিতির পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই লেখায় বলা হল, '.....খাদ্য ও কেরোসিনের দাবিতে পরিচালিত এই গণআন্দোলন সাধারণ মানুষের বাঁচার আন্দোলন। সাধারণ মানুষের অংশ হিসাবে শিক্ষক সমাজও এই আন্দোলনের অংশীদার। রাজ্যের সর্বত্র এই আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষক সমাজ যেভাবে গণতান্ত্রিক মানুষের অন্যান্য অংশের সহিত সমভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছে তাহাতে এই সভা গর্ব অনুভব করিতেছে।'[৮৪]

শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে আরো বলা হল শিক্ষকদের নিজেদের রুটি রুজির আন্দোলন সংগ্রামের পাশাপাশি তারা শিক্ষার দাবি নিয়ে সদর্থক আন্দোলনই করতে চান কিন্তু, '.....রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় নানা অছিলায় এখন সমিতির নেতৃস্থানীয় কর্মীবৃন্দ সহ সাধারণ মানুষের উপর পুলিশী অত্যাচার চালানো হইতেছে।'[৮৫] সুতরাং এই সভা সমগ্র রাজ্যে শান্তি ফিরাবার জন্য ও খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য সুষ্ঠু রেশনিং ব্যবস্থা, রেশন সামগ্রির বর্ধিত মূল্য হ্রাস করা, পুলিশি জুলুমের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্তের আদেশদান এবং আন্দোলন দমন করার জন্য সরকার কর্তৃক বন্ধ করে দেওয়া স্কুল কলেজ খোলার দাবি জানায়।

এবার আমাদের বিশদভাবে জানতে হবে বর্ধমান সম্মেলনে এমনকি দাবি শিক্ষকগণ করেছিলেন যার ফলে তৎকালীন সরকার এতটা ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। প্রথমেই সভার কার্যবিবরণী থেকে আমরা শিক্ষক সমিতির তৎকালীন সম্পাদক অনিলা দেবীর মন্তব্য উদ্ধৃত করতে পারি। সম্মেলনের প্রতিনিধিদের সংগ্রামমুখী মনোভাবকে উসকে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আন্দোলন ছাড়া এই সরকারের কাছ থেকে কোন সুবিবেচনা বা ন্যায় বিচার প্রত্যাশা করা একান্তই অবাস্তব। দ্বিধা ও সংশয় মুক্ত হয়ে প্রতিনিধিবর্গ সমিতির এই সম্মেলনে বলিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ আন্দোলনের

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এটাই আশা করি।'[৮৬] এই আহ্বানের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সম্মেলনে যে সমস্ত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়—(১) শিক্ষার ধারা ও পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাস করে শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী করতে হবে। (২) রাজ্যের পরিকল্পনা ও বাজেটের ২০% শিক্ষাখাতে ব্যয় করতে হবে। (৩) ১৪ বছর বয়স্ক বালক-বালিকাদের শিক্ষা আবশ্যিক ও অবৈতনিক করতে হবে এবং বালকদের ক্ষেত্রে যে সব পরিবারের আয় বার্ষিক ১২০০ টাকা পর্যন্ত এবং বালিকাদের ক্ষেত্রে যে সব পরিবারের আয় বার্ষিক ১৮০০ টাকা পর্যন্ত, তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করতে হবে।'[৮৭] সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য শিক্ষক সমিতি যে মাথা ঘামায়, তার প্রকৃষ্ট পরিচয় ছিল—শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন সংক্রান্ত দাবিগুলির মধ্যে। সমিতি বিরোধী শক্তি বারে বারে অপপ্রচার করত যে শিক্ষকেরা অর্থনীতিবাদের বেড়াজালে আটকে পড়ে, সেবার বদলে শিক্ষাকে একটি বিক্রয় যোগ্য পণ্যে পরিণত করার চেষ্টা করছেন। এই কথা যে সর্বৈব ভাবে অসত্য তা সমিতির শিক্ষা সংক্রান্ত এই সব দাবিগুলির মধ্য দিয়েই প্রস্ফুটিত হয়েছিল। হ্যাঁ, এটা ঠিক সমিতি তাদের পেশাগত দাবি দাওয়ার কথা অবশ্যই তুলে ছিলেন এই সম্মেলনে। যুগের পরিবর্তন হয়েছে। ছেঁড়াধুতি, ফাটা চশমা ও ভাঙা লাঠির আদর্শ শিক্ষক হিসাবে যাদের চিহ্নিত করা হত তারা তাঁদের ন্যায্য অধিকারের জন্য বারে বারে রাস্তায় নামছেন—তার মধ্যে কোন অন্যায় আছে এটা কোন যুক্তিবাদী মানুষই মেনে নেবেন না। সমাজের সেবাব্রতী হয়েও একজন ডাক্তার, আইনজীবী বা সরকারি কর্মচারী যদি নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হতে পারেন, তবে শিক্ষকরা নয় কেন। এর উত্তর সরকার বারে বারেই দিতে অপারগ হয়েছেন। বর্ধমান সম্মেলনে শিক্ষকেরা তাই তাঁদের পেশাগত কিছু দাবি দাওয়াও তুলেছিলেন। এই সব দাবিগুলির মধ্যে ছিল—(১) রাজ্যের সকল স্নাতক ও অবস্নাতক শিক্ষকদের জন্য যথাক্রমে ২৫০-৫০০ এবং ২০০-৪০০ টাকা হারে বেতনক্রম চালু করতে হবে এবং সেই বেতনহার ও চাকুরির অন্যান্য শর্তাবলী সর্বভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষক ফেডারেশনের কটক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে নির্ধারণ করতে হবে। স্মর্তব্য কটক সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে সত্যপ্রিয় রায় শিক্ষকদের বিবিধ দাবি দাওয়া নিয়ে মত প্রকাশ করেছিলেন যে, 'The conference will further attempt to formulate a uniform minimum pay structure and other service conditions of teachers varying from state to state in the republic of India. This does not help the teachers of one state feel that they are the citizens of the same country enjoying equal rights and privileges with those of other states. These diferences should immediately be removed in the interest of national integration.....Let us, however hope that as in the case of University and College teachers, the difference has been removed through the intervention of University Grants Commission. At the Secondary stage too, A central body on that line will be setup to remove the glaring anomalies in the service conditions of teachers in the different states of India.'[৮৮]

সত্যপ্রিয় রায়ের এই বক্তব্য প্রমাণ করে, একদিকে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষকদের ন্যূনতম বেতনের দাবি পরিপূরণের পাশাপাশি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি

কমিশন যেভাবে সারা দেশে অধ্যাপকদের বেতনের ক্ষেত্রে একরূপভাবে কাঠামো গড়ে তুলেছিল, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সেইরূপ একটি সংস্থা গঠন করে, মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতনের ক্ষেত্রে একরূপতা আনয়নের দাবির উদ্‌গাতা ছিল সমিতি। যাইহোক আমরা বর্ধমান সম্মেলনের দাবিসমূহ এবং তার পরবর্তী সংগ্রাম আন্দোলনের কথায় পুনরায় ফিরে আসি। এখানে স্মর্তব্য, বর্ধমান কনফারেন্স শুধু শিক্ষকদের দাবি দাওয়া নিয়ে সোচ্চার হয়নি। মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামো ধরে রাখবার আরো দুইটি প্রধান স্তম্ভ গ্রন্থাগারিক এবং অন্যান্য শিক্ষা কর্মীদের অর্থনৈতিক সাচ্ছল্য আনয়নের জন্যও তারা সবিশেষ যত্নশীলতার পরিচয় দিয়েছিল। সম্মেলনে দাবি করেছিল—(১) গ্রন্থাগারিকদের জন্য সমযোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকদের অনুরূপ ভাবে বেতন দান করতে হবে। (২) বিদ্যালয় করণিক, অন্যান্য অধস্থন কর্মচারী, ল্যাবরেটরি অ্যাসিসটেন্ট ইত্যাদিদের জন্য অনুরূপ সরকারি কর্মচারীদের সমহারে বেতন নির্ধারণ করতে হবে। সমিতি দৃঢ়তার সঙ্গে মত প্রকাশ করে যে, স্তর ও পরিচালনা নির্বিশেষে শিক্ষকসহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল কর্মীর জন্য নিঃশর্তভাবে অতিরিক্ত ত্রিশ টাকা সরকারি মহার্ঘভাতা প্রদান করতে হবে। সেই সময়ে পেনশন বা অবসর ভাতার দাবি তোলে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি। যা যে কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সংস্থায় অকল্পনীয় ছিল। পরিষ্কার ভাবে সমিতির কার্যবিবরণীতে লেখা হয়, 'অবিলম্বে মাধ্যমিক শিক্ষাকর্মীগণকে ভারত সরকারের বেসামরিক কর্মীগণের জন্য নির্দিষ্ট হারে ও নিয়মে পেনশন ও অন্যান্য অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে।'[৮৯] শুধুমাত্র নিজেদের পাওনা গণ্ডা বুঝে নেবার জন্যই শিক্ষকরা কখনোই সংগ্রামের ময়দানে অবতীর্ণ হননি—বাংলার শিক্ষক আন্দোলন সব সময়ই সামগ্রিক ভাবে শিক্ষা পরিস্থিতির সামগ্রিক মান উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৬৬ সালের আন্দোলনের যে দাবিগুলি আমরা অব্যবহিত পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তাতেই দেখা যাচ্ছে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার সুফল ছড়িয়ে দিতে আমাদের গুরুকুল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক দেশ। সর্বোচ্চ সংসদ থেকে সর্বনিম্ন গ্রাম পঞ্চায়েত সর্বত্রই গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সদস্যরাই তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রের কার্যপরিকল্পনা করে। এই ঐতিহ্য বহন করে আমাদের প্রায় সমস্ত রকম সংস্থা। শিক্ষকরা তাই স্বাভাবিক ভাবেই চেয়েছিলেন, রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রক সংস্থা, মধ্যশিক্ষা পর্ষদও গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারাই পরিচালিত হবে। কিন্তু প্রথম থেকেই তৎকালীন সরকার এই সংস্থাতে মনোনীত আমলাদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, সংস্থার গণতান্ত্রিক চেতনাকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দুইজন প্রধান শিক্ষকের প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত, অন্যান্য সহ শিক্ষকদের প্রতিনিধি প্রেরণ করার কোন ব্যবস্থাও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ছিল না। স্বাভাবিক ভাবেই মাধ্যমিক শিক্ষার তৃণমূল স্তরের সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত, রাজ্যের শিক্ষা ধারায়, পরিকল্পনা প্রণয়নে বা কার্যে রূপান্তরণের কোন পর্যায়েই সেই সহ শিক্ষকদের মতামত জানাবার কোন মঞ্চ ছিল না। স্বাভাবিক ভাবেই সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলনের পক্ষে এই অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। শিক্ষা প্রশাসনের কাঠামোর গণতন্ত্রীকরণের জন্যও বর্ধমান সম্মেলনে দাবি তোলা হয়েছিল। সম্মেলনে বলা হয়েছিল যে মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে তাত্ত্বিক ভাবে এবং বাস্তবেও সরকারি

নিয়ন্ত্রণ মুক্ত একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থায় পরিণত করতে হবে এবং এর পাশাপাশি এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষক প্রতিনিধি সহ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গঠন করতে হবে।[৯০] শুধুমাত্র বেতন বৃদ্ধির সোপান হিসাবে নয় ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানসম্মত ও আদর্শ শিক্ষাদানের হাতিয়ার হিসাবে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলি সম্প্রসারণ ঘটাবার দাবিও সমিতি এই সময়ে করেছিল। প্রশিক্ষণ বিহীন কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের দাবিও তোলা হয় এই সময়ে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে দাবিসমূহ উত্থাপনের মধ্য দিয়েই কোন সজীব সংগঠনের কাজ শেষ হয় না। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানে 'তত্ত্ব-দাবি-কাজের' মধ্যে সাযুজ্য না থাকলে যে কোন আন্দোলনই মুখ থুবড়ে পড়ে। আমরা দেখেছি শিক্ষক সমিতির প্রথম দিকের কার্যকর্তাগণ, বিশেষ করে স্বাধীনতা পূর্ব যুগে অনেক সময়ই নানা কারণে তত্ত্ব, দাবি ও কর্মের মধ্যে সাযুজ্য না রাখতে না পারার জন্য সে ভাবে আন্দোলন মুখীনতার পরিচয় দিতে পারেন নি। ১৯৪৮-এর পর থেকেই অবশ্য ক্রমশঃ শিক্ষক সমিতি তত্ত্ব দাবি ও কর্মের সাযুজ্য স্থাপন করতে বহুলাংশে সফল হয়েছিল। আলোচনার আলোকে পূর্বেই তা আমরা দেখেছি। এই ধারাবাহিকতা '৬৬-এর বর্ধমান সম্মেলনে বহাল ছিল।

সম্মেলনের কার্য বিবরণীতে উল্লেখ আছে, 'এই সম্মেলন মনে করে যে, জাতীয় স্বার্থে অবিলম্বে উপরোক্ত দাবি সমূহের পূরণ প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করিতে না পারিলে কোন দাবি আদায় করা সম্ভব নয়। .... এই সরকার ৩০ জুন, ১৯৬৬-এর মধ্যে উপরোক্ত দাবিসমূহ মানিয়া না লন তাহা হইলে সম্মেলন উপরোক্ত দাবিসমূহ আদায়ের জন্য নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া নিম্নলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ করিতেছে ঃ ১ জুলাই হইতে ১৫ জুলাই পর্যন্ত অভিযান পক্ষ পালন। এই পক্ষে প্রতিটি বিদ্যালয়, অঞ্চল, মহকুমা ও জেলায় শিক্ষক সভা করিতে হইবে এবং আন্দোলনের জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিতে হইবে।.... ১৬ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত প্রচার পক্ষ পালন। এই পক্ষে পথসভা, বৈঠক সভা, জনসভা, প্রাচীর ও প্রচার পত্রের মাধ্যমে দাবিসমূহ প্রচার করিতে হইবে।'[৯১] এই সম্মেলনে আরো ঠিক হয় '৬৬-এর আগস্ট মাসে, শিক্ষক সমিতির ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত দিনে কোলকাতা সহ সমস্ত জেলা সদরে দাবিপত্র পেশ ও বিক্ষোভ জমায়েত সংগঠিত করতে হবে। সম্মেলন এছাড়াও সিদ্ধান্ত নেয় যে আগস্ট মাসে প্রতি এলাকার বিধানসভা সদস্য ও অন্যান্য স্তরের নির্বাচিত সদস্যদের নিকট গণ প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হবে এবং গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা যাবে। সমিতির মতে এই সংগ্রামমুখী পদক্ষেপ সরকারের উপর দাবি মেনে নেওয়ার জন্য পরোক্ষভাবে চাপ সৃষ্টি করবে। আন্দোলনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ১৫ সেপ্টেম্বরের পর নিরবচ্ছিন্ন কর্মবিরতি অবস্থান সত্যাগ্রহ এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে আইন অমান্য করবেন শিক্ষকবৃন্দ।

এছাড়া বর্ধমান সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, সমিতির নিজস্ব আন্দোলনের পাশাপাশি সর্বস্তরের শিক্ষক আন্দোলন ও বৃহত্তর গণ আন্দোলন গঠনের প্রচেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ

শিক্ষকরা তাঁদের সম্প্রদায় গত স্বার্থের সঙ্গে অন্যান্য পর্যায়ের শিক্ষক/অধ্যাপকদের স্বার্থের সমরূপতাকে স্বীকৃতি তো দিলেনই, তার পাশাপাশি সামগ্রিক ভাবে মেহনতি মানুষ ও মধ্যবিত্ত জনতাকে পাশে পেতে চাইলেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, অন্যান্য পেশাজীবী কর্মচারীদের সহযোগে ইতোমধ্যেই শিক্ষকেরা ১২ জুলাই কমিটি নামে সংগ্রামের একটি মঞ্চ গঠন করেছেন এবং এই ভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মজীবীদের একটি সাধারণ মঞ্চ গঠন করতে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল সেই সময়ে। ৫৪-এর আন্দোলনের সময় প্রাথমিক ভাবে শিক্ষকবৃন্দের আন্দোলন ছিল একক পথিকের পথ চলা। এই আন্দোলনে পরবর্তী কালে সমাজের সব অংশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছিল। শিক্ষকরাও এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝতে শিখেছিলেন, যে সবার রঙে রঙ না মেশালে সংগ্রাম সফল হতে পারে না। এই অভিজ্ঞতার ফসল হিসাবেই '৬৬-এর আন্দোলনে সংগঠিত ভাবেই বিভিন্ন পেশার মানুষ শিক্ষক আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আন্দোলন এই ভাবে একটি ভিন্ন চরিত্র লাভ করেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাই এই সময়ে আমরা দেখি শিক্ষক সমিতি শুধুমাত্র নিজেদের পেশাগত দাবিসমূহ নিয়ে নয়—সামগ্রিক ভাবে জনগণের সরকারের কাছে প্রাথমিক দাবিদাওয়া সম্বলিত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। শিক্ষক সমিতির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক অনিলা দেবী, ২৪ জুন, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে সদস্যদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত ২নং বুলেটিনে অনুরোধ করলেন যে সমিতির পক্ষ থেকে সমস্ত পেশাজীবী মানুষদের যৌথ আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করতে হবে। মহার্ঘ ভাতা, চাকুরির নিরাপত্তা প্রভৃতি কয়েকটি সাধারণ ও মৌলিক দাবির ভিত্তিতে সারা পশ্চিমবাংলায় গণ অভিযানের ডাকও তাঁর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল।[৯২] আমরা আগেই উল্লেখ করেছি ইতোমধ্যে ৬৬ সালের প্রথমার্ধেই সমস্ত পেশাজীবীদের যুক্ত আন্দোলনের মঞ্চ হিসাবে 'শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক' যুক্ত আন্দোলন কমিটি স্থাপিত হয়েছিল এবং এই ত্রিশক্তির নেতৃত্বে ওই বছরের ১২ জুলাইয়ের মহতি মিছিল ও জনসভার সাফল্যের পর, সংগঠনটি ১২ জুলাই কমিটি নামেই প্রসিদ্ধ হয়েছিল।

সংগঠিত যৌথ আন্দোলনের পাশাপাশি শিক্ষকদের স্বতন্ত্র সংগ্রাম ও কিন্তু বহাল ছিল। যৌথ আন্দোলনের সাফল্য তাঁদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়ে উঠেছিল অবশ্যই। সেপ্টেম্বর '৬৬ তে ঐতিহাসিক সংগ্রামের শপথ নিল সমিতি। শিক্ষা ও সাহিত্যে, 'আন্দোলনের ডাক' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হল, 'আর মাত্র কয়েকটা দিন, তারপরেই সেপ্টেম্বর মাস। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আহ্বানে সারা পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষক সমাজ আজ প্রস্তুত সরকারের বঞ্চনামূলক ঘোষণাকে ব্যর্থ করিবার জন্য। সেপ্টেম্বরের ডাক আজ বিদ্যালয় কর্মীদের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। আজ আর কোন দ্বিধা নাই, নাই কোনো সংশয়। নিরবচ্ছিন্ন কর্মবিরতির মধ্য দিয়েই সরকার পাবেন তার অসাধু বঞ্চনামূলক ঘোষণার যোগ্য জবাব।..... শিক্ষকরা রাজনীতি করেন না কিন্তু অবশ্যই তাঁহারা শিক্ষানীতি করেন। তাই তাঁহারা সরকারি ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানাইবার জন্য পথে নামিতে যাইতেছেন না। কিন্তু শিক্ষার স্বার্থে শিক্ষকের স্বার্থে, ছাত্রদের স্বার্থে এবং জাতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতির স্বার্থে শিক্ষক আজ সরকারের অবিবেচনা

প্রসূত দম্ভের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত।'[৯৩] ২৭ আগস্ট ১৯৬৬ সমিতির কেন্দ্রীয় দফতরে সাধারণ সম্পাদক অনিলা দেবী, সাংবাদিকদের জানালেন যে শিক্ষকদের প্রতি রাজ্য সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তারা একদিকে শিক্ষকদের ন্যায্য দাবির পরিপূর্তি ঘটানোর কোন চেষ্টা করছেন না, অন্যদিকে নিজেদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও জনগণ ও শিক্ষককুলকে অন্ধকারে রাখছেন। এমত পরিস্থিতিতে সেপ্টেম্বরে জোরদার আন্দোলন শুরু করা ছাড়া, অন্য কোন গত্যন্তর নেই।[৯৪]

পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলির অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ শিক্ষককুল আগামীর আন্দোলনের রণনীতি ও রণকৌশল সম্বন্ধে আগে থেকেই একটি নীল নক্সা' প্রস্তুত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন '৬৬-তে। প্রথমেই আন্দোলনকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হল। ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ থেকে রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শুরু হল শিক্ষক ও কর্মীবৃন্দের ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত কর্মবিরতি। বিগত দিনে যে সব বিদ্যালয় কর্মবিরতি আন্দোলনে অংশ নেয়নি তারাও এবার সোচ্চার হল কর্মবিরতির স্বপক্ষে। ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে রাজভবনের সম্মুখস্থিত রাজপথে শিক্ষকদের অবস্থান সত্যাগ্রহ আরম্ভ হল। শিক্ষা ও সাহিত্যের কার্তিক, ১৩৭৩ সংখ্যায় বলা হল, 'এই অবস্থান সত্যাগ্রহ শিবিরে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন গণ সংস্থা, সমস্ত অকংগ্রেসি রাজনৈতিক দল, বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি আমাদের আন্দোলনের প্রতি তাহাদের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং অন্যান্য বিধিবদ্ধ সংস্থার শ্রমিক-কর্মচারী ও শিক্ষকগণের মিলিত সংস্থার দশ লক্ষ সদস্যের পক্ষ হইতে আমাদের দাবি ও আন্দোলনকে পরিপূর্ণ সমর্থন করা হয়।'[৯৫] এছাড়া এমনকি ৫৪-এর আন্দোলনের মতোই কংগ্রেসের অনেক সদস্য সমর্থক ও ব্যক্তিগত ভাবে এই আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেছিলেন। আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বেই এই জনজাগরণ দেখে সরকার শংকিত হয়ে পড়ল। তারা জনমতকে শিক্ষকদের পাশ থেকে সরিয়ে নেবার লক্ষ্যে, শিক্ষকদের এই আন্দোলনের ফলে, ছাত্র সমাজের পঠন-পাঠন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এরকম একটি প্রচার করতে শুরু করল। স্বভাবতই ছাত্র প্রিয় শিক্ষকেরা এই পরিস্থিতিতে নিশ্চুপ থাকলেন না। সমিতি তীব্র ভাষায় ঘোষণা করল, '....আন্দোলনের ফলে ছাত্রদের যে ক্ষতি হইবে সে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। পূর্বেও সমিতির নির্দেশে, সমিতির পতাকাতলে সমবেত বিদ্যালয়গুলি গ্রীষ্মের এবং পূজার ছুটি স্বেচ্ছায় কমাইয়া দিয়া ছাত্রদের ক্ষতিপূরণ করিয়া সাহায্য করিয়াছে। প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতেও সমিতির নির্দেশে শিক্ষক সমাজ পুনরায় ছাত্রদের ক্ষতিপূরণ করিবার প্রয়াস করিবে।[৯৬]

এই দিকে সেই সময় রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির দুইটি ভিন্ন ভিন্ন জোট গড়ে উঠেছে। একটি হল U.L.F. বা ইউনাইটেড লেফ্‌ট ফ্রন্ট (সি. পি. আই. এম., আর এস পি, এস ইউসি প্রভৃতি দল ছিল এই মোর্চাভুক্ত।) বামপন্থীদের আরেকটি জোট পরিচিত ছিল PULF বা প্রগ্রেসিভ ইউনাইটেড লেফ্‌ট ফ্রন্ট। এই মোর্চার মূল দলগুলির মধ্যে আমরা সি. পি. আই, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং বাংলা কংগ্রেসের উল্লেখ করতে পারি। এই দুই গোষ্ঠী দুটি মূলগত ভাবে কংগ্রেস বিরোধী হলেও, এদের মধ্যে যথেষ্ট অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল।[৯৭]

শিক্ষক আন্দোলনের সাফল্য ছিল এটাই যে যুযুধান এই দুই পক্ষই জনমতের চাপে শিক্ষকদের সংগ্রামকে সোচ্চারে সমর্থন করতে একত্রে সমবেত হয়েছিল। তাই আমরা দেখতে পাই যে শিক্ষকদের অবস্থান সত্যাগ্রহ চলাকালীন '৬৬-এর ২২ এবং ২৩ সেপ্টেম্বর শিক্ষকদের দাবিগুলির সমর্থনে বামপন্থী রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সম্মিলিত ভাবে রাজ্যব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। আটচল্লিশ ঘণ্টার এই ধর্মঘটে পশ্চিমবঙ্গ সম্পূর্ণভাবে নিশ্চল হয়ে যায়। এদিকে সরকারের অনমনীয় মনোভাবের প্রতিবাদে শিক্ষক সমিতির আহ্বানে ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হল আইন অমান্য আন্দোলন। তৎকালীন সমিতির কর্মী সুনীল ঘোষের স্মৃতিচারণ অনুযায়ী, 'আইন অমান্যের প্রথম দিনেই সমিতির সভাপতি সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্বে কয়েক শত শিক্ষক/শিক্ষিকা আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন। ৬ অক্টোবর '৬৬ পর্যন্ত এই আইন অমান্য আন্দোলনে, সন্তোষ ভট্টাচার্য, রথীন্দ্রকৃষ্ণদেব, অরুণ চৌধুরী, শশীমোহন ভট্টাচার্য সহ আড়াই হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা কারারুদ্ধ হন।'[৯৮] আইন অমান্যের প্রথম দিনে কলকাতার মনুমেন্ট (শহীদ মিনার) ময়দানে শত শত শিক্ষক, ১২ জুলাই কমিটি ও BPSF বা ছাত্রদের সংগঠন ও এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। সুনীল ঘোষ তাঁর লেখায় যে সমস্ত কারারুদ্ধ নেতৃত্বের উল্লেখ করেছেন, তাঁরা ছাড়াও আমোদ বিহারী বসু, অমূল্য নাথ লাহিড়ী, নীলিমা সেন ও মায়া চক্রবর্তীর মতো লড়াকু শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ করেছিলেন। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির তথা শিক্ষার জন্য সংগ্রামের ইতিহাসে দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম গণআইন অমান্য আন্দোলন অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে।

কিন্তু উদ্ধত সরকার এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও উত্তাল জন জোয়ারের সামনেও, ভাঙবে তবু মচকাবে না' নীতি অনুসরণ করেন। তারা শিক্ষকদের দাবিকে সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করে গান্ধীবাদের বদলে গাজোয়ারি মনোভাবেরই প্রকাশ করেছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই তখন কারাবন্দী। শিক্ষকদের দাবি মেনে নেবার কোন সদিচ্ছা তখনো অবধি সরকার দেখায়নি। সমিতির নেতৃবৃন্দ বুঝেছিলেন এই নিপীড়নমূলক অবস্থায় আন্দোলনকে আরো তীব্র করলে সরকারি শাসনের এবং অত্যাচারের ইঁদুরকলে শিক্ষকেরা আরো নিষ্পেষিত হবে। অনেক সময়ই কোন একটা দাবি আদায়ের জন্য, ভবিষ্যতে দুই পা এগোবার সুবিধার্থে অনেক সময়ই এক পা পিছোতে হয়—তাছাড়া শান্তিপ্রিয় সাধারণ শিক্ষকদের আরো উগ্র আন্দোলন পরিচালনা করবার মতো হিম্মত তৎকালীন পরিস্থিতিতে আছে কিনা সে বিষয়েও শিক্ষক নেতৃত্ব সন্দিহান ছিলেন। এই রকম পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্সী জেলে ৬ অক্টোবর ৬৬, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃবর্গ একটি জরুরি বৈঠকে বসেন। সেখানে উপরোক্ত মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটান সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষক নেতৃত্ব। এই সভায় প্রথমে শিক্ষক শিক্ষাকর্মী ও সাধারণ মানুষকে শিক্ষক আন্দোলনের প্রতি আদ্যন্ত অনুগত থাকার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে বলা হয়, 'The Association (i.e. ABTA) expects that they will, as before, kindly continue to bear the responsibility involved in the share taken by them in the negotiation and on the basis of the report made

by the General Secretary resolves that at this stage the programme of action on the basis of the Burdwan Resolution may be declared to be over.'[৯৯] দিলীপ চট্টোপাধ্যায়ের মতো তৎকালীন সমিতির কিছু 'তরুণ তুর্কী' আন্দোলন প্রত্যাহার করার পরিবর্তে তাকে চালিয়ে যাবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা আন্দোলনে স্ট্র্যাটেজী হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হননি। কিন্তু গোলকপতি রায় প্রমুখ নেতারা তাঁদের শেষ পর্যন্ত বোঝাতে সক্ষম হন, যে সামনের নির্বাচনে সকলের সমর্থনে এই জনবিরোধী ও শিক্ষা বিরোধী সরকারের পতন ঘটাতে হবে এবং তাই শক্তি সঞ্চয়ের জন্য আন্দোলনের হঠাৎ হঠে আসার দরকার আছে।[১০০] আসলে ৬৬-এর আন্দোলনে শিক্ষকরা পরাজিত হননি। তারা আগামীর পূর্ণাঙ্গ জয়ের জন্য কালক্ষেপ করেছিলেন মাত্র। আন্দোলন আপাতভাবে স্থগিত রাখার কথা বলতে গিয়ে সমিতির মুখপত্রের সম্পাদকীয়তে তাই লেখা হয়েছিল, 'উপযুক্ত সময়ে বর্ধমান সম্মেলনে গৃহীত আন্দোলনের নির্দেশ পরিপূর্ণ ভাবে ও সাফল্যের সহিত পালন করিয়া আন্দোলনের এই পর্যায়ের অবসান ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা আন্দোলন প্রত্যাহার নহে। ব্যাপকতর আন্দোলনের রূপরেখা প্রস্তুত করিয়া বলিষ্ঠতর আন্দোলনের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্যই, যে আন্দোলন স্বৈরাচারী সরকারের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই তাহার অবসান ঘোষণা করা হইল। শিক্ষক সমিতিকে এই উদ্দেশ্যে আরও সংহত আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। পরবর্তী স্তরে শিক্ষা, শিক্ষকের ও শিক্ষাকর্মীর ভাগ্যের বৈপ্লবিক পরিবর্তন করা সমিতির আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া যাইবে.....বর্তমান সরকার সমস্ত গণতন্ত্রবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ হারাইয়া ফেলিয়াছে। সমস্ত আন্দোলনই সরকার যদি তাহার অস্তিত্বের চ্যালেঞ্জ বলিয়া দেওয়ালে পিঠ দিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে উপেক্ষা করিয়া চলে, তবে আমাদের নতুন আন্দোলনের রূপরেখাতে সেই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করিতে হইবে।'[১০১] যাইহোক আন্দোলনের অবসানে '৬৬-এর ১০ অক্টোবর শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং কর্মচারীবৃন্দ নিজ নিজ বিদ্যালয়ে পুনরায় কর্মে রত হলেন। সংগ্রামের এই সময়োচিত বিরতি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষকদের সংগঠন সহ সমস্ত গণ সংগঠন কর্তৃক স্বাগত হল। সরকারি চ্যালেঞ্জের প্রত্যক্ষ জবাব দেবার এই সিদ্ধান্ত সমিতির আন্দোলনের রূপরেখাকে অনেকাংশে পরিবর্তিত করে দিল। স্বাধীনতা পূর্ব যুগের রাজনীতি নিরপেক্ষ উদারবাদী আবেদন নিবেদনমূলক সমিতি, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই একটি প্রেসারগ্রুপ হিসাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির সাহায্য নিয়েছিল ঠিকই কিন্তু তা কখনোই নির্দিষ্ট একটি 'ইজম' নির্ভর গণফ্রন্টে পরিণত হয়নি। এই না হওয়ার পিছনে সমিতির উদারবাদী ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কাঠামোয় তখনো অবধি বিশ্বাসী সমিতির অবিসংবাদিত নেতা সত্যপ্রিয় রায়ের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। কিন্তু নেতা হিসাবে সত্যপ্রিয় রায়ের দৃষ্টিভঙ্গিও ক্রমশঃ পরিবর্তিত হচ্ছিল। জ্যোতি বসুর স্মৃতিচারণ থেকে আমরা জানতে পারি, অন্যান্য বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী বা সমাজবাদের প্রবক্তা দলগুলির মতো, কমিউনিস্টরাও শিক্ষক আন্দোলনে প্রভাব বৃদ্ধি করতে ৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকেই সচেষ্ট ছিল। দলের পক্ষ থেকে এই দায়িত্বে ছিলেন জ্যোতি বসু ও নিরঞ্জন সেনগুপ্ত।[১০২] কিন্তু '৬৬-এর আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্ব থেকেই সত্যপ্রিয় রায়ের পাশাপাশি সমিতির ক্ষমতার ভরকেন্দ্র তিন কমিউনিস্ট নেতা অনিলা দেবী,

গোলকপতি রায় ও রথীন্দ্রকৃষ্ণ দেবের নেতৃত্বাধীনে চলে যায়। অন্য দলভুক্ত বা একেবারেই দলহীন ব্যক্তিবর্গ সমিতির সিদ্ধান্ত নির্ধারণের ক্ষেত্রে, সেরকম কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে সক্ষম হননি। '৫৪-এর আন্দোলনের ও '৬৬-এর আন্দোলনের তাই গুণগত ও পরিমাণগত পার্থক্য তাই সহজেই আমরা লক্ষ্য করি। সমিতির পরবর্তীকালের নেতা উৎপল রায়ের সঙ্গে আমরা একই সুরে তাই বলতে পারি, 'নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি অর্থনীতিবাদের ঘেরাটোপে কখনই আবদ্ধ হয়ে পড়েনি। অর্থনৈতিক দাবি—সংবলিত পেশার আন্দোলন ১৯৬৬-র সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় সমিতিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিমুখে পরিচালিত করলো।'[১০৩] শিক্ষা ও সাহিত্যের ১৩৭৩-এর পৌষ সংখ্যায় লেখা হল 'শিক্ষার স্বার্থে এই সরকারের পতন ঘটানো প্রয়োজন' শিরোনামে। এই ঘোষণা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেল, ১৯৬৬-এর ২০ নভেম্বর সমিতির একজিকিউটিভ কমিটির সভায়। সেখানে গৃহীত হল সমিতির সেই যুগান্তকারী ঘোষণা, 'Oust this Government to win a Progressive Educational policy.'।[১০৪] অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে কংগ্রেস সরকার শিক্ষক সংগ্রাম চলাকালীন যেভাবে 'Grant-In-Aid'-এর টাকা আটকে রেখেছিল, এমনকি দরিদ্র অথচ আত্মমর্যাদাপূর্ণ শিক্ষকদের পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষণের সাম্মানিক অর্থ পর্যন্ত দিতে অস্বীকার করেছিল, তার মধ্য দিয়ে শিক্ষক সমাজ শেষ পর্যন্ত অনুধাবন করেছিল, কংগ্রেস সরকার আর যাই হোক শিক্ষকদের মিত্র নয়। সেদিক থেকে কংগ্রেস প্রশাসনই শিক্ষকদের বিরোধী বামপন্থীদের দিকে ঠেলে দিয়েছিল একথা বলা যেতেই পারে।

এ প্রসঙ্গে অনিলা দেবীর মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, 'শিক্ষক সংগঠনের ইতিহাসে এই ধরনের সিদ্ধান্ত সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমিতির কিছু কিছু শুভার্থীর মনে এ সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠেনি তাও নয়। কিন্তু হঠাৎ উত্তেজনার অথবা কোনো দলীয় চিন্তা থেকে তো সমিতি এই সিদ্ধান্ত নেয়নি, এ সিদ্ধান্ত তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা প্রসূত। তাই নির্দ্বিধায় জাতীয় শিক্ষা কল্যাণে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত সদস্য বন্ধুদের সমিতির অনুসৃত কর্মসূচিতে অংশ নেবার আহ্বান জানালেন, সমিতির নেতৃবৃন্দ।[১০৫] অচেনা পথের দিকে পা বাড়াল বামপন্থী শিক্ষক সমিতি। সেই আলোচনায় আমরা যাব। তবে তার আগে তৎকালীন সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতিতে এতদিনকার শিক্ষক আন্দোলনের যে প্রভাব পড়েছিল তার নাতিদীর্ঘ আলোচনা করব আমরা।

শিক্ষক ঃ সংগ্রাম সাহিত্য

সাহিত্য সমাজের দর্পণ, সমসাময়িক ঘটনাসমূহ তো বটেই, সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টিতে ইতিহাসের ছায়াও প্রায় সময়েই রক্ষিত হয়। ইতিহাস অবশ্যই চলে সাল তারিখ স্থান পাত্রের, পাথুরে বাঁধানো পথ দিয়ে। সাহিত্যের কারবারে ইতিহাসের প্রতিমূর্তি পরিপূর্ণভাবে তৈরি হয় না এটা ঠিকই, কিন্তু প্রতিমার চালচিত্র গঠনে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রচনাশৈলী বা আঙ্গিক সাহিত্যের একটি বড় ঠিকই। কিন্তু বিষয়ের গুরুত্বও কম নয়। শিক্ষক আন্দোলনের বিবিধ পর্যায়েও তাই সমকালীন সাহিত্যের ছায়া পড়েছে। ঐতিহাসিক অশীন দাশগুপ্তের মতে

মানুষের মন বুঝতে না পারলে ঘটনাকে ঠিক ভাবে বোঝা যায় না।[১০৬] অনেকে বলেন, একলা মানুষকে নিয়েই সাহিত্য। ব্যক্তি মানুষের মন ও মানসিকতা তাঁর প্রধান বিবেচ্য। অপর দিকে ইতিহাস সমাজবদ্ধ সমবেত মানুষের অতীত নিয়ে কাজ করে। একদিকে ইতিহাস বিজ্ঞানধর্মী, কেননা সেখানে 'তথ্য থেকে সত্যে' পৌঁছানোর কথা থাকে। তবে ইতিহাস বিজ্ঞানের মতো সাধারণ কোন নিয়মের সৃষ্টি করতে পারে না। এই প্রসঙ্গেই অশীন দাশগুপ্ত তাঁর 'ইতিহাস ও সাহিত্য' প্রবন্ধে বলেছেন, 'সিদ্ধার্থ বোধিলাভ করেছিলেন বলে ইতিহাসে স্থান পাননি। তিনি নিজের মোক্ষ উপেক্ষা করে অন্যের মুক্তির জন্য সংসারে ফিরেছিলেন, সেই জন্যই তিনি ইতিহাসের বুদ্ধ'।[১০৭] এই 'একলা' বুদ্ধের কথাই সাহিত্য বলে, আর এই একলা বুদ্ধকে না বুঝলে, ইতিহাসের বুদ্ধকে আমরা জানতে পারি না। যে কোন আন্দোলনের মতো, শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের ইতিহাস সমসাময়িক সাহিত্যের উপর নির্ভরশীল। একলা শিক্ষকের মন মানসিকতা, পার্থিব ও পারমার্থিক চাহিদা, মূলতঃ সাহিত্যের বিষয় হলেও, তার সাহায্যে আমরা শিক্ষক সংগ্রামের মূল লক্ষ্য বা পরিকল্পনাকে সহজেই বুঝতে পারি। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'কোজাগর'এ যেমন ব্যক্তি জীবন আধারিত উপন্যাস হলেও সমসাময়িক রাজনীতির গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে দেয়। তেমনি শিক্ষক আন্দোলন সম্বন্ধে 'তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের' লেখা সহ, অনেক অনেক রচনা থেকে আমরা ব্যক্তি শিক্ষককে সঙ্গে নিয়েই তাঁদের সমষ্টিগত আন্দোলন সংগ্রামের একটা হদিশ পাই। সেই নিরিখেই আমরা সমসাময়িক সাহিত্য কীভাবে শিক্ষকদের সমষ্টিগত সংগ্রামের অনুসন্ধান করতে সাহায্য করে—তারই খোঁজে কিছু আলোচনা করতে উদ্যোগী হব।

আমরা আমাদের আলোচনার মধ্য দিয়ে আগেই দেখেছি, সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলন শুরু হবার আগেই, অর্থাৎ ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের আগেই বিভিন্ন সাময়িক পত্রের পাতায় শিক্ষকদের তৎকালীন জীবনের দুঃখ দারিদ্র্য নিয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। এমনকি বাংলা সাহিত্যের সূচনা পর্ব থেকেই শিক্ষকদের নিয়ে সৃষ্টিশীল সাহিত্য সৃষ্টির নিদর্শনও আমরা পাই। যার কিছু বিক্ষিপ্ত নিদর্শন আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। 'অনুবর্তন' বা 'সন্দীপন পাঠশালার' মধ্যে দিয়ে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে শিক্ষকদের দুরবস্থার চিত্র আমরা দেখি, তার কোন ব্যত্যয় আমরা এর ঠিক পূর্ববর্তী যুগেও আমরা দেখতে পাই না। বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েই আরম্ভ করি আমরা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রথম স্নাতক ডিগ্রিধারী বঙ্কিমের চোখ যেমন, তার যুগের প্রাক্ উচ্চশিক্ষা, শিক্ষা ব্যবস্থার ফোঁপরা শিক্ষা ব্যবস্থার কথা তুলে ধরেছে, ঠিক তেমনি শিক্ষকদের দুরবস্থার চিত্রও তুলে ধরেছে আমাদের সামনে। 'গ্রাম্য কথা' নামক রম্য রচনাসমূহের অন্তর্গত পাঠশালার পণ্ডিত মশাই-এর রচনায়—ছাত্র ভোঁদার মুর্খামী ও পণ্ডিতের বিদ্যার ও বিত্তের অভাব আমাদের আপাতভাবে হাস্য উদ্যেক করে। ভূ ধাতুর উপরে 'ক্ত' প্রত্যয় যুক্ত করলে কি হয়? তা পণ্ডিতও জানেনা—ছাত্ররও তা অজানা। শেষ পর্যন্ত ভোঁদার মা, এক বাঁকারিতে পণ্ডিত মহাশয়কে ভূতছাড়া করিয়াছে।'[১০৮] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গুরুভক্তি শীর্ষক রচনাটি বিদেশি প্রেক্ষাপটে রচিত। তবু সেখানে দরিদ্র শিক্ষকের পরিবার শেষ পর্যন্ত রাজানুগ্রহ

লাভ করেছে। আমরা দেখি শেষ পর্যন্ত রাজশক্তি বা বিশেষ ভাবে রাজ মহিষীর ব্যবস্থাপনায় সেই নিরুপায় (শিক্ষক) পরিবারের ভদ্ররূপে ভরণপোষণ চলে এবং শিশু-সন্তান দিগের উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষা হয়, তাহার অবিচলিত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।'[১০৯] অবশ্য বিদ্যাসাগরের অঙ্কিত শিক্ষকের চিত্রে আমরা শিক্ষকদের 'দয়ার দান' গ্রহণ করতে দেখি। সমকালীন সমাজ পরিস্থিতিতে আত্ম অপমানকারী দান গ্রহণ ছাড়া, শিক্ষকদের মধ্যে সংগ্রামশীলতার কোন প্রকাশ, অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছু ফলাফলই প্রসব করত না। শিক্ষকদের কাজকে তখনো অবধি 'বৃত্তি' নয় 'ব্রত' হিসাবেই দেখার চল ছিল। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ে 'মাষ্টার মহাশয়' গল্পে বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত দুটি গ্রামের শিক্ষকের বিদ্যাবত্তার পরীক্ষায় আজও আমাদের হাস্য সংবরণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। 'আই গো আপ/ইউ গো ডাউন'-এর এই যুগে দুপাতা ইংরাজি ঘোষাইতে পারলেই, শিক্ষক হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা যেতে পারত। এই গল্পে আমরা দেখতে পাই 'Horns of a dilemma' এবং 'I don't know' এর চক্করে, প্রকৃত গুণী শিক্ষকটিই 'দশচক্রে ভগবান ভূত'-এ পরিণত হয়েছিল। শিক্ষকরা সবাই সেই সময় 'আদর্শবানের' ভূমিকা গ্রহণ করত না। বরঞ্চ অনেক সময় তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক অসূয়া ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাবই প্রকাশ পেত। হয়তো অসহনীয় অর্থনৈতিক অভাব, তাঁদের এই মনোভাবের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। প্রভাত কুমার সেই চিত্রকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।[১১০]

শরৎচন্দ্রের অনেক রচনাতেই শিক্ষক সমাজের তৎকালীন পরিস্থিতির বর্ণনা আছে। এ প্রসঙ্গে আমরা 'পল্লী সমাজে' রমেশ ও বেণীবাবু দুই জমিদারের গ্রামস্থ বিদ্যালয়ের 'উন্নতির' জন্য বিপরীতধর্মী মনোভাবের পরিচয় পাই। তাঁর লিখিত 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসের বৃন্দাবনের কথা আমরা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি।[১১১] আবার রাজশেখর বসুর আতার পায়েস গল্পেও আমরা শিক্ষক-ছাত্রের বন্ধুত্বের সম্পর্কের নিদর্শন পাই।[১১২] বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবর্তন উপন্যাসে আমরা শহুরে শিক্ষকদের বারমাস্যা'র কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। শিক্ষক জীবন দিয়ে তাঁর 'গ্রাম সংস্কার' গল্পটির কথাও আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। যেখানে গ্রাম্য মাষ্টার শিক্ষকতার সঙ্গে কৃষকদের দলিল পত্রর অর্থ উদ্ধার করা এমনকি চিকিৎসা পর্যন্ত করতে অপারগ নয়। গল্পের মাষ্টার মশাই নিজের জবানীতেই স্বীকার করেছেন, 'এই সুদকষা থেকে ভূত ছাড়ানো পর্যন্ত তাবৎ বিদ্যার জোরে দীর্ঘ ছয়টি বছর প্রবল প্রতিপত্তিতে কাটাইয়া দিলাম।'[১১৩] বাংলার উজ্জ্বল সাহিত্যিক তারাশঙ্কর 'সন্দীপন পাঠশালা' উপন্যাসে শিক্ষক জীবনের জ্বালা যন্ত্রণা নিয়ে বিস্তৃত লিখেছেন। পূর্বে প্রসঙ্গ ক্রমে আমরা তার উল্লেখ করেছি। সাধারণতঃ শিক্ষক জীবন নিয়ে যাঁরা গল্প উপন্যাস ইত্যাদি রচনা করেছেন তারা সহ শিক্ষকদের 'রক্ত-ঘাম-অশ্রুজলের' কথারই বর্ণনা করেছেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিদ্যালয় পরিচালক পর্ষদের দোসর হিসাবেই চিহ্নিত হয়েছেন বহু সময়ে। কিন্তু তারাশঙ্করের 'হেডমাষ্টার' গল্পে নব্য শিক্ষক ছাত্রপ্রিয় সীতেশের ছাত্রদের ধর্মঘটে উৎসাহ দেওয়া ও তাদের 'বন্ধু দার্শনিক পথপ্রদর্শক' হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করাকে হেড মাষ্টার চন্দ্রভূষণ বাবু শৃংখলা ভঙ্গের সঙ্গেই তুলনা করেছেন। এই গল্পের হেড মাষ্টার মশাই চন্দ্রভূষণ বাবু, '১৯০৫ সাল, বঙ্গভঙ্গের

বৎসর.....নবগ্রামে এসে ইস্কুল করবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। গড়ে তুলেছেন। ঊনপঞ্চাশ বৎসর তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।'[১১৪] এই বর্ণনা অনুযায়ী ১৯০৫+৪৯ =১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষক আন্দোলনজনিত সময়ের কথাই যেন এই গল্পে বলা হয়েছে। গল্পের শেষে সীতেশ বাবুর যুক্তিও সংস্কারমুখী মনোভাবের জয় দেখালেও, তারাশংকরের লেখনীর গুণে পুরনো আমলের হেড মাষ্টার চন্দ্রভূষণ বাবুর পরাজিত মূর্তির জন্য, আমাদের চোখের কোণায় একটু জল এসেও জমা হয়। আবেগাপ্লুত হই আমরাও। মনোজ বসুর 'মানুষ গড়ার কারিগর' উপন্যাসে আমরা শিক্ষক সমাজের এক জীবন্ত বর্ণনা পাই। বৃদ্ধ শিক্ষক মহিমবাবু পাঠ্যদানে অপারগ হয়েছেন। তার সেই দুর্দশা সবার কাছে হাসি তামাশার বিষয়। সহ প্রধান শিক্ষক থেকে ছাত্রবৃন্দ, সকলের কাছে হাস্যাস্পদ তিনি। দারিদ্র্যের চাপে ন্যুব্জ শিক্ষক এই উপন্যাসে, তাই তাঁর প্রয়াত স্ত্রীর কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলছেন, 'সরলাবালার বড় ইচ্ছা ছিল, মাষ্টারের ছেলে মাষ্টার না হয়ে দশজনের একজন হয় যেন।'[১১৫] সত্যিই সেদিন দারিদ্র্য লাঞ্ছিত 'মাষ্টার' হওয়াকে দশজনের একজন হওয়া বলে সমাজ মনে করতো না। সেদিনের শিক্ষকদের মর্মযন্ত্রণার কথা করুণ পরিহাসের সুরে বেঁধে গল্প লিখেছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী। সেখানেও ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া পণ্ডিতমশাই। সেই পণ্ডিতমশাইয়ের স্কুলে, 'লাট এলেন, সঙ্গে ডেপুটি কমিশনার, ডাইরেক্টর, ইনস্‌পেক্টর, আর লাট সাহেবের এডিসি ফেডিসি না কি সব বারান্দায় জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।' লাট সাহেবের পোষা কুকুরটিও ছিল। যার আবার একটা ঠ্যাং খোঁড়া। যার জন্য মাসে খরচ হয় পঁচাত্তর টাকা। আর বৃহৎ পরিবার সহ সহ পণ্ডিত মশাইয়ের বেতন ২৫ টাকা। পণ্ডিত মশাই-এর উবাচ '.....অপিচ আমি ব্রাহ্মণি, বৃদ্ধামাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আটজন, আমাদের সকলের জীবন ধারণের জন্য আমি মাসে পাই পঁচিশ টাকা। এই ব্রাহ্মণ পরিবার লাট সাহেবের কুকুরের কটা ঠ্যাঙের সমান।'[১১৬] পণ্ডিত মশাই-এর আত্মঅবমাননায় তার ছাত্ররা তো বটেই, রসিকতার গণ্ডী ছাপিয়ে এখানে আমাদের চোখে জল এনে দেন মুজতবা আলী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টিচার' গল্পের কথা আমরা পূর্বেই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছি। তাই তার পুনরুল্লেখ আর করা হল না। সে যুগে শিক্ষকদের নিয়ে প্রথিতযশা অনেক লেখকই কলম ধরেছেন। এদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী 'জীবনের আইন', সুবোধ ঘোষের 'ব্রততী', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের হেডমিস্ট্রেস' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দাম' সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর 'মালেকা', তপোবিজয় ঘোষের 'জীবনদীপ' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ্য। এইসব গল্পের প্রায় প্রত্যেকটিতেই সে যুগের গুরুকুলের আর্থ-সামাজিক জীবনের অসহ্য সংকট আজো আমাদের ভাবায়, শিহরিত করে তোলে। মনে রাখতে হবে, এসব গল্প বা রচনা—সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়নি। সংবেদনশীল লেখক কুল, তাদের অন্তর্দৃষ্টি ও সহানুভূতির মানসিকতায়, শিক্ষক সমাজের এই দুরবস্থার চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

অবশ্য ৪২ পরবর্তীকালে শিক্ষক আন্দোলনের প্রস্তুতি তরঙ্গাঘাত যখন সরকারি ঔদাসীন্যের উপকূলে বারবার আঘাত হানছিল, তারই অভিঘাতেও বাংলা সাহিত্যে প্রচুর ছোট গল্প এবং কবিতা রচিত হয়েছিল। এবার আমরা সে সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করব। নারায়ণ

গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভাঙা চশমা' গল্পে শিক্ষক জীবনের সেই সময়কার মর্মন্তুদ কাহিনি আমরা লক্ষ্য করি। বুনো রামনাথের মতো যারা তেঁতুল পাতার ঝোল খেয়ে জ্ঞান তপস্বী আচার্যের মানসিক প্রশান্তি নিয়ে খুশী থাকবেন, তারাও এই সময়কার টালমাটাল অবস্থায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। যুদ্ধক্রান্ত সময় পেরিয়ে, জীবনজীবিকার অস্থিরতায় আচ্ছন্ন যখন শিক্ষকেরা, তখন গল্পের কথক এক মাইনর স্কুলের হেডমাষ্টার-এর দরিদ্র জীবন সম্বন্ধে কটাক্ষ করলেও, শিক্ষক কিন্তু প্রথমেই তার আত্মসম্মান বজায় রেখে 'তিনি কোন রিলিফ নিতে আসেননি' নিঃশব্দেই এটা ঘোষণা করেন। এটা অনুভব করে কথক তাকে পাগল ঠাউরেছিলেন। শিক্ষকের পীড়াপীড়িতে গল্পের কথক, শিক্ষকের স্কুল দেখতে যান। দুর্ভিক্ষের জর্জর সময়েই সেই স্কুল ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তবু কথককে শিউরে দিয়ে আদর্শবাদী প্রধান শিক্ষক যখন আমরা দেখি, চিৎকার করে বলছেন, 'আছে সবাই আছে। তারা কোথাও যায়নি, যেতে পারে না। আপনি শুনুন। কেমন করে পড়াতে হয়।' প্রতিকূলতা ও বিপর্যয় এবং তার মধ্যে অবিচল ও আদর্শে অটুট থাকা শিক্ষকের এক প্রতিচ্ছবি এই গল্পে চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। লেখক গজেন্দ্রকুমার মিত্র নিজে প্রথম জীবনে শিক্ষক ছিলেন। 'রাত্রির তপস্যা' নামক একটি উপন্যাসে তিনি সমকালের শিক্ষকদের জীবন এবং মনন খুব সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। দিনগত পাপক্ষয়ের বৃত্তিকে নীচতা ও প্রলোভনের উর্ধ্বে রাখার জন্য সমস্ত বিরুদ্ধতার নিঃসঙ্গ সংগ্রাম এই উপন্যাসের মূল কথা।[১১৭]

শুধুমাত্র উপন্যাস নয়—সে সময়কার কবিদের কাব্যেও শিক্ষক সমাজের নিদারুণ অবস্থা খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছিল। কবি আশরফ সিদ্দিকি তালের মাষ্টার কবিতায় লিখেছিলেন, 'যুদ্ধ থেমে গেছে/আমরা তো স্বাধীন/কিন্তু তালের মাষ্টারের তবু/ফিরল না তো দিন।'[১১৮] চিরকালের জন্য তালসোনা পুরের তালের মাষ্টার বিখ্যাত হয়ে রইল সাহিত্য হিসাবে এবং যুগের জিজ্ঞাসা হিসাবে। নিজের ও দশের স্বার্থে কবিরা সমাজের সঙ্গে সৃজনের সাঙ্গীকরণের জন্য তখন যথেষ্ট পরিমাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। পঞ্চাশের দশকে শিক্ষক আন্দোলনের ঐতিহাসিক মুহূর্তকে স্মরণ করে শিক্ষক কবি দীনেশ দাস তাঁর শিক্ষক মিছিল, ১৯৫৩ কবিতায় লিখেছিলেন, 'ইডেন উদ্যানের পাতাঝরা পথের ওপর/বসে আছে পাঁচ হাজার মানুষ/পাঁচ হাজার নীরব দুর্গের মত/ যদি একবার নেমে আসতে/দেখতে পাঁচ হাজার রক্তের নদী/দেখতে শুধু হাজার হাজার জ্বলন্ত নক্ষত্র'।[১১৯] ১৯৫৪-এর শিক্ষক আন্দোলন বিখ্যাত সাহিত্যিকদের মধ্যেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সেই সময়ে বিখ্যাত কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ লিখেছিলেন, 'তোমরা দিয়েছ শিক্ষা, যে শিক্ষায় কলম ধরেছি অন্যায় প্রতিবাদে/আজ যদি থাকি নির্বিকার তোমাদের ধর্মঘটে/তোমাদের জীবন সংগ্রামে/তবে মাথায় পড়ুক বজ্রঘাত।'[১২০] মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কবিতা একলব্যতে আমরা দেখতে পাই, শিক্ষক সমাজের কোন শ্রেণির পক্ষে কাজ করছেন এবং সুবিচার করছেন কিনা, এই আর্তনাদ দ্রোণাচার্যের মুখ থেকে উচ্চারিত—'পালা, পালা একলব্য পালা/যা, তুই যেদিক চোখ চলে/বল না। না বল আমি ফিরে যাই/ ঝন্‌ঝন্ ঝাঁকুনি আন সংশয়ের শ্লথ স্নায়ু ছিড়ে/না বল একবার/পঙ্গুকে জুগিয়ে দে রে, সামর্থ্যের লাঠি/আমি ফিরে চলে যাই।'[১২১]

শিক্ষকদের সংগ্রাম, সমাজসচেতন এবং অনুভূতিপরায়ণ সাহিত্যিকদের আন্দোলন চলাকালীন প্রচণ্ড ভাবে স্পর্শ করেছিল। শুধু মাত্র তুলি বা লেখনী দিয়ে সংগ্রামের সংবাদ শুনিয়ে তারা কর্তব্য সমাধা করেন নি। তারা দলে দলে শিক্ষকদের সংগ্রাম স্থলে এসেছিলেন। সৃষ্ট সম্ভার দিয়ে শিক্ষকবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। সুরকার গীতিকার সলিল চৌধুরী শিক্ষকদের সম্মুখে এনে দিয়েছিলেন তাঁদের প্রাণপ্রিয় বিশল্যকরণি। তাঁর বিখ্যাত গান, 'পথে এবার নামো সাথি/পথেই হবে এ পথ চেনা' এই আন্দোলনের গান শিক্ষকদের উদ্দেশ্য করেই রচিত হয়েছিল। এই গানের দুটো পংক্তির উল্লেখ করার লোভ আমরা সামলাতে পারলাম না। শিক্ষক সমাজ যে তাঁদের আজন্ম লালিত দ্বিধাদ্বন্দ্বকে ছুঁড়ে ফেলে, সংগ্রামের ময়দানে শামিল হয়েছিলেন, তাকে কুর্নিশ করে, এ গানে বলা হয়েছিল, 'অনেক তো দিন গেল বৃথা এ সংশয়ে/এসো এবার দ্বিধার বাধা পার হয়ে।'[১২২] আজো এই গান সংগ্রামী মানুষকে উদ্‌বেল করে তোলে। এই সময় হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কথা ও দিলীপ সেনগুপ্তের সুরে লেখা হয়েছিল, 'তোমরা জ্বেলেছ দীপ/তোমরা দিয়েছ আলো/তোমরা কেন গো আঁধার কুটীরে/ক্ষুধায় শীর্ণ কালো/.... গুরুর আসন দিয়েছি তোমায়/বিশ্ব বেসেছে ভালো/.....তোমাদের যারা করে অপমান/ধূলায় লুটাবে তাদের নিশান।'[১২৩] হেমাঙ্গ বিশ্বাসের এই লেখা আন্দোলন চলাকালীন সময়ে যেন শিক্ষকদের প্রতি জনতার মনোভাবের প্রতিফলন হয়ে উঠেছিল।

নাট্যকার, অভিনেতারা এই অশনীকালে নিস্তব্ধ হয়ে থাকেননি। শিক্ষক আন্দোলনের সম্পর্কিত প্রথম পথ নাটিকা পরিচালনা করেন দিলীপ সেনগুপ্ত। চুয়ান্নর আন্দোলনে পুলিশের গুলিকে কেন্দ্র করে শোভা সেন এবং তাঁর গ্রুপ 'সৌরীন মাষ্টার' শীর্ষক একটি পথ নাটিকা প্রদর্শন করেছিলেন। এই আন্দোলনের পটভূমিকাকে গ্রহণ করে এই নাটক সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন, 'এক দরিদ্র সহ প্রধান শিক্ষক এই নাটকের নায়ক। শিক্ষকদের সংগ্রামের তিনি বিরোধী, আশা করেন যে সৎভাবে শিক্ষকতা করার ন্যায্য স্বীকৃতি হিসাবে প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ তাহাকেই দেওয়া হইবে। চাকুরি ও পরিবারের ক্ষেত্রে নানা প্রতিকূল ঘটনার মধ্য দিয়া তাহার মোহমুক্তি এই নাটকের কাহিনীতে বিবৃত হইয়াছে।'[১২৪] শিক্ষক আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বে শিক্ষকরা সরকার ও বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির শুভ বুদ্ধির উপর আস্থা রেখেছিলেন। তাদের আশাকে পরাহত করেছিল সরকার। সেই সমস্ত শিক্ষকের আশাভঙ্গ ও আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়াই এই নাটকের উপজীব্য। এই প্রসঙ্গে বিজন ভট্টাচার্যের 'গোত্রান্তর' নাটকটির কথাও উল্লেখ করতে পারি। এই নাটকে উদ্‌বাস্তু কলোনীর মানুষ ও বিশেষ ভাবে সেখানকার শিক্ষক সমাজের দুরবস্থার চিত্র অঙ্কিত করেছেন, সুনিপুণ ভাবে বিজন বাবু। সমালোচক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের কলমে, 'কাহিনীর নায়ক হরেন মাষ্টার, কায়ক্লেশে দিনপাত করেন। একটি পাঠশালা করিয়াছেন। তবু অর্থ নহে আদর্শের জন্যই হরেন মাষ্টার প্রত্যহ পাঠশালা ঘরের শূন্য বেঞ্চির দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকেন।'[১২৫] শেষ পর্যন্ত ছোট ভাই কেশবলালের সামান্য বেতনের ভরসায় তিনি ও

তাঁর পরিবার শহরে আসেন। পরিশেষে আদর্শ গুরুমশাই ঘটনাক্রমে খেলনা পুতুলের ফেরিওয়ালা বনে যান। মেয়ের বিয়ে দেন শ্রমিক কানাইয়ের সঙ্গে। ইতোমধ্যে বস্তিবাদী হতে হয়েছে তাঁকে। সেই বস্তি ভাঙ্গতে জমিদার যখন লোক পাঠায়, রুখে ওঠে হরেন মাষ্টারের সংগ্রামী সত্তা।' সাহিত্য সমালোচক অজিত ঘোষ এই নাটকের ময়নাতদন্ত করেছেন, 'মধ্যবিত্ত শিক্ষক কন্যা.....বস্তিবাসী শ্রমিক যুবক কানাইকে ভালোবাসিল এবং অবশেষে উহাদের মধ্যে বিবাহ হইল, ইহাই গোত্রান্তর।.... মধ্যবিত্ত সমাজ যে আজ সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা ভদ্রতা ও শ্রেণি আভিজাত্যের গোত্র বন্ধন ছিন্ন করিয়া কায়িক পরিশ্রমজীবী শ্রমিক সমাজের গোত্রভুক্ত হইয়াছে, ইহাই প্রকৃত গোত্রান্তর।'[১২৬] বাস্তবের জগতে যখন শিক্ষকেরা নিজেদের আন্দোলনের স্বার্থেই হতদরিদ্র শ্রমিক কৃষক বা নিরন্ন, গৃহহীন উদ্বাস্তুদের সাহায্য চাইছে, তাঁদের শ্রেণি অবস্থানের তোয়াক্কা না করে, সেই পটভূমিকায় জীবনের ময়দানের প্রতিফলন ঘটেছে বিজন ভট্টাচার্যের এই নাটকে। নরেশ সেনগুপ্তর 'রবীন মাষ্টারও' নাটক হিসাবে যথেষ্ট সুখ্যাতি পেয়েছিল। ১৯৫৮-এর রমেশ লাহিড়ীর লেখা 'অপরাজিত' নামক নাটকও উল্লেখ্য। চলচিত্র পরিচালকরাও তাঁদের সৃষ্টি কলায়, শিক্ষক আন্দোলনকে অবহেলা করেননি। শিক্ষক সংগ্রামগুলিকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত চলচিত্র প্রস্তুত হয়েছিল, তার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের পরিচালনাধীন 'হেডমাষ্টার', 'ছোট দিদিমণি' প্রভৃতির কথা উল্লেখ করতে পারি। শিক্ষকের ছায়ায় এক নামগোত্রহীন কিশোরের বেড়ে ওঠা, এবং শিক্ষকের অভাব তার জীবনে কি ঝড় এনে দিয়েছিল নীহার রঞ্জন রায় তাঁর 'লালুভুলু' কিশোর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। এই রচনার চলচিত্রায়ণ করেছিলেন পরিচালক সত্যেন বসু।[১২৭]

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষক আন্দোলনের ছোঁয়ায় অন্নপূর্ণা গোস্বামী 'নয়া ইতিহাস' নামে উপন্যাস প্রণয়ন করেছিলেন। ওই সময় পর্বেই দীপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সুহাসিনী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা জয়তীকে প্রধান চরিত্রে রেখে রচনা করেন 'তৃতীয় ভুবন'। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'এক নতুন দায়িত্ব বোধ। মেয়েদের শান্ত রাখার জন্য কৌশল উদ্ভাবন, বয়োজ্যেষ্ঠা শিক্ষিকাদের পারস্পরিক ঈর্ষা কলহের মধ্যে নিরপেক্ষতা রক্ষা প্রধানা শিক্ষিকার সহিত স্কুল পরিচালনা নিয়ে মতদ্বৈধতা ইত্যাদির মধ্য দিয়া তাহার মন নতুন কর্মক্ষেত্রে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।'[১২৮] সেই সময়েই আদর্শ বোধের জন্য চরম ত্যাগ স্বীকারের এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন নারায়ণ সান্যাল, তাঁর 'প্যারাবোলা স্যার'-এ। বেতারে পরবর্তীকালে এই কাহিনীর নাট্যরূপও পরিবেশিত হয়েছিল। আদর্শ রক্ষা করার জন্য একাধিক বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত, পরিবার থেকে আদর্শগত কারণেই মানসিক ভাবে বিচ্ছিন্ন প্যারাবোলা স্যার' জীবনের শেষ পর্বে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন কোলকাতার রাস্তায়। হঠাৎ তিনি শিক্ষকদের সংঘবদ্ধ মিছিলের সম্মুখীন হন। সেখানে অনতিকালের মধ্যে শিক্ষক আন্দোলনের কর্মকর্তা তাঁর প্রাক্তন ছাত্র শচীনন্দনের সম্মুখীন হন তিনি। শচীনন্দন তাকে মাইক্রোফোনের সামনে এনে বলেন, 'কমরেডস্। ..... এই যে পক্বকেশ বৃদ্ধকে আপনারা দেখছেন এর নাম শ্রীযুক্ত সত্যবান চক্রবর্তী.....পঞ্চাশ বছর আগে এ. বি. টি. এ. তে প্যারাবোলা স্যারকে সবাই এক ডাকে চিনত। যে সংগ্রামে আজ আপনারা শামিল হয়েছেন এই বৃদ্ধ আজীবন সেই সংগ্রামই করে গেছে। উনি আমাদের পূর্বসূরী।'। প্রত্যুত্তরে

ভগ্ন স্বাস্থ্য কিন্তু অন্তরে দৃঢ় প্যারাবোলা স্যার বলে উঠেছিলেন, '.....আমার প্রথম কথা ঃ তোমাদের আমি চিনি, তোমরা আমার অতি প্রিয়জন—তোমরা শিক্ষক। দ্বিতীয় কথা, তোমাদের কিসের সংগ্রাম তাও আমি জানি। তোমাদের সংগ্রাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে।..... ঈশ্বরের কাছে একমাত্র প্রার্থনা—তোমরা অন্যায়ের সঙ্গে আপস কর না।'[১২৯] আত্মঘাতের পথ থেকে সরে এসে সংগ্রামের ময়দানে শামিল হন প্যারাবোলা স্যার। এই সময়েই প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ভবিষ্যতের ভার' গল্পে দেখি, মানুষ জাতটাকে গড়ে তোলবার ভার নিয়ে আত্মীয় স্বজনের কটাক্ষ সত্ত্বেও গল্পের নায়ক পবিত্র শিক্ষাঙ্গনে হেডমাষ্টার হিসাবে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু অচিরেই তিনি অনুধাবন করলেন, মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে পরিচিত শিক্ষকদের অনেকেই হৃদয়ে অতীব সংকীর্ণ। ছাত্রদের পাঠ্যাতিরিক্ত জ্ঞান বিতরণের জন্য তিনি কর্তৃপক্ষেরও বিরাগভাজন। চরমতম দারিদ্র্য এবং নিষ্প্রাণ শিক্ষাঙ্গনের জাঁতার মধ্যে পিষ্ট হতে হতেই শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রাণবন্ত শিক্ষক সত্তার অবসান ঘটে। গল্পটি পড়ে এই সত্যটিই উদ্‌ঘাটিত হয়, যে একক কোন চেষ্টায় নয়—বরঞ্চ সম্মিলিত প্রয়াসেও শিক্ষাঙ্গনের এই অন্ধকার দূরীভূত হতে পারে।[১৩০]

আসলে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক মুনাফাময় নয়, তা সজীব ও প্রাণবন্ত। কারখানার সঙ্গে শ্রমিকের, বাড়ির মালিক ও ভাড়াটের, ক্রেতার সঙ্গে বিক্রেতার, ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে আমানতকারীর মধ্যে যে সম্পর্ক, পেশা হলেও ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক সে জাতীয় নয়। প্রথমোক্ত সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে মুনাফা লাভের যান্ত্রিকতা। আবার শেষতম সম্পর্কটি জ্ঞানার্জনের আন্তরিকতায় বাঁধা। তারই প্রকাশ আমরা দেখি শিক্ষকদের বিভিন্ন আন্দোলনের সময়। শিক্ষক গরিব, স্বভাবতই সুস্থ গ্রাসাচ্ছদনের জন্য তার অর্থ চাই। এই দাবি মেটাবার ছলে, সরকার ছাত্র বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব যতবার করেছে, ছাত্রপ্রিয় শিক্ষক সমাজ ততবারই সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। উপরন্তু শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের সংগ্রামে ছাত্ররা সবসময়ই পাশে পাশে থেকেছে। বুদ্ধদেব বসুর 'শোণপাংশু'তে অবশ্য আমরা এক শ্রেণির শিক্ষকদের অসততা, সংকীর্ণতা ও ভণ্ডামীরও চিত্র দেখি। আসলে অন্যসব পেশার মতো কিছু কালো ঘোড়ার অস্তিত্ব আমরা লক্ষ্য করি এখানে, যা খুব স্বাভাবিক। পরিশেষে আমরা শিক্ষক আন্দোলনের সমভাগী চিত্র শিল্পীদের অবদান প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আলোচনা করব। বিভিন্ন চিত্রশিল্পীর আঁকা চল্লিশটি চিত্র দ্বারা, ৫৪-এর অবস্থান স্থলকে অলঙ্কৃত করা হয়েছিল। এগুলি মূলতঃ এঁকেছিলেন বিখ্যাত লেখক ও চিত্রশিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রবীণ চিত্রশিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে এই চিত্রগুলি আঁকা হয়েছিল।[১৩১] আসলে ৫০-এর দশকের প্রথমার্ধে একাকিত্বের সব বাঁধনকে ছুঁড়ে ফেলে শিক্ষকবৃন্দ জনতার পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। শ্রমিক-কৃষক, কর্মচারী, উদ্বাস্তুরা, যেমন তাদের জনবল ও সাধ্যমতো অর্থ ও অন্যান্য উপকরণ নিয়ে শিক্ষকদের পাশে এসে উপবিষ্ট হয়েছিলেন অবস্থান স্থলে। তেমনি রং, তুলি, লেখনী আর ক্যামেরা, পথ নাটিকা নিয়ে এসেছিলেন আমাদের বুদ্ধিজীবীকুল। ৫৪ এবং ৬৬-এর বড় দুই শিক্ষক সংগ্রামে তাই তাঁদের অবদান বড় কম ছিল না।

এতক্ষণ আমরা শিক্ষক আন্দোলনে তথাকথিত 'বহিরাগত' শিল্পী, সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু বুবুক্ষু শিক্ষকেরা তাঁদের নিজস্ব আন্দোলন সম্বন্ধে কি

ভেবেছিলেন—বুদ্ধিজীবী সমাজের অংশ হিসাবে তারা তাদের নিজস্ব মুখপত্র 'শিক্ষা ও সাহিত্য'র পৃষ্ঠায় আন্দোলনের আয়ুধ হিসাবে কোন্ সৃষ্টিকে স্থান দিয়েছিলেন, সেই সম্বন্ধেও নাতিদীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন আছে। সমিতি গঠনের প্রথম দিকে সমিতি পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতায় অবশ্য আদর্শ শিক্ষক কীরকম করে হতে হয় তাঁরই চিত্র মূলতঃ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন বিখ্যাত কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শিক্ষা সাহিত্যের চৈত্র ১৩২৯ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় লিখেছিলেন, 'কোমল মনের শিল্পী মোরা/কমল বনের পূজারী..... আমরা সেই কল্প পাদপ/পারিজাতের বাগিচা/অমৃতেরি আবাদ করি/উপাড়ি হায় আগাছা।' সেই সময়ে সমিতির মুখপত্রে যে সমস্ত কবিতা প্রকাশিত হত, তাতে সংগ্রামমুখিনতার চিত্রটি সেভাবে ফুটে উঠত না। এমনকি কবি ও শিক্ষক কালিদাস রায় যেখানে শিক্ষা ও সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে জ্বলন্ত ভাষায় বলছেন, 'স্কুলের মাহিনা সামান্য, অনেক স্থলে ইহা স্থাবর হইয়া থাকে বহুবর্ষ ধরিয়া। দশ বৎসরে এক টাকাও বেতন বৃদ্ধি হয় নাই, বাঙলা দেশে এমন হতভাগ্য স্কুল বহু আছে। যেখানে বেতন স্থবির হইয়া থাকে না—সেখানে জঙ্গম হইলেও, শম্বুকের গতিতে অগ্রসর হয়। এদিকে শিক্ষকের পারিবারিক ব্যয় বৃদ্ধি অশ্বগতিতে চলিতে থাকে।'[১৩২] সেই একই লোক কাব্যরচনার সময় কিন্তু বৃত্তি হিসাবে শিক্ষকতাকে কণামাত্র স্থান না দিয়ে ভাববাদের প্রভাবে সেই বিখ্যাত কবিতাটির সৃষ্টি করেছেন। কবিতাটি বহু পঠিত, তবু উল্লেখ করছি, 'বর্ষে বর্ষে দলে দলে/আসে বিদ্যামঠতলে চলে যায়/তারা কলরবে/ কৈশোরের কিশলয় পর্ণে পরিণত হয় যৌবনের শ্যামল গৌরবে' ছাত্রধারা শীর্ষক এই লেখাটিতে শিক্ষকবৃন্দের আর্থিক সামাজিক দুরবস্থার কোন চিহ্নই আমরা পাই না।

কিন্তু দুই দশকেই শিক্ষা ও সাহিত্যের কবিকুলের মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছিল। 'ব্রত'র পাশাপাশি 'বৃত্তি' ও মহনীয়—এই মনোভাবের সুস্পষ্ট প্রকাশ সেই সময়কার শিক্ষা ও সাহিত্যের পাতায় আমরা দেখতে পাই। এ প্রসঙ্গে একটি প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতার কথা আমরা বলব। 'সনাতনের স্বপ্ন ভঙ্গ' শীর্ষক এই কবিতার লেখক কানাইলাল গোস্বামীর লেখায় শিক্ষকের দুরবস্থা জনিত ক্ষোভ ও ক্রোধের প্রকাশ, আমাদের বিস্মিত করে না। কবিতাটি এই রূপ। সনাতন মোর নাম/সেঁত সেঁতে ফ্ল্যাট, চিলে কোঠা আর কুঁড়েঘর মোর ধাম/শিক্ষক আমি মহা পরিচয় স্বাধীন ভারতবর্ষে/ ভিক্ষুক নয়, খুদকুঁড়ো পেলে তবু নেচে উঠি হর্ষে/চাইনে অর্থকাম/লক্ষ্মী যে মোর বাম/ধর্মের তালে মোক্ষের সুর গেয়ে চলি অবিরাম/। কিন্তু আমরা এই কবিতার শেষ দিকেই দেখতে পাই বুনো রামনাথ থাকতে গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শিক্ষক আর চাইছেন না—সে বলে উঠছে, 'সনাতন আজি উঠেছে রাগিয়া অদ্যতনের ঘায়ে/তাসের ঘরের তাসগুলো উড়ে পড়ে মায়াবীর পায়ে/কাঁপে সরোবর কাঁপিছে ভূধর আকাশে অট্টহাসি/দূর দিগন্তে সাপুড়ে বাজায় বাঁশী/আজি হবে পূজা আজি মহাপূজা শঙ্খঘণ্টা বোল/জীবন দেবতা চাহে মোর পূজা লেলিহান উতরোল/।'[১৩৩] কবিতার পংক্তিতে কাগজ ভরানোর বদলে আমরা শিক্ষা ও সাহিত্যের পাতায় প্রকাশিত আর একটি কবিতার মধ্য দিয়ে ৫০ এবং ৬০-এর দশকের শিক্ষক কবিদের রচনার প্রসঙ্গ শেষ করব। সেই সকাল' শীর্ষক বিনয় গুহর কবিতা, 'অন্ধকারের শেকল ছিঁড়েছে/উঠেছে সূর্য রক্তলাল/কোটি শহীদের রক্ত পতাকা/কোটি শহীদের স্মৃতি

মশাল/..... 'হে মার্কেটের স্মৃতি জাগে ঐ/শিশির চোয়ানো ধানের শীষে/ঘাসে ঘাসে ভরা শিকাগোর স্মৃতি/মস্কোর স্মৃতি সাগরে মিশে....জেগে ওঠে আজ শহর নগর/জেগে ওঠে আজ খেত-খামার/ভেঙে গেল আজ হাতুড়ির ঘায়ে/সারা দুনিয়ার ঘুম-পাহাড়'।[১৩৪] সমিতির আন্দোলনের তিন দশকের তিনটি প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা যেন, আন্দোলনের তিনটি পর্যায় খুঁজে পাই। কুমুদরঞ্জন বা কালিদাস রায়ের কবিতায় শুধু মাত্র 'ব্রতধারী' শিক্ষকের দেখা পাই আমরা। অন্ততঃ তাঁদের কাগজে কলমে নিজেদের দাবি দাওয়ার প্রসঙ্গ কিছুটা অন্তরালেই থেকে গিয়েছে এই কবিতাদ্বয়ে। দ্বিতীয় কবিতা কানাইলাল গোস্বামীর লেখায় আন্দোলনের কথা এসেছে। এসেছে শিক্ষকদের বৃত্তির অসহনীয় দুরবস্থার চিত্র। তবে 'সরস্বতীর পা ধোয়া জলেই' তখনও পরম মোক্ষ খুঁজলেও জীর্ণতাকে পদাঘাতে চূর্ণ করার ডাকও তখন দিয়েছেন আমাদের গুরুকুল। আর আমার উল্লিখিত শেষ কবিতা 'সেই সকাল' এ শিক্ষককুল তাঁদের একার আন্দোলনকে করে তুলেছেন শুধু দেশের নয়—সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী আন্দোলনের অংশ হিসেবে। এর ভালো মন্দ নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি। সাহিত্যে শিক্ষক মানসের তিন যুগের পরিবর্তনই কেবল বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লেখ করলাম।

৬০-এর দশকে 'শিক্ষা ও সাহিত্য'-এ প্রকাশিত 'বশীর আল্‌হেলালের গজেনবাবুর ডায়েরি' শীর্ষক গল্পে এক আত্মভোলা শিক্ষক গজেনবাবু ও তার বিশেষ প্রিয় ছাত্র নকীবের কথা উঠে এসেছে। সেই মাষ্টার মশাই-এর মৃত্যুতে নকীবের শোকোচ্ছ্বাস সত্যিই আমাদের আবেগ আপ্লুত করে তোলে। ছাত্র প্রিয় সেই গজেন বাবু কিন্তু ছাত্র এবং শিক্ষকদের স্বার্থেই শিক্ষক আন্দোলনের সমভাগী হয়েছিলেন। লেখকের কথায়, '.....মানুষের মনের আগুন গজেনবাবু সেই সাতচল্লিশ সাল থেকেই দেখে আসছেন। মানুষের পেটের সমস্যা যে কত ভয়ংকর সমস্যা, সেটা এই স্বাধীনতার পর নেতারা যদি ভালো করে না বোঝেন, তাহলে তাঁদের নাকাল হতে সময় লাগবে না।' জেলখাটা স্বাধীনতা সংগ্রামী গজেনবাবুর '.....শরীরে আবার যৌবনের সেই রক্ত উঠল দুলে। তিনি হেঁকে উঠলেন, আমার বাঁচার মতো রোজগার চাই, রুজি রোজগারের নিরাপত্তা চাই।'[১৩৫] সরকার বিরোধী মত প্রকাশের জন্য আবার তাঁকে কারাগৃহে বন্দী হতে হল। তবে এবার বিদেশি সরকারের নয়, স্বদেশি সরকার জেলে ভরলো তাকে। আমৃত্যু সংগ্রামশীল গজেনবাবুর মৃত্যু হল সংগ্রামের ময়দানে লড়াই করতে করতে। এক শিক্ষকের সংগ্রামশীল জীবন যাপনের কাহিনি আমরা পেলাম গল্পকারের মুখে। শিক্ষা ও সাহিত্যে প্রকাশিত আরেকটা গল্পের কথা বলে এই প্রসঙ্গ আমরা শেষ করব। 'আলোর জন্ম' নামক এই গল্পের নায়ক অলকেশ। আনট্রেনড গ্র্যাজুয়েট/শিক্ষক অলকেশের ট্রেনিং না থাকার জন্য ইনক্রিমেন্টও নেই। অলকেশ এক বেলা হোটেলে খেয়ে অন্যবেলা শুকনো রুটি চেবায়। কিছু ছেলেকে টিউশান পড়ালেও, তাদের অভিভাবকদেরও এই কালবেলায় নিয়মিত বেতন দেবার ক্ষমতা নেই। মনে রাখতে হবে গল্পটির রচনাকাল ১৯৬৯। ধারাবাহিক শিক্ষক আন্দোলনের ফলে হতচকিত সরকার। অলকেশও বুঝতে পারে যে অধিকার ছিনিয়ে নিতে গেলে আন্দোলন ছাড়া গতি নেই। আমরা দেখতে পাই, আসানসোলের মতো তৎকালীন মফস্বল শহরেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল।

অলকেশও 'সবে ফিরেছে....মিউনিসিপ্যাল পার্ক থেকে। সেখানে মাধ্যমিক শিক্ষকদের একটা মিছিল ছিল। অনেকক্ষণ ধরে ও শ্লোগান দিল—হটন রোড পর্যন্ত ও মিছিলকে এগিয়েও দিল। শেষে বাধ্য হয়ে চলে আসতে হল। কারণ সন্ধ্যায় টিউশনি রয়েছে। সাধ থাকলেও সাধ্য নেই।'[১৩৬] শিক্ষক আন্দোলনে যোগদান করার সাধ তখন সর্বস্তরের শিক্ষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেটাই এই গল্পে খুব সুন্দর রূপে ফুটে উঠেছে গল্পকারের কলমে।

শিক্ষক ও লেখক রামরমণ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা সাহিত্য ও শিক্ষা আন্দোলন—একটি ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন, 'আত্মগত ভাবনাকে সমষ্টির ভাবনায় পরিণত করার পর্বটি খুব সহজ নয়। লেখকের অভিজ্ঞতা, দরদ, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিভার রঙে রসে জারিত হলে তবেই তা সার্বজনীন হয়। বৃহৎকালের সম্পদ হয়ে ওঠে। সব সাহিত্যের কপালে এই জয় তিলক অঙ্কিত হয় না। অনেকের লেখাই তাৎক্ষণিকতার দায় মিটিয়ে ক্ষণকালের গর্ভে স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই সব সাহিত্যও অনেক সময় ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সরবরাহ করে।'[১৩৭] রামরমণ বাবুর নিবন্ধ থেকে আমরা আমাদের উল্লিখিত দুইটি গল্প ছাড়াও অবনী সাহার 'আমার টাকা জমান' (১৯৫৭), নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিড়ম্বনা' (১৯৫৫), রমেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিফল স্বপ্ন' (১৯৫৭), জিতেন বিশ্বাসের 'বলিদান' (১৯৫৭), সুধীরচন্দ্র রায়ের 'অন্নদা মাষ্টার', স্বর্ণেন্দু ভট্টাচার্যের 'না' প্রভৃতির কথা উল্লেখ করতে পারি। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'ভগ্নদূত' ছদ্মনামে লেখা 'একটি দিনের কাহিনী' গল্পটি সম্বন্ধে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন। প্রথম পাঠে, গল্পটিতে নেতিবাচকতার একটি ছায়া পড়েছে বলে মনে হয়। বড় ব্যবসায়ী নায়ক এর বিপুল সুখ ও ঐশ্বর্যের ছায়ার পিছনে, তাঁর বিগত কালের শিক্ষক জীবনের কথা বলতে গিয়ে নায়কের স্মৃতিচারণা, '...একদা সে একজন শিক্ষক ছিল।....অভাব আর লাঞ্ছনা ছিল চিরসঙ্গী। তুচ্ছ কারণে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাড়িয়ে দেবার ভয় দেখিয়েছে।....অনেক সংগ্রাম আন্দোলন করেও ফল কিছু পাওয়া গেল না।'[১৩৮] শেষ পর্যন্ত নায়ক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে অল্প পুঁজির গামছা বিক্রেতার কাজ করলেও নিজ অধ্যবসায়ে ব্যবসায় সফল ও ধনী হল। শিক্ষক এখানে সংগ্রামের ময়দান ছেড়ে চলে গেছে। এটা কাম্য না হলেও, অনেক সময়ই তৎকালে বাস্তব ছিল। বাস্তব চিত্রই গল্পকার তুলে ধরেছেন। তবে এটাই শেষ কথা নয়। নায়কের মনে হয়েছে, '..... আজ সে একজন ধনী, সমাজের মান্যগণ্য ব্যক্তি। তবু অলক্ষে, সকলের অজান্তে বুকের কোণে কোথায় যেন কি একটা বেদনা বাসা বেঁধে ফেলে। শিক্ষকতা ছেড়ে বস্ত্র ব্যবসায়ে সাফল্য পেলেও, প্রাক্তন শিক্ষকের এই বেদনাকে আমরা যদি সংগোপনে সংগ্রামের ফল্গুধারার প্রকাশ বলি, তাহলে বোধহয় ভুল হবে না। শেষতঃ শিক্ষক আন্দোলনের সাংগঠনিক পরিমণ্ডলের অন্দরে কিংবা বাহিরে গল্প কবিতায় যে টানাপোড়েনের বুনন-এর কথা আমরা উল্লেখ করলাম সে সম্বন্ধে শিক্ষক আন্দোলনের অগ্রণী নেতা অরুণ চৌধুরীর সুরে সুর মিলিয়ে আমরা বলতেই পারি, 'সমিতি বা শিক্ষক আন্দোলনের পরোক্ষ ইতিহাস পাব ঔপন্যাসিক ও গল্পকারকের গল্প উপন্যাসে। বিশেষ করে তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মনোজ বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির উপন্যাসে ও গল্পে। মিলবে দিনেশ দাস, আসরাফ সিদ্দিকীর কবিতায়। সুনীল দত্তের নাটকে।'[১৩৯]

যাইহোক, এমন লেখা প্রকাশ হয়েছে দু-চার জনের হাত দিয়ে দু-চার বছরে নয়—বিরাট সময় পরিধি নিয়ে। স্বাধীনতার পূর্বে লেখা হয়েছে—স্বাধীনতার পরেও হয়েছে। সেই সব সাহিত্যের মধ্য থেকে শিক্ষা আন্দোলনের নির্যাসটি বের করে একটি সূত্র গ্রন্থনা করা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়।

মহিলাদের অবদান ঃ শিক্ষক সংগ্রাম ঃ আন্দোলনের অর্ধেক আকাশ

শিক্ষকদের বিভিন্ন সময়কার সংগ্রামে, বিশেষ করে ৫৪ থেকে ৬৬ এবং তার পরেও শিক্ষিকারা, অর্থাৎ মহিলারা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তবে সে সম্বন্ধে আলোচনার আগে আমরা কোন তাত্ত্বিক ভিত্তিতে আমাদের বাংলায় নারীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। প্রাচীন ও মধ্যযুগে কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে, আমাদের দেশে সেই ভাবে নারী শিক্ষার প্রচলন ছিল না। যদিও আমরা ভারতীয় নারীদের শিক্ষা প্রসঙ্গে গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা থেকে প্রাক্ আধুনিক যুগের হটি পণ্ডিত প্রভৃতিদের নাম করি। তবুও ইংরেজ পূর্ব যুগে নারী শিক্ষার হালহকিকৎ আমাদের দেশে খুব একটা ভালো ছিল না।[১৪০] মধ্যযুগেও নারীরা অনেকটাই অবরোধ বাসিনী ছিলেন। অভিজাত ঘরের কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে নারী শিক্ষার প্রচলন যথেষ্ট অপ্রতুল ছিল সেই সময়ে। ঔপনিবেশিক যুগের প্রথম পর্বে নিজেদের প্রশাসনিক প্রয়োজনের তাগিদে 'কেরানী ও আমলা' তৈরির জন্য, সীমিতভাবে পুরুষদের জন্য একটা শিক্ষা কাঠামো গড়ে তুলতে ঔপনিবেশিক প্রশাসন চেষ্টা করেছিল। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই নারী শিক্ষা সে সময়েও অবহেলিত ছিল। অবশ্য খ্রিস্টান মিশনারীদের এই সম্বন্ধীয় কিছু প্রচেষ্টাকে আমরা পৃথক ভাবে উল্লেখযোগ্য মনে করতে পারি।[১৪১] একমাত্র বাংলার তথাকথিত নবজাগরণের হোতারা প্রথম থেকেই নারী শিক্ষার প্রতি নজর দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে 'চরম রক্ষণশীল' রাধাকান্ত দেব, রামমোহন রায় এবং কিছু পরে বিদ্যাসাগর মশাই, মদনমোহন তর্কালংকার ও কেশবচন্দ্র সেনের প্রচেষ্টার কথা আমরা স্বতঃই মনে করতে পারি।[১৪২] ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে 'হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হলে, অন্ততঃ মধ্যবিত্ত নারী সমাজে শিক্ষা গ্রহণের একটি সুপবন প্রবাহিত হয়েছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ১৮৭০-৮০-এর মধ্যে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার কিছুটা ত্বরণের সৃষ্টি করল। ১৯০১-এর জনগণনায় আমরা দেখতে পেলাম বালিকা বিদ্যালয় ও ছাত্রী সংখ্যা, বিশেষ করে এই বাংলায় যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। সেই সময়ে ব্রাহ্ম পরিবারে মেয়েদের শিক্ষার হার ৫৫.৬ শতাংশ। ইংরেজি জানেন ৩০.৯ শতাংশ। বৈদ্যদের মধ্যে মেয়েদের শিক্ষার হার ২৫.৯ শতাংশ, ইংরেজি জানেন .৮ শতাংশ, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে আরও কম, ৫ থেকে ৮ শতাংশ মেয়ে পড়াশোনা করছেন। এ পরিবর্তনটা সত্যিই লক্ষণীয়।[১৪৩] বাংলায় মেয়েদের শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রসর হবার পথপ্রদর্শক ছিলেন কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও চন্দ্রমুখী বসু। মুসলিম মহিলারাও এক্ষেত্রে পদার্পণ করেছিলেন কিছুদিনের মধ্যেই। মুসলিম মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অগ্রপথিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বেগম রোকেয়া এবং তাঁর সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল। বেথুন কলেজে পড়াশোনা শেষ করে ফজিলতুন্নেসা ও আখতার ইমাম মুসলিম নারীদের শিক্ষা স্পৃহাকে

বর্ধিত করেছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।[১৪৪] আর অপ্রাতিষ্ঠানিক ভাবেও নারী শিক্ষা গ্রহণ করে, বাংলার নারীদের মুখ গৌরবোজ্জ্বল করে তুললেন কৃষ্ণভাবিনী দেবীর মতো মহিলারা। দুই সম্প্রদায়ের এই দুই মহিলার শিক্ষা ভাবনাকে আমরা উদাহরণ হিসাবে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করছি। কেননা সংগ্রামী শিক্ষিকারা তখনই তাদের অস্তিত্ব জানান দিতে পারেন, যখন তাদের পূর্বসূরিরা তাদের জন্য শিক্ষালাভের পথ উন্মুক্ত করে দেন। শিক্ষা প্রসঙ্গে কৃষ্ণভাবিনী দেবী লিখেছেন, 'জড় জগতে মাধ্যাকর্ষণের যেরূপ প্রভাব, মনের উপর কার্য্যমূলক জ্ঞানের সেইরূপ প্রভুত্ব দেখা যায়। উহা মানব জীবনের সমস্ত অংশের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখে।.....উহাই আমাদিগকে সুখময় কার্যের ন্যায় নিরানন্দ কর্তব্যের দিকেও অগ্রসর করে। এই কার্যমূলক জ্ঞানের উপর স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই অধিকার আছে।'[১৪৫] অন্যদিকে বেগম রোকেয়া বিশেষ করে মুসলিম নারীদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন, '.....সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল পরিচালনা করিয়া যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি, তাহাই আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহস করিতেছি।..... এখন প্রশ্ন এই যে, মুসলমান বালিকাদের সুশিক্ষার উপায় কি? ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব, কাহারা জানেন? সে জীব ভারত নারী।.... কন্যাকে মূর্খ রাখা এবং চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখিয়া জ্ঞান ও বিবেক হইতে বঞ্চিত রাখা অনেকে কৌলিন্যের লক্ষণ মনে করেন।'[১৪৬] এই দুই প্রতিনিধি স্থানীয় মহিলার বক্তব্যের মধ্য দিয়েই নারী শিক্ষার গুরুত্ব আমাদের চোখের সামনে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। নারী শিক্ষার পক্ষপাতী এই সব মহিলা সমাজ সংস্কারকদের তত্ত্ব ও কর্মমূলক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই বাংলার নারী সমাজে শিক্ষার আলো সীমিত ভাবে হলেও প্রকাশ পায়। আর বিংশ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই নারী শুধুমাত্র নিজে শিক্ষালাভ করেই সন্তুষ্ট হলেন না, শিক্ষাদান কার্যেও নিয়োজিত হলেন। আর শিক্ষিকা জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে 'আপন ভাগ্য' জয় করবার মানসে তাঁরা ক্রমশঃ শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। শিক্ষিকাদের মধ্যে এই সংগ্রামের ধারা আরো বেশি বেগবতী স্রোতস্বিনী হল যখন নারী শিক্ষায় অগ্রবর্তী পূর্ববঙ্গের মহিলারা দেশভাগ পরবর্তী সময়ে বাংলার পশ্চিম খণ্ডে এসে, শিক্ষিকার কর্মে নিয়োজিত হলেন। যাক্ এর পরে আমরা ৪০-এর দশক থেকে শিক্ষিত নারী থেকে সংগ্রামী শিক্ষিকায় রূপান্তরিত হবার কথায়ই আসব।

সমাজের অর্ধেক আকাশ নারী। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক যখন গঠিত হয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই সংগঠনে শিক্ষিকারা খুব কম সংখ্যায় অংশ নিয়েছিল। এর একটা বড় কারণ ছিল। মুষ্টিমেয় কিছু বালিকা বিদ্যালয় ছাড়া শিক্ষিকাদের প্রায় অস্তিত্ব ছিল নাই বলা চলে। আনুষ্ঠানিক ভাবে হোক বা না হোক এই সমস্ত শিক্ষিকারা 'রাজনীতি বর্জিত' সেবাব্রতী হিসাবেই মূলতঃ শিক্ষা ক্ষেত্রে অবস্থান করতেন। সভা সমিতির সঙ্গে সে রকম সম্পর্ক তাদের ছিল না।[১৪৭] কিন্তু দেশভাগের অব্যবহিত পূর্ব থেকেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছিল। এমনিতেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে বিদ্যালয়মুখী ছাত্রীদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি ছিল। সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের টানা পোড়েনে তারা দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে অভিপ্রয়াণ করবার পর, তাদের অসহনীয় কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, যে পূর্ববঙ্গ আগত শিক্ষানুরাগী মানুষেরা

এখানে এসে বহু বহু উদ্বাস্তু কলোনি স্থাপন করেছিলেন এবং তারা সেই সমস্ত কলোনির ছেলে/মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রথমেই বিদ্যালয় নির্মাণে অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রচুর শিক্ষকের পাশাপাশি দরকার হয়ে পড়েছিল প্রচুর শিক্ষিকার। বিশেষ করে বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের কিছু পুরনো বালিকা বিদ্যালয় তো ছিলই।

১৯৪৮ খিস্টাব্দে শিক্ষক সমিতি যখন ক্রমশঃ সংগ্রামমুখী হয়ে উঠছিল, তখন আমরা দেখতে পাই সুধা রায়, অনিলা দেবীর মতো রাজনৈতিক শিক্ষিকারা শিক্ষক সমিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রে ধীরে ধীরে নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন। বিশেষ করে সমিতি যতই সংগ্রামমুখী হয়েছে ততই লিঙ্গ সাম্যর নিদর্শন হিসাবেই সুধা রায়, অনিলা দেবী প্রমুখের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে সমিতির অভ্যন্তরে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষক সমিতির এই সব শিক্ষিকা নেত্রী বা কর্মীদের অন্য রাজনৈতিক গণসংগঠনের সঙ্গে পূর্ব থেকেই, বিশেষ করে 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' কিংবা 'ছাত্র আন্দোলনের' ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অনিলা দেবী, পঙ্কজ আচার্য বা কণক মুখার্জী শিক্ষক আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট হবার আগেই, তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয় গড়ে উঠেছিল। অনিলা দেবী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সমিতির মুখপত্র শিক্ষা ও সাহিত্য-এর এককালীন সম্পাদক লিখেছিলেন, 'মার্কসবাদী অনিলা দেবী তাঁর অগ্রণী চেতনায় যেমন ভাবে শিক্ষক আন্দোলনকে বুঝতেন—সত্যপ্রিয় রায় তখনও ঠিক সেইভাবে বুঝতেন না। শিক্ষক আন্দোলনের শীর্ষ নেতা সত্যপ্রিয় রায়ের আন্দোলনের চিন্তা ভাবনাকে পাশে দাঁড়িয়ে ধৈর্য ও যত্নের সাথে জীবনমুখী করে তুলেছিলেন কমরেড অনিলা দেবী।'[১৪৮] এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতেই পারি যে শিক্ষক আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি গঠনে সত্যপ্রিয় রায়ের বিকল্প না থাকলেও, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ময়দানে তার পাশাপাশি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের নেত্রী অনিলা দেবী সমভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এছাড়া ৫৪ এবং ৬৬-এর সংগ্রাম থেকে শুরু করে, অনেক মহিলা নেত্রী ও কর্মী শিক্ষক সংগঠন গড়বার ক্ষেত্রে অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মহিলা নেত্রী মণিকুন্তলা সেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন, '১৯৫৪ সনে শিক্ষকেরা এই (শিক্ষা সংক্রান্ত) সমস্যা সমাধানের জন্য আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হন।....আমাদের মহিলা কর্মীদের একটা বড় অংশ শিক্ষিকা। তাঁরাও অনশনে আছেন। অতএব আমরা মহিলা সমিতির প্রায় সকলেই তাদের পাশাপাশি আছি। কত যে মেয়েদের স্কুল আর কত যে তার শিক্ষিকা, তা যেন টের পেলাম এই প্রথম।'[১৪৯] এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দেশভাগ পরবর্তী কালে উদ্বাস্তু মহিলারা অবাধে ট্রেনে বাসে বোঝাই হয়ে স্কুল কলেজ যাচ্ছে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে শুধু নিজের নয়—পরিবারের ভার কাঁধে নিচ্ছে। আজ এই ভিড়ের (শিক্ষক সমাবেশ) মধ্যে তাঁদেরও যেন খুঁজে পাচ্ছি।[১৫০] মণিকুন্তলার দৃষ্টিভঙ্গিতে, কিছুদিন আগে হলেও একসাথে নয়, শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য হয়তো অবস্থানের জন্য আলাদা শিবির করতে হত, কিন্তু দেশভাগ জনিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফলে, আন্দোলনের রাজপথে, তখন নারী পুরুষ সমান অধিকারেই বসে আছেন। শপথে শ্লোগানে তখন নারী ও পুরুষ শিক্ষকের কণ্ঠে উঠেছিল একই সামগানের সুর। স্বভাবতঃই পূর্ববাংলা থেকে দেশভাগ জনিত কারণে পশ্চিম বাংলায় আগত শিক্ষিকারাই তাঁদের নিজেদের এবং পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষার্থেই আজ রাজপথে সমাসীন এবং

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিকাদেরও, তারা পথে নামার অঙ্গীকারে দীক্ষা দিয়েছেন বলে মণিকুন্তলা সেন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন।[১৫১] শ্রমিক, ছাত্র, উদ্বাস্তু, সওদাগরী ও সরকারি কার্যালয়ের ইউনিয়নগুলির মতো মহিলারাও সেদিন সংঘবদ্ধ ভাবে, শিক্ষক না হয়েও শিক্ষক আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। তখন মণিকুন্তলা মহিলা সমিতির শীর্ষ নেত্রীদের অন্যতম। এছাড়া আইনসভায় বামপন্থীদের প্রতিনিধি। এর পরের বর্ণনা আমরা মণিকুন্তলার জবানীতেই শুনব। তিনি লিখেছেন, 'আইনসভায় একদিন খবর এলো মুখ্যমন্ত্রী ডা. রায়ের বাড়ির সামনে স্কুলের ছেলেদের পেটানো হয়েছে। ..... সেদিন আমিও একটা জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে ফেললাম। কিন্তু আশ্চর্য পুলিশ মন্ত্রী অযথাই জোরে জোরে হাসতে লাগলেন। আমাদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল। জ্যোতি বাবু জুতো দেখালেন, আমি জুতো ছুঁড়লাম। তারপর বই খাতা যার হাতে যা ছিল ঘরময় ছোঁড়াছুড়ি হতে লাগল।.....আমরা রাগে গরগর করতে করতে বিধানসভা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।[১৫২] সেদিনের স্বাভাবিক ক্রোধকে মণিকুন্তলা অবশ্য পরে 'শালীনতার বাইরের ব্যাপার' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তা অবশ্য অনেক পরের কথা। সেই সময় অর্থাৎ ৫৪-এর আন্দোলনের সময় নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির অবস্থানরত শিক্ষিকাদের যেমন গ্রেফ্তার করা হয়েছিল, ঠিক তেমনি তাঁদের সহযোগী হিসাবে মহিলা সমিতির নেত্রীরাও জেলবন্দী হয়েছিলেন মণিকুন্তলা সেন, বেলা লাহিড়ী, পঙ্কজ আচার্য প্রমুখ সেই সময় কারাবাস করেছিলেন।

৫৪ এবং ৬৬-এর শিক্ষক আন্দোলনে, মহিলা সমিতি উদবাস্তু আন্দোলন এমনকি সদ্য ছাত্র আন্দোলন শেষ করে বার হয়ে আসা তরুণী শিক্ষিকারাও শিক্ষক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শীর্ষ নেতৃত্বের স্তরে পৌঁছানো অনিলা দেবী, সুধা রায়, ফুলরেণু গুহ ছাড়াও মীরা চট্টোপাধ্যায়, মায়া চক্রবর্তী প্রভৃতি শিক্ষক আন্দোলনের দ্বিতীয় সারির নেত্রীগণের নাম এই প্রসঙ্গে আমাদের স্বতঃই মনে পড়ে। ৫৪, ৬৬ এ আগুন ঝরানো দিনগুলির প্রস্তুতিতে শুধু সাংগঠনিক ভাবে সভা সমিতিতে উপস্থিত থাকা নয়—স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক আন্দোলনে যে রণনীতি ও রণকৌশল সংক্রান্ত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল, তাঁর দিক দিশারী হিসাবে শিক্ষিকারাও যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন। সেই পর্বে শিক্ষক নেত্রী মীরা চট্টোপাধ্যায়ের লেখা অনুযায়ী 'আমাদের শিক্ষানীতি কি হবে সে বিষয়ে আলোচনার জন্য একদিন ডেকার্স লেনে আমাদের শিক্ষকদের ডাক পড়লো।.....মাধ্যমিক শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন হীরেন রায়, অজিত দাস, বীণা মজুমদার, দ্বিজেন গুপ্ত, অপর্ণা সেন, কণক মুখার্জী, কমলা মুখার্জী এবং আমি (মীরাদেবী)।[১৫৩] উক্ত নামের তালিকা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, শিক্ষক আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষিকারাও যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

আবার সাংগঠনিক ভাবেও শিক্ষক আন্দোলনের কোন স্তরেই শিক্ষিকারা পিছিয়ে ছিলেন না। শিক্ষক আন্দোলনের সেদিনের সেই স্বর্ণযুগের অন্যতম সাক্ষী, সমিতি নেত্রী, মায়া চক্রবর্তী, কিছুদিন আগেই যিনি ময়মনসিংহে ছাত্র ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত গার্লস স্টুডেন্ট

অ্যাসোসিয়েশনের নেত্রী ছিলেন, তাঁর শিক্ষক জীবনের সূচনাই হয়েছিল ৫৪-এর আন্দোলনের কিছু পূর্বে। তিনি এক স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, ৫৪ সালে, 'গোটা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী আন্দোলনকে পরিপূর্ণ সফল করে তুলতে বিভিন্ন জেলা থেকে যোগ্য কর্মীদের একাংশকে কলকাতার কেন্দ্রীয় আন্দোলনের সাহায্যে ও পরিচালনায় দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছিল। উত্তর কলকাতা ও মধ্য কলকাতার বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে (প্রাতঃকালীন ও মধ্যাহ্নকালীন বিভাগে) আন্দোলন কালে সফল কর্ম-বিরতি পরিচালনার দায়িত্ব পড়েছিল—মীরা চট্টোপাধ্যায়, নীলিমা সেন এবং আমার (মায়া চক্রবর্তী) ওপরে।'[১৫৪] শুধুমাত্র বালিকা বিদ্যালয় সমূহে ব্যারিকেড গড়ে তোলার কাজে নয়—পুরুষ সহকর্মীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেদিনের শিক্ষিকারা। সেদিনকার আন্দোলনের নেত্রী নীলিমা সেনের সাক্ষাৎকার থেকে আমরা জানতে পারি স্কুলে স্কুলে যাওয়া ভল্যান্টিয়ার সংগ্রহের কাজেও শিক্ষক সমিতির শিক্ষিকারা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ৫৪-এর সংগ্রামের সময় তাঁর ভাষায়, '.....যখন অবস্থান এবং Cease work শুরু হয়ে গেল আমরা তো এসপ্লানেড ইস্টেই বসে থাকতাম। সেই সঙ্গে সকালে মরনিং স্কুল এবং তারপরই ডে স্কুলগুলোতে পিকেটিং-এর জন্য ছুটতে হত। মাষ্টার মশাইরা এদিক ওদিক দাঁড়িয়ে থাকতেন। একটু ফাঁক পেলেই স্কুলে ঢুকে পড়তেন। তাই আগে থেকেই গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তাদের আসার সম্ভাবনা থাকত।'[১৫৫]

আটান্নর অনশনে এবং ৬১-এর আন্দোলনেও গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল শিক্ষিকাদের। ১৯৬৬-এর শিক্ষক সমিতির আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল মেয়েরা। আইন অমান্য করে জেলে যাবার যে পরিকল্পনা করেছিল সমিতি তাতে, 'প্রথম দিন ছেলেদের লীড করলেন সত্যপ্রিয় রায় আর মেয়েদের নিয়ে যাবার ভার পড়ল আমার (নীলিমা সেন) ওপর। আমরা দল বেঁধে আইন অমান্য করলাম।'[১৫৬] বাংলার সাধারণ ঘরের শিক্ষিকাদের জেলে যাবার ভীতি থেকে মুক্ত করেছিল এই আন্দোলন। নীলিমা সেনের স্মৃতিচারণ থেকে আমরা আরো জানতে পারি, যে সরকারি প্রশাসন কীভাবে বিশেষ করে জেলবন্দী মহিলা শিক্ষিকাদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে সচেষ্ট হয়েছিল। তার জবানীতেই শোনা যাক, '....একদল ছিল যারা এই সংগ্রামটাকে ভণ্ডুল করতে চাইত, অপদস্থ করতে চাইত। বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যেই কয়েকজনকে তারা জেলে পাঠিয়েছিল। সেই মেয়েরা অন্য মেয়েদের মনোবল ভেঙে দেবার চেষ্টা করত। আমার উপর দায়িত্ব ছিল....। আমি সবসময় ছায়ার মতো তাদের কাছে কাছে থাকতাম। তাদের হতাশা দূর করে মনোবল বাড়িয়ে দিতাম। রাত্রেও শান্তি ছিল না। সেই মেয়েগুলিকে আমি চিনতাম। যেই দেখতাম তারা আমাদের মেয়েদের কাছে গেছে আমিও যেতাম। রাত্রে তাদের পাশে শুয়ে পড়তাম। এটাই ছিল জেলের মধ্যে আমার প্রধান কাজ। সংগ্রাম যাতে বানচাল না হয়ে যায়।'[১৫৭] আমরা এই আলোচনা থেকে বুঝতে পারি, সংগ্রামী শিক্ষক/শিক্ষিকাদের মধ্যে অকুতোভয় সংগ্রামী শিক্ষকদের পাশাপাশি যেমন লুকিয়ে চুরিয়ে স্কুলে ঢোকার মতো শিক্ষকরাও ছিলেন। মেয়েদের মধ্যেও তেমনি কমবেশি 'পঞ্চম বাহিনীর' অস্তিত্ব যে একদম ছিল না, তাও নয়। যে কোন আন্দোলনেই অবশ্য এরকমটা ঘটেই থাকে। ক্ষুদিরাম বা ভগৎ সিং-এর পাশাপাশি,

তাই আমরা বিদেশি সরকারের কাছে মুচলেকা দেওয়া সাভারকার বা ডাঙ্গেকে সহজেই খুঁজে পাই।

শুধু কোলকাতায় নয়—বিভিন্ন জেলাতেও শিক্ষিকারা সমিতির সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। প্রয়াত নেত্রী কণক মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সংগঠিত ভাবে শিক্ষক সংগ্রামে বিভিন্ন সময়ে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।[১৫৮] সমিতির জেলাওয়ারি মহিলা নেত্রীদের অনেকেই রাজধানী কোলকাতার মতো, একই সঙ্গে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সদস্যা ছিলেন। এই সমস্ত নেতাকর্মীদের মধ্যে জলপাইগুড়ির তারা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিমা দেবী, লতিকা মুখোপাধ্যায় নাম আমরা করতেই পারি। এমনকি ৫০-এর দশকে শিক্ষক সংগ্রাম যখন চরম আকার ধারণ করেছে, গৌরী বসু এবং কল্যাণী সরকারের মতো শিক্ষিকারা তাঁদের পুরুষ সহকর্মীদের মতো কর্মচ্যুত হয়েছিলেন।[১৫৯] এবার আসি পূর্বতন পশ্চিম দিনাজপুর জেলায়, এখানে অবশ্য মহিলা নেত্রীরা খুব একটা অগ্রবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করতে অপারগ হয়েছিলেন। তবু ৫০-এর দশকে পুষ্প রায় (চক্রবর্তী), সবিতা মজুমদার, বীণা শিকদার প্রমুখের ভূমিকা অবশ্যই অনস্বীকার্য।[১৬০] পুরুলিয়া জেলা, ৫৪-এর আন্দোলনকালীন পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাই ঐ সময়কার আন্দোলনে, ওখানকার শিক্ষকেরা প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয়নি। পরবর্তীকালেও সেখানে সমিতির মহিলা নেত্রীদের অভাব আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। এটা অবশ্যই একটা ব্যতিক্রম। বাঁকুড়া জেলা, সেই সময়ে কিছুটা পেছিয়ে পড়া জেলা ছিল। এখানেও আমরা দেখব অন্তত নেতৃত্বের প্রশ্নে মহিলাদের অগ্রগতির ভূমিকায় দেখি না।[১৬১] সমৃদ্ধতর জেলা হিসাবে বর্ধমানের শিক্ষিকারা অবশ্যই একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। মূলতঃ বামমার্গী এই সব শিক্ষিকারা অনেকেই গার্লস স্টুডেন্ট ইউনিয়ন বা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির আঁতুড় ঘর থেকে শিক্ষক আন্দোলনের অঙ্গনে পা রেখেছিলেন। তাই চেতনার দিক থেকেও খানিকটা অগ্রবর্তী ছিলেন তারা। শ্রীমতী দুর্গা চক্রবর্তী, অমলা মজুমদার প্রমুখ নেত্রীদের নাম এ প্রসঙ্গে আমাদের স্বতঃই স্মরণে আসে। এবার আসা যাক হুগলী জেলায় এ. বি. টি. এ.-র সাংগঠনিক কাজে দক্ষ মহিলা নেতা কর্মীদের কথায়। এখানকার নেত্রীদের মধ্যে সুহাসিনী সেনের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্য গণসংগঠনের নেত্রী মুক্তাকুমার বা সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায়রাও তীব্র শিক্ষক আন্দোলনের সময় পর্বে সক্রিয়ভাবে শিক্ষক সমিতির সঙ্গে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন।[১৬২] কোলকাতার কাছাকাছি হাওড়া জেলাতেও সমিতির কাজে মহিলা নেত্রীদের কল্যাণ হস্তের ছোঁয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। সেই ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে সমিতির হাওড়া জেলার সম্মেলনে সমিতির অন্যতম নেতৃত্ব স্থানীয় কর্মী শ্রীমতী কণক লতা রায় নারী শিক্ষার উপর একটি প্রবন্ধ অধিবেশনে পাঠ করে সবার প্রশংসা পেয়েছিলেন।[১৬৩] মালদহ জেলায় নানা কারণে প্রথম থেকেই সমিতির কাজে নারীদের অংশগ্রহণ খুব একটা সহজসাধ্য ছিল না। এমনকি ১৯৫৪-৫৫-এর উত্তাল দিনগুলিতে বেশির ভাগ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়ত্রীরা স্কুলগত ভাবে সমিতির সদস্য ছিলেন না। অবিভক্ত ২৪ পরগণা জেলায় সমিতির বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা সদস্য থাকলেও, সমিতির অন্যতম নেত্রী মায়া চক্রবর্তীর একটি লেখা

থেকে আমরা সেই সময়কার মহিলা কর্মীদের সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাই। বীণা বন্দ্যোপাধ্যায় নামে ২৪ পরগণার এক শিক্ষিকা সেই সময় যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন।[১৬৪]

সংক্ষিপ্ত আলোচনার আলোকে আমরা দেখতে পাই যে কিছু কিছু জেলায় শিক্ষক সমিতির মহিলা কর্মীদের মধ্যে সমিতি কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলেও, বেশির ভাগ জেলাতেই মহিলা কর্মীদের সংখ্যায় যথেষ্ট স্বল্পতা ছিল। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে এমনিতেও বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা আমাদের রাজ্যে মুষ্টিমেয় ছিল। শিক্ষিকারাও তখন ম্যানেজিং কমিটি বা প্রধান শিক্ষিকাদের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করতে অনেক সময়ই পারতেন না। আরেকটি বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। আমরা দেখতে পাই, পশ্চিমবঙ্গ ও অধুনা বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলি অর্থাৎ জলপাইগুড়ি থেকে কোলকাতা-হাওড়া-২৪ পরগণায়ই শিক্ষিকারা অন্ততঃ কর্মী হিসাবে সমিতির কার্যক্রমে এগিয়ে এসেছিলেন। আসলে পূর্ববঙ্গ আগত যে সমস্ত মহিলারা শিক্ষিকা হিসাবে কাজ করতেন তাঁরা এই সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতেই মূলতঃ শিক্ষকতা করতেন। পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসবার পথে তাদের অনেক রক্ত-ঘাম-অশ্রুজলের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তার ফলে সে সময়ের অন্যান্য আন্দোলনের মতো তারা শিক্ষক সমিতির কাজেও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। উদ্বাস্তু কলোনিগুলোর কর্মকর্তাগণ, ৪৭-এর পরে, কলোনিগুলিতে বালক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বালিকা বিদ্যালয়ের পত্তন করেছিলেন। তাঁদের উৎসাহেই শিক্ষিত তরুণীরা বহু সংখ্যায় এই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হিসাবে কাজ করতে লাগলেন। উদ্বাস্তু আন্দোলনের মতো শিক্ষক আন্দোলনে যোগ দেবার ক্ষেত্রেও তাঁরা খুব বেশি সামাজিক রক্ষণশীলতার সম্মুখীন হননি। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব থেকেই বসবাসকারী শিক্ষিকাদের অনেক সামাজিক রক্ষণশীলতাকে কাটিয়েই 'মাষ্টারনি'-র চাকুরি নিতে হত। তাই সমিতির আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার ক্ষেত্রে তারা কিছুটা পিছুতেই পড়ে রয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষা ও সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক সীমা দত্ত শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব ও স্বাধীনতা পর্ব ও স্বাধীনোত্তর পর্বে অনিলা দেবী, মীরা চট্টোপাধ্যায়, নীলিমা সেনগুপ্ত, মায়া চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ করেছেন। বিশেষ ভাবে তারা প্রত্যেকেই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণি থেকে আসলেও, পরবর্তীকালে বহুলাংশে শ্রেণিচ্যুত হয়ে সাধারণ জনতার আন্দোলনের সঙ্গে মধ্যবিত্ত শিক্ষক আন্দোলনের সংযোগ সাধন করতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ১৯৫৪-এর ঐতিহাসিক আন্দোলনেও এই শিক্ষক নেত্রীরা যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সীমা দেবীর ভাষায়, 'In the memorable historical movement for 12 days in 1954, in 1958 15 days hunger Satyagraha, ...1966's clarion call to oust the existing anti people anti education government, the role of Anila Devi, Sudha Roy, Mira Chattopadhya, Nilima Sengupta, Maya Chakraborty was remarkable'।[১৬৫] এছাড়া তাঁর লেখায় জেলা পর্যায়ের কিছু মহিলা শিক্ষক নেত্রীর কথা আমরা জানতে পারি।

সূত্র নির্দেশ

১. Roy, Satyapriya–Selected writings and speeches, Kolkata, 1999–A Biographical note on Satyapriya Roy,p. XII

২. তদেব, Presidential Address at the conference of All India Secondary Teachers Federation on 25.12.1965, p. 141

৩. তদেব, পৃঃ ১৪৬

৪. ধর, প্রশান্ত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, চুয়ান্নর সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা—নভেঃ, ২০০৩, পৃঃ ৪৪

৫. Roy, Satyapriya–Selected writings and speeches, প্রাগুক্ত, Text of the Presidential Address at Ahmedabad Teachers and Head Masters Conference, p. 08

৬. তদেব, পৃঃ ১০

৭. তদেব, Text of the Introductory Statement on behalf of the AISTF at the All India Seminar on the pattern of secondary Education in India, pp. 20-21

৮. রায়, সত্যপ্রিয়—রাষ্ট্র সমাজ শিক্ষা, কলকাতা, ২০০৮, প্রবন্ধ ঃ 'বিশ্ব শিক্ষক ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক', পৃঃ ৩২-৩৩

৯. Roy, Satyapriya–Selected writings and speeches, প্রাগুক্ত, Teachers Status in India, Article published in the Journal 'Teachers of the world'. vol no 3/68 (Organ of F.I.S.E.), pp. 178-79

১০. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর স্মরণীয় বারো দিন, কলকাতা, প্রকাশনার তারিখ নেই, 'যুগবাণী পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৩৪-১৩৫

১১. স্বাধীনতা পত্রিকা, উদ্ধৃত, মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৮

১২. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর স্মরণীয় বারো দিন, পৃঃ ১৪০

১৩. তদেব, পৃঃ ১৪০

১৪. তদেব, পৃঃ ১৪০

১৫. ধর, প্রশান্ত (সং) চুয়ান্নর সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'পুরনো সেই দিনের কথা'—মীরা চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৯

১৬. Roy, Satyapriya–writings and speeches, প্রাগুক্ত, A memorandem, submitted to Pandit Jawharlal Nehru, Prime Minister of India, on 02/11/54, p. 37

১৭. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং) ABTA সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, (১৯২১-৭১), পৃঃ ৭৪

১৮. অধিকারী, অশোক—শিক্ষা ও সাহিত্য, অনিলা দেবী শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা, কলকাতা, নভেঃ ২০১৩, বক্তৃতা ঃ বিধানসভায় অনিলা দেবী, ১লা মার্চ-১৯৫৫, পৃঃ ১০২৪

১৮(ক). নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি—চুয়ান্নর সংগ্রামী ঐতিহ্য ও তার উত্তরাধিকার, কলকাতা ২০০৫, পৃঃ ৫৬

১৯. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং) ABTA সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, (১৯২১-৭১), কলকাতা, ১৯৭১, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পঞ্চাশ বছর', সুনীল ঘোষ, পৃঃ ৭৪

২০. বাগ, অজিত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জুবিলি সংখ্যা, কলকাতা, সেপ্টেঃ, ১৯৯৬, প্রবন্ধ ঃ 'অতীত দিনের কথা'—মায়া চক্রবর্তী, পৃঃ ৫৪২

২১. তদেব, পৃঃ ৫৪৩

২২. তদেব, পৃঃ ৫৪৩

২৩. দত্ত, ভানুদেব (সং), সত্যানুসন্ধান, সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদারের জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি, কলকাতা, ২০১১, প্রবন্ধ ঃ 'সরকারের শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে বিধান সভায় অভিভাষণ, ৫ই জুন, ১০৫৮, পৃঃ ১৬০

২৪. তদেব, পৃঃ ১৬৬

২৫. বাগ, অজিত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জুবিলি সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'অতীত দিনের কথা'—মায়া চক্রবর্তী, পৃঃ ৫৪৬

২৬. ধর, প্রশান্ত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, চুয়ান্নর সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, কলকাতা, নভেঃ-২০০৩, প্রবন্ধ ঃ '৫৪-র আন্দোলনে একজন কর্মী'—শীতল চন্দ্র শী, পৃঃ ৬৩

২৭. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—'চুয়ান্নর স্মরণীয় বারো দিন', কলকাতা, প্রকাশকাল নেই, কোলকাতা, পৃঃ ১৪৩

২৮. Dutta, Mrinal Kanti, The origin and development of the West Bengal of Secondary Education, Kol, 1988, p 32-33

২৯. Das, Suranjan & Banyopadhyay, Premansu Kumar (Ed), Food Movement of 1959, 2004, Kolkata, p. X

৩০. তদেব, পৃঃ XIII

৩১. মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ ও অন্যান্য (সং), সত্যপ্রিয় রায় ও উত্তরাধিকার, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ একটি জীবনের বিকাশ ধারা—মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, পৃঃ ২৪

৩২. চৌধুরী, কমল (সং), বাংলার গণ আন্দোলনের ছয় দশক, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ২০০৯, পৃঃ সংযোজন, পৃঃ ৭৪

৩৩. চৌধুরী, কমল (সং), বাংলার গণ আন্দোলনের ছয় দশক, দ্বিতীয় খণ্ড, তদেব, পরিশিষ্ট-২১, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ কর্তৃক ভারতীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতির নিকট প্রদত্ত পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ সংবলিত স্মারকলিপি (জুলাই-৫৯), পৃঃ ৩৯৪

৩৪. তদেব, পরিশিষ্ট-২১, পৃঃ ৩৯৫

৩৫. তদেব, পরিশিষ্ট-২১, পৃঃ ৩৯৫

৩৬. তদেব, পরিশিষ্ট-২১, পৃঃ ৩৯৫
৩৭. Dutta, Mrinal Kanti. The origin and development of the West Bengal of Secondary Education, Kolkata, 1988, Pg. 44
৩৮. নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, 'চুয়ান্নর সংগ্রামী ঐতিহ্য ও তার উত্তরাধিকার', কলকাতা ২০০৫, পৃঃ ৫৬
৩৯. Roy, Satyapriya–Selected writings and speeches of the Satyapriya Roy, Kolkata, 1999, Article Text of the welcome Address on behalf of the All India Secondary Teachers Second annual general Conference, Held at Cuttack, 1962, pp. 46-47
৪০. অধিকারী, অশোক (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, অনিলা দেবী শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা, ২০১৩, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'রবীন্দ্র স্মরণে', অনিলা দেবী, পৃঃ ৯৯২
৪১. তদেব, অনিলা দেবীর বিধান সভায় বক্তৃতা, ২১/১১/১৯৬২, পৃঃ ১০৩৩
৪২. মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ ও অন্যান্য (সং), সত্যপ্রিয় রায় ও উত্তরাধিকার, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'জন্ম শতবর্ষে আমাদের শপথ—চির সাথি হোন সত্যপ্রিয় রায়'—অমিতাভ সেন, পৃঃ ৫১
৪৩. ভট্টাচার্য, সূর্য্যাংশু (সং), পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের প্রতীক পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি'—সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'পল্লবিত স্মৃতির লতাগুল্মাদি'—সূর্য্যাংশু ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫৩
৪৪. ঘোষ, অতুল্য—'কষ্টকল্পিত' নবপর্যায়, কলকাতা ১৯৮৪, পৃঃ ১৩০
৪৫. মৈত্র, ভবেশ, প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষা ও সমাজ, কলকাতা, ২০০৭, প্রবন্ধ ঃ 'শিক্ষক আন্দোলনের স্মৃতি থেকে'—ভবেশ মৈত্র, পৃঃ ১৮৯-৯০
৪৬. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং), A.B.T.A. সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পঞ্চাশ বছর—সুনীল ঘোষ, পৃঃ ৭৫
৪৭. মৈত্র, ভবেশ, প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষা ও সমাজ, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'শিক্ষক আন্দোলনের স্মৃতি থেকে'—ভবেশ মৈত্র, পৃঃ ১৯০
৪৮. রায়, সত্যপ্রিয়, রাষ্ট্র সমাজ শিক্ষা, কলকাতা-২০০৮, পৃঃ ৫১-৫২
৪৯. দত্ত, সীমা (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির শতবর্ষ সংখ্যা, ২০২১, প্রবন্ধ ঃ 'শতবর্ষের অভিজ্ঞতায় সামনের লড়াই—আশিস পাণ্ডে, (উদ্ধৃতি ঃ সম্পাদকীয় দেশ, ২৮শে নভেম্বর ১৯৬৪), পৃঃ ৩১১
৫০. অধিকারী, অশোক (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, অনিলা দেবী শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠী স্বার্থের উর্ধ্বে থাকিয়া সকল স্তরের বিদ্যালয় কর্মীগণের আন্দোলনকে সংহত করুন'—অনিলা দেবী, পৃঃ ১০০৭
৫১. তদেব, পৃঃ ১০০৮

৫২. তদেব, পৃঃ ১০১০

৫৩. Report of the Education Commission (1964-66), Vol-II, School Education, New Delhi, 1966, p. X

৫৪. N. C. E. Bengal, Lessons in living : Stories from the life of Triguna Sen, Kolkata, 2018, pp. 152-153

৫৫. Roy, Satyapriya, Selected writings and speeches of Satyapriya Roy,প্রাগুক্ত, Replies to the questionnarie issued by the Education Commission of 1964, p. 116

৫৬. তদেব, পৃঃ ১২১-১২২

৫৭. তদেব, পৃঃ ১২৬

৫৮. তদেব, পৃঃ ১৩১

৫৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, অনুবর্তন, বিভূতি রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, কলকাতা, ১৪০৪ (বঙ্গাব্দ), পৃঃ ৮৭

৬০. মণ্ডল, বিকাশ (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, সত্যপ্রিয় রায় জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা, কলকাতা, মার্চ, ২০০৭, প্রবন্ধ ঃ 'সত্যপ্রিয় রায়কে যেমন দেখেছি—ভবেশ মৈত্র, পৃঃ ৩০৯

৬১. Report of the Education Commission (1964-66), প্রাগুক্ত, p. 295

৬২. ঘোষাল, মন্দিরা (সং), শিক্ষা দর্পণ, পঃ বঃ সরকার, জ্যোতি বসু স্মরণ সংখ্যা, কলকাতা, মার্চ-জুন ২০১০, শিক্ষক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে, (বিধান সভার অভিভাষণ, ২ মার্চ, ১৯৬৫)—জ্যোতি বসু, পৃঃ ৬২

৬৩. তদেব, বিধানসভায় অভিভাষণ—জ্যোতি বসু, পৃঃ ৬৯

৬৪. বাগ, অজিত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, মার্চ, ১৯৯৬, প্রবন্ধ ঃ অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী ঃ জীবন ও কর্ম—ননী গাঙ্গুলী, পৃঃ ১৩৯

৬৫. রায়, উৎপল (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, কলকাতা, অক্টোবর, ২০১৬, প্রবন্ধ ঃ 'ছেষট্টির ঐতিহাসিক সংগ্রামের পঞ্চাশ বছর—উৎপল রায়, পৃঃ ৬১৮

৬৬. তদেব, পৃঃ ৬১৯

৬৭. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং), A.B.T.A. সুবর্ণ জয়ন্তী, ১৯২১-৭১, কলকাতা, ১৯৭১, প্রবন্ধ ঃ 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সংগ্রামী জীবন ধারা'—অনিলা দেবী, পৃঃ ১১

৬৮. রায়, উৎপল (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, অক্টোঃ, ২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১৯

৬৯. রায়, উৎপল (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, তদেব, প্রবন্ধ ঃ ছেষট্টির.....পঞ্চাশ বছর, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত অনিলা দেবী বুলেটিন নং—১, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ৬৬, পৃঃ ৬১৯

৭০. রায়, উৎপল (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, তদেব, কলকাতা, নভেঃ, ২০১৬, 'ছেষট্টির....পঞ্চাশ বছর', পৃঃ ৬৭৩

৭১. ভট্টাচার্য, সূর্য্যাংশু (সং), পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, (১৯৪৮-৯৮), কলকাতা, ১৯৯৮, প্রবন্ধ ঃ 'শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের প্রতীক পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি'—সুধীর অধিকারী, পৃঃ ০৮

৭২. তদেব, পৃঃ ০৮

৭৩. তদেব, পৃঃ ১০-১১

৭৪. রায়, শিবশংকর (আহ্বায়ক), সংগ্রামে-শপথে ১২ই জুলাই কমিটির পঞ্চাশ বছর, কলকাতা, ২০১৬, পৃঃ ০২

৭৫. রায়, অর্ণব (সং), স্পন্দন, কলকাতা, ১৯৯৩, প্রবন্ধ ঃ পরিবর্তনশীল সামাজিক কাঠামোয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী—সমীর মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১০

৭৬. রায়, শিবশংকর (আহ্বায়ক), সংগ্রামে-শপথে ১২ই জুলাই কমিটির পঞ্চাশ বছর, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫

৭৭. তদেব, পৃঃ ১৮

৭৮. মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ ও অন্যান্য (সং), সত্যপ্রিয় রায় ও উত্তরাধিকার, কলকাতা, ২০০৮, প্রবন্ধ ঃ 'কমরেড সত্যপ্রিয় রায় ও যুক্ত আন্দোলন—মনোরঞ্জন রায়, পৃঃ ২১

৭৯. রায়, উৎপল (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, কলকাতা, নভেঃ, ২০১৬, প্রবন্ধ ঃ 'ছেষট্টির ঐতিহাসিক সংগ্রামের পঞ্চাশ বছর', (ধারাবাহিক)—উৎপল রায়, পৃঃ ৬৭৪

৮০. তদেব, পৃঃ ৬৭৪

৮১. তদেব, ডিসেম্বর, ২০১৬, (ধারাবাহিক), পৃঃ ৭৭৯

৮২. তদেব, পৃঃ ৭৮০

৮৩. তদেব, নভেম্বর, ২০১৬, পৃঃ ৬৭৩

৮৪. তদেব, নভেম্বর, ২০১৬, পৃঃ ৬৭৪

৮৫. তদেব, নভেম্বর, ২০১৬, পৃঃ ৬৭৪

৮৬. রায়, উৎপল (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, কলকাতা, ডিসেম্বর, ২০১৬, পৃঃ ৭৭৭

৮৭. তদেব, রায় উৎপল-৭৭৭

৮৮. Roy, Satyapriya, Selected writings and speeches, প্রাগুক্ত, অভিভাষণ ঃ Text of the welcome address on behalf of the All India Secondary Teachers' Federation at the All India Secondary Teachers' Second Annual General Conference, held at Cuttack, 1962, pp. 51-52

৮৯. রায়, উৎপল (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, কলকাতা, ডিসেম্বর, ২০১৬, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ ছেষট্টির.....পঞ্চাশ বছর (ধারাবাহিক), পৃঃ ৭৭৭

৯০. তদেব, পৃঃ ৭৭৭

৯১. তদেব, পৃঃ ৭৭৭-৭৭৮

৯২. তদেব, পৃঃ ৭৭৮

৯৩. তদেব, পৃঃ ৭৭৯

৯৪. তদেব, পৃঃ ৭৭৯

৯৫. তদেব, পৃঃ ৭৮০

৯৬. তদেব, পৃঃ ৭৭৯

৯৭. বসু, অঞ্জন—বাংলায় বামেরা—রাজ পথে রাজ্যপাটে (১৯২০-২০১১), কলকাতা, ২০১৭, পৃঃ ২৮৭

৯৮. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ—ABTA. সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা (১৯২১-৭১), কলকাতা, ১৯৭১, প্রবন্ধ ঃ 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পঞ্চাশ বছর'—সুনীল ঘোষ, পৃঃ ৭৭

৯৯. রায়, উৎপল (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, কলকাতা, ডিসেম্বর, ২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮১

১০০. দত্ত, সীমা (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, কলকাতা, জুলাই, ২০১৯, প্রবন্ধ ঃ 'আমার চোখে গোলকদা—দিলীপ চট্টোপাধ্যায়', পৃঃ ৪৪১

১০১. রায়, উৎপল (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, ডিসেম্বর, ২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮১

১০২. মণ্ডল, বিকাশ (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, সত্যপ্রিয় রায় জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা, কলকাতা, মার্চ, ২০০৭, প্রবন্ধ ঃ 'সত্যপ্রিয় রায় প্রসঙ্গে—জ্যোতি বসু, পৃঃ- ২৯৭

১০৩. রায়, উৎপল (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, ডিসেম্বর, ২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮১

১০৪. রায়, উৎপল (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, ডিসেম্বর, ২০১৬, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮১

১০৫. অধিকারী, অশোক (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, অনিলা দেবী শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা, কলকাতা, নভেম্বর, ২০১৩, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রণী চেতনা'—অমিতাভ সেনগুপ্ত, পৃঃ ৯৭৩

১০৬. দাশগুপ্ত, অশীন, প্রবন্ধ সমগ্র, কলকাতা, ২০০১, প্রবন্ধ ঃ 'ইতিহাস ও সাহিত্য', পৃঃ ৩৫

১০৭. তদেব, পৃঃ ৩৮

১০৮. নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, আচার্য কাহিনি, কলকাতা, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, (গল্প) 'গ্রাম্যকথা'—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ০৬

১০৯. তদেব, 'গুরুভক্তি'—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পৃঃ ০২

১১০. তদেব, 'মাস্টার মহাশয়'—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৬

১১১. তদেব, 'পণ্ডিত মশাই'—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৭

১১২. তদেব, 'আতার পায়েস'—রাজশেখর বসু, পৃঃ ৪৭-৪৮

১১৩. তদেব, 'গ্রাম-সংস্কার'—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৩

১১৪. তদেব, 'হেড মাস্টার'—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৮০

১১৫. তদেব, 'মানুষ গড়ার কারিগর'—মনোজ বসু, পৃঃ ১০৭

১১৬. তদেব, 'পাদটীকা'—সৈয়দ মুজতবা আলী, পৃঃ ১১৬

১১৭. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, চুয়ান্নর স্মরণীয় বারো দিন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৮-১৪৯

১১৮. তদেব, পরিশিষ্ট 'ছ'

১১৯. দাস, দীনেশ—শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, ১৯৯১, পৃঃ ৬৬

১২০. মজুমদার শচীন্দ্র কুমার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৩

১২১. তদেব, পৃঃ ১৫১-৫২

১২২. তদেব, পৃঃ ১৫৪

১২৩. তদেব, পৃঃ ১৫৪

১২৪. তদেব, পৃঃ ১৫৫

১২৫. তদেব, পৃঃ ১৫৫

১২৬. তদেব, পৃঃ ১৫৭

১২৭. তদেব, পৃঃ ১৫৭

১২৮. তদেব, পৃঃ ১৫৭

১২৯. তদেব, পৃঃ ১৫৮

১৩০. ভৌমিক, তাপস (সং), কোরক সাহিত্য পত্রিকা, প্রাক্ শারদ সংখ্যা—'শিক্ষা-শিক্ষক-শিক্ষকতা', প্রবন্ধ ঃ বাংলা কথা সাহিত্যে শিক্ষকতার সেকাল-একাল—প্রসূন ঘোষ, পৃঃ ১৭৫

১৩১. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, 'চুয়ান্নর.....১২ দিন', প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৫

১৩২. দত্ত, সীমা (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য শতবর্ষ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪১৫

১৩৩. তদেব, পৃঃ ৫১০

১৩৪. তদেব, পৃঃ ৫০৯

১৩৫. তদেব, পৃঃ ৫০৫

১৩৬. তদেব, পৃঃ ৫০৭

১৩৭. বাগ, অজিত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জুবিলি সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'বাংলা সাহিত্য ও শিক্ষা আন্দোলন—একটি ভূমিকা'—রামরমণ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৬৪৯

১৩৮. তদেব, পৃঃ ৬৪৯

১৩৯. তদেব, পৃঃ ৬৫০

১৪০. গুপ্ত, সুপর্ণা—'ইতিহাসে নারী শিক্ষা', কলকাতা, ২০০১, প্রবন্ধ ঃ 'প্রাচীন ভারতে নারী শিক্ষা'—কুমকুম রায়, পৃঃ ৩২-৩৩

১৪১. তদেব, প্রবন্ধ ঃ 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলা দেশে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে দুই একটি ভাবনা—মল্লিকা ব্যানার্জী, পৃঃ ৪৫-৪৬

১৪২. দে, অমলেন্দু—বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ ২১-২২

১৪৩. গুপ্ত, সুপর্ণা—'ইতিহাসে নারী শিক্ষা', প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'নারী শিক্ষা ঃ উনিশ শতকে কিছু কথা'—মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৮৬

১৪৪. তদেব, পৃঃ ৯৮

১৪৫. অনুষ্টুপ —সাহিত্য পত্র (গ্রীষ্ম-বর্ষা সংখ্যা), কলকাতা, ২০১৩, প্রবন্ধ ঃ কার্য্যমূলক শিক্ষা ও জাতীয় উন্নতি—শ্রী কৃষ্ণভাবিনী দাস (উদ্ধৃত) প্রদীপ/চতুর্থ ভাগ/শ্রাবণ ১৩০৮/৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৫৫

১৪৬. আবদুর রাউফ (সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি), রোকেয়া রচনা সংগ্রহ, অভিভাষণ ঃ 'বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি' (সভাপতির বক্তব্য), কলকাতা, ২০০৬ (সবর্ধিত সংস্করণ), পৃঃ ৪০৯-৪১০
১৪৭. নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, আচার্য কাহিনি, প্রাগুক্ত, ছোটগল্প ঃ 'হেড মিস্ট্রেস'—নরেন্দ্র নাথ মিত্র, পৃঃ ১৬৮-৬৯
১৪৮. অধিকারী, অশোক (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, Vol. XCIL, No. 11, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৩, পৃঃ ৯৬২
১৪৯. সেন, মণিকুন্তলা—সেদিনের কথা, কলকাতা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৬-৪৭
১৫০. তদেব, পৃঃ ২৪৭
১৫১. তদেব, পৃঃ ২৪৭
১৫২. তদেব, পৃঃ ২৪৭-৪৮
১৫৩. দত্ত, সীমা (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, শতবর্ষ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'স্মৃতির ছবি'—মীরা চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৯৩
১৫৪. বাগ, অজিত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জুবিলি সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'অতীত দিনের কথা'—মায়া চক্রবর্তী, পৃঃ ৫৩৮
১৫৫. তদেব, 'স্মৃতিচারণা'—নীলিমা সেন, পৃঃ ৫২০
১৫৬. তদেব, 'স্মৃতিচারণা'—নীলিমা সেন, পৃঃ ৫২২
১৫৭. বাগ, অজিত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জুবিলি সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'স্মৃতিচারণা—নীলিমা সেন, পৃঃ ৫২২
১৫৮. মুখোপাধ্যায়, কণক—নারী মুক্তি আন্দোলন ও আমরা, কলকাতা-২০০৩, পৃঃ ১৪৪-৪৫
১৫৯. বাগ, অজিত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জুবিলি সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'জলপাইগুড়ি ও শিক্ষা আন্দোলনের গোড়ার কথা'—সুবোধ মিত্র, পৃঃ ৫৭৬
১৬০. তদেব, প্রবন্ধ ঃ 'সংগ্রামী উত্তরাধিকার'—নৃপেন্দ্রনাথ মহান্ত, পৃঃ ৫৭৯
১৬১. তদেব, প্রবন্ধ ঃ 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি ও বাঁকুড়া জেলা'—মুক্তি দাশগুপ্ত, পৃঃ ৫৮৮-৮৯
১৬২. তদেব, প্রবন্ধ ঃ 'আন্দোলন ও সংগঠনের বিকাশের ধারায় এবিটিএ'র হুগলী জেলা শাখা'—কালিপদ সেনগুপ্ত ও সমীর বড়াল, পৃঃ ৫৯৬-৫৯৭
১৬৩. তদেব, প্রবন্ধ ঃ 'ইতিহাস অনুসন্ধান—হাওড়া জেলা'—কল্যাণ ঘোষাল, পৃঃ ৬০২
১৬৪. তদেব, প্রবন্ধ ঃ 'অতীত দিনের কথা'—মায়া চক্রবর্তী, পৃঃ ৫৪৩
১৬৫. দত্ত, সীমা (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির শতবর্ষ সংখ্যা, কলকাতা, ২০২১, প্রবন্ধ ঃ 'Breaking the Barriers', Sima Dutta, পৃঃ ৪২৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষক সংগঠনের স্বর্ণজয়ন্তী কাল ঃ সমকালীন রাজনীতির প্রভাব এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের নানা রূপ

নতুন দিনের ভোর ঃ যুক্তফ্রন্ট সরকার ও শিক্ষক সমিতি

এদিকে দেশের স্বাধীনতার ঠিক কুড়ি বছর পর, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বামপন্থীদের জয়ের পিছনে, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, নারী, উদ্বাস্তু আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের জেদি সমর্থন, একটি অনুঘটকের কাজ করেছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যদিও কংগ্রেস ভাঙা, অজয় মুখোপাধ্যায় বাংলা কংগ্রেসের নেতা হিসাবে এই মন্ত্রীসভায় মুখ্যমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। তা সত্ত্বেও সরকারের প্রাণ ভোমরা ছিল কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। ইতোমধ্যে ভারত রাষ্ট্রের শ্রেণিচরিত্র এবং চিন-ভারত সীমানা সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে বিভাজিত দুই কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যথেষ্ট তিক্ততার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই দুই পার্টি ৬৭'-এর নির্বাচনে পৃথক জোট হিসাবে অংশগ্রহণ করেছিল। নির্বাচনের পর কংগ্রেস তো নয়ই, বামদের দুই গোষ্ঠীর কোনটিই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। অঞ্জন বসুর গবেষণা ধর্মী গ্রন্থ 'বাংলার বামেরা রাজপথে ও রাজ্যপাটে' থেকে আমরা জানতে পারি, ভোটের ফল যেমনই হোক, সেবার একটা বিকল্প সরকারের জন্য জনগণের দিক থেকে চাপ ছিল প্রচণ্ড। সেটা বোঝা গেল ভোটের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর কলকাতা সহ বিভিন্ন শহরে জনতার উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ দেখে। আন্দোলনের রেশ তখনও কাটেনি। বিশ বছরের কংগ্রেস শাসনের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ তখন চরমে। কংগ্রেস বিরোধী দুটি জোট না হলে হয়তো তখনই বিকল্প অ-কংগ্রেসি সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যেত।[১]

শেষ পর্যন্ত অবশ্য দীর্ঘ আলোচনার মধ্য দিয়ে দুই বামজোট ক্ষমতার কুর্সিতে বসলেন। বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখোপাধ্যায় এই মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রী হলেন। উপমুখ্যমন্ত্রী হলেন জ্যোতি বসু। শিক্ষামন্ত্রীর পদে আসলেন ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য। এই সরকার প্রথমেই বলল বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোয় জনস্বার্থে কোন মূলগত পরিবর্তন করা অসম্ভব। তবু জনগণকে কিছুটা রিলিফ দেওয়া অবশ্যই সম্ভব। সরকারের কর্মসূচিতে বন্দী মুক্তি, কংগ্রেস আমলে চাকুরিচ্যুতদের পুনরায় কর্ম ফিরিয়ে দেওয়া প্রভৃতি ছাড়াও সরকারি কর্মী ও শিক্ষকদের জন্য বেতন কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই প্রথম শিক্ষকদের সরকারি কর্মচারীদের সমমর্যাদা দিল নতুন রাজ্য সরকার।[২] স্বভাবতঃই শিক্ষক সমাজ এবং শিক্ষক সমিতি বামপন্থীদের ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠলেন। এই পরিস্থিতিতে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে বীরভূমের সিউড়িতে শিক্ষক সমিতির বিয়াল্লিশতম বার্ষিক সম্মেলন আহূত হল। সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে

মনোনীত হয়েছিলেন অধ্যক্ষ অমিয় চক্রবর্তী। সম্মেলন উদ্‌বোধন করেন যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য। ইতোমধ্যেই যুক্তফ্রন্ট সরকার শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত পক্ষের সমন্বয়ে 'শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শদাতা কমিটি' গঠন করে, সমিতির অনেক দিনের দাবিকে মেনে নেন। সিউড়ি সম্মেলন স্বাভাবিকভাবেই নতুন সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি সম্বন্ধে আলোচনান্তে এই সরকারকে স্বাগত জানায়।[৩] তাঁরা সম্মেলনের মঞ্চ থেকে আশা প্রকাশ করেন যে যুক্তফ্রন্ট সরকার শিক্ষকদের জীবন ও জীবিকার সংগ্রাম সম্বন্ধে সতত সহানুভূতিশীল থাকবে। অবশ্যই এই সরকার নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সমস্ত দাবির সহজ সমাধান করতে পারগ হবেন, এই দুরাশা সমিতির ছিল না। সংগ্রামের সাথী হিসাবেই তারা নতুন সরকারকে স্বাগত জানিয়েছিল মাত্র। নতুন পরিস্থিতিতে ৬৭-এর জুন মাসেই কোলকাতার সমিতি ভবনে পাঁচদিন ব্যাপী শিক্ষা সেমিনার অনুষ্ঠিত হল। সেখানে শিক্ষকদের বৃত্তিগত দাবির পাশাপাশি সামগ্রিক ভাবে রাজ্যের শিক্ষা পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য নব গঠিত সরকারের কাছে আহ্বান জানানো হল। সেই বছরের অক্টোবরেই বিশেষ সম্মেলনে সকলের সুচিন্তিত অভিমতের ভিত্তিতে এর চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হল।

শিক্ষায় মোট বাজেট বরাদ্দের ১০% ব্যয় করার দাবিকে কেন্দ্র করে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছে এক স্মারকলিপি ও প্রদান করেন শিক্ষক নেতৃবৃন্দ এই সময়ে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরের শিক্ষকদের দাবি পরিপূরণের জন্য নতুন সরকার এসে একটি 'পরামর্শ দাতা সমিতি' গঠন করেছিল। এই পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে মাধ্যমিক সমিতির প্রতিনিধিরা বিশেষ করে চাকুরির নিরাপত্তা, মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য অবসর ভাতা বা পেনশনের সুব্যবস্থা করা ও স্কুলগুলিকে সরকারি অনুদানের ক্ষেত্রে লাল ফিতের ফাঁস মুক্ত করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার তার ১৮ দফা কর্মসূচি জনগণের সামনে উপস্থিত করেছিলেন। তার মধ্যে ৬ নম্বর দফাটিই ছিল শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সংক্রান্ত। সেখানে বলা হয়েছিল, 'প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা ও মান উন্নত করার জন্য ও শিক্ষা পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য, শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বস্তরের জটিল পরিস্থিতিকে দূর করার জন্য, শিক্ষায় একটি সুসংহত পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য এবং উন্নত ভবিষ্যৎ বংশধর গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সাহিত্যে, খেলাধুলা, শরীরচর্চা ও শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতিও যথাযথ নজর দেওয়া হবে। ছাত্র সমস্যার বিষয়েও যথাযথ ভাবে বিবেচনা করা হবে।'[৪]

১৪ নম্বর দফায় শিক্ষা পেশায় এবং অন্যান্য পেশাতেও গণতন্ত্রীকরণের লক্ষ্যে যুক্তফ্রন্ট বলেছিল, 'যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক এবং সর্বশ্রেণির কর্মচারীদের নিজেদের ন্যায্য দাবি ও অভাব অভিযোগ পেশ করার জন্য ইউনিয়ন গঠনের অধিকারের স্বীকৃতি দেবে এবং জনসাধারণের গণতান্ত্রিক ও ন্যায্য আন্দোলন দমন করবে না।'[৫]

এই পরিস্থিতিতে সরকার গঠনের অব্যবহিত পরেই শিক্ষক সমিতির সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে, বাজেট অধিবেশনের আগেই তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিভিন্ন

স্তরে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করলেন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১ মে থেকে এই মহার্ঘভাতা কার্যকরী হয়। তাতে বেতন হারের নীচের দিকে অর্থাৎ ১৪৯ টাকা পর্যন্ত মহার্ঘ ভাতার হার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত হারের কাছাকাছি পৌঁছায়। তবে সর্বনিম্ন স্তরে অর্থাৎ ১০৯ টাকা পর্যন্ত রাজ্য সরকারের দেওয়া মহার্ঘভাতা কেন্দ্রীয় সরকারের হারের থেকে এক টাকা বেশি হয়। তবে শিক্ষক সংগঠন ও সব পেশাজীবীর যুক্ত মঞ্চ ১২ জুলাই কমিটি উচ্চতর স্কেলের কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে বেশি হারে হওয়ায় বন্ধু সরকারের সমালোচনা করতেও ছাড়েনি। তারা কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবিতেও সোচ্চার হয়। দেখা যায় বস্তুতপক্ষে সেই নীতির ভিত্তিতে, বক্তব্য সঠিক হলেও রাজ্য সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখেই মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিল কর্মচারী ও শিক্ষক সমাজ।[৬] কিন্তু বিদ্যালয় করণিকদের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রাপ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দফ্তর কর্তৃক ভুল তথ্য পরিবেশিত হবার ফলে, তাঁরা সমান হারে এই সুবিধা থেকে সাময়িকভাবে বঞ্চিত হল। এই সময় শিক্ষক সমিতি প্রস্তাব দেয় যে, মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দ অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা থেকে মাথাপিছু দুই টাকা হ্রাস করে সেই টাকা করণিকদের দেওয়া হোক। সরকারও এই প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই ঘটনা বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের পারস্পরিক সহমর্মিতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে গণ্য করা যায়। সরকার 'বন্ধু ভাবাপন্ন' বলে সমিতি কিন্তু তার অন্যান্য দাবি দাওয়া থেকে সরে আসেনি। বিভিন্ন শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত দাবিতে ১৯৬৭-এর ২৫ জুলাই, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ একযোগে বিধানসভা অভিযান করেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে শিক্ষা ক্ষেত্রে জাগ্রত ভূমিকা গ্রহণের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য ওই বছরেরই ১৪ সেপ্টেম্বর সরকারের প্রধান প্রশাসনিক ভবন, রাইটার্স বিল্ডিংস বা মহাকরণ অভিমুখে এক অভিযাত্রাও সংগঠিত করলেন শিক্ষকেরা। ১৪৪ ধারার নিষেধ সীমানায় মিছিল রত আমাদের গুরুকুলের দাবি দাওয়া শুনতে স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী জ্যোতি ভট্টাচার্য ছুটে এলেন। পথের ধূলায় বসে বসে শুনলেন সমিতির দাবি দাওয়ার কথা।[৭]

১ অক্টোবর, ৬৭ খ্রিস্টাব্দে বসল সমিতির বিশেষ সম্মেলন। সেই সম্মেলনে যুক্তফ্রন্ট সরকার বিরোধী চক্রান্ত সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সচেতন করে দিলেন সমিতির পোড়খাওয়া নেতৃবৃন্দ। যুক্তফ্রন্ট সরকার মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের এবং সমস্ত স্তরের সরকারি ও আধা সরকারি কর্মীদের বাজার দরের পরিপ্রেক্ষিতে বেতন নির্ধারণের জন্য 'পে কমিশন' গঠন করলেন। সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের অনেক দিনের দাবি সাকার হল এই ভাবে। ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে শিক্ষকদের চাকুরির নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের পথে অগ্রসর হচ্ছিল। এই সময় সমস্ত বিদ্যালয়ের খাতে পেনশনের সুযোগ যাতে সম্প্রসারিত হয়, তার চেষ্টাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিদ্যালয়ে সরকারি আমলাদের দীর্ঘসূত্রিতা উপেক্ষা করে, সঠিক সময়ে অনুদান প্রেরণের জন্যও প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার সচেষ্ট হয়েছিল। বন্দী মুক্তি, ভূমি সংস্কারের প্রচেষ্টা, শ্রমজীবী মানুষদের আন্দোলনের অধিকার দান রাজ্যের কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূদের কাছে, অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তালসোনাপুরের তালের মাস্টারের অনুরূপ ছেঁড়া

ধুতি, ময়লা পাঞ্জাবি ও ভাঙ্গা ছাতায় শোভিত শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের পরে আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নও এতদিন যে গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক ও শহুরে পেটি বুর্জোয়ারা স্কুলগুলি পরিচালনা করতেন, তাদের মনোমত হয়নি। এমত পরিস্থিতিতে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য দিল্লির কংগ্রেস সরকার চেষ্টার কসুর রাখেননি। সরকারের মধ্যেও এই 'শ্রেণির' উপস্থিতি পরিস্থিতিতে জটিল করে তোলে। এই রকম পরিস্থিতিতে ৬৭-এর ২১ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের বকলমে রাষ্ট্রপতি যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অপসারিত করল।[৮] ডা. প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে এক 'পুতুল সরকার' ক্ষমতায় আসীন হল। ফ্রন্ট সরকার অপসারিত হবার পরেই নানাস্তরের কর্মচারী সহ শিক্ষকরা যে সমস্ত নবলব্ধ অধিকার ভোগ করছিলেন, তা কেড়ে নেবার প্রচেষ্টাও শুরু হয়ে গেল। গণতন্ত্রের উপর স্বৈরতন্ত্রের এই স্টিম রোলার চালানোর বিরুদ্ধে গর্জে উঠল শিক্ষক শ্রেণি।

শিক্ষক-শিক্ষণ ও শিক্ষক সমিতি

ঔপনিবেশিক যুগ শিক্ষক শিক্ষণের মাধ্যমে আমাদের আচার্যগণকে প্রকৃত গুরুর ভূমিকা পালনের জন্য একটি চেষ্টা আমরা দেখতে পাই। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় কিছুটা সচেতনতা দেখালেও, সামগ্রিকভাবে আমাদের 'জাতীয় শিক্ষা'-র অভিভাবকেরা কিছুটা ঔদাসীন্যই দেখিয়েছেলেন। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কী পড়ান হবে, তা নিয়ে জাতীয় নেতাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ বর্তমান থাকলেও, কীভাবে পড়ানো হবে তা নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথার সেরকম কোন নিদর্শন নেই।[৯] রবীন্দ্রনাথও এক্ষেত্রে খুব একটা সচেতনতার পরিচয় দেননি। তিনি 'জন্মগত শিক্ষক তত্ত্বে অনেকটাই বিশ্বাসী ছিলেন। আশ্রমের রূপও বিকাশ প্রবন্ধে তিনি সতীশচন্দ্র রায় প্রমুখ শান্তিনিকেতনের যে সমস্ত 'জন্মগতভাবে শিক্ষকদের কথা উল্লেখ করেছেন, তারা কেউ সে অর্থে শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিলেন না।[১০] অথচ ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দেই বিদ্যাসাগরের সহায়তায় বাংলা তথা ভারতের প্রথম নর্মাল স্কুল বা শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী কালে চুঁচুড়া, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এইগুলির মান যথেষ্ট উন্নত ছিল। হান্টার কমিশন (১৮৮২) মন্তব্য করেছিলেন।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দের পর ঔপনিবেশিক সরকার, প্রথমে সরকার ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে শিক্ষকদের দক্ষ করার মানসে শিক্ষক প্রশিক্ষণকে সজীব করার জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেয়। হুগলী, কোলকাতা ও ঢাকায় গড়ে ওঠে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কলেজ। এদের মধ্যে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কোলকাতার ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজকে প্রাদেশিক মডেল কলেজ হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়।[১১] কোলকাতাকেন্দ্রিক এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সারা বাংলার শিক্ষকদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিল—আদর্শ শিক্ষক হিসাবে নিজেদের গড়ে তোলার কাজে। অবশ্য সরকারি স্কুলের শিক্ষকদেরই ভর্তির ক্ষেত্রে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হত। এখানে ডেপুটেশনে শিক্ষক শিক্ষণ গ্রহনেচ্ছু সরকারি স্কুল শিক্ষকরা পড়াশোনা চলাকালীন পূর্ণ বেতন পেলেও, বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের তা থেকে বঞ্চিত করা হত।[১২] এর ফলে স্বাধীনতা পূর্ব

যুগে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ নেওয়া দুরূহ হয়ে পড়েছিল। স্বাধীনোত্তর কালে আরো কয়েকটি ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হলেও, বিরাট সংখ্যক বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাঁদের সংখ্যাধিক্যর জন্যই শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে অপারগ হতেন। এ পাশাপাশি তথাকথিত 'ফ্রেসার'রাও অনেক সময় কম যোগ্যতার কারণে এইসব ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পেতেন না। অথচ স্বাধীনতার পরে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রশিক্ষণ না থাকবার অজুহাতে, অনেক শিক্ষকের 'বেতন বৃদ্ধি' করতে অস্বীকার করতেন। সরকারের এই 'ভাত দেওয়ার কেউ নয়/কিল মারার গোঁসাই'-এর ভূমিকা এ.বি.টি.এ. নেতৃবৃন্দ তথা তাঁদের তৎকালীন নেতা সত্যপ্রিয় রায়কে ভাবিত করেছিল। তাই শিক্ষকদের সংগঠনের পরিচালনায় একটি সরকার অনুমোদিত শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তিনি অনেক দিন মনোমধ্যে লালন করেছিলেন। সুযোগ আসলো প্রথম যুক্তফ্রন্ট প্রতিষ্ঠার সময়পর্বে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রথম যুক্তফ্রন্ট-এর পতনের পর সমিতির আন্দোলনমুখিনতা নিয়ে আলোচনার পূর্বে—১৯৬৬-৬৭ খ্রিস্টাব্দে সমিতির কিছু গঠনমূলক কাজ নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। তখন কংগ্রেসি রাজ—এ.বি.টি.এ-র সদস্য শিক্ষকদের কাছে বেশিরভাগ শিক্ষক শিক্ষণ কলেজের দ্বার রুদ্ধ অলিখিত ভাবেই। এই রকম পরিস্থিতিতে সমিতি, বিশেষভাবে এই পরিস্থিতির শিকার শিক্ষক ও ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের, শিক্ষক-শিক্ষণ পড়বার সুবিধার জন্য একটি বি. এড কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা করল। আসলে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি একদিকে যেমন তৎকালীন দরিদ্র শিক্ষক শ্রেণির রুটি-রুজির লড়াইকে সংগঠিত করেছে, ঠিক তেমনই এর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সেমিনার/ওয়ার্কসপ ইত্যাদি সংগঠিত করে শিক্ষকদের শিক্ষাদানের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করতেও যত্নবান হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতেন সমিতির সর্বজনমান্য নেতা সত্যপ্রিয় রায়। অবশ্যই তাঁর পাশে থাকতেন অনিলা দেবী, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী, সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ভবেশ মৈত্রের মতো সমিতি নেতৃত্ব এবং হিতৈষীরা। সত্যপ্রিয় রায়ের অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল সমিতির তত্ত্বাবধানে একটি বি. এড. কলেজ খোলা এবং পূর্বোক্ত বাস্তব ও তাত্ত্বিক অসুবিধাগুলি দূরীকরণ করে একদল উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক তৈরি করা। তার সঙ্গে সঙ্গে হবু শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষণ পটু করে তোলার চিন্তাও তার মাথায় ছিল। কিন্তু সমিতির শত চেষ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেস সরকারের আমলে এই সংক্রান্ত ছাড়পত্র পাওয়া যায়নি। অবশেষে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম যুক্তফ্রন্টের সময়ে গণেশ এভিনিউতে অবস্থিত সমিতির প্রধান কার্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন নিয়ে একটি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে সমিতি সক্ষম হয়। ২১ জুলাই ৬৭ থেকে কলেজটিতে পঠন-পাঠন শুরু হয়। অধ্যাপক ভবেশ মৈত্রের স্মৃতিচারণ থেকে আমরা জানতে পারি, 'সত্যপ্রিয় রায় স্বপ্ন দেখতেন যে শিক্ষক সমিতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই কলেজের গ্রন্থাগারকে ব্যবহার করে শিক্ষানীতি ও তার প্রয়োজনীয় দিক সম্পর্কে নিজেদের যোগ্যতর করে তুলবেন। সত্যপ্রিয় রায় ও অনিলাদির আগ্রহে আমি (ভবেশবাবু) কলেজে অধ্যাপক পদে যোগ দিই।'[১৩] সেই সময়ে পাস-গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকেরা কোন ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হতে পারছিলেন না। অথচ তখনকার সরকারি নিয়ম ছিল ট্রেনিং না নিলে শিক্ষকদের বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি বা ইনক্রিমেন্ট বন্ধ থাকবে।

নতুন কলেজ কমিটির তৎকালীন সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন সত্যপ্রিয় রায় ও অনিলা দেবী। প্রতিষ্ঠানটি পরিচালন কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষানুরাগী অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী, গোলকপতি রায় প্রমুখ। তারা এই অসহায় শিক্ষকদের পাশে থাকার অঙ্গিকার করে ঘোষণা করেছিলেন, এ. বি. টি. এ. কলেজে পাশ গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকেরা ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। আরম্ভটা ভালো ভাবে হলেও, এক বছরের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটল। কংগ্রেসি নেতৃত্বের চাপে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একাংশ, কলেজ পরিচালনার ক্ষমতা থেকে 'বামপন্থী' পরিচালকদের হঠানোর জন্য সবিশেষ চেষ্টা করতে থাকে। তারা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক বা T.I.C. কে তাদের সহযোগী হিসাবে পেয়ে যান। বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে তিনি এমন সব পদক্ষেপ নিতে থাকেন, যা কলেজের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে বলে কলেজ পরিচালন কর্তৃপক্ষ বা এ.বি.টি.এ. নেতৃত্ব মনে করেন। সেই সময়ে কলেজে পাঠরত শিক্ষার্থীদের অন্যতম ছিলেন নদীয়া জেলা শিক্ষক আন্দোলনের নেতা অজিত সান্যাল এবং ছাত্র আন্দোলনের রাজ্য নেতা শিপ্রা ভৌমিক (চক্রবর্তী)। তারা কলেজ বিরোধী তথাকথিত দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে ছাত্রদের নেতৃত্ব দেন। আর পূর্বতন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে সরিয়ে দিয়ে অধ্যাপক ভবেশ মৈত্র ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের পদে আসীন হন। ইতোমধ্যে অবশ্য দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সত্যপ্রিয় রায় এই সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। এই সময়ে কলেজের সংকট নিরসনে তিনি এবং কলেজ কমিটির তৎকালীন সম্পাদক গোলকপতি রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। অধ্যাপক ভবেশ মৈত্র কলেজটির অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করতে থাকেন। সমগ্র প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন পরীক্ষা সমূহের নিয়ামক অনাদি নাথ দাঁ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।[১৪]

এই এ.বি.টি.এ. কলেজের গণ্ডগোলে কিন্তু একটা বিষয়কে আমাদের সামনে এনে দেয়, সেটা হল কলেজ সংক্রান্ত এই অচলাবস্থা কিন্তু সেইরকম আদর্শগত কারণে ঘটেনি। এই সংঘর্ষের প্রধান কারণ ছিল এ.বি.টি.এ. নেতৃত্বাধীন কলেজকে বামবিরোধী শক্তিগুলির অধিকারে নিয়ে আসার চেষ্টা। অবশ্যই অন্যায় সেই চেষ্টা। কিন্তু টাকার উল্টো দিকটা দেখলে আমরা লক্ষ্য না করে পারিনা, যে বামপন্থী দলগুলি বিশেষ করে নবগঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) সেই সময় ক্রমশঃ এ.বি.টি.এ.-র স্বাধীন সত্তাকে গ্রাস করেছিল। এটা ইতিহাসের সত্য যে স্বাধীন প্রেসারগ্রুপ হিসাবে এ.বি.টি.এ.-র পরিচয় আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। কলেজ পরিচালনা সংস্থাকে বিশ্ববিদ্যালয় যেমন রাজনৈতিক ভাবে ব্যতিব্যস্ত করছিল—শাসক শক্তির পক্ষভুক্ত হয়ে, তেমনি সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে এ.বি.টি.এ. হয়তো নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে বড় গাছে নাও (নৌকা) বাঁধার মতো, বাইরের বামপন্থী শক্তিগুলির শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য তথা নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির অন্যতম কর্ণধার অনিলা দেবী বা গোলকপতি রায় প্রমুখ এই দুই শক্তির সেতুবন্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কলেজের সংঘাতময় পরিস্থিতির বর্ণনায় এ.বি.টি.এ. কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক ভবেশ মৈত্রর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, কলেজ সংক্রান্ত ডামাডোলের সময়ে 'সমিতির সাধারণ

সভ্য, কলেজের একাংশ শিক্ষার্থী এবং পার্টির একাংশের মধ্যে নানারকম সংশয় দেখা যায়।' লেখাটির কয়েক অনুচ্ছেদ পরেই তিনি জানাচ্ছেন, এই অশনীকালে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যাঁরা এসব করেছিলেন তারা মরিয়া হয়ে ওঠেন। বাইরে পার্টি-বিরোধী ও সমিতি বিরোধী শক্তি মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য সকল রকম চেষ্টা করে।'[১৫]

শিক্ষক সমিতি ও তাদের পরিচালিত কলেজের প্রসঙ্গে পরপর দুইবার ভবেশবাবু পার্টি অর্থাৎ সি. পি. আই. (এম.)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। যাকে আমরা 'slip of the pen' হিসাবে কখনোই ধরতে পারি না। এতদিনকার শিক্ষা আন্দোলনের উদারনীতিক নেতা সত্যপ্রিয় রায়ও সমিতির শক্তি বৃদ্ধির তাগিদেই ক্রমশঃ বামপন্থীদের কাছাকাছি হতে শুরু করেন। তা সত্ত্বেও তাঁর বিরোধী শক্তি কর্তৃক লিখিত স্মৃতিচারণা অনুযায়ী, ৫৪-এর পরবর্তীকালে সত্যপ্রিয় রায়ের ব্যক্তিগত সংগঠনগত দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে বলতে পারি না যে, 'সত্যপ্রিয় বাবু তখনও কোন দলে যোগ দেননি। তখন তিনিও বিশ্বাস করতেন যে গণ সংগঠন হচ্ছে autonomous সংগঠন। কোন পার্টিরই গণসংগঠনে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। যখন দেখলাম সত্যপ্রিয় বাবু পার্টিম্যান হয়ে গেলেন, মই বেয়ে উঠতে লাগলেন, আর ABTA ক্রমশঃ কমিউনিস্ট পার্টির আজ্ঞাবহ সংগঠন হয়ে উঠল, ABTA-র সঙ্গে আমার আত্মিক যোগ নষ্ট হল।'[১৬] প্রাক্তন কমিউনিস্ট পরে কংগ্রেসি সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কিছুটা স্বাধীনোত্তর বাংলায় কংগ্রেস সরকারের মাউথ পিস হিসাবে উপরোক্ত কথাগুলি বলেছিলেন। সদর্থকভাবে এর মধ্যে কিছু সত্য অবশ্যই ছিল। অবশ্য তিনি একথাও বলেছিলেন, 'সত্যপ্রিয় বাবুর মতো মুক্তমনা নির্দল মানুষ যখন সংকীর্ণতার ও মন্ত্রবদ্ধতার কুহকী রাজনীতিতে ঢুকলেন, তখন সত্যিই বিষণ্ণ বোধ করেছি।.....তাঁর নেতৃত্ব সুলভ গুণ ছিল, সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল, শিক্ষা ভাবনাও ছিল তাই ওঁর কাছে আমার প্রত্যাশা ছিল বেশি। ওর শেষের জীবন কর্মধারা আমার ভালো লাগেনি।'[১৭] অবশ্য সত্যপ্রিয় বাবুর এই রকম মূল্যায়ন অনেকাংশেই সত্য নয় বলেই মনে হয়। ব্যাজ স্তুতির অন্তরালে বিরোধী শিক্ষক নেতা সতীন্দ্রনাথ বাবু সত্যপ্রিয় রায়ের কার্যবিধির সামগ্রিক সমালোচনাই করেছিলেন।

বন্ধু সরকারের পতন ঃ নবতর আন্দোলন ঃ

এ বিষয়ে বামপন্থীদের বা সত্যপ্রিয় বাবুর মতামত পরিস্ফুট হয়ে দাঁড়াবে ২য় যুক্তফ্রন্টের সময় কাল থেকেই। এবার সেই কথাই আমরা বলব। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের ২১ তারিখে রাজ্য সরকারের শরিক বাংলা কংগ্রেসের দোলাচলতা ও কেন্দ্রীয় সরকারের, বিরোধী শক্তির সরকারের প্রতি অসহিষ্ণুতার ফলস্বরূপ প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটল। গদিতে বসল ড. প্রফুল্ল ঘোষের সরকার। যা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। যাইহোক অন্তর্বর্তী এই সরকার শিক্ষক সহ সমস্ত জনতার সংগ্রামলব্ধ প্রতিটি অধিকার হরণের চেষ্টা করতে থাকেন।[১৮] স্বভাবতঃই সমিতি এই সরকারের অপসারণ চেয়ে, আন্দোলনের পথেই চলতে চাইল। সমিতি বিরোধী শক্তি, সমিতি তার অরাজনৈতিক পথ পরিত্যাগ করে, রাজনীতি করছে বলে হৈ চৈ শুরু করল। এটা তো ঠিকই যে কংগ্রেস সরকার বাস্তবিকপক্ষে শিক্ষকদের স্বার্থে প্রায় কিছুই করেনি। সেই সময় যেটুকু অধিকার তাঁরা পেয়েছিল তা লড়াই করে। আর এই লড়াইয়ের

সময় তাঁরা বামপন্থী সহ বিরোধীদেরই পাশে পেয়েছিল। তাই আমরা বলতেই পারি যে পরিস্থিতিই শিক্ষক সমিতিকে বামপন্থীদের পাশে ঠেলে দিয়েছিল সেই সময়ে। শিক্ষকরা তাই প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর ১২ জুলাই কমিটি ও রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম সমিতির নেতৃত্বে এই অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই অংশ নিয়েছিল।

এদিকে তখন নকসালপন্থী আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। বাম ও অতিবামদের সংগ্রামের ময়দানের লড়াইকে প্রতিরোধ করার মানসে প্রফুল্ল ঘোষের সরকার যাদবপুর, কোলকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদের উপর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। উত্তরপাড়ার প্যারিমোহন কলেজের সংগ্রামরত ছাত্রছাত্রীদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে প্রফুল্ল ঘোষের পুলিশের হাত। এই সব ঘৃণ্য আক্রমণের সামনে শিক্ষক সমিতির পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব ছিল না। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি সর্বস্তরের শিক্ষক সংগঠনগুলি এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে আগামী আন্দোলনের পরিচালনার জন্য একটি যুক্ত কমিটি গঠন করলেন। এই যুক্ত কমিটির উদ্যোগে পাঁচ শতাধিক শিক্ষক/শিক্ষিকা বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ৬৮-এর ২৮ মার্চ রাজধানী দিল্লীর রাজপথে ধর্ণায় বসলেন। গণ আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার চাপে ও তৎকালীন স্পীকার বিজয় ব্যানার্জীর সংসদীয় আইন সংক্রান্ত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে শেষ পর্যন্ত প্রফুল্ল ঘোষ সরকারের অল্পদিনের মধ্যেই বিনাশ সাধন হল।[১৯]

এদিকে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ডা. হীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত সমিতির সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মে মাসের ১০ তারিখে অর্জিত অধিকার রক্ষার দাবিতে সারা পশ্চিমবাংলার সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সফল কর্মবিরতি পালন করা হল। সেই সময়ে অনুষ্ঠিত বিধান পরিষদের নির্বাচনে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রার্থী হিসাবে মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও সুবোধচন্দ্র মিত্র বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিলেন। এই ভাবে আইনসভার ভিতরে এবং রাস্তার লড়াইয়ে সমিতি সমভাবে সাফল্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। ওই বছরেরই ১৬ থেকে ১৯ আগস্ট সরকারের শিক্ষা ও শিক্ষক বিরোধী নীতির প্রতিবাদে বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কয়েক হাজার মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ রাজভবনের সম্মুখে একটি অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হলেন। কিন্তু রাজ্যপাল, সম্মানীয় শিক্ষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবারও কোন প্রয়োজন অনুভব করলেন না। শিক্ষকদের বিভিন্ন 'গ্রেড' অনুযায়ী পেনশন প্রদান ও শিক্ষাকর্মীদের পেনশন সংক্রান্ত বঞ্চনার বিরুদ্ধে ১৬ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে শিক্ষক সমিতির তৎকালীন সম্পাদক অনিলা দেবীর নেতৃত্বে শিক্ষক, শিক্ষিকারা পাঁচদিন ব্যাপী অনশন সত্যাগ্রহ করলেন। এই অনশন সমাপ্তি উপলক্ষ্যে সমিতির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল, 'আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে বিপুলভাবে জয়ী করানোর জন্য সমিতির প্রত্যেকটি কর্মীকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।'[২০] শুধুমাত্র নিজেদের জীবন ও জীবিকা সংক্রান্ত সংগ্রামেই বাংলার শিক্ষকবৃন্দ নিমগ্ন থাকেন নি কখনো। তাই আমরা দেখি ওই বছরেই মেদিনীপুরের বন্যা এবং জলপাইগুড়ি সহ সমস্ত উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যা

পরিস্থিতিতে সমিতি নিশ্চুপ থাকেনি। তারা বন্যার্তদের ত্রাণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সেই সময় অগ্রগামী হয়েছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গের শিক্ষা কাঠামো প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থায় সেখানকার শিক্ষা কাঠামোকে পুনর্নির্মাণের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির মানসে সমিতি ৬৮-এর ৭ ডিসেম্বর শিক্ষা বাঁচাও দিবস' ও ১৭ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় শিক্ষক সমাবেশ সংগঠিত করেছিল।

অন্যদিকে ক্রমশঃ অন্তর্বর্তী নির্বাচন এগিয়ে আসছিল। বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি, কংগ্রেসের গরিব ও মধ্যবিত্ত বিরোধী নীতির প্রতিবাদে, তাদের জোটের ন্যূনতম কর্মসূচি নির্ধারণ করে, এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আমূল ভূমি সংস্কার, দরিদ্র কৃষকদের ভূমি রাজস্ব মকুব, প্রান্তিক কৃষকদের খাস ও উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন এবং শ্রমিকস্বার্থে ন্যূনতম মজুরি স্থিরিকরণ, বোনাস আইনের মাধ্যমে মেহনতি মানুষের কাছাকাছি আসতে চেয়েছিল যুক্তফ্রন্ট। শিল্পায়নের উপরও গুরুত্ব দিয়েছিল তাঁরা। জনৈক বিশ্লেষকের ভাষায় শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচিতে। বলা হয় ঃ সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা চালু করা হবে, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হবে, চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক; শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি করা হবে।[২১] শিক্ষা ক্ষেত্রে ৬৭-এর প্রথম যুক্তফ্রন্ট উন্নয়নের জন্য যেসব পদক্ষেপ নিতে চেয়েছিল, আগামী দিনে তারই সার্থক পরিকল্পনা সংঘটনের একটি চেষ্টা, আমরা উপরোক্ত পংক্তিগুলির মধ্যে লক্ষ্য না করে পারি না।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট ঃ শিক্ষামন্ত্রী সত্যপ্রিয় রায়

যাইহোক দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট আগের থেকেও বিশাল বহুমত পেল মানুষের কাছ থেকে। ১৯৬৭-এর নির্বাচনে তেতাল্লিশ আসন প্রাপ্ত যুক্তফ্রন্টের সবচেয়ে বড় শরিক মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, এবারকার অর্থাৎ ৬৯-এর অন্তর্বর্তী নির্বাচনে আশিটি আসন পেয়েছিল। বাংলা কংগ্রেসও তার আগের প্রভাব অনেকটাই ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। মার্কসবাদীরা সবচেয়ে বেশি আসন পেলেও, কোয়ালিশন সরকার গঠনের স্বার্থে বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখোপাধ্যায়কে পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী পদ ছেড়ে দিল। জ্যোতি বসু তাঁর 'যতদূর মনে পড়ে' তে লিখেছেন, '.....যুক্তফ্রন্টের ঐক্যের স্বার্থে ও রাজ্যের বৃহত্তর স্বার্থে বাংলা কংগ্রেসের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি আসন পাওয়া সত্ত্বেও সি. পি. আই (এম) মুখ্যমন্ত্রীর পদটি বাংলা কংগ্রেসকে ছেড়ে দিল।'[২২] অন্যান্যদের সঙ্গে, এতদিনকার শিক্ষক নেতা সত্যপ্রিয় রায়কে করা হল শিক্ষামন্ত্রী। তখনো শিক্ষা বিভাগ আজকের মতো উচ্চশিক্ষা বা প্রাথমিক/মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ হিসেবে পৃথগন্ন হয়নি। সত্যপ্রিয় রায়ের শিক্ষামন্ত্রিত্ব লাভের সদর্থক ও নঞর্থক দিক দুটোই আছে। নঞর্থক দিকের কথাই প্রথমে বলি, রায়ের শিক্ষামন্ত্রী হবার মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হল বামপন্থীদের সঙ্গে বিশেষ ভাবে মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের সঙ্গে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির একটি বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সমিতির সর্বজনমান্য নেতা তখনো অবধি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দলের সদস্য না হয়েও, আস্থাভাজন হয়েছেন বামপন্থীদের। আর এই দুই পক্ষের বিক্রিয়ায় অনুঘটকের কাজ করেছেন

সমিতির মধ্যে থাকা অনিলা দেবী, গোলকপতি রায়, রথীন্দ্রকৃষ্ণদেব বা ভবেশ মৈত্রের মতো মার্কসবাদী পার্টির নেতারা। এটা সর্বতোভাবে সত্য যে এই সময় থেকেই শিক্ষকদের নিজস্ব অরাজনৈতিক সংগঠন, একটি বিশেষ দলের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। অবশ্য এর পাশাপাশি এটাও ঠিক, যুক্তফ্রন্টের সময়কালে তো বটেই পরবর্তীকালে আমাদের আলোচ্য সময়ের বহির্ভূত ১৯৭৭ পরবর্তী বাম রাজত্বেও তাদের 'বন্ধু সরকারের' সঙ্গে শিক্ষক সমিতি বারে বারে বিভিন্ন ইস্যুতে মতভেদের প্রকাশ ঘটিয়েছে। প্রথম যুক্তফ্রন্টের সময় শিক্ষাকর্মীদের মহার্ঘভাতা নিয়ে সমিতি যেমন সরকারের সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করেছে, তেমনি অনেক পরে বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক প্রাথমিক ইংরেজি ভাষাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার বিষয়ে বামপন্থী সরকারের বিরোধিতা করেছে তাঁরা। সে অন্য প্রসঙ্গ।

এর পাশাপাশি আমাদের মনে রাখতে হবে শিক্ষক নেতা সত্যপ্রিয় রায়ের এই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ আমাদের রাজ্যের শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের পরিধিতে একটি বিশাল পরিবর্তন আনয়নে সমর্থ হয়েছিল। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আগে বিশিষ্ট শিক্ষকেরা যে শিক্ষামন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেননি এমন নয়। তবে তাঁরা ছিলেন উচ্চশিক্ষার উচ্চপদের শিক্ষক। তথাকথিত বঞ্চিত মাধ্যমিক শিক্ষকদের মৌন মুখের ভাষাকে প্রশাসনের অন্দরে পৌঁছে দেবার ইচ্ছা তাদের মধ্যে কারুর কারুর ছিল না, এই মত আমরা কেউই হয়তো পোষণ করি না। কিন্তু উচ্চশিক্ষার গজদন্ত মিনারে বসে, সারা বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা তথাকথিত সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতার শিক্ষক মহাশয়দের নিত্য নৈমিত্তিক যন্ত্রণার কথা প্রশাসনের কাছে তুলে ধরা ও তার সামগ্রিক সুরাহা করার দিক থেকে সত্যিই সত্যপ্রিয় রায় ছিলেন সঠিক ভাবে নির্বাচিত শিক্ষামন্ত্রী। সেই সময়কার শিক্ষকনেত্রী নীলিমা সেনের স্মৃতিচারণ থেকে আমরা জানতে পারি, 'সত্যপ্রিয় রায় বাংলা দেশের (পঃ বঃ) স্কুলগুলি সম্পর্কে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। কোন্ স্কুলের কি সমস্যা, 'নটোরিয়াস কমিটি' কোথায় আছে সব জানা। কোথায় অনিয়ম হয়, বে-আইনি কাজ হয়, চুরি হয়, সব জানা ছিল। শিক্ষকরা 'এ. বি. টি. এ. করি' একথা সাহস করে বলতে পারতেন না। ছাঁটাই-এর খড়্গ নেমে আসত। লুকিয়ে তাদের সদস্য করা হত। স্কুলে নির্বাচনও হত না। আট বছর, দশ বছর ধরে একই কমিটি কাজ করত। সত্যপ্রিয়বাবু এসেই সেগুলো ভেঙে দিয়ে বললেন, নতুন করে নির্বাচন করতে হবে। কোথাও সুপারসীড করে নতুন কমিটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেন। শিক্ষকদের চাকরির নিরাপত্তা সৃষ্টি করলেন। তাঁদের ভয় ভেঙে যেতে লাগল।'[২৩]

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে শিক্ষকদের উন্নতি, শিক্ষার্থীদের প্রেরণাদান ও সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলুষ মুক্ত করার কথাই দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট গোষ্ঠী নির্বাচনের প্রাক্কালে ঘোষণা করেছিল। এবার তাঁদের মোট ৩২ দফা কর্মসূচিতে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা নিয়ে একটু বিশদভাবে আলোচনা করার দরকার আছে। দপ্তরওয়ারি কর্মসূচির দশ নম্বরেই দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতির স্থান হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, 'শিক্ষা-১০। যুক্তফ্রন্ট সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে অরাজকতা দূর করার জন্য দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করবে এবং একটি সুষ্ঠু পারম্পর্য সম্পন্ন এবং সংহত শিক্ষা পদ্ধতি চালু

করবে। সে দিকে দৃষ্টি রেখেই (ক) শিক্ষার উচ্চতম স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হবে, (খ) চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষা প্রবর্তিত হবে— প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হয়নি এমন সমগ্র অঞ্চলে বিদ্যালয় খোলা হবে, (গ) অষ্টম শ্রেণি অবধি শিক্ষা অবৈতনিক করা হবে, (ঘ) গ্রামাঞ্চল ও প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার মান এবং শিক্ষকদের চাকরি বিধির মানেও যে বৈষম্য চলতি রয়েছে সেগুলি দূর করা হবে, (ঙ) প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে একটি নতুন সামগ্রিক আইন চালু করা হবে; (চ) বর্তমান জেলা স্কুল বোর্ডগুলি বাতিল করে তার স্থলে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে নতুন বোর্ড স্থাপন করা হবে, (ছ) মাধ্যমিক শিক্ষক বোর্ডকে সংস্কার করা হবে; (জ) বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ব্যবস্থাপনার গণতন্ত্রীকরণ করা হবে; (ঝ) সকল শ্রেণির শিক্ষক ও অশিক্ষক বিদ্যালয় কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা হবে এবং চাকুরি বিধিরও বদল করা হবে—যাতে কাজের নিরাপত্তা সৃষ্টি হয়; (ঞ) শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের সময়মত বেতনের ব্যবস্থা করা হবে, (ট) শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে বাড়ানো হবে; (ঠ) নতুন প্রতিষ্ঠান খুলে এবং চলতি প্রতিষ্ঠানেও নতুন শিফ্‌ট প্রথায় ছাত্র ভর্তি সমস্যার মীমাংসা করা হবে; (ড) চলতি পরীক্ষা গ্রহণ প্রথার সংস্কার করা হবে ; (ঢ) বিদ্যায়তনের প্রধানের অনুমতি ব্যতিরেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিশের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হবে; (ণ) ছাত্র ও যুবকদের কল্যাণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে; (ত) শিক্ষক, ছাত্র ও পরিচালকদের মধ্যে সহযোগিতার প্রসার ঘটানো হবে; (থ) সাহিত্য, কলা, খেলাধুলা, শরীর চর্চা এবং যাবতীয় সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে এবং (দ) কলকাতায় একটি স্টেডিয়াম খোলা হবে।[২৪]

যুক্তফ্রন্টের এই ইস্তাহারে একটু খুঁটিয়ে খুঁজলেই আমরা দেখি যে, কংগ্রেস আমলে যে মাথাভারী বা উল্টানো পিরামিডতুল্য শিক্ষা কাঠামো গড়ে উঠেছিল অর্থাৎ উচ্চশিক্ষায় সবচেয়ে বেশি জোর দিয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবহেলা করার ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যকে অনুসরণ করা—তার বিপরীতে বামপন্থীরা অন্তত, তত্ত্বগতস্তরে শিক্ষা পিরামিডকে উল্টো থেকে আবার সোজা করার চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শিক্ষা ব্যবস্থার অবৈজ্ঞানিক ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য যা গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা' ভুলে তাঁর শিষ্যরা চালু রেখেছিলেন, তার সঙ্গে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক জোটের শিক্ষা চিন্তার পার্থক্য বোঝাবার একটা চেষ্টা আমরা করব।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার এক্ষেত্রে যে একটি যুগান্তকারী শিক্ষা পরিকল্পনার ত্রুটি সংশোধন করেছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। শিক্ষক আন্দোলনের পোড় খাওয়া নেতা সত্যপ্রিয় বাবু, যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচির ১০ নম্বর ধারার উপর ভিত্তি করে সরকার গঠনের অব্যবহিত পরেই যুক্তফ্রন্টের ২০/১১/৬৯-এর মিটিং-এ এ বিষয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনার নীল নক্সা তৈরি করে ফ্রন্টের সব শরিকদলের নেতাদের সামনে উপস্থিত করেন।[২৫] এই বক্তব্যে ঔপনিবেশিক যুগের শিক্ষার যে বিকৃত রূপ পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের আমলে বর্তমান এবং বর্ধমান ছিল তার পরিবর্তে বিজ্ঞানসম্মত গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী শিক্ষা ধারা চালু করার সুপারিশ করেন সত্যপ্রিয়বাবু। এই বিবৃতির প্রথমাংশেই সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের পক্ষে সওয়াল করা হয়। যা আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়।

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা উন্নতির জন্য শিক্ষামন্ত্রী সত্যপ্রিয়ের বক্তব্যে আসা যাক। প্রথমেই সামন্ততান্ত্রিক দুর্নীতির আখড়া স্কুল ম্যানেজিং কমিটিগুলি কর্তৃক যেভাবে শিক্ষকদের চাকুরির নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হত, পূর্ববর্তী আমলে, তাকে সমূলে বিনাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শিক্ষামন্ত্রী অনবদ্য ভাষায় বলেছিলেন, 'The U.F (United front) was unanimous in its finding that many of the existing Managing Committees indulged in corruption and mal practices and developed into coteries of vested interest. If in view of this the Managing Committees of some 160 schools have been superseded, it was needed to implement the general U. F. Policy of clean administration in public Institution'.[২৬] অনেক দুর্নীতিগ্রস্ত ম্যানেজিং কমিটি সেই সময় ভেঙে দেওয়া হয়, এবং ওই সব ক্ষেত্রে কোন বিশিষ্ট শিক্ষক বা সরকারি কার্যনির্বাহককে অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করার কথা বলা হয়।

শিক্ষক আন্দোলনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ শিক্ষামন্ত্রী সত্যপ্রিয় তার সংগ্রাম সঞ্জাত অভিজ্ঞতাতেই বুঝেছিলেন মাধ্যমিক শিক্ষার মূল পরিচালনাকারী সংস্থা, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাঠামোগত সংস্কার না করলে, সামগ্রিক ভাবে শিক্ষা কাঠামোর মধ্য পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সোপানটিকে অনিন্দ্যসুন্দর করে গড়ে তোলার স্বপ্নটি কখনোই সাকার হবে না। না, সীমিত ক্ষমতা ও সরকারের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন চিহ্নের মুখে, এ বিষয়ে আমূল পরিবর্তনের কোন চিন্তা, যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। 'The only important changes that have taken place in the composition of the Board of Secondary Education are the appointments of Secretary and authorization of a member of the Board to carry on the functions of the president of the Board.'[২৭] পরবর্তীকালে অবশ্য শিক্ষা জগত থেকে বহুদূরে অবস্থিত আমলা সচিবের বদলে, সরকারের শিক্ষা বিভাগের শিক্ষকদেরই মূলতঃ এই সব পদে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অবশ্যই শুধুমাত্র মাধ্যমিক শিক্ষা নয়—সামগ্রিক ভাবে তৎকালে শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে সত্যপ্রিয়বাবু কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক উচ্চশিক্ষার সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। যা বর্তমান অন্বেষণের ক্ষেত্রে অনেকটাই অপ্রয়োজনীয়।

মন্ত্রী থাকাকালীন সত্যপ্রিয়বাবু ১৯৬৯-এর ২৩ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় শিক্ষা বাজেট পেশ করেছিলেন। বাজেট বক্তৃতায় তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, ''আমার দুঃখ হচ্ছে, আমি সারা জীবন শিক্ষার আন্দোলন করেছি। আমি আজ শিক্ষামন্ত্রী পশ্চিমবাংলার। কেরালা, তামিলনাড়ু তার মোট সরকারি ব্যয় বরাদ্দের অনেক বেশি শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করে, আমার দুঃখ হচ্ছে আমি শিক্ষার আন্দোলন করে এসেছি। আমি শিক্ষামন্ত্রী, আমি আমার বাজেট বরাদ্দের মাত্র ২০ শতাংশ শিক্ষার জন্য রাখার দাবি করেছি। তামিলনাড়ু, কেরালা অনেক বেশি ব্যয় করে। আমার দুঃখ আমি ২০ শতাংশ ব্যয় করছি।''[২৮] শিক্ষাদরদী সত্যপ্রিয় রায় বুঝতেন যে মানব সম্পদ উন্নয়ন না হলে, একটা দেশে সার্বিক বিকাশ অধরাই থেকে যায়। তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে যতবেশি ব্যয় করা হবে এবং তাকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা যাবে, ততই সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে, এটাই ছিল শ্রীযুক্ত রায়ের বিশ্বাস।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের ঘটনা বহুল স্বল্প সময়কালের মধ্যে সত্যপ্রিয় রায় শিক্ষা ক্ষেত্রে একেবারে আমূল পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এটা বললে সত্যের অপলাপ হবে। তবে তিনি শুধুমাত্র যুক্তফ্রন্টের জন্য নয়—পরবর্তীকালের বামপন্থীদের জন্য যে সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিলেন পরবর্তীকালে তা প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। মন্ত্রীর আসনে বসে, তিনি বাস্তবতঃ শিক্ষা ক্ষেত্রে কতটা কি করেছিলেন, তার সালতামামীতে আসবার আগে, আমরা মনে রাখবো মহাকরণের লাল বাড়িতে বসলেও তিনি কিন্তু 'রাস্তাই একমাত্র রাস্তা' এই বাস্তবতাকে কখনোই ভুলে যাননি। সত্যপ্রিয় বাবুর অতি ঘনিষ্ঠ বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা অমিতাভ সেন এই প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন, যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের নিয়ে সত্যপ্রিয়বাবু মন্ত্রী থাকাকালীনই দিল্লির রাজপথে সংগ্রাম মিছিলে নেতৃত্ব দিতে পিছুপা হননি। সারা ভারতে সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা এবং শিক্ষকদের চাকুরির নিরাপত্তা বজার রাখার দাবি ও অবসরান্তে তাদের পেনশনের দাবি জানিয়ে দিল্লির বুকে এই মিছিল হয়েছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এই পরিস্থিতিতে সত্যপ্রিয় রায় সহ শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্য পরিশেষে সবটাই অরণ্য রোদনে পর্যবসিত হয়েছিল। শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানোর তথাকথিত দাবির প্রতি মৌখিক সহানুভূতি জানালেও, এই বিষয়ে শ্রীমতি গান্ধীর সরকার সদর্থক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি।[২৯]

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকগুলি পরিবর্তনের সূচনা হল। এই সরকার অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা প্রচলনের উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পরিপূরক সাহায্যের জন্য প্রেরণ করে। অবশ্য সরকারের এই প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় সরকারের কোনরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। এছাড়া পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চাকুরির নিরাপত্তা ও পরিচালন সমিতি সংক্রান্ত বিধি সংশোধন করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কায়েমি স্বার্থের বিলোপ করার একটি চেষ্টাও সেই সময় করা হয়। অবসরকালীন সুযোগ সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি রচনার জন্য তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী সচেষ্ট হয়েছিলেন। সর্বাধিক জনপ্রিয় যে প্রকল্পটি সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্বে গ্রহণ করা হয়েছিল, সেটি হল প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণের সূচনা করা। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে 'বাংলা ভাষার' বই দিয়ে এই প্রকল্প শুরু হয়েছিল। না, তথাকথিত কোন 'বামপন্থী প্রাইমার' নয়—রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বই পুস্তকের কপিরাইট তখন 'বিশ্বভারতী'র। তাদের সঙ্গে কথা বলে, নির্দিষ্ট রয়্যালটি মিটিয়ে দিয়ে সহজ পাঠ প্রথম ভাগ ও সহজ পাঠ—দ্বিতীয় ভাগ, বই দুইটি বিনামূল্যে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য বিলি করবার বন্দোবস্ত করা হয়।[৩০] এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শিক্ষা সংস্কারের কাজ করার মধ্যেই সত্যপ্রিয় রায় থেমে থাকেননি, এর পাশাপাশি শিক্ষকদের দৈনন্দিন সংগ্রামের সঙ্গে তিনি সংযোগ ছিন্ন করেন নি। মন্ত্রী থাকার জন্য তখন নিয়ম অনুযায়ী তিনি শিক্ষক সমিতির সভাপতি বা সম্পাদক কোন পদেই ছিলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমিতির উপর এই দীর্ঘদেহী মানুষটির দীর্ঘ ছায়া বারে বারেই বাইরের প্রখর রৌদ্রতুল্য প্রতিবন্ধকতাকে প্রশমিত করেছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের

অবকাশ নেই। আসলে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে বামপন্থীরা তাকে শিক্ষামন্ত্রী করেছিল, শিক্ষক আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নেতা হিসাবে। দীর্ঘদিনের আন্দোলনের সহযোগী বামপন্থীদের এই চেষ্টাকে তাঁর পক্ষে প্রতিহত করা সম্ভবপর ছিল না। মন্ত্রী হবার পরেও শিক্ষক আন্দোলনের নেতা হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্রদের নিয়েই শিক্ষা। তাই শিক্ষার উন্নতি ও সম্প্রসারণ করতে হলে একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পদ্ধতি নূতন ভাবে জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচলন করা উচিত তেমনি শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চাকুরির নিরাপত্তা এবং তাদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। এই দাবির ভিত্তিতে দীর্ঘদিন তিনি সমিতির সম্পাদক ও সভাপতি রূপে সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। তিনি মনে করতেন যে, শিক্ষার ব্যয় দরিদ্র জনসাধারণের উপর চাপানো উচিত নয়। শিক্ষার সমগ্র ব্যয়ই দেশের সরকারকে বহন করতে হবে।[৩১] সমিতির আরো একজন নেতা ও সত্যপ্রিয় রায়ের দীর্ঘদিনের সহমর্মী ও সহযোদ্ধা গোলকপতি রায় এই মতামতের মধ্য দিয়ে মন্ত্রী সত্যপ্রিয় রায় এবং শিক্ষক নেতা সত্যপ্রিয় রায়ের চিন্তা চেতনার মধ্যে যে কোন পরস্পর বিরোধিতা ছিল না তা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছিলেন।

সত্যপ্রিয় রায় এর চিরকালের দাবি ছিল সরকারি মহার্ঘভাতা দেওয়ার ক্ষেত্রে, বিদ্যালয়ের একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী হতে প্রধান শিক্ষক সকলেই সমান হারে মহার্ঘ ভাতার দাবিদার হবেন। পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকার এই দাবি কোন দিনই মানেনি। অথচ যে 'প্রাইশ ইনডেক্স' এ ভিত্তিতে এই ভাতা দেওয়া হত তা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতেই স্থিরিকৃত হত এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাব স্তর নির্বিশেষে সকল কর্মচারীদের উপর সমভাবেই পড়ত। নিজে শিক্ষামন্ত্রী হবার পর সত্যপ্রিয় বাবু শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সবার জন্য সমহারে মহার্ঘভাতা দেবার বন্দোবস্ত করেন। এই টাকার অঙ্ক বেশি না হলেও বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী থেকে কলেজের অধ্যক্ষ পর্যন্ত একই হারে মহার্ঘভাতা পাওয়ার অধিকারী হন। মত ও পথের মধ্যে যে স্ববিরোধিতা অনেক সময়ই এককালের নেতা ও পরবর্তীকালের মন্ত্রীদের মধ্যে দেখা যায়—তার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম দেখা যায় সত্যপ্রিয় রায়ের চরিত্রে। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের জন্য তার জন্মলগ্ন থেকেই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। তা সত্ত্বেও যে কয়েক মাস তিনি মন্ত্রী হিসাবে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তার মধ্যেই শিক্ষকদের চাকুরির নিরাপত্তা বিধান এবং সাহায্যপ্রাপ্ত ও সাহায্যহীন বিদ্যালয়ের সর্বস্তরের কর্মীদের জন্য পেনশন দানের ব্যবস্থা করেন।[৩২] এছাড়া শিক্ষাকর্মীদের সন্তানদের মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করাও তার আরেকটি কীর্তি। শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে মাধ্যমিক স্তরের ক্রমোন্নতির দিকে শুধু নয়—প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষাস্তরের প্রগতির দিকেও দৃষ্টিপাত করেছিলেন তিনি। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রের পরিচালনার জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করার পাশাপাশি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনার নতুন বিধি তৈরি, কলেজ শিক্ষকদের নতুন বেতনহার চালু করেন তিনি। বর্তমান অভিসন্দর্ভে যার বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রী হবার ছয় মাসের মধ্যে আইনসভার সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক—তাই তখনো অবধি আইনসভার সদস্য না থাকা, সত্যপ্রিয় বাবু,

কমিউনিস্ট নেতা নিরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রয়াত হবার ফলে বিধানসভার টালিগঞ্জ কেন্দ্রের শূন্য আসনে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁর বিরোধী হিসাবে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র পেশ করেন, পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির নেতা বিষ্ণুব্রত ভট্টাচার্য। যাইহোক এই উপনির্বাচনে চব্বিশ হাজারের বেশি ভোটে কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করেন সত্যপ্রিয় রায়। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হলেও এই উপনির্বাচনে সত্যপ্রিয় বাবুর ভাবমূর্তি ও নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জনপ্রিয়তা, উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এই অঞ্চলের প্রচুর স্কুল কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত জনতার মধ্যে যে বর্তমান ছিল তা প্রমাণ করেছিল।

এই প্রসঙ্গে জ্যোতি বসু তাঁর একটি লেখায় সংক্ষেপে মন্ত্রী হিসাবে সত্যপ্রিয় রায়ের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'সত্যপ্রিয় রায় ১৯৬৯-৭০ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন। আমরা এক সঙ্গে কাজ করেছি। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের শিক্ষা সমস্যার খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কেও তিনি সব জানতেন। বেশি দিন এই সরকার কাজ করতে পারেনি। তবু অল্প সময়ের মধ্যেও তিনি অনেক কাজ করেছেন। নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষকদের অবস্থার পরিবর্তন করেছিলেন। সরকারকে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। যদিও সময় বিশেষ পাননি। অল্প সময়ের মধ্যে সরকারকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।.....আগামী দিনের শিক্ষা আন্দোলনের গতি প্রকৃতি নির্ধারিত হোক সত্যপ্রিয় রায়ের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে।'[৩৩] জ্যোতি বাবুর মতো মিতভাষী জননেতা তার এই স্বল্প বাক্যেই সত্যপ্রিয় রায়ের মন্ত্রিত্ব সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণাকে তুলে ধরেছিলেন এই লেখায়। এর মূল্য বড় কম নয়।

সত্যপ্রিয় মন্ত্রীসভার মসনদে আসীন হবার পরেও কিন্তু শিক্ষক সমিতি তার আন্দোলনমুখী চরিত্রকে বিসর্জন দেননি। রায় পরবর্তী সমিতির দুই শীর্ষনেতা অনিলা দেবী ও গোলকপতি রায়ের নেতৃত্বে শিক্ষক সমাজ, সংগ্রামের আয়ুধ কখনোই পরিত্যাগ করেন নি। যুক্তফ্রন্ট তার ঘোষিত শিক্ষা নীতিতে ঔপনিবেশিক শিক্ষা নীতিকে পরিত্যাগ করে জাতীয়, গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রাধিকার, অবৈতনিক শিক্ষা প্রদান, অগণতান্ত্রিক মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আইন প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবিতে তাই সমিতির লড়াই জারি ছিল।[৩৪] এই দাবিগুলোই ১৯৬৯-এ সমিতির কোলকাতা সম্মেলনের প্রতিনিধিরা সোচ্চারে তুলে ধরেছিলেন। এই কালবেলায় সমিতির এই সম্মেলনে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন বিশিষ্ট গান্ধীবাদী লেখক ও বুদ্ধিজীবী অন্নদাশঙ্কর রায়। না কমিউনিস্ট বা বামপন্থী কারোকে নয়—সভাপতি হিসাবে অন্নদাশঙ্করের নির্বাচনই বুঝিয়ে দেয় সমিতি তখনো তার দল নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি বিসর্জন দিতে রাজী ছিল না।

অন্নদাশংকর ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীর অনুগামী ছিলেন তবে ABTA-এর মধ্যে বামপন্থী ঝোঁক আছে, জেনেও তিনি ওই সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশ নিয়েছিলেন। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ নির্ণয় করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আধুনিক যুগোপযোগী ও মানবিকবাদী শিক্ষার পক্ষে তিনি সওয়াল করেছিলেন। ঔপনিবেশিক ধাঁচের শিক্ষা ব্যবস্থা যে স্বাধীন দেশে অচল, বিকল্প ব্যবস্থা চালু করা অতীব প্রয়োজনীয় এই

ছিল তার মত। তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করে তিনি বলেছিলেন, 'জনগণের চাই এমন এক শিক্ষা যাতে মাথার সঙ্গে সমানে খাটবে হাত।.....হাতের অনুশাসন ভুলে যায় তো খেতখামার কলকারখানা কোথাও কিছু গড়ে উঠবে না, উৎপন্ন হবে না। বাবু সমাজ মাথার অনুশীলন করে এই বুনিয়াদী সমস্যার সমাধান করতে পারবে না।'[৩৫] প্রসঙ্গান্তরে অন্নদাশংকর রায় আরো বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষা, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক এই ত্রয়ীকেই সমগুরুত্ব দিতে হবে। তৎকালীন পরিস্থিতিতে শিক্ষকরাও যে প্রকারান্তরে বিদ্রোহী নন, তা নয়। আমাদের রাজস্বের সিংহের ভাগ চলে যায়, সৈন্য ও পুলিশ বিভাগে। সে খরচ না কমালে শিক্ষার জন্য খরচ বাড়ানো শক্ত।'[৩৬] গান্ধীবাদী অন্নদাশংকর তাঁর বক্তৃতায় গান্ধীজীর উদ্ভাবিত 'বুনিয়াদী' শিক্ষারও প্রশংসা করেন। সম্মেলনে উপস্থিত শিক্ষকরা অবশ্যই ঋদ্ধ হয়েছিলেন তার ভাষণে।

যাইহোক, সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যের শিক্ষা ব্যয়ের অন্ততঃ ৬০% কেন্দ্রকে দিতে হবে এই দাবিতে ৬৯-এর ২৩ জুলাই এক বিরাট শিক্ষক মিছিল, বিধান সভা অভিমুখী অভিযানে লিপ্ত হল। যুক্তফ্রন্ট ঘোষিত অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে—এই দাবিতে ওই বছরেরই ১৩ আগস্ট সর্বস্তরের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যুক্ত কনভেনশন ডাকল নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি। এই যুক্ত কনভেন্শন-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে আদর্শ শিক্ষা কাঠামো প্রস্তুত করার স্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক, এই দাবিকে জোরদার করার লক্ষ্যে সর্বস্তরের শিক্ষক/শিক্ষিকারা—সংখ্যায় প্রায় দুই হাজার হবে, 'দিল্লী অভিযান' করলেন। যুক্তফ্রন্ট অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা প্রসারের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিলেও মন্ত্রীসভারই কোন কোন শরিকের উদাসীনতার ফলে সরকার গঠন করবার ৬ মাস পরেও তা দ্বিধাগ্রস্ত আলোচনা'র স্তরে থেকে গিয়েছিল। তাই এই দাবির স্বপক্ষে বড় আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষক সমিতির আহ্বানে ওই বছরেরই ৯ ডিসেম্বর চব্বিশটি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে কোলকাতায় আরো একটি কনভেনশন আহূত হয়েছিল। এই কনভেনশন থেকেই সমাজের সব অংশের মানুষের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে 'যুক্ত শিক্ষা সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয়েছিল।[৩৭] এই কমিটির আহ্বানে অবিলম্বে অষ্টম শ্রেণি অবধি বিনা বেতনে শিক্ষাক্রম চালু করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের শহর ও গ্রামে বহু সভা ও মিছিল সংগঠিত করেছিল এ.বি.টি.এ.। ১৯৬৯-এর ১৯ ডিসেম্বর হাজার হাজার মানুষের বিশাল মিছিল, মহাকরণের সামনে উপস্থিত হল। 'জনদরদী' মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু এই জনজমায়েতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোন আলোচনাতেই গেলেন না। ঐ একই দাবিতে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি চল্লিশটি গণসংগঠনের পক্ষে অসংখ্য মানুষ সমবেত হয়েছিলেন বিধানসভার সামনে। সেখানে নেতৃবৃন্দ জানালেন, 'শিক্ষামন্ত্রী প্রস্তাবিত নয় কোটি টাকা যদি কেন্দ্র দিত, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে ৭০ সাল থেকেই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করা যেত। ২য় যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বাংলা কংগ্রেস দলের অজয় মুখোপাধ্যায় শিক্ষামন্ত্রী সত্যপ্রিয় রায় রচিত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের পেনশন স্কিম' যদি চেপে না রাখতেন, তাহলে পেনশন বিধিও চালু হয়ে যেত।[৩৮] বহু অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ শিক্ষক সমাজ ক্রমশঃ বুঝতে পারছিলেন যে যতদিন যাচ্ছে, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের কিছু শরিকদল, তাদের গোষ্ঠী স্বার্থে

সাধারণ মানুষের শিক্ষা ও শিক্ষক কল্যাণ দাবি পরিপূরণের ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশ করছেন। যাইহোক শেষপর্যন্ত ১৯৭০-এর ১৬ মার্চ, অভ্যন্তরীণ কলহে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারেরও পতন ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে ১৭ মার্চ রক্তস্নাত হরতাল পালন করে।

পরবর্তীকালে শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সত্যপ্রিয় রায় মত প্রকাশ করেছিলেন, 'যুক্তফ্রন্ট শিক্ষা সম্পর্কে যে কর্মসূচী ঘোষণা করেছিল তাকে কার্যকরী করার জন্য আমি চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাকে কার্যকর করতে বিভিন্ন শরিক দলের মন্ত্রীরাই বাধা দিলেন।.....আমি প্রধানমন্ত্রীকে ৫ কোটি টাকা সাহায্যের জন্য চিঠি দিয়েছিলাম। জবাবে জানিয়ে দিলেন..... টাকা চাইতে হলে মুখ্যমন্ত্রীকে চাইতে হবে। মেয়েদের শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেবেন বলেছিলেন কিন্তু তাও চাইতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে। আমি মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের সেই চিঠি দেখাই। কিন্তু তারা এটা বুঝলেন না যে শিক্ষা না হলে মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে না। শিক্ষাই মানুষকে পরিবেশ পরিবর্তনে, পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তারে সাহায্য করেছে।.....চীন ভারতবর্ষের চেয়েও দরিদ্র ছিল। শিল্প ও চলাচল ব্যবস্থা ভারতের চেয়েও অনুন্নত ছিল। অথচ তারা কত দ্রুত উন্নতি লাভ করলো। শিক্ষার বিস্তার ছাড়া এই উন্নতি সম্ভবপর নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশে প্রতিটি মানুষকে সমাজ সচেতন করার জন্য শিক্ষিত করা হয়। আমরা যদি জীবনের সর্বক্ষেত্রে উন্নতি করতে চাই তাহলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনায় সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে। আমি একটি সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের খসড়া করেছিলাম। কিন্তু বিভিন্ন শরিকদলের মন্ত্রীদের বাধায় সেটিকে আইনে পরিণত করা যায়নি।'[৩৯] উদ্ধৃতিটি একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্তু এই উদ্ধৃতি সত্যপ্রিয় রায়ের শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তা চেতনাকে বিন্দুতে সিন্ধুর মতো তুলে ধরেছে। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের সময়কালে সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যতখানি করা সম্ভব তিনি তা করতে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারের কিছু শরিকদলের ভিন্ন মানসিকতা, তৎকালীন বাংলা কংগ্রেসের নেতা মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়ের অসহযোগিতা, তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেয়নি। সত্যপ্রিয় রায়ের এই আক্ষেপ উপরোক্ত উদ্ধৃতিতেই স্ফটিক স্বচ্ছের মতো পরিস্ফুট হয়েছে।

কমিউনিস্টরা ত্রিধাবিভক্ত ঃ কংগ্রেসেও বিভাজন

সত্যপ্রিয় রায় মনে করতেন, মন্ত্রিত্ব থেকে সমিতি বড়। তাই মন্ত্রী হিসাবে তাঁর কার্যকাল সমাপ্ত হলে তিনি আবার সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তবে এবার বাধা আসল অন্যদিক থেকে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি চিন-ভারত সীমানা বিরোধ ও ভারত রাষ্ট্রের এবং সরকারের শ্রেণি চরিত্র নিয়ে বিবাদের ফলে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। প্রথম দিকে এই দুই অংশই নিজেদের আসল কমিউনিস্ট পার্টি বলে পরিচয় দিত। সাধারণ্যে এবং সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় কংগ্রেস সরকারপন্থী কমিউনিস্টরা 'ডান কমিউনিস্ট' ও সেই সরকার বিরোধীরা 'বাম কমিউনিস্ট' নামে পরিচিত ছিল। পরে অবশ্য

প্রথমোক্ত দলটি সি.পি.আই. এবং দ্বিতীয়োক্ত দলটি সি.পি. আই. (এম) নামে পরিচিত হয়। ৬০-এর দশকে কংগ্রেসও দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পথে। এর একটি হল ইন্দিরা গান্ধীর গোষ্ঠী নব কংগ্রেস, রাজ্যে যার অন্যতম কর্ণধার ছিলেন চিত্তরঞ্জন দৌহিত্র সিদ্ধান্ত শঙ্কর রায়। পুরনো কংগ্রেস সেই সময় আদি কংগ্রেস নামে পরিচিত ছিল। কেন্দ্রীয় স্তরে এর নেতা ছিলেন নিজলিঙ্গাপ্পা, কামরাজ, সঞ্জীব রেড্ডী প্রমুখ নেতা। এই রাজ্যে দল চালাতেন প্রফুল্ল সেন, বিজয় সিং নাহার, প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র। রাজ্যে অবিভক্ত কংগ্রেসের 'বড়বাবু' অতুল্য ঘোষ অবশ্য এই সময় থেকে উপরোক্ত কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেষি করেন নি। তিনি এই সময়কালে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে অনেকটাই সরে আসেন। এ.বি.টি.এ. সম্বন্ধে তার অসূয়াসূচক মনোভাবের কিন্তু কোন পরিবর্তন হয়নি। তাঁর ভাষায়, 'বোধহয় ১৯২৭-২৮ সালে এ.বি.টি.এ.-র সৃষ্টি হয়। যারা সৃষ্টি করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম পুরোধা ছিলেন সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত। ওঁরা শিক্ষকদের দায়িত্ব কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করার জন্যই অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেছিলেন। তাঁরা তখন স্বপ্নেও ভাবেন নি যে, এ.বি.টি.এ.-র নামেও দলবাজি হবে।'[৪০] আমাদের ঐ বক্তব্য বিশ্লেষণ করে মনে হয় ABTA যে 'দলবাজে' পরিণত হল, তাঁর পিছনে অতুল্য ঘোষদের কংগ্রেসের অবদান বড় কম ছিল না।

কমিউনিস্ট পার্টিতে দ্বিতীয় ভাঙন ও শিক্ষক সমিতি

এবার আমরা ৬০-এর দশকের শেষার্ধে এবং ৭০-এর দশকের শুরুতে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ABTA তে তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবার পরে পরেই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে আবার একটা ভাঙনের সূত্রপাত হল। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে, কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ডাক দিল, উপরোক্ত দলের একটি উগ্র অংশ। হল নকশাল বাড়ির পুলিশ-কৃষক সংঘর্ষ। চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল প্রমুখের নেতৃত্বে গড়ে উঠল নতুন পার্টি—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) বা সি.পি.আই. (এম. এল.)। রাজ্য নেতৃত্বের বৃহৎ অংশটি এই নবগঠিত গোষ্ঠীর বিরোধিতা করলেও, সি.পি.আই. (এম)-এর রাজ্য নেতাদের মধ্যে সুশীতল রায় চৌধুরী, সৌরেন বসু, পরিমল দাশগুপ্ত কিংবা নির্মল মজুমদারের মতো নেতারা নতুন পার্টিকে সমর্থন জানালেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের পুরনো পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হল।[৪১] নতুন পার্টিকে স্বাগত জানালো চিনের কমিউনিস্ট পার্টি। নতুন এবং পুরনো পার্টির ক্যাডারদের মধ্যে সংঘর্ষও শুরু হয়ে গেল। প্রশাসনিক ব্যবস্থাও শুরু হয়ে গেল উগ্র বামদের বিরুদ্ধে। অঞ্জন বসু লিখছেন, 'এই কৃষক বিদ্রোহ দমন অভিযানে যুক্তফ্রন্ট পুলিশের কৌশল ছিল ত্রিমুখী (১) প্রচুর পুলিশ দিয়ে উগ্রপন্থী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি ঘিরে রাখা হবে এবং আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হবে আন্দোলনকারীদের। (২) কয়েকটি এলাকায় ব্যাপক অভিযান চালিয়ে এমন একটা পরিস্থিতি ও পরিবেশ তৈরি করা হবে যাতে অন্যত্র কৃষকদের মধ্যে একটি আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং (৩) আন্দোলনকারীদের পালাবার রাস্তা বন্ধ করা হবে।[৪২] তথাকথিত এই 'ভারতের বুকে বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ' এর কর্মসূচিকে প্রশমিত করবার জন্য মার্কসবাদী

কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার রাজনৈতিকভাবেও সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই হঠকারী আন্দোলনকে আর অগ্রবর্তী না হবার জন্য, হরেকৃষ্ণ কোঙার এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, '....এ কী ধাঁচের উদ্ভট বিপ্লবের ধারণা যেখানে পুলিশ—মিলিটারির সম্মুখীন হতে হবে না এবং সামান্য পুলিশ এলেই সে বিপ্লব হাওয়া হয়ে যায়, একেই বলে বিপ্লবের ছেলেখেলা। এই অতি বিপ্লবী বাক্যবাগীশেরা কৃষক সংগ্রামকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। একে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কায়েমি স্বার্থকে খোরাক জুগিয়ে দেয়েছে। নকশালবাড়ি ধারণা জঙ্গি গণসংগ্রামের প্রতীক নয়, এ হলো চরম দায়িত্বজ্ঞান হীন হঠকারিতা ও সংকীর্ণতার এক জগাখিচুড়ি।'[৪৩] অন্যদিকে নবগঠিত পার্টি যা নকশালপন্থী দল নামে পরিচিত ছিল, তাঁদের তখনকার অবিসংবাদিত নেতা চারু মজুমদারের মত ছিল, 'পার্টি নেতৃত্ব (সি. পি. আই. এম.) বিপ্লবী প্রতিরোধ' বা সশস্ত্র সংগ্রামের কথা শুনলেই হঠকারিতা বলে চিৎকার করে উঠছেন।'[৪৪] যাইহোক নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গিয়ে এই নকশাল আন্দোলন শেষ পর্যন্ত মনীষীদের মূর্তি ভাঙা, বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করবার প্রতীক হিসাবে স্কুল কলেজে অগ্নিসংযোগ এবং শ্রেণি শত্রুর রক্তে হাত রাঙানোর নামে অন্যদলের কর্মীদের খুন করবার যন্ত্রে পরিণত হয়েছিল।[৪৫] রাষ্ট্র শক্তিও পালটা আঘাত করতে দ্বিধাবোধ করেনি। জেল, জরিমানা, বিনা বিচারে পুলিশি অত্যাচার নকশালদেরও ক্ষতি করেছে। অন্য দলগুলির আক্রমণেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা। এই বিষয়টি আমাদের আলোচ্যের মূল ঘটনা নয়। তবে এই আন্দোলন, বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের নামে তখন শিক্ষকবৃন্দ বা তাঁদের সংগঠনের উপর যে আক্রমণ শানিয়েছিল, তার কিয়ৎ পরিমাণ বর্ণনা এই উপলক্ষ্যে করা যেতেই পারে। নকশালপন্থী নেতা কর্মীদের কিছু ক্ষেত্রে ত্যাগ ও আদর্শবাদের কথা মনে রেখেও আমরা বলতে পারি, ৬৯-এর শেষাধিকাল থেকে নকশাল ও কংগ্রেস বাহিনী, যাঁদের অনেক সময় 'কংশাল' বলে চিহ্নিত করা হত, তারা শিক্ষাক্ষেত্রকে প্রায় জঙ্গলরাজে পরিণত করেছিল। একদিকে অভ্যন্তর এবং বাইরে থেকে নানা চক্র এবং চক্রান্তে জনসাধারণের অন্যান্য অংশের সঙ্গে শিক্ষকদের উপরও নিপীড়ন নেমে এসেছিল। অন্যদিকে সমষ্টিগত ভাবে আমাদের সাংস্কৃতিক জগৎকে ধ্বংস করা হচ্ছিল প্রতি মুহূর্তে। নবজাগরণের যেসব নায়কবৃন্দ তাদের সমকালে হাজারো একটা প্রগতিশীল কাজকর্ম করেছিলেন, সময়ের নিরিখে অবশ্যই তাদের কর্মে কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। তাদের কালিমালিপ্ত করার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল এ. বি. টি. এ.। স্তব্ধ শিক্ষা জীবন এবং আচ্ছন্ন সেই চেতনার মধ্যেও শিক্ষক সমিতি ঘোষণা করেছিল 'শিক্ষা বাঁচাও, শিক্ষার দরজা উন্মুক্ত রাখো।' সেই আহ্বানে শিক্ষক সমাজের অধিকাংশই সাড়া দিয়েছিল। নির্বাপিতপ্রায়, শিক্ষা দীপগুলি জ্বালিয়ে রাখতে আমাদের গুরুকুল আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, সে দিনের সেই কালবেলায়। যাঁরা এগিয়ে গিয়েছিল অগ্রবর্তী বাহিনীর সৈনিক ও সেনাপতি হিসাবে, ঘাতকের অস্ত্রে তাঁদের উপরই প্রথম আঘাত নেমে এল। উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত হলেন, সমিতির স্বনামধন্য নেতা সন্তোষ ভট্টাচার্য। দুর্গাপুরে প্রধান শিক্ষক বিমল দাশগুপ্তকে পুড়িয়ে মারা হল। নির্বিরোধী ছাত্রপ্রেমী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপাল সেন আততায়ীর হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। বিরোধী পক্ষের হাতে নিহত হলেন শিক্ষক সত্য নারায়ণ সিংহ, দীপক মজুমদার,

নিরঞ্জন বসু, কণক কান্তি রায়, সুনীল মুখোপাধ্যায়, রবি বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাধীন ঘটক, সন্তোষ সরকার, সুশীল মৌলিক, সত্যপ্রসন্ন গোস্বামী, অনিল মহাপাত্র, অশোক রায়, শঙ্কর চক্রবর্তী, রঘুবীর যাদবের মতো শিক্ষক আন্দোলনের আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের নেতা কর্মীরা।[৪৬] সেই কালবেলায় শিক্ষক সমিতির মোট সাতাশ জন নিষ্ঠ কর্মী নিহত হলেন, শুধুমাত্র একটি বিশ্বাসে স্থিত হয়ে আন্দোলন করার জন্য।

ইতোমধ্যে ৭০ খ্রিস্টাব্দে সমিতির সম্মেলন আহূত হয়েছিল। আমরা তা আগেই উল্লেখ করেছি। লড়াকু নেতা সন্তোষ ভট্টাচার্য সমিতি গঠনতন্ত্রের সংশোধন পেশ করেছিলেন তখন। বিরোধী গোষ্ঠীর বাধা সত্ত্বেও অবিচলিত সন্তোষ বাবু বজ্র কণ্ঠে সেই সংশোধনীর পূর্ণ বয়ান পাঠ করেন। এই অসুবিধার মধ্যেও সমিতি তার আন্দোলনমুখিনতা বজায় রাখার স্বার্থে কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করে। সম্মেলনের ডাকে চার হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা গণতন্ত্র, শিক্ষা ও বৃত্তির দাবিকে সামনে রেখে ১৯৭০-এর ৬ মে থেকে মহাকরণের সামনে আটচল্লিশ ঘণ্টার গণ অবস্থান করেছিলেন। এর পাশাপাশি বিধানসভা বাতিল ও মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবিতে মাধ্যমিক শিক্ষক সমাজ অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুললেন। ওই বছরেরই একুশে জুলাই সরকারি মহার্ঘভাতা ও অনুদান অবিলম্বে প্রেরণের দাবিতে তিন সহস্রাধিক শিক্ষক/শিক্ষিকা/শিক্ষাকর্মী মহাকরণ অভিযান করেন। ২৬ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর সমিতির আহ্বানে ইতোমধ্যে অর্জিত রক্ষার দাবিতে সাতদিন ব্যাপী সফল কর্মবিরতি ও রাজভবনের সামনে অগণ্য শিক্ষকের অবস্থান সমিতির ঐক্যকে আরো সুদৃঢ় করে তুলেছিল। এই আন্দোলন দমন করার জন্য পুলিশ, গুণ্ডা ও বিভেদপন্থীরা যে ঘৃণ্য চক্রান্ত করেছিল তা মূল সমিতির শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরা তা ব্যর্থ করে, আন্দোলনকে বহুলাংশে সফলতার সিংহ দরজায় আনয়ন করেছিলেন। সমিতির তথাকথিত বিরোধীদের মোকাবিলা করবার মানসে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করলেন, 'অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া আর কোন বাঁচার পথ নেই।'[৪৭] গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তিতে আতঙ্কিত শাসক শ্রেণি এক নতুন পথ গ্রহণ করলেন। বামপন্থী রাজনীতির ছাপ দিয়ে শাসক শ্রেণি পশ্চিমবাংলার বুকে শুরু করল গুপ্ত হত্যা। সমিতিকে ভাঙবার জন্য, শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য বিদ্যালয়গুলোর ওপর শুরু হল হামলা। সমিতির কর্মীদের ওপর শুরু হল গুপ্ত আক্রমণ। প্রাণ দিলেন সমিতির কয়েকজন কর্মী। আহত হলেন অনেকে। পুলিশের দমননীতি বিভেদ পন্থীদের অনৈক্য সৃষ্টির অপচেষ্টা ও শাসক শ্রেণির পরিকল্পিত গুপ্ত হত্যা ও আক্রমণ ভাঙতে পারল না পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী শিক্ষকের মনোবল।[৪৮] পশ্চিমবঙ্গের তিন স্তরের শিক্ষকদের মঞ্চ 'যুক্ত শিক্ষা সংগ্রাম কমিটির' ডাকে ৭০-এর ১২ সেপ্টেম্বর এবং ২ ডিসেম্বর শিক্ষাগণতন্ত্রীকরণের জন্য কোলকাতায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। ওই বছরেরই ১৯ ডিসেম্বর রাজ্যের সর্বত্র মিটিং মিছিলে সমবেত হলেন শিক্ষকেরা। সমিতির আহ্বানে আমাদের রাজ্যে বিশেষ ক্ষেত্রে যে অগণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, বিদ্যালয়গুলির ধ্বংসসাধন ও শিক্ষকদের উপর যে হামলা চলছিল, ৭০-এর ২২ নভেম্বর কোলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের কেন্দ্রীয় কনভেনশনে তার তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হল।

চারদিকে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসের পরিপ্রেক্ষিতেও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হল শিক্ষক সমিতির প্রাদেশিক সম্মেলন। ইতোমধ্যে সমিতি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের অনুগামী হয়ে পড়েছে। তা সত্ত্বেও পূর্বের প্রথার ব্যতিক্রম না করে দলীয় কোন ব্যক্তি নয়, শিক্ষাবিদ ড. রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে সভাপতি নির্বাচিত করা হল এই সম্মেলনে। বিধানসভা নির্বাচনে অগণতান্ত্রিক ভাবে কোয়ালিশান সরকার গঠন, সন্তোষ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য সমিতি অন্তর্ভুক্ত শিক্ষকদের হত্যা করা, প্রভৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল সমিতি। উপরোক্ত বছরেই সমিতির আন্দোলনকে শুধু রাজ্যের রাজধানী কোলকাতায় সীমাবদ্ধ না রেখে, 'শিক্ষা বাঁচাও অভিযান ঘোষণা করে জেলাগুলিতে এবং মহকুমা মহকুমায় ১২ ঘণ্টা অবস্থান করলেন শিক্ষকেরা।

ইতোমধ্যেই সমিতির অন্তর্ভুক্ত এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দলের সদস্য, বিশিষ্ট নেতা সন্তোষ বাবুকে সমিতি বিরোধী শক্তির হাতে নিহত হতে হয়েছিল। শিক্ষক সমিতির অগণিত সদস্য হয় নিহত কিংবা আক্রমণের মাধ্যমে গুরুতর আহত হয়েছিলেন। সমিতির শীর্ষ নেতাদের মধ্যে গোলকপতি রায়, রথীন্দ্র কৃষ্ণদেব ও 'কংশালদের' হাতে লাঞ্ছিত ও আহত হয়েছিলেন। এমনকি সমিতির অবিসম্বাদিত নেতা সত্যপ্রিয় রায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দৈহিক আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। নকশালপন্থী গোষ্ঠীর মুখপত্র দেশব্রতী থেকে উদ্ধৃত করে অমলেন্দু সেনগুপ্ত দেখিয়েছেন, '৩১ জানুয়ারী ৭০' ডেবরা গোপীবল্লভপুরের সংগ্রামী কৃষকের রক্তমাখা হাত নিয়ে পৌরোহিত্য করতে দেব না। বিপ্লবী ছাত্রদের বিক্ষোভের মুখে শিক্ষামন্ত্রীর পলায়ন (সংবাদ শিরোনামা)। যুক্তফ্রন্ট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী সি. পি. এম.-এর পাণ্ডা ঝানু সংশোধনবাদী সত্যপ্রিয় রায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে উঠে কিছু বলতে না বলতেই শতশত বিপ্লবী ছাত্র প্রতিবাদ করে বজ্র কণ্ঠে শ্লোগান দিতে থাকেন। ডেবরা গোপীবল্লভপুরের কৃষকের রক্তমাখা হাত নিয়ে অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতে দেব না।...মন্ত্রীমশাই তার পার্টির ফ্যাসিস্ত যুবফৌজের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও আর বক্তৃতা চালিয়ে যেতে সাহস করে না। বক্তৃতা অসমাপ্ত রেখেই সে পালিয়ে যায়।'[৪৯] সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতার সঙ্গে নকশালপন্থীদের এই ব্যবহার সত্যপ্রিয় রায়কে আরো বেশি করে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সন্নিকটস্থ করে তুলেছিল, এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ক্রমশঃ তাঁর মনে হয়েছিল শিক্ষার মৌল পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং তা করতে পারে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণির পার্টি। ভারতবর্ষে অনেকগুলি কমিউনিস্ট এবং সমাজতান্ত্রিক দল থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন সি.পি.আই. (এম)-এর অনুরক্ত হয়েছিলেন, সেই বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে অবশ্যই। আমাদের মনে হয় তার উদারনৈতিক বুর্জোয়া মনোভাব, বিভিন্ন বামপন্থী গণসংগঠনের সংগ্রামী সহায়তায় পরিবর্তিত হচ্ছিল। অন্যদিকে বাস্তবগত ভাবে শিক্ষক সমিতির অভ্যন্তরেই তার সহকর্মী হিসাবে যে সমস্ত নেতা ছিলেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বা সহমর্মী। অমিতাভ সেনের লেখা থেকে আমরা জানি, 'যিনি (সত্যপ্রিয়বাবু) ৪৮-এ মজুরদের মতো পোস্টার দিতে রাজি হননি, তিনি ৭১ সালে নিজে আবেদন করলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সভ্য পদের জন্য। দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের শেষ দিন

পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি। বৃদ্ধ বয়স, ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে যখন তিনি আন্দোলন থেকে অবসর গ্রহণ করলেও কেউ আশ্চর্য হতেন না, সেই সময়ে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সাথে সভ্য হিসাবে যুক্ত হলেন। পার্টি শৃংখলা গ্রহণ করলেন এবং নিয়ম অনুযায়ী ছ মাস প্রার্থী সভ্য থেকে পূর্ণ সদস্যের মর্যাদা লাভ করলেন। পার্টির দুঃসময়ে, পার্টিতে এলেন যখন পার্টির উপর আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস ধেয়ে এসেছে।' তিনি বললেন, 'আমি শিখতে চাই, আরো শিখতে চাই।'[৫০] ABTA-এর শীর্ষ নেতৃত্ব তো বটেই, মাঝারি ও নিম্ন পর্যায়ের সদস্যরা সমিতিতে ভাঙন জনিত কারণে তখন মার্কসবাদী পার্টির সদস্য/সমর্থক—এবার তাঁদের শীর্ষ নেতৃত্ব মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হলে সর্বদলীয় মঞ্চ থেকে নিছক একটি রাজনৈতিক দলের গণসংগঠনে রূপান্তরিত হল, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি। ১৯৫৪-এর আন্দোলনে যে শিক্ষক সংঘ সর্বদলীয় সমর্থন প্রাপ্ত হয়েছিল, ৬৫তে সিপিআই (এম) প্রভাবিত বারোই জুলাই কমিটির সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তা একটি নির্দিষ্ট দলের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ৭১-এ মার্কসবাদীদের পক্ষ থেকে মানিকতলা বিধানসভায় নির্বাচিত হলেন সমিতির নেতৃত্ব অনিলা দেবী। এর পূর্বেই ৬৭-এর লোকসভা নির্বাচনে সত্যপ্রিয় রায় বামপন্থীদের সমর্থনে নির্বাচনে লড়েছিলেন। তারপরে ৬৯-এ শিক্ষামন্ত্রী ও টালিগঞ্জ কেন্দ্র থেকে সি.পি.আই (মার্কসবাদী) সমর্থনে বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হন তিনি। তার বিরোধীদের অন্যতম এক সময়ের মার্কসবাদী ও পরবর্তীকালে কংগ্রেস নেতা শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত জনৈক অধ্যাপক মার্কসবাদী পার্টির সঙ্গে সত্যপ্রিয় রায়ের ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে শ্লেষ ভরে লিখেছিলেন, 'যখন দেখলাম সত্যপ্রিয়বাবু পার্টিম্যান হয়ে গেলেন, মই বেয়ে উঠতে লাগলেন, আর ABTA ক্রমশঃ কমিউনিস্ট পার্টির আজ্ঞাবহ সংগঠন হয়ে উঠল, অর্থ ও ক্ষমতার পিছনে ছুটলো, তখনই ABTA সঙ্গে আমার আত্মিক যোগ নষ্ট হল। সত্যপ্রিয় বাবুর মতো মুক্তমনা, নির্দল মানুষ যখন সংকীর্ণতার ও মন্ত্রবদ্ধতার কুহকী রাজনীতিতে ঢুকলেন, তখন সত্যিই বিষণ্ণ বোধ করেছি।'[৫১] কিন্তু কোন্ পরিস্থিতিতে সংগঠনকে বড় করা ও শত্রুশক্তির আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য সত্যপ্রিয়বাবু প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ঢুকেছিলেন, তার বিশদ বর্ণনা লেখক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জানান নি। এই প্রসঙ্গে সমিতির তৎকালীন নেতা ও আগে থেকেই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য গোলকপতি রায়-এর জবানীতে আমরা সত্যপ্রিয় রায়ের মার্কসবাদী দলে যোগদানের ব্যাপারে কিছু কথা জানতে পারি যে সত্যপ্রিয় রায় বহুদিন ধরে অনুরোধ্য হয়েও পার্টি শৃংখলার কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ থাকবেন না বলে পার্টির সদস্য পদ নেননি।[৫২] তিনি শেষ পর্যন্ত বাস্তব পরিস্থিতির সামনে সেই পার্টিরই সদস্য হতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

সমিতির ভাঙনের সূচনা

১৯৬০-এর দশকে বামপন্থী কমিউনিস্টরাই আমাদের রাজ্যে শক্তিশালী ছিলেন। আর শিক্ষক সমিতির নেতৃত্ব হিন্দু মহাসভার হাত থেকে ক্রমশঃ বামপন্থীদের বা বিশেষ করে সি.পি.আই.এম.-এর করায়ত্ত হয়ে পড়েছিল। এই প্রসঙ্গে শিক্ষক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী

অনিলা দেবী বলেছেন, 'সমিতি গঠনের প্রথম ধাপে যাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই হিন্দু মহাসভার অনুগামী। সমিতি গঠনের কাজে তারা বিশেষ ভাবে আনুকূল্য লাভ করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন কর্ণধার শ্রদ্ধেয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নেতারাও কর্মসূচী গ্রহণে তাঁদের নির্দেশ অবশ্য পাল্য বলে মনে করতেন।'[৫৩] অবশ্য নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি তাদের দৈনন্দিন কার্যাবলী হিন্দু মহাসভার নির্দেশ অনুযায়ী পালন করতেন বলে অনিলা দেবী যা মন্তব্য করেছেন তা অত্যুক্তি দোষে দুষ্ট বলে মনে হয়। আমরা বড়জোর একথা বলতে পারি যে, ফজলুল হক যখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী (তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হত) তখন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গঠনের জন্য যে বিতর্ক হয়—তাতে সমিতি হিন্দু মহাসভার নীতির দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময়ও হিন্দু মহাসভার প্রোৎসাহে সমিতির সদস্য অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা বিশেষ করে প্রধান শিক্ষকেরা ছাত্ররা যাতে এই আন্দোলনে যোগদান না করে, সেই বিষয়ে সবিশেষ সচেষ্ট হয়েছিলেন। অবশ্যই বিপরীত ব্যতিক্রমও ছিল। যদিও তখনো অবধি অন্যান্য দলের সমর্থক শিক্ষক বা তথাকথিত 'অরাজনৈতিক শিক্ষকেরা' ও নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির বালার্ক লাঞ্ছিত পতাকার তলেই অবস্থান করছিলেন। প্রথম দিকে জ্যোতি বসু ও নিরঞ্জন সেনগুপ্ত মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। পরে সমিতির নেতৃত্বে উঠে আসেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট সদস্যত্রয় অনিলা দেবী, গোলকপতি রায় ও রথীন্দ্র কৃষ্ণদেব। পুরোপুরি না হলেও এটা বহুলাংশে সত্য যে শিক্ষক আন্দোলনের উদারনৈতিক 'Icon' সত্যপ্রিয় রায়ের ভাবমূর্তিকে সামনে রেখে অনিলা দেবীরা ক্রমশঃ স্বাধীন সত্তা বিশিষ্ট শিক্ষক সমিতিকে মার্কসবাদীদের গণ সংগঠনে পরিণত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির সাবেক সম্পাদক এবং এককালের কমিউনিস্ট নেতা সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণার কথা উল্লেখ করতে পারি। ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি অবধি সত্যপ্রিয় রায় দল নিরপেক্ষ ভাবেই শিক্ষক সংগঠনকে পরিচানার পক্ষপাতী ছিলেন। সতীন্দ্রবাবুর ভাষায়, '১৯৫১ সালে মাধ্যমিক শিক্ষকেরা মূলতঃ বেতন বৃদ্ধির দাবিতে বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলে। Dalhousie Square-এ অবস্থান ধর্মঘট হয়। কমিউনিস্ট পার্টির তরফে যে পরিচালনা কমিটি নেপথ্যে ছিল তাতে আমিও ছিলাম। তখন ABTA (All Bengal Teachers Association) ছিল মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রধান সংগঠন। আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন সত্যপ্রিয় রায়। সত্যপ্রিয় রায় তখনও কোন দলে যোগ দেননি। তখনও তিনি বিশ্বাস করতেন যে, গণসংগঠন হচ্ছে autonomous সংগঠন। কোন পার্টিরই গণসংগঠনে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।'[৫৪]

তবে এই বিষয়ে অনিলা দেবী বা সত্যপ্রিয় রায়কে এককভাবে দোষ দিলে সত্যের অপলাপ হবে। প্রতিষ্ঠার প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই হিন্দু মহাসভার লোকেরা এই প্রতিষ্ঠানের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজার রাখতে সচেষ্ট ছিলেন বলে অনিলা দেবী উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায় 'সমিতি গঠনের প্রথম ধাপে যাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন—তাঁরা প্রায়

সকলেই ছিলেন হিন্দু মহাসভার অনুগামী। সমিতি গঠনের কাজে তাঁরা বিশেষ ভাবে আনুকূল্য লাভ করেছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন কর্ণধার শ্রদ্ধেয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও পরবর্তীকালে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নেতারাও কর্মসূচী গ্রহণে তাঁদের নির্দেশ অবশ্য পালনীয় বলে মনে করতেন।'[৫৫] অথচ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে যখন পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি তাদের বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধক হিসাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, তখন স্পষ্টবাদী সত্যেন্দ্রনাথ তীব্র আপত্তি প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'তোমাদের পঃ বঃ প্রধান শিক্ষক সমিতি দলীয় রাজনীতিকর। আমি এরকম কোন প্রতিষ্ঠানে যাই না।' প্রধান শিক্ষক সমিতির তৎকালীন নেতা ঈশ্বরচন্দ্র প্রামাণিক বলেছেন যে তিনি বিজ্ঞানাচার্যকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, এই সমিতিতে সব রাজনৈতিক দলের শিক্ষক আছেন। কিন্তু অনৃত ভাষণে বিজ্ঞানাচার্যের মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি। স্বাভাবিক ভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে বাম নিয়ন্ত্রিত হলেও, গণ সংগঠন হিসাবে ABTA তে যতটা মুক্ত বাতাস প্রবাহিত হত—কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত প্রধান শিক্ষক সমিতিতে তার সিকি ভাগও ছিল না। বিজ্ঞানাচার্যের দৃষ্টিতেও তা সুস্পষ্ট ছিল।[৫৬]

স্বাভাবিকভাবেই ওইসব প্রাচীনপন্থী নেতারা কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচি ব্যতিরেকেই সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করেই ক্ষান্ত হতেন তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এমনকি ১৯৪৮-এর পর মূলতঃ সত্যপ্রিয় রায় এবং হীরেন্দ্রনাথ রায়, পুষ্পময়ী বসু, অনিলা দেবী প্রমুখের নেতৃত্বে সমিতি একটু বামঘেঁষা নীতি নিয়ে চলার চেষ্টা করলেও উদারনৈতিক কংগ্রেসি নেতা রাজকুমার চক্রবর্তী, হিন্দু মহাসভার নীহার দাস, আর সি. পি. আই.-র সুধাময় দাশগুপ্ত, আর. এস. পি.-র মাখন পাল, ফরোয়ার্ড ব্লকের নানু ঘোষ, এস. ইউ. সি.-র সুবোধ ব্যানার্জী প্রভৃতি নানা পথের নানা মতের নেতৃবৃন্দই শিক্ষক সমাজের এই মূল সংগঠনটির আন্দোলন এবং কার্যাবলীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বলাই বাহুল্য সংগঠনের মধ্যে প্রভাব বৃদ্ধি করতে সব দলই সর্বতোভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই সব দলগুলি কোন জাদুবলে এ.বি.টি.এ.-র সংস্পর্শ থেকে হটে গেল? প্রথম কথা, রাজকুমারবাবু, চারুচন্দ্র সান্যাল, জে. সি. গুপ্ত প্রমুখ উদারনৈতিক কংগ্রেসসেবীরা, তাদের দলেরই সরকারের মধ্যে নানা কারণে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। রাজকুমার বাবুর মতো প্রবীণ কংগ্রেসি যিনি, এমনকি পাকিস্তানের গণপরিষদে কংগ্রেস সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনিও অবশেষে বামপন্থী দলের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি '১৯৬৪ সালে তিনি নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির মনোনীত শিক্ষক প্রতিনিধি হিসাবে ২৪ পরগণার শিক্ষক কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটাধিক্যে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। কংগ্রেস মহলে তিনি বামপন্থী বলে অভিহিত হতে লাগলেন।'[৫৭]

শিক্ষক আন্দোলনে ভাঙনের পূর্বাভাষ

অন্য পার্টিগুলোও দেখতে পাবো, এ.বি.টি.এ.-র নেতৃত্ব পদ কব্জা না করতে পেরে, মূল সংগঠন ছেড়ে নিজ নিজ দলের নিজস্ব শিক্ষক সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব। আমরা একটু আগেই উল্লেখ করেছি সমিতির মধ্যে প্রথম বিভাজন

করে যে সংগঠন, স্বাধীনোত্তর বাংলায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, সেই পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি, যে আদ্যন্ত একটি কংগ্রেসি সংগঠন ছিল, তার প্রমাণ আমরা ওই সংগঠনের পত্রিকাতেই পাই। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আমরা সকলেই জানি শুধুমাত্র 'লাইব্রেরী/ল্যাবটরিতে' অ্যাকাডেমিক বিদ্যাচর্চায় মনোনিবেশ করে থাকতেন না। বিভিন্ন দেশপ্রেমিক সংগঠনের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করে, তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে দেশসেবার কাজেও অংশগ্রহণ করতেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ৫৪-এর ঐতিহাসিক সংগ্রামের পূর্বাহ্নে তিনি এমনকি নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির শিলিগুড়ি সম্মেলনের সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন। অথচ হেডমাস্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের কংগ্রেস ঘেঁষা মনোভাবের জন্য, তাঁদের সম্মেলনে তিনি যোগ দেননি, তখনো কিন্তু বামপন্থী বিশেষ করে কমিউনিস্টরা শিক্ষক সংগঠনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। তখনো কমিউনিস্টরা অন্যান্য দলভুক্ত যে সমস্ত মানুষ এ.বি.টি.এ.-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাদের মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। শুধু তাই নয় সমিতির প্রথম যুগের নেতা মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত যিনি কোন ভাবেই কমিউনিস্টপন্থী ছিলেন না, তাকে পরবর্তী কালে শুধুমাত্র সমিতির সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল তাই নয়—তাঁকে শিক্ষক কেন্দ্র থেকে বিধান পরিষদের সভ্য পর্যন্ত করা হয়। একটি স্মৃতিচারণায় তিনি বলেছিলেন, 'আমার নির্বাচনের কথা শুনতে চান? আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন শ্রী বিজন ভট্টাচার্য। কংগ্রেস প্রার্থী তিনি। ডাঃ বিধান রায়ের মতো ব্যক্তি তার সমর্থক। আর আমি তো সামান্য স্কুল শিক্ষক। কিন্তু আমি এ.বি.টি.এ-র প্রার্থী। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বাঙলা দেশের শিক্ষক সমাজ সমিতির আহ্বানে যথার্থ উত্তর দিল কংগ্রেসকে পরাজিত করে।' তিনি আরো বলেন, 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি এক অসাধারণ সংগঠন। বিশেষ করে শ্রী সত্যপ্রিয় রায় এবং অনিলা দেবীর নেতৃত্ব পেয়ে সমিতি দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করছে। শুধু ভারতে নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সমিতি আজ স্বীকৃতি লাভ করেছে।'[৫৮]

আমরা পূর্ববর্তী বর্ণনায় উল্লেখ করেছি যে ঠিক স্বাধীনতার পরাহ্নে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে শিক্ষক সমাজের ক্রম অগ্রগতিতে, নিজেদের প্রাধান্য হারাবার আশংকার কিছু প্রধান শিক্ষক মিলে, প্রধান শিক্ষক সমিতি নামে, এ.বি.টি.এ.-র প্রতিদ্বন্দ্বী একটি শিক্ষক সংগঠন গড়ে তোলেন। তখন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে এবং কর্মধারায় এক নতুন পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। স্বভাবতঃই সমিতির এই সংগ্রামমুখিনতা, সদ্য ক্ষমতার কুর্সীতে আসীন কংগ্রেসের কাছে প্রীতিপদ হয়নি। তাই তাঁরা প্রথম থেকেই প্রধান শিক্ষক সমিতিকে মদত দিয়ে এসেছিল। আমরা দেখতে পাই, যখন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি ৫০-এর দশকে ক্রমশঃই শিক্ষা ও শিক্ষকের দাবি নিয়ে আন্দোলনমুখী হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন তখন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের তাত্ত্বিক জগতে নিজেদের কর্মপরিসরকে আবদ্ধ করে রাখছে। এ যেন সেই বহুচর্চিত সেফ্‌টি ভাল্‌ভ' তত্ত্বের নবরূপায়ণ—প্রধান শিক্ষক সমিতি তাত্ত্বিকতার বেড়াজালে শিক্ষকদের ক্ষোভকে আটক রাখতেই এই সময়ে সদা সচেষ্ট ছিল বলে মনে হয়। প্রধান শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক পৃথ্বীশ বসু ও পরোক্ষভাবে এই সমালোচনাকে তার স্মৃতিচারণে স্বীকার করেছেন। '১৯৫০ সালের মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ আইন অনুসারে ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গঠিত হয়।

ঐ বছরই পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি রাজ্য সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন লাভ করে। সমিতির কর্মকর্তারা এর পর থেকে শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে বহু আলোচনাচক্র ও কর্মশালার আয়োজন করেন। ঐ সব আলোচনা চক্র ও কর্মশালার সুচিন্তিত সিদ্ধান্তসমূহ রাজ্য সরকার ও পর্ষদের কাছে তাঁরা পেশ করেন।'[৫৯] ১৯৫২-তে ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক আয়োজিত সর্বভারতীয় প্রধান শিক্ষকদের সম্মেলনে—প্রধান শিক্ষক সমিতির তদানীন্তন সম্পাদক ধরণী মোহন মুখোপাধ্যায় অংশ নেন। পরবর্তীকালে দার্জিলিং-এ অনুষ্ঠিত পূর্বাঞ্চলের আলোচনাচক্রে জ্যোতিবিকাশ মিত্র ও ধরণীবাবু অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে সারা বাংলার শিক্ষকেরা মাঠে ময়দানে সংগ্রামে অংশ নিচ্ছেন। তখনও প্রধান শিক্ষক সমিতি বিদ্যালয়ের সিলেবাস নিয়ে ঠাণ্ডা ঘরে আলোচনায় মগ্ন। পৃথ্বিশবাবুর লেখা থেকে আমরা আরো জানতে পারি, 'গত পঞ্চাশ বছরে শিক্ষক আন্দোলনের ফলে শিক্ষার উৎকর্ষ বাড়েনি। বিদ্যার্থীদের মধ্যে শ্রমমর্যাদা তো দূরের কথা, আত্মমর্যাদা হারিয়ে গেছে। শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত শিথিল হয়েছে। ত্যাগ ও সেবার ভাব বিন্দুমাত্র বাড়েনি। শিক্ষার নৈতিক পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। স্বাধীন চিন্তার স্থান নেই। এমন আন্দোলনের সার্থকতা কোথায়? গত পঞ্চাশ বছর শিক্ষকেরা যে আন্দোলন করেছেন তা তেল, নুন, লকড়ির জন্য। বেতন বাড়াও, মাগ্গী ভাতা বাড়াও, পেনশন দাও, গ্র্যাচুয়িটি দাও। অর্থাৎ সর্বদাই চাই-চাই রব।'[৬০] পৃথ্বিশবাবুর বক্তব্য যেন পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারের মতামতের অনুরণন মাত্র। প্রধান শিক্ষক সমিতি, অর্থনীতিবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের অভিযোগে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির নিন্দাবাদ ছাড়া আর কিছুই করেনি। আমাদের আলোচ্য সময়কালে, বাস্তব অবশ্য অন্য কথা বলে। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি 'রাস্তাই একমাত্র রাস্তা' অর্থাৎ মাঠে ময়দানে লড়াই করেছিল ঠিকই কিন্তু তাদের নেতারাও শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিশন/কনফারেন্সে অংশ নিয়েছেন। ভারত, বিশেষ করে বাংলার শিক্ষক সমাজ ও শিক্ষা পরিবেশের ক্রমোন্নতি নিয়েও নিজেদের মতামত জানিয়েছে। ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আন্তরিক যোগাযোগকে সম্বল করে তাঁরা নিজেদের আন্দেলনে ছাত্রদের সমর্থন আদায় করেছে। অর্থাৎ প্রধান শিক্ষক সমিতির বিপরীতে তারা তাঁদের সংগ্রামে ও কর্মের সংমিশ্রণ ঘটাতে সমর্থ হয়েছে। প্রধান শিক্ষক সমিতি ধরণীবাবু থেকে বিষ্ণুব্রত ভট্টাচার্যের সময় পর্যন্ত কিন্তু তাদের দাবি পূরণের জন্য সেভাবে মাঠে ময়দানের লড়াইতে নামেনি। একমাত্র রাজ্যে বামপন্থী সরকারের প্রতিষ্ঠার পর, তারা সরকারের শিক্ষানীতির অন্তর্ভুক্ত, প্রাথমিক শ্রেণিতে ইংরাজি উঠে যাওয়া বা পাস-ফেল প্রথার অবসানের জন্য কিছু আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল—যা আমাদের আলোচ্য সময়ের আলোচনা বহির্ভূত। এই ভাবে প্রধান শিক্ষক সমিতি সীমিত ভাবে হলেও সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলনের শক্তির কিছুটা ক্ষয়ীভবন অবশ্যই করেছে।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিতে দ্বিতীয় বিভাজন আসে ১৯৫৪-এর ঐতিহাসিকগণ আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই। শিক্ষকদের সংঘবদ্ধ সংগ্রামের সাফল্য তৎকালীন কংগ্রেসের সরকারের হৃৎকম্প বৃদ্ধি করে দেয়। ততদিনে বিভিন্ন দলভুক্ত বামপন্থীরা তাদের কূটনৈতিক কৌশল ও আন্দোলনের অন্দরে প্রবেশের মাধ্যমে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির মধ্যে তাদের

প্রভাব বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই ১৯৫৪-এর ঐতিহাসিক বারো দিনের সংগ্রামে ভীত হয় পড়েছিল বিধানচন্দ্র রায়ের কংগ্রেস সরকার। তারা এটা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল যে, শুধুমাত্র লাঠি-গুলি-জেল-জরিমানার মাধ্যমে শিক্ষকদের সংগ্রামের এই জলতরঙ্গ রোধ করা সম্ভব হবে না। উপায়ন্তর না দেখে তারা ইংরেজ আমলে স্বাধীনতার মহান সংগ্রামকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে, নানা জাতির মধ্যে 'Divide and rule' নীতির পন্থাকে অনুসরণ করে, শিক্ষক সংগঠনে ভাঙন সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সরকারি ক্ষমতাকে সম্বল করে ৫৪-এর আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই, শিক্ষকদের দাবি দাওয়া মেটাবার প্রতিশ্রুতি রাখার ক্ষেত্রে টালবাহানা করতে উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। সমিতির তৎকালীন নেতৃত্ব মীরা চ্যাটার্জীর কলম থেকে আমরা জানতে পারি, 'সরকার তার কথা রাখেনি। যে দাবিদাওয়া সে মেনে নেবে বলেছিল সে সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্যই করল না। মহাকরণে তাঁর (বিধানচন্দ্র) সঙ্গে দেখা করতে গিয়েও নেতারা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলেন। সরকার আমাদের উপেক্ষা করলো। উপরন্তু প্ররোচনা দিল সমিতির সংহতিতে ফাটল ধরাবার। কর্মবিরতির পরেই বহরমপুরে সমিতির বার্ষিক সম্মেলন হয়। সেখানে অবিভক্ত সমিতির একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা বামনদাস মণ্ডল শাসক কংগ্রেস সদস্য এবং সমর্থক শিক্ষকদের নিয়ে অবিভক্ত সমিতির সদস্যপদ ত্যাগ করে একটি নতুন সমিতি গঠন করলেন। এই সংগঠনের নাম দেওয়া হল 'পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি।'[৬১] কংগ্রেস অভিযোগ করতো যে, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির মধ্যে বামপন্থীরা ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করছে। এর মধ্যে কিছুটা সত্য অবশ্যই ছিল। বাংলার ইতিহাসের গতিপথে কমিউনিস্ট পার্টি তথা বামপন্থীদের কাছে সেই সময়টা ছিল 'স্বর্ণযুগের কাল'। ট্রাম শ্রমিকদের, ডাক ও তার বিভাগের, উদ্বাস্তুদের, খাদ্য সংকটে জেরবার আপামর সাধারণ মানুষের, মূক মুখকে মুখর করে তুলেছিল এই বামপন্থীরা। আর শিক্ষকরাও তো ছিলেন এই বৃহৎ জনগণেরই শরিক। তাই তাঁদের আন্দোলনে বামপন্থী প্রভাব পড়ার ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক কিছুই ছিল না। ১৯৫৪-তে বিরূপ সরকারের সঙ্গে শিক্ষকদের দাবিসমূহ নিয়ে দর কষাকষির সময়েও যেমন, তেমনি দুইটি যুক্তফ্রন্টের স্বল্পকালীন শাসনের সময়ে বামপন্থীরা শিক্ষকদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তা উদ্দেশ্য তাঁদের যাই থাক না কেন। অন্যদিকে ছেঁড়া পাঞ্জাবি ও ভাঙা ছাতায় সজ্জিত আমাদের গুরুকুলকে 'সেবাব্রতের সৈনিক' হিসাবে চিহ্নিত করে কংগ্রেসি সরকার তাদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার প্রতি উদাসীন ছিলেন। তাই তৎকালীন সরকারের মদতপুষ্ট পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি ব্যাপকভাবে শিক্ষকদের সমর্থন লাভে বঞ্চিত হয়েছিল। পরিশেষে একটি কাগুজে সংগঠনেই পরিণত হয় তাঁরা। তাই সমিতির মধ্যে বামপন্থীদের দলতন্ত্রের অভিযোগ তুলে ধরেন যারা, তাদের মনে রাখতে হবে এই অভিযোগ সত্য হলে, কংগ্রেসসেবী হাতে গোনা শিক্ষকের মূল সমিতি থেকে বার হয়ে যাওয়াও এই দলতন্ত্রের প্রভাবেই সম্ভাবিত হয়েছিল। এই দল ভাঙাভাঙি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এককালের সমিতি নেতৃত্ব অরুণ চৌধুরী বলেছিলেন, 'চুয়ান্নর এই আন্দোলন শিক্ষকদের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রইল না, তা এক গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত হল। শিক্ষার দাবি জাতীয় দাবিতে রূপান্তরিত হল..... সমিতির অভ্যন্তরে আন্দোলন বিমুখ অংশ কোণঠাসা হয়ে

গেলেন। তাঁদের অন্যতম নেতা বামনদাস মণ্ডলকে সামনে রেখে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে শিক্ষক আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে জীইয়ে তোলা হল।'[৬২] অবশ্য এই বিভাজনে বাস্তবে মূল সমিতির কার্যগত কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু এই ভাঙন, সর্বদলীয় মঞ্চ হিসাবে সমিতির নৈতিক জোরকে যে অনেকখানি হ্রাসপ্রাপ্ত করেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

'সব শিক্ষকের মঞ্চ' নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জীবনে তৃতীয় ধাক্কাটি এসেছিল ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে, যখন ভারত-চিন সীমানা সংঘর্ষ নিয়ে দেশ উত্তাল। প্রধানতঃ এই কারণে কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙনের মুখে। তখন এই সীমানা বিরোধ নিয়ে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির মধ্যেও একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। সমিতি তখনো দল নিরপেক্ষ ভাবে এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে, নিজেদের মত জানাতে দ্বিধাবোধ করেনি। বাম কমিউনিস্ট নেত্রী হয়েও বিধান পরিষদের শিক্ষক সমিতি সমর্থিত প্রার্থী অনিলা দেবী তাই পরিষদের অধিবেশনে বলতে দ্বিধা বোধ করেননি যে, শিক্ষকেরা 'কোন চাপে পড়ে নয়, কোনো ভয়ে নয়, কোনো সমালোচনার জন্য নয়—তাঁরা বিশ্বাস করেন দেশ তাঁদের সবচেয়ে বড়, তাঁরা বিশ্বাস করেন মাতৃমর্যাদা সবচেয়ে বড়। অতীতে তাঁদের জীবিকা শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা সরকারের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে। তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের দাবি দাওয়া নিয়ে। কিন্তু আজ যখন সমগ্র দেশের দাবি এক, আমার মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্য, আমার প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য যখন মাতৃভূমির সমস্ত অমর্যাদা দূর করে পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা, তখন সরকারের লক্ষ্যের সঙ্গে শিক্ষক সমাজের লক্ষ্যের কোন সংঘাত নাই।'[৬৩] আইনসভার কংগ্রেস সদস্য রবীন্দ্রলাল সিংহ এর অব্যবহিত পূর্বে দেশবিরোধী হিসাবে সমিতির অন্তর্ভুক্ত শিক্ষকদের চিহ্নিত করে, তাদের স্থান নর্দমায় বলে, শ্লেষ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর বিনম্র জবাব দিয়ে ওই বক্তৃতায় অনিলা দেবী আরো বলেছিলেন, 'আমার যে ভারতবর্ষ কর্মজ্ঞানের জননী, আমার যে ভারতবর্ষ ধর্মধ্যানের ধাত্রী, আমার যে ভারতবর্ষের প্রতি তৃণের উপর দেবতার আশীর্বাদ, সেই ভারতবর্ষের জয়ধ্বনিকে আরো ব্যাপক করবার জন্য তাঁর প্রস্তাবকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থনই শুধু নয়, সর্বান্তঃকরণে সংকল্প গ্রহণ করে এই কথা বলেই শেষ করতে চাই এই ভারতবর্ষের জয়ধ্বনি দিকে দিকে উঠুক। আমাদের নেতা ও পথপ্রদর্শক হিসাবে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী যে উদাত্ত আহ্বান দিয়েছেন, সেই ধ্বনি হচ্ছে জয় হিন্দ। সেই জয় হিন্দ ধ্বনি আমার, সমস্ত শিক্ষক সমাজের। জয়হিন্দ।'[৬৪] উগ্র জাতীয়তাবাদ নয়—দেশপ্রেমের সামগানই সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল রাজ্য আইন সভায়। তা সত্ত্বেও চিন-ভারত বিরোধকে পুঁজি করে কংগ্রেস ও অন্যান্য কিছু দক্ষিণপন্থী দল কুৎসা রটনা শুরু করল। কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষিকাকে দিয়ে গড়ে তোলা হল কাগুজে সংগঠন 'Democratic Teachers Front'। কতিপয় শিক্ষক, শাসক শ্রেণির একদল সশস্ত্র গুণ্ডাকে নিয়ে ৬২-এর ৮ নভেম্বর সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা চালাল। কার্যালয়ে তখন সত্যপ্রিয় রায় ছাড়াও, গোলোকপতি রায়, অনিলা দেবী, সন্তোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ সমিতির শীর্ষ স্থানীয় নেতা/নেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। সমিতির কার্যালয় দখল করতে উদ্যত এই গুন্ডারা জোর করে সত্যপ্রিয় রায়কে দিয়ে সমিতির পদাধিকারীর পদ থেকে পদত্যাগ করাতে উদ্যোগী হলে, রুখে দাঁড়ালেন তিনি। বজ্রস্বরে তিনি বলেছিলেন,

'আমার দেহে প্রাণ থাকতে আপনাদের কথায় সায় দেব না।'[৬৫] যাইহোক প্রসঙ্গে ফিরে আসি। উগ্র জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা, এই ডেমোক্রেটিক টিচার্স ফ্রন্টও বেশি দিন তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেনি। সমিতির সাম্য ও ঐক্য বজার রাখতে বেশির ভাগ সাধারণ শিক্ষকই উৎসুক ছিল। সমিতি শান্তিপূর্ণ আলোচনার মধ্য দিয়ে ভারত-চিন সীমানা সংঘর্ষের যে প্রস্তাব জনসাধারণের কাছে রেখেছিল, তাকে সমর্থন করেছিলেন তাঁরা।

এর সঙ্গে এটাও অবশ্য সত্য কথা সমিতির যত করে কংগ্রেস বা নকশালদের আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছিল, ততই তা সাংগঠনিক ভাবে বামপন্থীদের বা বিশেষ করে তাঁদের বড় শরিক মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের কাছাকাছি চলে আসছিল। অনেকটা বাধ্য হয়েই। আর সমিতির শীর্ষপদগুলিও ক্রমশঃ উক্ত রাজনৈতিক দলের 'ক্যাডার'দের করায়ত্ত হয়ে উঠছিল। সত্যপ্রিয় পরবর্তী যে সব নেতা সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্রমশঃ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিলেন, তার মধ্যে 'থ্রি কমরেড্স, অনিলা দেবী, গোলকপতি রায় ও সন্তোষ ভট্টাচার্যের কথা আমরা স্বতঃই উচ্চারণ করতে পারি। এছাড়া কিছু পরে রথীন্দ্রকৃষ্ণ দেবও এদের সারিতে পা মেলান। তাছাড়া যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে স্থায়ী ও জনকল্যাণকামী একটি সরকার উপহার দিতেও উপরোক্ত ফ্রন্ট বহুলাংশে ব্যর্থ হয়। বামপন্থীদের দলাদলি সজ্ঞাত পারস্পরিক এই অবিশ্বাসের আবহাওয়া শিক্ষক সমিতির মধ্যেও ছাপ ফেলে।

প্রসঙ্গ ঃ চন্দননগর সম্মেলন—শিক্ষক আন্দোলনে চূড়ান্ত ভাঙন

দেখতে দেখতে চলে আসে সমিতির পঁয়তাল্লিশতম অধিবেশনের সময়। স্থান চন্দননগর। এই অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হলেন ড. হীরেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়। সুনীল ঘোষের লেখায় আমরা পাই, 'যে সব অশুভ বুদ্ধি ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যুক্তফ্রন্ট ভাঙার পিছনে সাহায্য করলেন, তাঁরাই সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের অংশীদার নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির মধ্যে বিভেদ আনবার চক্রান্ত শুরু করলেন।'[৬৬] এদিকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ আমাদের রাজ্যে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের বকলমে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হল। শিক্ষক সমিতিতে তখন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিরই প্রাধান্য। যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি শিক্ষক সমিতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে অপারগ। এদিকে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের অর্জিত অধিকারগুলির উপর সরকারি কর্তৃপক্ষের আক্রমণ পুনরায় শুরু হল। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি গোদের উপর বিষফোঁড়ার ন্যায় নকশালপন্থীদের সমিতির উপর আক্রমণও সেই সময় ক্রমবর্ধমান। এই সাঁড়াশি আক্রমণের প্রভাবে সত্যপ্রিয় রায় সমিতি বাঁচাবার জন্য মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হতে বাধ্য হয়েছেন। যার বিশেষ উল্লেখ আমরা নকশালপন্থী আন্দোলন ও সমিতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে আগেই করেছি। সেই সময় সম্বন্ধে পুরুলিয়া জেলার অন্যতম নেতা শক্তিপদ সাহানীর এক সাক্ষাৎকার থেকে আমরা জানতে পারি, ''চন্দননগর সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য এই যে শিক্ষকগণের একটা ছোট প্রতিক্রিয়াশীল অংশ তাকে বানচাল করবার সক্রিয় চেষ্টা চালান। পূর্ব ষড়যন্ত্র অনুযায়ী সম্মেলনের কাজ শুরু হতে না হতেই প্রায় বিনা কারণে কয়েকজন রাজনৈতিক শিক্ষক' সম্মেলন মঞ্চ থেকে বার হয়ে যায়। দলীয় রাজনীতির নগ্নরূপ খুববেশি প্রকট হয়ে পড়ে।''[৬৭] ১৯৭০-এর

চন্দননগর সম্মেলনে সমবেত প্রায় ছয় হাজার প্রতিনিধিদের মধ্যে তিনশোর মতো প্রতিনিধি সম্মেলন ত্যাগ করেন। পরে এরা STEA গঠন করেন। বাঁকুড়া জেলার মতো কিছু জেলায় ABTA-র এই আণুবীক্ষণিক অংশ কিছুটা ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ দেখাতে সক্ষম হন। বাঁকুড়ার নেতা মুক্তি দাশগুপ্তের বর্ণনা অনুযায়ী, সমিতির জেলা সভাপতি সুধেন্দু দাসকে সমিতির এই বার হয়ে যাওয়া অংশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য বহিষ্কারও করা হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে চন্দননগর সম্মেলন আয়তন এবং প্রতিনিধি সংখ্যার দিক থেকে বৃহৎ আকারে আয়োজিত হয়েছিল। আসলে সম্মেলনে বিশাল সংখ্যক বামমার্গী শিক্ষকের উপস্থিতি, অন্যান্য দলের শিক্ষক নেতাদের বিহ্বল করে তোলে। 'কিল খেয়ে কিল হজম' মতো তারা দেখতে পেয়েছিলেন যে সংগঠন তখন আর নির্দলীয় স্বাধীন সংগঠন নেই। শীর্ষ থেকে মহকুমা সব স্তরের কমিটির বেশির ভাগ নেতৃত্বই মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের করায়ত্ত হয়েছে। এমনকি উদারনৈতিক বুর্জোয়া সত্যপ্রিয় রায় অবধি মার্কসবাদী পথের আনুষ্ঠানিক ভাবেই, অনুসারী হয়ে গেছেন। যাক্ সে কথা। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির চলার পথের প্রাথমিক পর্বে হিন্দু মহাসভার একটা প্রভাব ছিল। সেটা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আবার অনেক কংগ্রেসপন্থীরাও প্রাক্ স্বাধীনতাপর্বে সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৮ থেকে ৬২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই তাঁরা সমিতি ছেড়ে বার হয়ে নতুন সংগঠন করেন। এদিকে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে যাঁরা সংগ্রামী ভূমিকার অঙ্গনতলে আনয়ন করতে সচেষ্ট ছিলেন, তাদের মধ্যে রাজনীতিগতভাবে মূলতঃ ছিলেন বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতিভূরা। দুই কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়াও স্যোস্যালিস্ট, প্রজা সোস্যালিস্ট, বলশেভিক পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি., আর. এস. পি. প্রভৃতি দলভুক্ত শিক্ষকরা একত্রে স্বাধীনোত্তর পর্বে বিশেষ করে ১৯৫৪ এবং ১৯৬৬-এর তীব্র আন্দোলনে সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭০-এর পর, যুক্তফ্রন্টের গুরুত্ব অনেক পার্টিই অনুধাবন করতে সক্ষম হল না। দলগুলোর হাল হল, 'বারো রাজপুত্রের তেরো হাড়ির মতো'। এই অবস্থার প্রভাব অন্যান্য গণসংগঠনের মতো শিক্ষকদের সংগঠনেও পড়েছিল। তাই যুক্তফ্রন্টের ১৯৬৭ এবং ৬৯-এর তিক্ততার প্রতিফলন হিসাবে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দেই নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির চন্দননগর সম্মেলন সমিতির মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অনুগতরা ছাড়া অন্যান্য বামপন্থীরা এস.টি.ই.এ নামে একটি সংগঠনের সৃষ্টি করলেন। অনেক কংগ্রেসীও যোগ দিলেন ওই সংগঠনে। শিক্ষাবিদ অরুণ চৌধুরীর অসামান্য ভাষায়, 'ওই নতুন সংগঠনে, সি.পি.আই ও কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃত্বের মুড়োটা ভাগাভাগি হল। অন্য বামপন্থীরা পেলেন লেজটা।'[৬৮] চন্দননগরেই ABTA ছেড়ে বার হয়ে যাওয়া সদস্যরা বিকল্প সম্মেলন করে। তবে শিক্ষককুলের বেশির ভাগ নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিতেই থেকে যায়। যাই হোক মূল সমিতির মঞ্চ থেকে সত্যপ্রিয় রায় সেদিন বলেছিলেন, 'ঐতিহাসিক কারণেই আজ যাঁরা STEA গঠন করছেন, ঐতিহসিক কারণেই শ্রেণিগত আন্দোলনে শিক্ষক সমাজের অংশগ্রহণে সেই STEA বিলুপ্ত হয়ে যাবে।'[৬৯]

এখন দেখতে হবে অন্ততঃ আনুষ্ঠানিক ভাবে, কোন অজুহাতে কংগ্রেস ও নানা বামগোষ্ঠীরা STEA-এর মধ্যে হাতে হাত মেলাল। এই গোষ্ঠী বলল যে, সমিতি নেতৃত্ব কেন সদস্যদের

প্রতি ফ্রন্ট সরকার ভাঙার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সক্রিয় ভূমিকা নেবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কেনই বা তারা মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবি তোলার ডাক দিয়েছেন। এতে সমিতির গণফ্রন্ট হিসাবে স্বাধীন সত্তা নষ্ট হয়েছে বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেন। অন্যদিকে সমিতির মার্কসবাদী পার্টির নেতারা এর উত্তরে বলেন, যে গণতন্ত্রের প্রতি অমর্যাদার প্রতিবাদ সমিতি অতীতে বহুবার করেছে এবং মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবিও তাঁরা এই প্রথম করছেন না। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভাঙ্গা হলে সমিতি অনুরূপ ভূমিকাই গ্রহণ করেছিল। তখন কিন্তু বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী কোন প্রতিবাদ প্রণয়ন করেনি। শিক্ষক সমিতির শীর্ষ নেতৃত্ব আরো জানিয়েছিল, সদস্যদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে শিক্ষক সমিতির কোন নিষেধ বিধি থাকা যেমন অনুচিত, তেমনি তাদেরও অবশ্য কর্তব্য শিক্ষা ও শিক্ষক কর্মী সমাজের কল্যাণ পরিপোষক রাজনীতির স্বপক্ষে নির্দ্বিধায় কথা বলা।[৭০]

পরবর্তীকালে অবশ্য বহু শিক্ষক পার্টিগত আনুগত্যের প্রমাণ দিয়ে STEA পরিত্যাগ করে। আর. এস. পি., ফরোয়ার্ড ব্লক, এস. ইউ. সি., সি. পি. আই. প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলগুলির নিজস্ব শিক্ষক সংগঠন গড়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে বাম শিক্ষক নেতা নিতাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা থেকে আমরা এই বিভেদ প্রবণতার একটি দিক দেখতে পারব। তিনি লিখেছেন, '১৯৭০ সালে চন্দননগরে এ.বি.টি.এ. সম্মেলনে ব্যাপক বাক বিতণ্ডার পরে শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের একটি অংশ সেই সম্মেলন থেকে বেরিয়ে আসে। আমি অবশ্য সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম না। পরবর্তীকালে যে সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী চন্দননগর সম্মেলন থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন তাঁদের একটি অংশ 'মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। আমরা অবশ্য সেই সংগঠনে যোগ দিইনি। আমাদের মধ্যে যখন আলোচনা হয় তখন আমি ভিন্ন সংগঠন গড়ার পক্ষে ছিলাম না। আমি আমাদের নেতৃবৃন্দকে বলেছিলাম এই ব্যাপারে কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু তারা রাজী হননি। কাজেই অনুগত সৈনিকের মতো আমি সেটা মেনে নিয়েছি।'[৭১] নিতাই বাবুর লেখা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে কোন আদর্শগত কারণে নয়—বিভিন্ন দলগুলি যখন দেখল বাইরে সবচেয়ে বড় বামপন্থী দল মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের গণ আন্দোলন এবং কিছুটা কূটকৌশলের ফলে এবং শিক্ষক সমিতির শীর্ষ নেতৃত্বের প্রায় সবাই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হবার ফলে, এ.বি.টি.এ. ওই পার্টির গণসংগঠনে পরিণত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে তারা তাদের নিজ নিজ দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আলাদা শিক্ষক সংগঠন গড়ে তোলেন। অন্যদিকে ওই সব দলের দলীয় শিক্ষকদের চাপমুক্ত হয়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্টরা নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে তাঁদের পরিচালনাধীন গণফ্রন্টের সমতুল্যে পরিণত করেন। ৭০-৭১ সময়কালে ১৯২১-এ প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন গণসংগঠন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি এই ভাবে তার বহুদলীয় চরিত্র দ্রুত হারানোর দিকে ধাবিত হয়।

এর পাশাপাশি সেই সময় রাজ্যস্তরে প্রবল আন্দোলনের কাণ্ডারী সত্যপ্রিয় রায় প্রমুখের চেষ্টায় জাতীয় স্তরে, সর্বদলীয় সংগঠন হিসাবে সারা দেশব্যাপী যে শিক্ষক মঞ্চ এ. আই. এস.

টি. এফ গড়ে উঠেছিল, তা ক্রমশঃ রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের মতো হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বহুলাংশে করায়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিল।[৭২] দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে সেই সময়কার কংগ্রেস ও একটি কমিউনিস্ট দল, বাম কমিউনিস্টদের প্রভাব হ্রাস করার উদ্দেশ্যে এই রকম কাজ করেছিল। এ রাজ্যেও সর্বভারতীয় সংগঠনের মতোই শিক্ষক সংগঠনে বামেদের প্রভাব ক্ষীয়মাণ করবার একটা প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল। সমিতির বর্ষীয়ান নেতা অরুণ চৌধুরীর বক্তব্য অনুসারে, '১৯৭০ সালে সমিতির চন্দননগর সম্মেলনে যাঁরা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অপকৌশলে পা দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, কৃষক সংগঠন, যুব সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, মহিলা সংগঠন প্রভৃতিতে ভাঙন ধরিয়ে দেশের গণসংগঠন ও গণ আন্দোলনের সর্বনাশ করেছিল, তাঁরা ঐ সম্মেলনে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে দুই টুকরো করলেন।'[৭৩] এটা ঠিকই নতুন সংগঠন STEA, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সুবিধাবাদের চরম নিদর্শন স্থাপন করে আর, এস. এস.-এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। তবে এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে বামপন্থী কমিউনিস্টরাও শিক্ষক সংগঠনের নীতি ও রণকৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ণায়কের ভূমিকা নিতে চেয়েছিলেন। তখনও অবধি সংগঠনে অবশ্যই বুর্জোয়া উদারনীতিবাদের প্রভাব একেবারে লুপ্ত হয়নি। তবু সংগঠনের কর্মপন্থা নির্ধারণে মার্কসবাদীদের প্রভাব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যতই বিশিষ্ট বামমার্গী কমিউনিস্ট অরুণ চৌধুরী বলুন না কেন যে, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সংগ্রামী চিন্তাধারা ও কর্ম নিয়ন্ত্রণে মার্কসবাদী কমিউনিস্টপন্থীদের শুধু নয়—অন্য বাম দলগুলির প্রভাব ছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলশেভিক পার্টি, কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি প্রভৃতি কতকগুলি ছোটখাটো বামমার্গীয় দলের নামও করেছেন তাঁর লেখায়।[৭৪] বাস্তবতঃ নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির গণসংগঠনেই পরিণত হবার দিকেই পা দিয়েছিল। এইভাবে 'চাপ সৃষ্টিকারী' সংগঠনের খোলস ছেড়ে নির্দিষ্ট একটি দলের গণসংগঠনে পরিণত হতে চলেছিল এ. বি. টি. এ.।

কোচবিহারের তৎকালীন শিক্ষক সমিতির অন্যতম নেতা সমরেন্দ্র সাহার লেখা থেকে আমরা বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মতো অনুধাবন করতে সক্ষম হই যে কোচবিহারের মতো কংগ্রেস প্রভাবিত দুর্গম জেলায়, ৭০'-এর বিভাজন এর পরই সত্যপ্রিয় রায় এবং অনিলা দেবীর মতো মূল সংগঠনের নেতারা অন্যান্য জেলার মতোই STEA-এর প্রভাব খর্ব করতে বারে বারে সফর করেছেন। তাঁরই ভাষায়, 'ছোট্ট এই জেলার (কুচবিহার) শিক্ষক নেতৃত্ব বিপুল উদ্যমে সারা জেলায় যোগাযোগ করে বৃহত্তম জমায়েত ও মিছিলের উদ্যোগ গ্রহণ করে। STEA অংশ নিউটাউন গার্লস স্কুলে কনভেনশন ডাকে। সেই দিনই জেলার প্রায় সত্তর ভাগ শিক্ষক শিক্ষিকা সমিতির পতাকা হাতে 'নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি দীর্ঘজীবী হোক' শিক্ষক আন্দোলনে বিভেদকামীরা দূর হটো' শ্লোগানে শ্লোগানে সেই STEA-র কনভেনশনে উপস্থিত শিক্ষকদের এবং তাদের নেতৃত্বকে বুঝিয়ে দেয়, এ. বি. টি. এ. জেলার শিক্ষকদের একমাত্র সংগঠন। এখানে বিভেদকামীদের স্থান নেই।'[৭৫] তাঁর লেখা থেকে আমরা আরো জানতে পারি, শুধু কোচবিহার নয়, সারা উত্তরবঙ্গ জুড়ে অনিলা দেবী, সত্যপ্রিয় রায়, মীরা চ্যাটার্জী প্রমুখ শিক্ষকদের বঞ্চনা,

পেশাগত সমস্যা, অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা নিরসনের জন্য মূল সমিতির সঙ্গে থাকা উচিত বলে প্রচার করেন। সেই কঠিন সময়ে স্থানীয় নেতৃত্বের চেষ্টায় এবং উপরোক্ত মানুষদের পৃষ্ঠপোষকতায়, বড় ভাঙন থেকে সমিতি রক্ষা পায়। এটি একটি উদাহরণ মাত্র। সারা পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় এই রকমটিই ঘটেছিল।

উদাহরণস্বরূপ মালদহ জেলার কথাতেই আসি। এখানকার বর্ষীয়ান শিক্ষক নেতা নগেন্দ্র নাথ ঘোষের একটি সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, যে চন্দননগরের ১৯৭০-এর সম্মেলনে আগে থেকেই টানা-পোড়েনের আন্দাজ পেয়ে ৬/৭ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে রাজ্য সরকার প্রথমে এই সম্মেলন বানচাল করবার জন্য সচেষ্ট হলেও, তা ব্যর্থ হয়েছিল। তার ভাষাতেই বলা যাক্—'শিক্ষার যে দাবি সেটা মূলতঃ আমরা রাজনৈতিক দাবি বলে মনে করি।.....৬৯ সালে যে সরকারটি আমরা পেলাম সেই সরকারটা আবার ভেঙে দেওয়া হলো। ৭০ সালে সেই সরকারকে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া অর্থাৎ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক সেই প্রস্তাবটা আমরা ওখানে গ্রহণ করতে চেষ্টা করি। সেটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে একদল লোক চেঁচামেচি করতে লাগলেন। সেটা যদিও মুষ্টিমেয় ২০০ থেকে ২৫০-৩০০ খুব জোর হবে এরকম।'[৭৬] আসলে শিক্ষক নেতার এই মন্তব্যে কিছুটা পার্টিজান মনোভাবের প্রকাশ অবশ্যই হয়েছিল। এটা ঠিকই বামপন্থী কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক মতাদর্শ তখন শিক্ষক সমিতিতে প্রাধান্য লাভ করেছিল। সেই মতাদর্শকে হয়তো সদর্থক ভাবেই তারা সমিতির সদস্যদের মধ্যে চাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। রাজনৈতিক ভাবে এর মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। অন্যদিকে কমিউনিস্ট বিরোধীরা 'সংখ্যালঘু' হলেও, তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই নিজেদের রাজনৈতিক বিশ্বাস সমিতির মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইছিলেন। তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ 'বিরোধীদের' সঙ্গে না পেরে সমিতি থেকে বার হয়ে যান। এছাড়া তাঁদের কাছে অন্য কোন উপায় ছিল না। এতে কোন পক্ষের লাভ বা কোন পক্ষের লোকসান সে হিসাব করা আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রের বাইরে। আমরা শুধু এইটুকুই এখানে বলতে পারি এর ফলে সমিতি রাজনৈতিক ভাবে সংহত রূপ ধারণ করলেও, তার সর্বদলীয় মঞ্চ হিসাবে যে পরিচিতি ছিল, তা লুপ্ত হয়ে যায়।

পুরুলিয়া জেলার প্রবীণ নেতা শক্তিপদ সাহানীও এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'চন্দননগর সম্মেলনে শিক্ষকদের একটি ছোট অংশ, পূর্ব ষড়যন্ত্র অনুযায়ী, বিনা কারণে কয়েকজন রাজনৈতিক শিক্ষক সম্মেলন স্থল পরিত্যাগ করে। তাঁর মতে এর ফলে, 'দলীয় রাজনীতির নগ্নরূপ খুব বেশি প্রকট হয়ে পড়ে। আমাদের জেলার (পুরুলিয়া) প্রতিনিধিরা একটা স্কুলে থাকবার জায়গা পায়। সম্মেলনে কি কি বক্তব্য রাখা হবে তা নিয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রায় সারারাত আলোচনা চলে ও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই। পরদিন আমরা সম্মেলন মঞ্চে ঢুকবার সময়ই দেখতে পাই যে আমাদেরই কয়েকজন আমাদের আগেই ঢুকে অন্য জেলার কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে মঞ্চ ত্যাগ করছে।'[৭৭] এই বিবৃতি থেকেই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে পুরুলিয়া জেলায় এই ভাঙনের কমবেশি প্রভাব পড়েছিল।

এবার আসি বাঁকুড়া জেলার কথায়। এই জেলায়ও সমিতি ভাগের কিছুটা হলেও প্রভাব পড়েছিল। ওই জেলার তৎকালীন জেলা সম্পাদক তারা প্রসাদ সিকদার নিজেই মূল সমিতি ত্যাগ করে, জনা সাতেক সম্মেলন প্রতিনিধি সমভিব্যবহারে STEA তে যোগ দেন। পরবর্তীকালে উক্ত জেলার সভাপতি সুধেন্দু দাসও 'নতুন সমিতি'তে যোগদান করেন। স্বভাবতই আমরা ধরে নিতে পারি যে এর ফলে বাঁকুড়া জেলায় মূল সমিতি কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। মূল সমিতির পরবর্তী জেলা সম্পাদক মুক্তি দাশগুপ্ত, এমনকি নতুন সমিতি সম্বন্ধে এই অভিযোগও আনয়ন করেন যে, 'তদানীন্তন জেলা সম্পাদক সমিতির খাতাপত্র, টেস্ট প্রশ্ন বিক্রীর গচ্ছিত টাকা ও হিসাব, অনুরোধ সত্ত্বেও নতুন সম্পাদককে দেননি। ব্যক্তিগত চাঁদা দিয়ে জেলা কাউন্সিলের কাজ কিছুদিন চলে। পরে অনিলা দেবী জেলাকে ৭৭২.০০ টাকা দেবার ব্যবস্থা করেন। জেলা সংগঠনের ইতিহাসে দলত্যাগীদের অপচেষ্টা ব্যর্থ করে নতুন জেলা কমিটি প্রতি জোন ও মহকুমায় কমিটি গঠন করেন। ১৯৭১-এ সব জেলার মতো বাঁকুড়ারও সদস্য সংখ্যা কমে। জেলায় তিন হাজারের কিছু বেশি সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে সদস্য হন ১৪৫২ জন।'[৭৮] এর থেকে বোঝা যায়, যে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিতে যে ভাঙনের সৃষ্টি হয়, মূল সংগঠনের কর্মকর্তারা তাকে খুবই সংখ্যালঘুদের দলত্যাগ বললেও বাস্তবে কিছু জেলায় অন্ততঃ তার প্রভাব ব্যাপক হয়েছিল।

বর্ধমান জেলায় অবশ্য এই ভাঙনের প্রভাব খুব একটা বেশি পড়েনি। স্বভাবতই বামপন্থীদের দুর্গ এই জেলায় মূল ABTA সংগঠন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে তাঁদের প্রভাব বর্ধমান রাখতে সক্ষম হন। বরিষ্ঠ নেতা দেবেন্দ্র কুমার লাহিড়ী এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, 'চন্দননগরে সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য হিসাবে যে স্মৃতিটুকু মনে আছে তাহলো প্রায় একশত প্রতিনিধি সম্মেলন মণ্ডপ ছেড়ে চলে যান। তখন যে কোন সদস্যই বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারতো। ৭/৮ হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তখনই অনুভূত হয় নীচের স্তরের সদস্য দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই কেবল মাত্র বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের অধিকারী হবেন। এ ব্যবস্থা না করলে সম্মেলনগুলি ভবিষ্যতে অত্যন্ত ব্যয় বহুল হয়ে পড়বে।'[৭৯]

হুগলী জেলার কথা দিয়ে বক্ষ্যমাণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শেষ করতে হবে। না হলে এই পরিচ্ছেদটি একটা পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধে পরিণত হবে। উক্ত জেলার নেতা কালিপদ সেনগুপ্ত এবং সমীর বড়ালের লেখনী নিঃসৃত বাক্যাবলী থেকে আমরা জ্ঞাত হই যে, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে সমিতি ভাঙার সময় হুগলী জেলায় মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি ছাড়া, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বৃহদংশ মূল সমিতির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[৮০]

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে এমনকি ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দেও তো ভিন্নরূপে হলেও সমিতিতে ভাঙন ধরেছিল। আমরা আমাদের গবেষণা নিবন্ধে মূলত এই দলছুট ব্যক্তিবর্গের ক্ষুদ্র স্বার্থই যে এইসব ভাঙনের জন্য দায়ী ছিল তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি। এর পিছনে তৎকালীন সরকারগুলির 'বিভাজন করো ও শাসন করো' এই নীতির কালো ছায়াও আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। কিন্তু ১৯৭০-এর ভাঙনের সঙ্গে আগের

ভাঙনগুলির একটি মূলগত পার্থক্য ছিল। আগের ভাঙনগুলির সময় এমনকি কংগ্রেস সমর্থক ব্যক্তিদের অনেকে সমিতির সর্বদলীয় চরিত্রকে মান্যতা দিয়ে মূল সমিতিতেই থেকে গিয়েছিলেন। হিন্দু মহাসভা, জনসংঘের মতো দক্ষিণপন্থী দলগুলোর পাশাপাশি 'বারো রাজপুত্রের তেরো হাঁড়ি' বামপন্থী বিভিন্ন দলও সমিতির ঐক্যর ক্ষেত্রে প্রশ্নাতীত আনুকূল্য প্রদর্শন করেছিলেন সেই সময়ে। কিন্তু ১৯৭১-এর ভাঙন ছিল বাইরের বিভিন্ন দলের মতপার্থক্য ও নিজ নিজ পৃথক শিক্ষক সংগঠন গঠনের চেষ্টার ফলশ্রুতি। এই ভাঙনে শুধুমাত্র দক্ষিণপন্থীদের বিভেদপন্থার ছায়া পড়েছিল এমন নয়—মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের সমিতির অভ্যন্তরে প্রতিপত্তিতে আপত্তি তুলে, বামপন্থী অন্যান্য অনেক দল ঐতিহ্যমণ্ডিত নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির অঙ্গন পরিত্যাগ করে। তাঁরা নিজ দলের অনুসারী শিক্ষক সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। আর মূল শিক্ষক সমিতি সর্বার্থেই পরিচিত হয়ে ওঠে মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি গণসংগঠনে। এটা দুঃখের ও পরিতাপের কিনা জানিনা। ইতিহাস আনন্দ/দুঃখের হিসাব রাখে না। যা ঘটেছে তার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করে মাত্র। এখানে আমরা সেই পরিধিতে আবদ্ধ হয়েই নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির শেষ ভাঙনের কথা উল্লেখ করলাম। বামপন্থী কমিউনিস্টরা এর পরে শিক্ষক সমিতির গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করে। বৎসরান্তে সমস্ত স্তরের সব শিক্ষকদের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের রীতিতে পরিবর্তন আনয়নের সিদ্ধান্ত নেয়। পিরামিডাকৃতি ভাবে আঞ্চলিক স্তরের নেতারা মহকুমা বা জেলা স্তরের সম্মেলনে এবং জেলা সম্মেলনে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রাজ্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবার অধিকারী হয়।[৮১]

অবশ্য আমাদের আলোচনা সীমার শেষ বছরেও নতুন ABTA তাঁদের নিজস্ব ধারায় আন্দোলন চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। এ. বি. টি. এ.-র মধ্যে ভাঙন সত্ত্বেও, চন্দননগর সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চার হাজার শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মী, গণতন্ত্র, শিক্ষা ও বৃত্তিগত দাবি দাওয়া নিয়ে ৭০-এরই ৬ মে, মহাকরণের সামনে আটচল্লিশ ঘণ্টার গণঅবস্থান করেন। বিধানসভা বাতিল ও মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবিতে তারাও অন্যান্য গণসংগঠনের আন্দোলনের পাশে দাঁড়ান।[৮২] ওই বছরেরই ২১ জুলাই সরকারি মহার্ঘভাতা ও অনুদান অবিলম্বে প্রেরণের দাবিতে তিন সহস্রাধিক সমিতি কর্মী মহাকরণ অভিযানে সামিল হন। ২৬ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ সমিতির আহ্বানে অর্জিত অধিকার বজায় রাখার স্বার্থে সাতদিন ব্যাপী সফল কর্মবিরতি ও রাজভবনের সামনে অবস্থান করেন শিক্ষকেরা। আন্দোলনের শেষ দিনে অবস্থান শিবিরে সমিতির নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেছিলেন, 'অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে মিলিত হয় যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া আর কোন বাঁচার পথ নেই।[৮৩]

এতদিন নকশালপন্থীদের হাতে সমিতির সদস্যরা লাঞ্ছিত হচ্ছিলেন। এই সময় অর্থাৎ ১৯৭১ থেকে রাজ্য সরকারের মদতে পুলিশ এবং নবগঠিত যুব কংগ্রেসের সাঁড়াশি আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন শিক্ষকেরা।[৮৪] এর প্রতিবাদে ওই বছরের ১২ সেপ্টেম্বর এবং ২ ডিসেম্বর বিশেষ করে নকশালদের হাতে গুপ্তহত্যা, রেনেসাঁ ব্যক্তিত্বদের মূর্তি ভাঙা প্রভৃতির সোচ্চার প্রতিবাদরত

বামমার্গী সমিতি নেতৃত্ব এবার সরাসরি রাষ্ট্রশক্তির আক্রমণের মুখোমুখি হলেন। নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্বর বিঘ্ন ঘটিয়ে নতুন রাজনীতির মঞ্চে এই অবস্থান স্বভাবতই তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক শক্তির আক্রমণের সূচনা করল। এর ভালোমন্দ বিবেচনা না করেই বলা যায়, এই অবস্থা তৎকালীন পরিস্থিতিতে অনিবার্যই ছিল।

সূত্র নির্দেশ

১. বসু, অঞ্জন—বাংলায় বামেরা (রাজপথে রাজ্যপাটে—১৯২০-২০১১), কলকাতা, ২০১৭, পৃঃ ২৮৭-৮৮

২. তদেব, পৃঃ ২৯১

৩. বাগ, অজিত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, 'এক নজরে পঁচাত্তর বছর'—নামহীন, প্ল্যাটিনাম জুবিলি সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃঃ ৪৬৮

৪. দাশগুপ্ত, বাসব, 'যুক্তফ্রন্ট সরকার ও পশ্চিম বাংলা', কলকাতা, ১৯৭২, পরিশিষ্ট ঃ 'প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের ১৮ দফা কর্মসূচী', পৃঃ ২৩১

৫. তদেব, পৃঃ ২৩২

৬. রায়, শিব শংকর (আহ্বায়ক), 'সংগ্রামের শপথে ১২ই জুলাই কমিটির পঞ্চাশ বছর', কলকাতা, ২০১৬, পৃঃ ৩১

৭. তদেব, পৃঃ ৩১

৮. দাশগুপ্ত, বাসব, 'যুক্তফ্রন্ট সরকার ও পশ্চিম বাংলা', প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০

৯. চট্টোপাধ্যায়, গৌতম (সং), ইতিহাস অনুসন্ধান, ১২, কলকাতা, প্রবন্ধ ঃ ঔপনিবেশিক ভারতে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা ও ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ ঃ একটি পর্যালোচনা, প্রবাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ২৯৪

১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—'শিক্ষা চিন্তা (সংকলন), নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, কলকাতা, ২০১২, প্রবন্ধ ঃ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ', পৃঃ ৩৭৭

১১. চট্টোপাধ্যায়, গৌতম (সং), ইতিহাস অনুসন্ধান, ১২, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৬

১২. তদেব, পৃঃ ২৯৭

১৩. মৈত্র, ভবেশ, প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষা ও সমাজ, প্রবন্ধ ঃ 'শিক্ষক আন্দোলনের স্মৃতি থেকে', পৃঃ ১৯২-৯৩

১৪. তদেব, পৃঃ ১৯৩

১৫. তদেব, পৃঃ ১৯৩

১৬. ভট্টাচার্য, সূর্য্যাংশু (সং), সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি (১৯৪৮-১৯৯৮), কলকাতা, ১৯৯৯, প্রবন্ধ ঃ 'স্মৃতিচারণ এবং শিক্ষক আন্দোলন প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন'—সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পৃঃ ২১-২২

১৭. তদেব, পৃঃ ২২

১৮. বসু, অঞ্জন—বাংলায় বামেরা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৬-২৯৭

১৯. তদেব, পৃঃ ২৯৭
২০. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং), নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, প্রবন্ধ ঃ 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পঞ্চাশ বছর'—সুনীল ঘোষ, পৃঃ ৭৮
২১. বসু, অঞ্জন, 'বাংলায় বামেরা'—প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৮
২২. বসু, জ্যোতি—'যতদূর মনে পড়ে', কলকাতা, ২০০৬, পৃঃ ২৬৫
২৩. বাগ, অজিত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জুবিলি সংখ্যা, প্রাগুক্ত, স্মৃতিচারণা ঃ নীলিমা সেন, পৃঃ ৫২২
২৪. সেনগুপ্ত, বরুণ—'পালা বদলের পালা'—কলকাতা ১৯৭১, পরিশিষ্ট-২, ৩২ দফা কর্মসূচী (যুক্তফ্রন্ট) ১৯৬৯, পৃঃ ২১৫-১৬
২৫. Roy, Satyapriya, Selected writings and speeches, Kolkata, 1999, Statement of Sri Satyapriya Roy, Education minister, Govt of WB, at the UF meeting held on 20/11/69, p. 186
২৬. তদেব, পৃঃ ১৮৯
২৭. তদেব, পৃঃ ১৯০
২৮. রায়, পার্থ (সং), পর্ষদ বার্তা, শিক্ষাবিদ সত্যপ্রিয় রায় জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা, কলকাতা, নভেঃ/ডিসেঃ ২০০৮, প্রবন্ধ ঃ 'নতুন সহস্রাব্দের শিক্ষা ভাবনা'—অগ্রাধিকার ও করণীয়, কান্তি বিশ্বাস, পৃঃ ৬০
২৯. তদেব, প্রবন্ধ ঃ 'আমার চেনা সত্যপ্রিয় রায়—অমিতাভ সেন, পৃঃ ৩৫-৩৬
৩০. মৈত্র, ভবেশ, প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষা ও সমাজ, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'শিক্ষক আন্দোলনের স্মৃতি থেকে', পৃঃ ১৯৫
৩১. দত্ত, সীমা (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, গোলক পতি রায় জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যা, কলকাতা, জুলাই, ২০১৯, প্রবন্ধ ঃ কমরেড সত্যপ্রিয় রায় স্মরণে—গোলকপতি রায়, পৃঃ ৪০১
৩২. তদেব, পৃঃ ৪০২
৩৩. মণ্ডল, বিকাশ (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, সত্যপ্রিয় রায় জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা, মার্চ, ২০০৭, প্রবন্ধ ঃ সত্যপ্রিয় রায় প্রসঙ্গে—জ্যোতি বসু, পৃঃ ২৯৯
৩৪. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং), নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পঞ্চাশ বছর'—সুনীল ঘোষ, পৃঃ ৭৮
৩৫. রায়, অন্নদাশংকর—'শিক্ষার সঙ্কট, কলকাতা, ১৯৯১, প্রবন্ধ ঃ 'শিক্ষা প্রসঙ্গে', পৃঃ ৫৩
৩৬. তদেব, প্রবন্ধ ঃ শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক, পৃঃ ৬৫
৩৭. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং), নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পঞ্চাশ বছর'—সুনীল ঘোষ, পৃঃ ৭৯
৩৮. তদেব, পৃঃ ৭৯
৩৯. রায়, পার্থ (সং), পর্ষদ বার্তা, শিক্ষাবিদ সত্যপ্রিয় রায় জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, সত্যপ্রিয় রায় (১৯০৭-১৯৭৮), প্রবন্ধ ঃ 'স্মৃতিচারণে সত্যপ্রিয় রায়'—প্রশান্ত বসু, পৃঃ ৩৩

৪০. ঘোষ, অতুল্য, কষ্ট কল্পিত (নব পর্যায়), কলকাতা, ১৯৮৪, পৃঃ ১৩০
৪১. বসু, অঞ্জন—বাংলায় বামেরা, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৫
৪২. তদেব, পৃঃ ৩১৫
৪৩. তদেব, পৃঃ ৩০৪
৪৪. তদেব, পৃঃ ৩০৪
৪৫. চক্রবর্তী, শান্তনু, সমকাল ও বিবৃতি, চুঁচুড়া, ২০১৭, প্রবন্ধ ঃ 'প্রসঙ্গ ঃ নকশাল বাড়ী আন্দোলনের অর্ধশতবর্ষ—বাঁকা চোখে'—প্রবাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ৭৬
৪৬. ঘোষ, সুকান্ত, '৭০-এর আপনজন', কলকাতা, ২০০৭, পৃঃ-১৩৫ (পরিশিষ্ট ঃ ৭০-এর দশকে যে কমরেডরা গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে গিয়ে বলি হয়েছেন, তাঁদের তালিকা)
৪৭. সেনগুপ্ত, উৎপল (আহ্বায়ক), 'লালদীঘি'—তিন দশক, একটি সংকলন, কলকাতা, জানুঃ-১৯৯২, প্রবন্ধ ঃ 'শ্রমিক কর্মচারী-শিক্ষক আন্দোলন দীর্ঘজীবি হোক'—অরিন্দম ঘোষ, পৃঃ১৬৪-৬৫
৪৮. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং), নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পঞ্চাশ বছর'—সুনীল ঘোষ, পৃঃ ৭৯-৮০
৪৯. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু—জোয়ার ভাটার ষাট-সত্তর, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃঃ ১৯৮
৫০. মণ্ডল, বিকাশ (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, সত্যপ্রিয় রায় জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ জন্মশতবর্ষে আমাদের শপথ—চিরসাথী হোন্ সত্যপ্রিয় রায়'—অমিতাভ সেন, পৃঃ ৩১৪
৫১. ভট্টাচার্য, সূর্য্যাংশু (সং), পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৯৯, প্রবন্ধ ঃ 'স্মৃতিচারণ এবং শিক্ষক আন্দোলন প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন'—সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পৃঃ ২২
৫২. দত্ত, সীমা (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, গোলক পতি রায় জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যা, কলকাতা, জুলাই, ২০১৯, প্রবন্ধ ঃ কমরেড সত্যপ্রিয় রায় স্মরণে—গোলকপতি রায়, পৃঃ ৪০০
৫৩. বিশ্বাস, অনিল (সং), গণশক্তি শারদ সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৯৫, প্রবন্ধ ঃ 'শিক্ষক আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ'—অনিলা দেবী, পৃঃ ১৬২-৬৩
৫৪. ভট্টাচার্য, সূর্য্যাংশু (সং), পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, প্রাগুক্ত, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১
৫৫. বিশ্বাস, অনিল (সং), গণশক্তি শারদ সংখ্যা, প্রাগুক্ত অনিলা দেবীর প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩
৫৬. ভট্টাচার্য, সূর্য্যাংশু (সং), পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'আমার স্মৃতিতে'—ঈশ্বরচন্দ্র প্রামাণিক, পৃঃ ৪৩
৫৭. বাগ, অজিত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, কলকাতা, মার্চ, ১৯৯৬, প্রবন্ধ ঃ 'অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী ঃ জীবন ও কর্ম'—ননী গাঙ্গুলী, পৃঃ ১৩৯

৫৮. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং), নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, প্রাগুক্ত, সাক্ষাৎকার ঃ 'সমিতির প্রবীণ নেতা শ্রী মনোরঞ্জন সেনগুপ্তের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার', পৃঃ ৯১

৫৯. ভট্টাচার্য, সূর্য্যাংশু (সং), পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'সমিতির ঐতিহ্য ও আন্দোলনের উত্তরাধিকার'—পৃথ্বীশ বসু, পৃঃ ১৭

৬০. তদেব, পৃথ্বীশ বসুর প্রবন্ধ, পৃঃ ২৩

৬১. ধর, প্রশান্ত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, ৫৪-এর সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, কলকাতা, নভেঃ, ২০০৩, প্রবন্ধ ঃ পুরানো সেই দিনের কথা—মীরা চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৯

৬২. বাগ, অজিত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'বহু সংগ্রামের গৌরবময় ঐতিহ্যবাহী আমাদের এই সংগঠন'—অরুণ চৌধুরী, পৃঃ ৬১৭

৬৩. অধিকারী, অশোক (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, অনিলা দেবী শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা, প্রাগুক্ত, আলোচনা ঃ বিধান সভায় অনিলা দেবীর বক্তৃতা—২১ নভেঃ (Motion on the Chinese Aggression), পৃঃ ১০৩৩

৬৪. তদেব, পৃঃ ১০৩৩

৬৫. মণ্ডল, বিকাশ (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, সত্যপ্রিয় রায় জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'সত্যপ্রিয় রায়কে যেমন দেখেছি'—ভবেশ মৈত্র, পৃঃ ৩০৯

৬৬. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং), নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পঞ্চাশ বছর'—সুনীল ঘোষ, পৃঃ ৭৯

৬৭. বাগ, অজিত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জুবিলি সংখ্যা, প্রাগুক্ত, সাক্ষাৎকার ঃ 'পুরুলিয়া জেলার প্রবীণ নেতা শ্রীযুক্ত শক্তিপদ সাহানী', পৃঃ ৫৬০

৬৮. অধিকারী, অশোক (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, অনিলা দেবী শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ অনিলা দেবী ঃ এক সংগ্রামী নেত্রী—অরুণ চৌধুরী, পৃঃ ৯৬৫

৬৯. তদেব, প্রবন্ধ ঃ 'অনিলাদিকে যেভাবে দেখেছি—সমরেন্দ্রনাথ সাহা, পৃঃ ৯৫৫

৭০. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং), নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, প্রাগুক্ত, অনিলা দেবীর প্রবন্ধ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০

৭১. মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ ও অন্যান্য (সং), সত্যপ্রিয় রায় ও উত্তরাধিকার, কলকাতা, ২০০৮, প্রবন্ধ ঃ 'শ্রদ্ধেয় সত্যপ্রিয় রায়কে মনে রেখে'—নিতাই লাল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৬

৭২. মণ্ডল, বিকাশ (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, সত্যপ্রিয় রায় জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা, মার্চ, ২০০৭, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'জন্ম শতবর্ষে আমাদের শপথ—চিরসাথী হোন্ সত্যপ্রিয় রায়'—অমিতাভ সেন, পৃঃ ৩১৮

৭৩. তদেব, পৃঃ ৩১৮

৭৪. তদেব, পৃঃ ৩১৮

৭৫. অধিকারী, অশোক (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, অনিলা দেবী শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা, নভেঃ, ২০১৩, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ অনিলাদিকে যেভাবে দেখেছি'—সমরেন্দ্র নাথ সাহা, পৃঃ ৯৫৬

৭৬. বাগ, অজিত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জুবিলি সংখ্যা, প্রাগুক্ত, সাক্ষাৎকার ঃ 'প্রবীণ শিক্ষক নেতা এবং মালদহ জেলা শাখার দীর্ঘদিনের কমরেড নগেন্দ্রনাথ ঘোষ', পৃঃ ৫৬৮

৭৭. তদেব, সাক্ষাৎকার ঃ পুরুলিয়া জেলার প্রবীণ নেতা শক্তপদ সাহানীর সাক্ষাৎকার', পৃঃ ৫৬০

৭৮. তদেব, প্রবন্ধ ঃ 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি ও বাঁকুড়া জেলা'—মুক্তি দাশগুপ্ত, পৃঃ ৫৮৭-৫৮৮

৭৯. তদেব, স্মৃতিচারণা—দেবেন্দ্র কুমার লাহিড়ী, পৃঃ ৫৯৪

৮০. তদেব, প্রবন্ধ ঃ আন্দোলন ও সংগঠনের বিকাশের ধারায় এবিটিএ'র হুগলী জেলা শাখা—কালিপদ সেনগুপ্ত ও সমীর বড়াল, পৃঃ ৫৯৬-৯৭

৮১. তদেব, স্মৃতিচারণা—দেবেন্দ্র কুমার লাহিড়ী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯৪

৮২. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং), নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পঞ্চাশ বছর'—সুনীল ঘোষ, পৃঃ ৭৯

৮৩. তদেব, পৃঃ ৭৯

৮৪. ঘোষ, সুকান্ত, ৭০-এর আপনজন, কলকাতা, ২০০৮, পৃঃ ২৮

উপসংহার

সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের তুলনামূলক আলোচনা

১৯৭১-এর পর সমিতির কর্মকাণ্ড

সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলন তথা নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস নিয়ে আলোচনার সমাপ্তি এই ভাবেই আমরা করলাম। তবে সংক্ষেপে এর পরবর্তী কালের কিছু ইতিহাস আমরা উপসংহার হিসাবে মোটা দাগে আলোচনা করব। সমিতি যখন একদিকে একটি নির্দিষ্ট দলের ছত্রছায়ায় চলে গেল, তখন ভারতবর্ষ তথা বাংলার রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক জীবনে এক ভয়ংকর ঝড় নেমে এসেছিল। একদিকে ১৯৭১-এর আমাদের পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে স্বাধীনতার লড়াই, অন্য দিকে সেই কালবেলায় পশ্চিমবাংলায় ৭২ খ্রিস্টাব্দের কংগ্রেসি শাসনের ও ১৯৭৫-এর জরুরি অবস্থার কালবেলায়, শিক্ষক সমিতির কার্যকলাপ সম্বন্ধে দুই/চার কথা বলবার প্রয়োজন আছে। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটল। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়, জমি উদ্ধারকে কেন্দ্র করে গ্রামাঞ্চলে অশান্তি সৃষ্টি হলে, নিজ সরকারকেই 'অসভ্য বর্বর সরকার' আখ্যা দেন।[১] যুক্তফ্রন্টের পরে ১৯৭১-এর ২ এপ্রিল কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেস একত্রে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। বাঙালী জীবনে দলাদলি পারস্পরিক কুৎসার এক কালো অধ্যায় সে সব দিন। তবে এই অবস্থাতেই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে, সর্বসম্মত সহায়তা ও সহানুভূতি জানিয়ে প্রস্তাব নিয়েছিল। এদিকে ১৯৭১-এর ১৫ মে কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসের জোট সরকারের বিরুদ্ধে বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করা হয়। যাইহোক শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী পদত্যাগ করেন। ২৯ জুন ১৯৭১ আবার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় বাংলায়। পরে ৭২-এর বিতর্কিত নির্বাচনে জয়ী হয়ে সিদ্ধার্থ শংকর রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন। সেই কালবেলার বিস্তারিত বিবরণ আমাদের আলোচ্য সূচি বহির্ভূত হলেও, এই বিশেষ পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক শিক্ষকদের আন্দোলনের গতি প্রকৃতির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পাতা আমরা উল্টাতেই পারি। কোন মতবাদের অন্ধতায় না গিয়েও শিক্ষক আন্দোলনের প্রবীণ নেতা তুষার পঞ্চাননের ভাষায় বলা যেতেই পারে, 'এই সময় এলো রাজ্যের অন্ধকারময় দিন। ৭০ থেকে ৭৭-এর কালা দিনগুলি। শিক্ষার পরিবেশ রসাতলে গেল, কবে পরীক্ষা হবে, কবে ফল বেরুবে কেউ বলতে পারে না। পরীক্ষার নামে প্রহসন, গণটোকাটুকি চলতে লাগল। আবার অতিবিপ্লবীরা বুর্জোয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্নি সংযোগ আরম্ভ করলো। কত শিক্ষক শিক্ষাকর্মী নিহত হলেন, বাড়ি ছাড়া হলেন, কর্মচ্যুত হলেন। বয়ঃসন্ধিকালের ছাত্রছাত্রীরা আবেগতাড়িত হয়ে মাদকাসক্ত হয়ে উঠলো। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির যন্ত্রে পরিণত হল। সে এক অসহনীয় পরিবেশ।'[২]

শিক্ষকরা কিন্তু এই অমানিশার দিনগুলিতে থেমে থাকেন নি। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি, তাদের মতো করে আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে

সমিতির ছেচল্লিশতম বার্ষিক সম্মেলনে ড. রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে সংগঠিত হয়েছিল। বার্ষিক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোয়লিশন সরকার গঠন ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ৯ আগস্ট মহাকরণ অভিযান করা হয়। ওই বছরেরই ১০ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন জেলাও মহকুমায় বারো ঘণ্টার অবস্থান ও 'শিক্ষা বাঁচাও' অভিযান সংগঠিত করা হয়। ১৯৭২-এ মালদহে সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তীর বছরে, প্রখ্যাত সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বার্ষিক সম্মেলন হয়। ৭৩-এর সম্মেলনের স্থান ছিল হাওড়া। ওই বছরের ৬ মার্চ এসপ্ল্যানেড ইস্টে সমিতির আহ্বানে 'Salary Deficit Scheme' এর বিরোধিতা ও গণ ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ১৯৭৪-এর বাঁকুড়া সম্মেলনে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে অবৈজ্ঞানিক পাঠ্যসূচি সংশোধনের এবং ভয়াবহ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যূনতম বেতন ও সকলের জন্য ১১৮ টাকা মহার্ঘভাতা দাবি করা হয়। ১৯৭৫ তে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পঞ্চাশতম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি হন রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। এর আগেই ১৩ দফা দাবিতে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ছয় ঘণ্টার গণ অবস্থান করা হয়। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। ওই বছরেরই ৪ মার্চ ভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষক ফেডারেশনের আহ্বানে দাবি দিবস এর পরে ৭৫-এর ১৯ মার্চ বিশৃংখলাময় শিক্ষা কাঠামোর পুনরুদ্ধারের দাবিকে সামনে রেখে কর্মবিরতিতে যোগ দেন শিক্ষকেরা। ১৯৭৬-এর আগস্ট মাসে শিক্ষকদের গোপন রিপোর্ট (CCR) বাতিল করার দাবি ওঠে, বামঘেঁষা এই সমিতির কোচবিহার সম্মেলনে।[৩]

বামফ্রন্ট সরকার ও শিক্ষক সমিতি

এসে পড়ল ১৯৭৭। সিউড়িতে সমিতির অধিবেশন বসল। সমিতি আহ্বান জানাল সংগঠনকে তৃণমূল স্তরে বিদ্যালয় ইউনিটের শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর জন্য। সেই বছরেই ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে সরিয়ে দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হল জনতা পার্টির সরকার। পশ্চিমবঙ্গেও স্থাপিত হল বামফ্রন্ট সরকার। সমিতির পরামর্শে আট দফা শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করল এই সরকার।[৪] ৭৭-এর ১২ সেপ্টেম্বর রাজনৈতিক সন্ত্রাসে জীবিকাচ্যুত শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের জীবিকা ফিরিয়ে দেবার কথা বলল সরকার। ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা হল অবৈতনিক। একটু পরে হলেও ১৯৮০-এর কাঁথি সম্মেলনে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ করল মূল সমিতি। সম্মেলনে সমিতির গঠনতন্ত্রের আংশিক পরিবর্তন ঘটিয়ে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সংযোজিত হল 'to cultivate the spirit of scientific socialism-among the workers in the field of education'। সমিতি সম্পূর্ণ ভাবে বিশেষ একটি দলের গণফ্রন্টে পরিণত হল আনুষ্ঠানিকভাবে।[৫] নতুন সরকারের কাছে অবশ্য পে কমিটি গঠন সহ অন্যান্য দাবিতে সোচ্চার হয়েছিল সমিতি। কিন্তু তা জঙ্গীরূপে নয়। সেই সময় শিক্ষকদের অন্য সমিতিগুলিও বিভিন্ন দলের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছিল। তখন প্রধান শিক্ষক সমিতির মূল নেতা ছিলেন বিষ্ণুব্রত ভট্টাচার্য এবং প্রদ্যোত কুমার সিংহ। কংগ্রেস আশ্রিত এই সংগঠন এতদিনের শীতঘুম ভেঙ্গে সরকারের বিরোধিতা করতে শুরু করে দিলেন। ইংরেজি শিক্ষা প্রাথমিক স্তরে তুলে দেওয়া, পাশ-ফেল প্রথা তুলে নেওয়া, শিক্ষকদের অবসরের বয়স পঁয়ষট্টি থেকে ষাট করার প্রতিবাদে তারা সোচ্চার হন।[৬] এদিকে কালের

গতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নিজস্ব শিক্ষক সংগঠনসমূহ গড়ে উঠতে থাকে। এতদিনকার ভুয়ো নিরপেক্ষতা ছিন্ন করে এ. বি. টি. এ. বা প্রধান শিক্ষক সমিতির পাশাপাশি আত্মপ্রকাশ করে মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘ, ওয়েস্ট বেঙ্গল হাইয়ার সেকেন্ডারি টিচার্স ফোরাম, মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি, সারা বাংলা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি, নিখিল বাংলা বিদ্যালয় অশিক্ষক কর্মী সংস্থা, প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের শিক্ষক ফ্রন্টের সৃষ্টি হল।[৭]

অন্যদিকে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার ততদিনে নিজেদের মতো করে শিক্ষা সংস্কার করতে সচেষ্ট হয়েছিল। এটা তো ঠিকই ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজনৈতিক অস্থিরতায় এই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা দারুণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৭-এ নতুন পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে, শিক্ষা পরিচালন সংস্থাগুলির গণতন্ত্রীকরণ, শিক্ষক ও কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, নিয়মিত বেতন দান, পেনশন দান প্রভৃতি সরকারি ব্যবস্থাপনায় চালু হল। তবু তদানীন্তন বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী সব সমস্যার সমাধান হয়নি তা সোচ্চার ঘোষণা করেছিলেন। 'শিক্ষার প্রশ্নে বহু অপূর্ণতা এখনও বিদ্যমান। শিক্ষা সংবিধানের যুগ্ম তালিকায় থাকা সত্ত্বেও এবং পূর্বের সকল শিক্ষা কমিশনের সুপারিশে কেন্দ্রীয় বাজেটের অন্ততঃ ১০ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দের কথা বলা হলেও, এই হার আজ পর্যন্ত ৩ শতাংশ অতিক্রম করতে পারেনি। এর ফলে রাজ্য সরকারও আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে শিক্ষা পরিকল্পনা করতে হয়। রাত্রিক অন্ধকার বৃন্ত হতে এই সরকারকে ছিঁড়ে আনতেই হবে শিক্ষার ফুটন্ত সকাল।'[৮]

নির্দিষ্ট দলের গণসংগঠন হওয়ার জন্যই হয়তো, বাম সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে এ. বি. টি. এ.-র সাধারণ সম্পাদক অধিক্রম সান্যালের কথায়, 'সাতাত্তরে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা সংক্রান্ত যে যে নীতি গ্রহণ করেছে সবগুলোই যুগান্তকারী। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল শিক্ষাকে অবৈতনিক করে দিয়ে বামফ্রন্ট রাজ্যের শিক্ষাকে সর্বজনীন করেছে। শিক্ষকদের মান মর্যাদা, চাকরির নিশ্চয়তা, আর্থিক অবস্থার উন্নতি ইত্যাদি সব হয়েছে এই আমলেই।'[৯] অবশ্যই অন্য অভিমতও আছে। প্রধান শিক্ষক সমিতির সম্পাদক পৃথ্বীশ বসুর কথায়, 'ক্ষমতায় এসেই শিক্ষাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে বামফ্রন্ট....শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও সরকারের আচরণ বৈষম্যমূলক। পঁয়ষট্টির বদলে ষাট বছর শিক্ষকদের অবসর ঘটাবার ঘোষণা হলে, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি ছাড়া বাম-অবাম, প্রায় সব শিক্ষক সংগঠনই এর সমালোচনা করে। এ বিষয়ে তারা আন্দোলনের পথেও যায় কমবেশি। অবশ্য আশ্চর্যের বিষয় এ. বি. টি. এ.-র নেতৃত্বের কুশলতায় বেশির ভাগ শিক্ষক ষাট বছরের অবসরের সরকারি সিদ্ধান্তকে মেনেও নেয়। রাস্তাই একমাত্র রাস্তা একথা এতদিনে যেন বোধোদয় ঘটালো বামফ্রন্ট বিরোধী শিক্ষক সংগঠনের নেতাদের। ধর্মঘটের ডাকও দিল তারা। স্বভাবতই এই ধর্মঘটের বিরোধিতা করল নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি।[১০] রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির বেড়াজালে আবদ্ধ না করে, বিভিন্ন কমিটি/কমিশন ঘটানোর মধ্য দিয়েই সামগ্রিক শিক্ষা পরিকাঠামোকে উন্নত করতে অন্ততঃ প্রাথমিক ভাবে বামফ্রন্ট সরকার সচেষ্ট

ছিল। এর মধ্যে ১৯৯১-এর অশোক মিত্র কমিশন, ২০০১ খ্রিস্টাব্দে রঞ্জুগোপাল মুখার্জী কমিটি, মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সচেষ্ট হয়েছিল।[১১] যা বর্তমান গবেষণা পত্রের কালসীমার বাইরে—উপসংহারে এই বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ নেই। দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, যে ওই সময়ে শিক্ষকদের মন মানসিকতায় একটি পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। তাঁর ভাষায় 'School teachers even closer to the left, it also had an unintended consequence....it turned the teachers into a privileged class, enhancing their distance with rest of the village (or town) there by weakening their representative functions.'[১২] এই নব্যধনী শিক্ষকেরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে একটি দূরত্ব বজায় রাখতেন। অভ্যাস বশেই কিংবা আর্থিক বা রাজনৈতিক চাওয়া পাওয়ার হিসাব কষে, তাঁরা সংগঠিত শিক্ষক সংগ্রামের সংশ্লিষ্ট থাকলেও তাদের চরিত্রগত একটি পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল। ১৯৭৭ পরবর্তী পর্যায়ে অথচ সেটা হবার কথা নয়—দ্বৈপায়ন বাবুর হিসাব মতো ১৯৭৬-৭৭ খ্রিস্টাব্দে যেখানে রাজ্য বাজেটে ১২.৮ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় হত, সেখানে ১৯৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল ২৬.০৪ শতাংশে।[১৩] তাই শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তোলার মতো অর্থের অভাব ছিল না। ঘাটতি ছিল নব্য শিক্ষকবৃন্দদের দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে। সে অন্য প্রসঙ্গ। আরো একটি পৃথক গবেষণা পত্রের বিষয় হতে পারে তা।

শেষ কথা

যাইহোক বাংলার সার্বিক শিক্ষা ও শিক্ষকদের অবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা ভারতবর্ষের বিশেষ করে বাংলায়, কি ভাবে প্রাচীনকাল থেকে 'আশ্রম-টোল-চতুষ্পাঠীতে শিক্ষকবৃন্দের নেতৃত্বে পাঠাভ্যাস চলতো তার একটি রূপরেখা আমাদের আলোচনায় অঙ্কন করতে সচেষ্ট হয়েছি। সাধারণভাবে একটু ভুল ভেবেই একটি ধারণা রয়েছে যে সেই সুপ্রাচীন কালে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কে কোন দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক ছিল না—কিন্তু আলোচনার আলোকে আমরা দেখাতে চেয়েছি শিক্ষান্তে 'গুরু দক্ষিণা' দিতে ছাত্ররা বাধ্য ছিলেন। শাসক শক্তিও গুরু মহাশয় অর্থ বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী দান করে তাঁদের গ্রাসাচ্ছদনের বন্দোবস্ত করতেন। গুরুর কাছে শিক্ষার্থী হিসাবে পাঠাভ্যাসকালীনও শিক্ষার্থীদের গুরু সেবা করতে হতো। এই প্রসঙ্গে আরুণি উদ্দালক বা গুরু দ্রোণ একলব্য'র 'অন্যায় গুরু দক্ষিণা' দানের কথাও আমরা জানি। বৌদ্ধ এবং পরবর্তীকালের মধ্যযুগেও শিক্ষক ও ছাত্রের শুধু আত্মিক সম্পর্ক নয়—দেনা পাওনার সম্পর্ক ছিল, অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই।

ঔপনিবেশিক যুগেও প্রথমে মিশনারীদের দ্বারা এবং পরবর্তীকালে ইংরেজ প্রশাসকদের ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক ক্ষমতার সাহায্যে আধুনিক স্কুল ব্যবস্থা চালু হবার পরে, শিক্ষকদের মহান ব্রত যে একটি বৃত্তিও ছিল—এটা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। বাংলার নবজাগরণের নায়কগণ যথা রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষকতাকে ব্রত'র পাশাপাশি বৃত্তি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ প্রবন্ধে, আদর্শ শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায়ের কথা উল্লেখ করেছেন রবিঠাকুর। আপন ভোলা শিক্ষক টাকা পয়সার চিন্তা না করলেও, বাস্তবের নিরিখে তার পিতার কাছে অর্থ সাহায্য পাঠাতেন রবীন্দ্রনাথ।[১৪]

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথও শিক্ষকের•'Plain living and high thinking'-এর আদর্শকে মানলেও, তাদের ন্যূনতম জীবন ধারাকে বহন করার দায়িত্ব যে বিদ্যালয়ের উপরেই ন্যস্ত হয়, তা স্বীকার করে নিয়েছিল। এর পূর্বেও আদর্শ পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের মতো ব্রতধারী শিক্ষকেরা তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত কাজের জন্য, সরকারি/বেসরকারি কর্তৃপক্ষের তরফে বেতন নিতেন, তাও আমরা জানি।[১৫] তারা কেউই শিক্ষকতার 'ব্রত' ও 'বৃত্তির' মধ্যে সম্পর্ককে অস্বীকার করেন নি। এক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আমলে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং স্বদেশি যুগের জাতীয় শিক্ষার অন্যতম কর্ণধার সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষক স্বার্থবাহী পদক্ষেপের কথাও আমাদের স্বতঃই স্মৃতিতে আসে।[১৬]

বিংশ শতকের ২য় দশকে একদিকে সোভিয়েত বিপ্লব, অন্যদিকে গান্ধীজীর সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের প্রভাব শিক্ষকদের জীবনেও পড়েছিল। জনগণের বিভিন্ন অংশের মানুষ তখন তাদের স্ব-স্ব জীবিকার উন্নয়নের জন্য সংঘবদ্ধ হবার প্রেরণা পেয়েছিল। বিশেষ করে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC) প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে শ্রমিক শ্রেণির সংঘবদ্ধ সংগ্রাম অন্যান্য পেশার মানুষদের সংঘ শক্তিতে আস্থাবান হতে সহায়তা করেছিল। আমাদের আলোচ্য বাংলার শিক্ষকেরাও তার ব্যতিক্রম ছিল না—১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামে সীমিত ভাবে শিক্ষকদের সংগঠন গড়ে তুলবার যে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়েছিল, তাই চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করেছিল ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে। বাংলার বাইশ জন প্রধান শিক্ষকের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে গড়ে উঠেছিল, এই সমিতি। এটা ঠিকই জন্মলগ্ন থেকে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোটামুটি ভাবে, আবেদন নিবেদনের মধ্য দিয়ে, শিক্ষক সমিতি অনিচ্ছুক ম্যানেজিং কমিটি, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের হাত থেকে কিছু দাবি আদায় করতেই সচেষ্ট হয়েছিল। তবু তাদের দাবি দাওয়া যেমন, ৫০% বেতন বৃদ্ধি, চাকুরির নিরাপত্তা, ভবিষ্যৎ নিধি চালু করার জন্য সাদা-কালোয়, দাবিপত্র পেশ করে চলেছিল কর্তৃপক্ষের কাছে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে সমিতির অনুরোধ মেনেই সরকার 'বিদ্যালয় পরিচালনার বেদ' হিসাবে স্কুল কোডের' প্রচলন করেছিল। এই সময় পর্বেই ঔপনিবেশিক প্রাদেশিক সরকার বে-সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নতি কল্পে তিন লক্ষ টাকা মঞ্জুর করতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৪০ পর্যন্ত এই রকম ভাবে নরমনীতিই ছিল সমিতির নেতাদের অভীষ্ট। একটি সারণির মাধ্যমে আমরা সেই সময়ে সমিতির কার্যকলাপকে বিন্দুতে সিন্ধুর মতো তুলে ধরতে পারি।

সারণি—১

বছর	**দাবিসমূহ**	**আন্দোলনের প্রকৃতি**
১৯১৫-এর পরবর্তী কাল।	শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা ও ছাত্র কল্যাণ।	নিয়মতান্ত্রিক ও আবেদনমূলক বাইরের গণ আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ হীনতা।
১৯২১ (আনুষ্ঠানিক-ভাবে শিক্ষক সমিতি গঠন) থেকে ১৯৪৭ (স্বাধীনতা) পর্যন্ত।	বাইরের রাজনীতি যথা গান্ধীজীর আন্দোলনের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে নৈতিক সমর্থন ও চাকুরির স্থায়িত্বকরণ ও বেতন বৃদ্ধির দাবি।	নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন তবে জনমনে শিক্ষক আন্দোলন সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আভাষ।

এদিকে ৪০-এর দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু ও শেষের পরবর্তী কালে, দেশ স্বাধীন ও বিভক্ত হলো। বিভাজিত বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে শিক্ষক আন্দোলন অনেকটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। স্বদেশি সরকারের কাছে স্বভাবতই তাদের প্রত্যাশা ছিল অনেক। কিন্তু বাস্তবে সরকারের কাছে মাত্র দশ টাকা মহার্ঘ ভাতা চেয়েও তারা প্রত্যাখ্যাত হলেন। সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইলো না শিক্ষকদের। শিক্ষক সমিতির নরমপন্থী ও চরমপন্থী নেতৃত্বের মধ্যে আন্দোলন সংগ্রামের পদ্ধতি নিয়ে শুরু হল দ্বন্দ্ব। এই রকম সময়েই সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্বে আন্দোলনমুখী সমিতির অংশটি সক্রিয় হয়ে উঠলো। এটা ঠিকই পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সদর্থক না হলে কখনো কোন আন্দোলন গতিশীল হয় না। ইতিহাসে তাই 'স্থান ও কালের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু উপযুক্ত নেতৃত্ব না থাকলে, আন্দোলন দানাও বাঁধে না—এটাও সমভাবে সত্যি। নৈর্ব্যক্তিক আন্দোলনমুখী আবহাওয়ায়, সংগ্রামের তরণীকে সাফল্যের তীরে নিয়ে যেতে পারেন সফল নেতৃত্ব। আসলে যে কোন দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের প্রক্রিয়া ও ফলাফল সম্বন্ধে যাঁদের একটি অন্তর্দৃষ্টি থাকে, তারাই হতে পারেন, সংগ্রামের সারথি।'[১৭] নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি ৪৮' থেকে এই রকম একজন নেতার দেখা পেল। তিনি হলেন সত্যপ্রিয় রায়। ইতিহাস ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়—কিন্তু ব্যক্তি-নেতার গুরুত্বও বড় কম নয়। অবশ্য একক ব্যক্তির নেতৃত্ব অনেক সময়ই এক নায়কত্বের জন্ম নেয়। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ক্ষেত্রে উপরোক্ত পর্বে অবশ্য সে রকম ঘটনা ঘটেনি। সত্যপ্রিয় রায় তাঁর সহযোগী হিসাবে এই পর্বেই পেয়েছিলেন, অনিলা দেবী, সন্তোষ ভট্টাচার্য, গোলকপতি রায় এবং রথীন্দ্রকৃষ্ণ দেবের মতো নেতা নেত্রীদের।

৪৮-এর আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ যখন ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ঐতিহাসিক বারো দিনের সংগ্রামের অগ্নিবলয়ে পরিণত হল, তখন শিক্ষক শক্তি যেমন একদিকে তাদের সহিষ্ণুতা ও সব কিছু শান্ত মনে মেনে নেবার মনোভাবকে তাদের অঙ্গের ছেঁড়াধুতি ও ভাঙ্গা ছাতার মতো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, তেমনি বিভিন্ন গণ সংগঠন সহ সাধারণ মানুষ তাদের পাশে এসে, সংগ্রামের ময়দানে সহযাত্রী হবার ফলে, তাদের এতদিনকার 'ঠুনকো ব্রতচারী' চরিত্রেরও পরিবর্তন হল। কেউ খাবে/কেউ খাবে না/তা হবে না—তা হবে না' বলে শ্রমিক, কৃষক, উদ্বাস্তু আন্দোলনের সহযাত্রী হলেন তাঁরা। ১৯৫৪-এ যে ঐতিহাসিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তারই হাত ধরে ১৯৫৮, ১৯৬৬-তে আবারো দুঃসাহসিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হলেন তাঁরা। তাঁরা আর তখনো নিঃস্ব, নির্বান্ধব নয়, ছাত্ররাও আজ শিক্ষক গুরুদের সহযাত্রী। কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের কলমে যেন সেই মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে—'তোমরা দিয়েছ শিক্ষা/যে শিক্ষায় কলম ধরেছি/অন্যায়ের প্রতিবাদে/আজ যদি জীবন সংগ্রামে/যদি থাকি নিরপেক্ষ/লেখনীতে জ্বলন্ত প্রচার/না যদি বেরোয়, তবে মাথায় পড়ুক বজ্রাঘাত/কবি জন্ম শেষ হোক।'[১৮] সলিল চৌধুরীর কথা ও সুর শিক্ষক আন্দোলনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে রণিত হয়ে উচ্চকিত হয়ে বলে উঠেছিল, 'পথে এবার নামো সাথি/পথেই হবে, এ পথ চেনা।'[১৯] বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সেই সময়ে দক্ষিম, বাম নির্বিশেষে শিক্ষকদের পাশে এসে তো দাঁড়িয়ে ছিলই এমন কি তৎকালীন শাসক শক্তি কংগ্রেসের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরাও শিক্ষক সমাজেরহ পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সেদিন। জে. সি. গুপ্ত এবং চারুচন্দ্র সান্যালের মতো

পুরনো কংগ্রেস নেতারা বিধানসভার অন্দরে, শিক্ষকদের সঙ্গে সমঝোতা করার জন্য চাপ সৃষ্টিও করেছিলেন। এই সময় শিক্ষকদের আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির দিকে আমরা যদি একটু সচেতন দৃষ্টি দিই তবে দেখতে পাব যে, অনর্থক গণ্ডগোল করে, 'আন্দোলনের জন্যই আন্দোলন' তারা করেন নি, বরঞ্চ একটি উন্নত, বিজ্ঞানসম্মত, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এবং শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দাবির প্রতি রাষ্ট্রশক্তির দৃষ্টি আকর্ষণই তাঁরা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরকারের সমর্থন বেশির ভাগ সময়েই তাঁরা পেতে সমর্থ হননি। এমনকি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত মুদালিয়র বা কোঠারী কমিশনের সুপারিশগুলি বাস্তবায়িত করবার জন্য শিক্ষকদের অনুরোধও রাজ্য সরকার রাখেন নি। তদুপরি সরকার শিক্ষক সংগ্রামে 'বিভাজন কর এবং শাসন কর' নীতি অনুসরণ করে, শিক্ষক সমিতির মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করতে সদা সচেষ্ট ছিল।

এটা ঠিকই বামপন্থী দল এবং অন্যান্য গণ সংগঠন শিক্ষক আন্দোলনকে সব সময় সমর্থন জানিয়েছিল। শিক্ষক আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ ভাবে সংগ্রামশীল করার পেছনে তাঁদের অবদান ছিল যথেষ্ট। এই রকম পরিস্থিতিতে বাম তথা কমিউনিস্টপন্থী বিভিন্ন গণসংগঠনের সঙ্গে শিক্ষক সমিতির অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল স্বাভাবিক ভাবেই। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির বামপন্থী কর্মচারী, শ্রমিকদের জোটের অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে, সমিতির ইতিহাসে একটি জলবিভাজিকা হিসাবে আমরা গণ্য করতে পারি। এরই চরম পরিণতিতে ১৯৬৬-এর আন্দোলন প্রসূত অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে, শিক্ষক সমিতি কংগ্রেস সরকার সম্বন্ধে চরম মনোভাবাপন্ন হয়ে 'Oust this anti people Government' শ্লোগান তুলতে বাধ্য হয়। ক্রমশঃ নিজ স্বাধীন অস্তিত্বের অবলুপ্তির পথে এগিয়ে গিয়ে সমিতি চরমপন্থীদের বিশেষ করে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়ার ভালো/মন্দ দুটি দিকই ছিল, যা আমরা মূল আলোচনায় বিশ্লেষণ করেছি। এই 'কমরেড শিপের' ফল স্বরূপই ১৯৬৯-এর দ্বিতীয় যুক্ত ফ্রন্টের সরকারে শিক্ষামন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করতে আহ্বান জানানো হয়, শিক্ষক সমিতির অবিসংবাদিত নেতা সত্যপ্রিয় রায়কে। মনে রাখতে হবে, সত্যপ্রিয় রায় কিন্তু তখনো সরকারে আসীন, মুখ্য দল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দলের 'সভ্য' ছিলেন না—যদিও ওই দলটির আগ্রহাতিশয্যেই তাঁর শিক্ষা মন্ত্রীর পদে বসতে হয়েছিল। এই সময়কার শিক্ষক সমিতির কার্যাবলী আমরা আরেকটি সারণির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি।

সারণি—২

বছর	দাবিসমূহ	আন্দোলনের প্রকৃতি
১৯৪৮-৬১	অনিচ্ছুক সরকারের কাছে পেশাগত অবস্থার উন্নতির দাবি।	প্রথমে আবেদন নিবেদনের প্রকাশ দেখা গেলেও, পরিস্থিতির চাপে চরমপন্থী ও রাস্তার আন্দোলন। ১৯৫৪-এর বিখ্যাত ১২ দিনের আন্দোলন এই পর্যায়েরই ফসল। শুধুমাত্র শিক্ষকদের নিজস্ব সভা সমিতি নয়। বিভিন্ন স্তরের
১৯৬২-৬৬	উগ্র জাতীয়তাবাদী আক্রমণের মুখে, অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার পাশাপাশি তৎকালীন সরকারের রাজনীতির বিরোধিতা।	মানুষের আন্দোলনে এক সাথে প্রকাশ্য সভা ও সমাবেশ। বিভিন্ন পেশা সংযুক্ত অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে যৌথ সংগ্রাম।

এর পরে সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলনের ভাঙ্গনের অব্যবহিত পূর্বের অবস্থা। মূল লেখায় আমরা লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। একদিকে গণসংগঠন হিসাবে এই সময় মূল সমিতির উপর যেমন ক্রমশঃ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বিস্তৃত হচ্ছিল, শিক্ষক আন্দোলনের অগ্রবর্তী নেতা হিসাবে 'কমিউনিস্ট ত্রয়' অনিলা দেবী, গোলকপতি রায় ও রথীন্দ্রকৃষ্ণ দেব সমিতিকে ধীরে অথচ মসৃণ ভাবে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ছত্রছায়ায় এনে ফেলছিলেন শিক্ষক সংগঠনকে। তখনো অবধি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তির সমিতির শীর্ষ নেতা সত্যপ্রিয় রায়ও ক্রমশঃ নকশাল আন্দোলন জনিত হঠকারিতার পাশাপাশি 'নব কংগ্রেসের গুন্ডা' বাহিনীর 'শিক্ষকদের উপর প্রতিনিয়ত দৈহিক ও মানসিক উৎপীড়ন দেখে ক্রমশঃ মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের বৃত্তের মধ্যে চলে আসতে থাকেন। এর আগে বহুবার তাঁকে উপরোক্ত পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করার জন্য, সমিতিতে তার সহযোগী কমিউনিস্টরা অনুরোধ করলে, 'বুড়ো বয়সে' শৃংখলাবদ্ধ পার্টিতে থাকার অপারগতাই জানিয়ে ছিলেন তিনি। তবে ৭০'-এর সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির 'অশনী সংকেত' তার দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন এনেছিল। বিশেষ করে, মুর্শিদাবাদের শিক্ষক নেতা সন্তোষ ভট্টাচার্য, তথাকথিত নকশালদের হাতে মৃত্যুবরণ করলে, সেই ঘটনা তাঁর বুকে 'শেল' সম আঘাত করেছিল। এই পরিস্থিতিতে এতদিনকার স্বাধীন গণসংগঠনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী সত্যপ্রিয় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ গ্রহণ করলেন। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি এর পরে পরিণত হয় ওই বিশেষ রাজনৈতিক দলের গণ সংগঠনে। তার ভালো-মন্দ আমরা মূল নিবন্ধে আলোচনা করেছি।

এই পর্যায়ে সমিতির পথ চলাকেও আমরা নিম্নলিখিত সারণির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি।

সারণি—৩

বছর	দাবিসমূহ	আন্দোলনের প্রকৃতি
১৯৬৭-৭০	শুধুমাত্র শিক্ষকদের আর্থ-সামাজিক দাবি নয়, রাজনৈতিক অধিকারের দাবি করা হয়েছিল—এই পর্যায়ে এর পাশাপাশি শিক্ষা প্রশাসনে গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এই সময়ে।	দুই বাম প্রাধান্য যুক্ত সরকারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ। এর পাশাপাশি মাঠে-ময়দানে লড়াই-এ অংশগ্রহণ। সমাজের অন্যান্য গণ সংগঠনের সঙ্গে একত্রে লড়াই।

যদিও আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রের বহির্ভূত, তবুও অতি সংক্ষেপে আমরা ১৯৭০-৭১-এর শিক্ষক সমিতির ভাঙ্গন পরবর্তী পর্বের একটি অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। এই দশকের প্রথমার্ধে প্রথমে দিল্লির দাপটে, বিশেষ করে, কেন্দ্রীয় সরকারের পশ্চিমবঙ্গ সংক্রান্ত মন্ত্রী ও ৭২'-এর অনৈতিক নির্বাচনের কাণ্ডারী, পরবর্তীকালের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের পাঁচ বছরের শাসন শিক্ষকদের পক্ষে সুখকর হয়নি। এর দোসর হিসাবে এসেছিল নক্‌শালপন্থীরা। এঁদের অনেকেই আদর্শবান হলেও, ভুল পথে শ্রেণি শত্রুদের রক্তে হাত রঞ্জিত করবার মানসে, অনেক সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছিলেন। শিক্ষকদের উপরেও আক্রমণ নেমে এসেছিল তখন। আমাদের এই প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে পড়ে শিক্ষক আন্দোলনের নেতা সন্তোষ ভট্টচার্য ও বিমল

দাশগুপ্তের হত্যা। যাদবপুরের উপাচার্য অজাতশত্রু গোপাল সেনকে হত্যা করে কংগ্রেস কিংবা নকশালেরা। অর্থনৈতিক দাবিদাওয়াকে পেছনে সরিয়ে নিজেদের জান ও জবানের অস্তিত্ব রক্ষা করাই তাঁদের তখনকার মূল কাজ ছিল।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট রাজ্যের ক্ষমতা পায়। তাদের ৩৬ দফা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মধ্যে ৮ দফাই ছিল শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন সংক্রান্ত।[২০] কংগ্রেস আমলে যেসব শিক্ষককে জোর করে, পদচ্যুত করা হয়েছিল—তাঁদের আবার পুনঃবহাল করেছিল এই সরকার। ৭৮-এ শিক্ষকদের বেতন সংক্রান্ত দাবির পরিপ্রেক্ষিতে 'পে-কমিটি বসিয়েছিল সরকার। বন্ধু সরকার'কে মূলগত ভাবে সমর্থন করলেও, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি কিন্তু আন্দোলনের পথ পুরোপুরি রুদ্ধ করেনি। পে কমিটির সংক্রান্ত ব্যাপারে, এমনকি প্রাথমিক স্তরে 'ইংরাজি পড়ানো কোন ক্লাস থেকে হওয়া উচিত—এই প্রসঙ্গে সরকারের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছে তারা। আবার অবৈতনিক শিক্ষা চালু করা, প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনা মূল্যে খাদ্য বিতরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁরা বামফ্রন্ট সরকারকে সহায়তাও করেছেন। অবশ্যই এই সময়ে শিক্ষক আন্দোলনের দিক দর্শন-এর বদল হয়েছে। অনেকের মতে নেতৃস্থানীয় এ. বি. টি. এ. কর্মীরা, প্রশাসন এবং বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনী পদে তাদের পার্টির এজেন্ট হিসাবে কাজ করছেন। দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য-এর বই থেকে আমরা জানতে পারি, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বিশেষ করে গ্রাম বাংলায় বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক বর্ধিত অর্থনৈতিক সুবিধাকে হাতিয়ার করে, শিক্ষকেরা একটি 'Privileged class'-এ পরিণত হয়েছিল। আবার আঞ্চলিক পঞ্চায়েতে বহুলাংশে তারাই ছিল হর্তা কর্তা। এর ফলে পূর্বে ছেঁড়া ধুতি ও ভাঙ্গা ছড়ির'-এর শিক্ষকরা যেমন গ্রাম সমাজে শ্রদ্ধা-সম্মান পেতেন, তা থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে থাকেন শিক্ষকদের একাংশ। সুবিধাভোগী শ্রেণিতে পরিণত হন তারা। দূরত্ব বাড়ে আপামর জনতার সঙ্গে। কিছুদিনের মধ্যেই সরকার তার ভুল বুঝতে পারে। দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যের কথায়, 'In the new climate the left parties the CPI(M) in particular, quickly revised their approach to school teachers. Officially, the left now claimed that by involving themselves in politics and by standing as representative in the local Government the school teachers were neglecting their primary responsibility of teaching'.[২১] যদিও গ্রাম্য আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের গুরুত্বকে কোন ভাবেই হ্রাস করা যায় নি, এর পরেও। এরাই পরবর্তীকালে দ্বৈপায়ন বাবুর কথায়, '.....these local agents of the left, the key levers of its mammoth 'machinery' swiftly changed sides offering a ready net work to the opposition TMC for rapidly expanding the latter's operations.[২২] যাক সে অন্য প্রসঙ্গ—অন্য কথা।

আবার একটি সারণির মাধ্যমে আমরা শিক্ষক আন্দোলনের উপরোক্ত ঘটনা প্রবাহকে বুঝতে চেষ্টা করব।

সারণি—৪

বছর	দাবিসমূহ	আন্দোলনের প্রকৃতি
১৯৭০-৭৬	অতি বাম এবং কংগ্রেস সরকারের প্রশাসনের ও দলীয় কর্মীদের দ্বারা শিক্ষক সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।	অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মবিরতি ধর্ণা প্রভৃতির পাশাপাশি, গোপন ভাবে আন্দোলনের প্রস্তুতি। শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক আন্দোলন। বন্ধু সরকার এর
১৯৭৭-এরপর	কর্ম পরিবেশের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক দাবি সমূহ 'বন্ধু সরকারের' সমীপে পেশ করা। শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পাঠ্যক্রম প্রণয়নে গণতান্ত্রিকতা ও বিজ্ঞানসম্মত অভিমুখের দাবি।	সাহায্যে কনফারেন্স, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতি সংগঠিত করা। উদ্দেশ্য—একটি গণতান্ত্রিক ও বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলা।

তারপরে এসেছিল ১৯১১—আবার অ-মিত্র সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার সময় এসেছিল শিক্ষক সমিতির। এইভাবে ১৯২১ অর্থাৎ আজ পর্যন্ত সংগ্রাম আন্দোলনের উতরাই চড়াই বেয়ে চলেছে ১০০ বছরের পুরনো সংগঠন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি। এই চলার পথে কখনো রয়েছে ঝড় ঝঞ্ঝা। কখনো বা আপাত শান্ত পরিবেশে চলেছে এই সংগঠনের বালার্ক খচিত পতাকা হাতে শিক্ষকদের নিরবচ্ছিন্ন মিছিল। কখনো ভুলভ্রান্তি এসে ব্যক্তি শিক্ষক ও সমষ্টিগত সংগঠনকে দিকভ্রান্ত করেছে—আবার সেই ভুল ভ্রান্তিকে অতিক্রম করে সমিতি নতুন উদ্যমে চলেছে নবতর পথে। কবির ভাষায় শেষ কথা হিসাবে আমরা তাই বলতেই পারি, 'কারাগার আর শহীদ শোণিতে লেখা ইতিহাস/জাগিয়ে রেখেছে পথ চলবার ঐক্যের বিশ্বাস/....সংগ্রাম মানে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি/সাম্য পথের নিশানা চিনে ইতিহাস নির্মিতি।'[২৩]

সূত্র নির্দেশ

১. দত্ত, সত্যব্রত—বাংলার সংসদীয় রাজনীতির ইতিবৃত্ত, কলকাতা, ২০১৭, পৃঃ ১৭৬
২. দত্ত, সীমা (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, শতবর্ষ সংখ্যা, কলকাতা, সেপ্টেঃ ২০২০, প্রবন্ধ ঃ শিক্ষা নিয়ে ভাবনা'—তুষার কান্তি পঞ্চানন, পৃঃ ৪৫৮
৩. বাগ, অজিত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জুবিলি সংখ্যা, কলকাতা, সেপ্টেঃ ১৯৯৬, প্রবন্ধ ঃ 'এক নজরে পঁচাত্তর বছর—লেখকের নাম হীন, পৃঃ ৪৬৮-৬৯
৪. মিত্র, দীপক, বামফ্রন্ট সরকার, ৩৪ বছরের ইতিহাস সংকলন, কলকাতা, ২০১৪, পৃঃ ৩১
৫. বাগ, অজিত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জুবিলি সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'এক নজরে পঁচাত্তর বছর', প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬৯

৬. দে, অসিতকৃষ্ণ (সং), পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলন, কলকাতা, ২০০০, প্রবন্ধ ঃ 'শিক্ষক আন্দোলন'—অরুণ কুমার সেনশর্মা, পৃঃ ৯৪
৭. তদেব, পৃঃ ৯২
৮. তদেব, উদ্ধৃতি, দৈনিক প্রতিদিন, ২০শে জুন, ১৯৯৯, পৃঃ
৯. তদেব, পৃঃ ৯৩
১০. তদেব, পৃঃ ৯৮
১১. বিশ্বাস, কান্তি—'আমাদের শিক্ষা, কলকাতা, ২০০৬, প্রবন্ধ ঃ তিন দশকে এই রাজ্যের শিক্ষার অগ্রগতি', পৃঃ ১০৩
১২. Bhattacharyya, Dwaipayan, Government as Practices–Democratic left in a transforming India, Kolkata, 2016, p. 101
১৩. তদেব, পৃঃ ৯৩
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষা চিন্তা—প্রবন্ধ ঃ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, কলকাতা, ২০১২, পৃঃ ৩৭৭
১৫. মণ্ডল, অজিত ও চট্টোপাধ্যায় কৌশিক (সং), সমকালের ভাবনায় বিদ্যাসাগর, কলকাতা, ২০২১, প্রবন্ধ ঃ শিক্ষক সংস্কারে শিক্ষক বিদ্যাসাগর—তৃষ্ণা গোস্বামী, পৃঃ ২০৭-০৮
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ (সং), শারদীয় কালান্তর, ২০১৯, প্রবন্ধ ঃ 'দ্বিশতবর্ষে অক্ষয় কুমার দত্ত'—প্রবাল সেনগুপ্ত, পৃঃ ২৩০
১৭. Plekhanov, G.V–The Role of the Individual in history, Kolkata, p. 50 উদ্ধৃত 'চিত্তরঞ্জন দাশ ও বাংলার রাজনীতি—সমালোচনার আলোকে'—প্রবাল সেনগুপ্ত, কলকাতা, ২০১৮, পৃঃ ১১-১২
১৮. ঘোষ, বিমল চন্দ্র, উদ্ধৃত, শচীন্দ্র কুমার মজুমদার, পৃঃ ১৫৩
১৯. চক্রবর্তী, প্রিয়দর্শী (সং), জীবন উজ্জীবন এবং.....—সলিল চৌধুরী, কলকাতা-২০২০, পৃঃ ২৬৯
২০. মিত্র, দীপক, বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরের ইতিহাস, সংকলন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১
২১. Bhattacharyya Dwaipayan, Government as Practices, প্রাগুক্ত, p. 102
২২. তদেব, পৃঃ ১০৩
২৩. দত্ত, সীমা, শিক্ষা ও সাহিত্য, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির শতবর্ষ সংখ্যা, ফেব্রুঃ-মার্চ, ২০২১, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে রচিত থিম সঙ্', কথা ঃ উৎপল রায়, সুর ঃ তাপস কুমার রায়, পৃঃ ৩০১

পরিশিষ্ট—১

সত্যপ্রিয় রায় এবং মাধ্যমিক শিক্ষক আন্দোলন

ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, আন্দোলন-সংগ্রাম সংগঠনে বৃহৎ ভূমিকা পালন করেন, না, স্থান-কাল-পরিবেশই সেখানে নির্ধারিত করে ভবিষ্যতের রূপরেখা, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতদ্বৈধতা, চিরকালের। 'ঐতিহাসিক অনিবার্যতায়' বিশ্বাসী হলেও, হয়তো আমাদের অনেকেরই মনে হয়, একটি বিশেষ দেশে জন্মে, নির্দিষ্ট পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় 'স্থান-কালের নিরিখেই একজন নেতৃস্থানীয় মানুষের কার্যাবলীর রূপরেখা অঙ্কিত হয়। তবে মনে রাখতে হবে তা রূপরেখাই—বিস্তৃত কাজ নয়। এবং এখানেই ব্যক্তি সত্তার নেতৃত্বগুণ ইতিহাসের উপজীব্য হতে পারে। ই. এইচ. কারের 'What is History'-এর বক্তব্যের সঙ্গে তাই একমত হয়ে বলা যেতেই পারে, '.....যা অপরিহার্য মনে হয়, তা হল একজন মহামানবের মধ্যে একটি অতি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া, যিনি একই সঙ্গে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটির ফসল ও তার নির্বাহী। যে সব সামাজিক শক্তি, পৃথিবীর ও মানুষের চিন্তাধারার ধরণ বদলে দেয়—একসঙ্গে যিনি তাদের প্রতিনিধি তথা স্রষ্টা।'[১]

একটি নির্দিষ্ট আন্দোলনের মধ্যেকার ধারাবাহিকতা যেমন ঐতিহাসিক ভাবে গড়ে ওঠে, তেমনি সেই নির্দিষ্ট আন্দোলনটি নিজেকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিজের মধ্যে কিছু রূপান্তরও সংযোজিত করে। এই ধারাবাহিকতা ও রূপান্তর যেমন নৈর্ব্যক্তিক ঘটনাক্রমের দ্বারা পরিচালিত হয়, তেমনি সেখানে ব্যক্তির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সংগ্রামময় দিনগুলোর প্রাণপুরুষ, সত্যপ্রিয় রায় শিক্ষক আন্দোলনে কি ভূমিকা নিয়েছিলেন, আবার আন্দোলন তার চিন্তা সত্তায় কি পরিবর্তন আনয়ন করেছিল—তার ভূমিকা হিসাবেই কথা কটি বললাম। এই দৃষ্টিভঙ্গীর নিরিখেই আমরা গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলায় যে সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, তার ধারাবাহিক ও রূপান্তরিত ইতিবৃত্ত আলোচনা করতে সচেষ্ট হয়েছি। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার বাইশজন প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় রংপুরের গাইবান্ধায় বাংলায় মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রথম সংগঠিত সমিতি হিসাবে জন্ম নেয় নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি। সেই সময় দেশে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক সংকটের সূচনা হয়েছিল। এই সংকটের প্রভাব পড়েছিল শিক্ষকদের মধ্যেও।[২] ১৯১৭-এর রুশ দেশের সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আর আমাদের দেশে গান্ধীজীর গণমুখী আন্দোলনের ফলস্বরূপ বিভিন্ন পেশাভুক্ত ব্যক্তিবর্গ, তাদের আর্থ রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ নিরসনের তাগিদে সংগঠিত হতে শুরু করেছিলেন বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে।

১৯২১ খ্রিস্টব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষক সমিতির গঠনের একটি সদর্থক দিক অবশ্যই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। প্রাথমিকভাবে 'মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক ব্যক্তিবর্গের দ্বারা সমাকীর্ণ',

শিক্ষক সম্প্রদায় রাস্তায় নেমে আন্দোলনের একেবারেই পক্ষপাতী ছিলেন না। তাদের নেতা রায়সাহেব ঈশান চন্দ্র ঘোষ বা হেমদাকান্ত রায় সাংবিধানিক চৌহদ্দীর মধ্যে আবেদন নিবেদনমূলক আন্দোলনে বিশ্বাসী হলেও, সমিতি প্রতিষ্ঠার বছরেই সমিতির মুখপত্র হিসাবে 'শিক্ষা ও সাহিত্য' পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এই পত্রিকায় প্রথম সংখ্যায়ই প্রকাশিত হয় সেই অসামান্য লেখা, 'শিক্ষকগণের আর্থিক উন্নতির উপায় কি?' অর্থাৎ তখনও অবধি কর্মগত ভাবে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের প্রতি শিক্ষকগণের অনীহা থাকলেও, তাত্ত্বিক ভাবে অন্ততঃ তাঁদের মনোগত বাসনার প্রকাশ ঘটেছিল এই লেখাতে।[৩]

তবে এই প্রসঙ্গে এটাও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে, ১৯২১-এর প্রতিষ্ঠা বর্ষ থেকে ১৯৪৭-৪৮ পর্যন্ত শিক্ষক সমিতির নরমপন্থী নেতৃত্ব শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, ছাত্রদের স্বার্থে বিদ্যালয়সমূহের পরিকাঠামোর উন্নতিকরণ, স্কুলগুলির আইনসঙ্গত পরিচালানোর জন্য 'স্কুল কোড প্রণয়ন, শিক্ষকবৃন্দের কাজের স্থায়িত্ব বিষয়ে সরকারি হস্তক্ষেপ, প্রভৃতি দাবী, তাদের বিভিন্ন বাৎসরিক সম্মেলনে রুটিন মাফিক তুললেও, তা নিয়ে কোন প্রত্যক্ষ আন্দোলন করেনি।[৪] এর মানে কিন্তু এটা নয়, যে প্রত্যক্ষ আন্দোলন গড়ে তোলার সামর্থ্য তাদের ছিল না। ১৯৪০-এর দশকে যখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের পরিচালনভার, বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে নিয়ে স্বশাসিত সংস্থা, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দাবি তৎকালীন আইনসভায় তোলা হয় এবং সেখানে সম্প্রদায়গত সদস্যপদ দানের চিন্তা করা হয়। তখন স্কুলগুলির বর্ণ হিন্দু নিয়ন্ত্রিত ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে, বৈরিতার প্রসঙ্গ ভুলে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষক প্রস্তাবিত মধ্যশিক্ষা প্রস্তাবে, তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার সংখ্যাগুরু মুসলিম সম্প্রদায়ের পৃথক সদস্যপদ দানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন।[৫] আসলে শিক্ষকরা বিদেশি প্রশাসন ও ম্যানেজিং কমিটির প্রতি ভয় মিশ্রিত একটি শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করতেন সেই সময়। তাই অর্থনৈতিক দাবি সহ অন্যান্য দাবির প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল, তাদের মুখ্য কাজ। নেতৃত্বের এই বেতসী বৃত্তি অবশ্য সাধারণ শিক্ষকদের মনঃপূত ছিল না—তাঁরা আশা করেছিলেন, দেশের তথা আমাদের রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষক সমিতির নেতৃত্ব তাঁদের দাবিদাওয়াকে, রাজ্য আইনসভায় তুলে ধরবেন এবং তার পাশাপাশি 'রাস্তাই একমাত্র রাস্তা' এই মনোভাবকে স্বীকৃতি দিয়ে সভা-সমিতি-ধর্ণা ইত্যাদি সংগঠিত করে একদিকে যেমন প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন—অন্যদিকে রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে 'প্রায় ভিক্ষাজীবী শিক্ষককুল'-এর দুর্দশা তুলে ধরার চেষ্টা করবেন।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সমিতির সাধারণ সদস্যের এই আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করবার জন্যই যেন সমিতির নরমপন্থী নেতৃত্বের বিপরীতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামপন্থী একদল নতুন নেতৃত্ব সমিতির কার্যকলাপের উপর প্রভাব বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হলেন। এই সমস্ত নেতাদের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষক আন্দোলনের জন্ম থেকে যুক্ত মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ছাড়াও, শৈলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধা রায়, অনিলা দেবী, ফুলরেণু গুহ প্রমুখের নাম আমরা করতেই পারি। তবে যে মানুষটি শিক্ষক সমিতির চরমপন্থী নেতাদের কার্যকলাপের স্ফুলিঙ্গকে দাবানলে পরিবর্তিত করেছিলেন—তাঁর

নাম সত্যপ্রিয় রায়।[৬] ১৯৪৮ থেকে ১৯৭০ শিক্ষক সমিতি ও সত্যপ্রিয় রায় যেন সমার্থক হয়ে উঠেছিল। এই কারণেই আমাদের আলোচনার শেষ পর্যায়ে পরিশিষ্ট অংশে তাঁর কথা বিশেষ ভাবে আলোচনার প্রয়োজন আমরা বোধ করছি।

কথায় বলে, 'মর্নিং সোজ দ্য ডে'। সত্যপ্রিয় রায় শিক্ষক সংগঠনের প্রাণপুরুষ হওয়ার আগে থেকেই একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামী মানুষ ও আদর্শবাদের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলায় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ১লা মার্চ তিনি জন্মেছিলেন। পিতার নাম ছিল গিরিশচন্দ্র রায়।[৭] ছোটবেলা থেকেই সত্যপ্রিয় ছিলেন বিদ্যাচর্চায় অত্যন্ত মেধাবী। তিনি প্রথমে পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রথম শ্রেণিতে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন তিনি। পরবর্তীকালে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বা বি. টি. পরীক্ষায়ও তিনি প্রথম শ্রেণি পেয়েছিলেন। পরীক্ষার ফলের নিরিখে তিনি তৎকালীন বাংলার প্রশাসনের যে কোন উচ্চপদ করায়ত্ত করা তাঁর পক্ষে সহজ সম্ভব ছিল। এমনকি পুলিশ সার্ভিসের উচ্চপদে নির্বাচিত হলেও, তিনি সেই পদ গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করেন।[৮] এছাড়াও যে কোন সরকারি বা বেসরকারি কলেজে শিক্ষকতা বৃত্তি নিতেও তাঁর সামনে কোন বাধা ছিল না। পরিবর্তে তিনি অত্যল্প বেতনে স্থানীয় মৃত্যুঞ্জয় উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। এরপরে তিনি জাফরগঞ্জ ও কানুনগোপাড়া বিদ্যালয়েও স্বল্পকালের জন্য শিক্ষকতা করেন।

আসলে শিক্ষকতা তাঁর কাছে শুধু বৃত্তি নয়, ব্রত ছিল। সম্ভবতঃ তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, শিক্ষা পিরামিডের মধ্যবর্তী স্তর অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করাই হবে তাঁর জীবনের লক্ষ্য। প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা থাকে চারাগাছ তুল্য। মাধ্যমিক শিক্ষায় সেই চারা গাছকে, পালন পোষণের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বৃক্ষে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করা হয়। আর উচ্চশিক্ষার পীঠভূমিতে যখন শিক্ষার্থীর প্রবেশ ঘটে, তখন বিদ্যাবৃক্ষে ফুল ও ফলের উদ্‌গমন ঘটে। শিক্ষার্থীদের জীবনের বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর মাধ্যমিক শিক্ষাকেই সত্যপ্রিয়, তাই তার জীবন সাধনার পীঠস্থান হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন।[৯] অবশ্য জীবনের অভিজ্ঞতা এটাই তাকে শিখিয়েছিল, যে শিক্ষকদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভালো বন্দোবস্ত না হলে শিক্ষকতার ব্রত সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব নয়।

যাইহোক পূর্ববঙ্গে থাকাকালীন তার কানুনগোপাড়া বিদ্যালয়কে একটি 'মডেল বিদ্যালয়' হিসাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন তিনি। কানুনগোপাড়া স্কুলে তার একদা ছাত্র, হুগলী জেলার সহ ম্যাজিসট্রেট নরেন্দ্রনাথ সেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ''১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্টের আমলে.....সত্যপ্রিয় রায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। সেই সময় একবার তিনি চন্দননগরে ফ্রান্স ইনস্টিটিউটে গিয়েছিলেন।.....তখন কথা প্রসঙ্গে জানাই—আমি কানুনগোপাড়া স্কুলে তাঁর ছাত্র ছিলাম। শুনে তিনি কী খুশি। সেই সময়কার অনেক কথা ও অনেকের কথা বললেন.....'।[১০] এমনই ছিল সত্যপ্রিয় রায়ের শিকড়ের টান। অবশ্য খুব শীঘ্রই একটি ঘটনা পরম্পরায় পূর্ববঙ্গ থেকে কোলকাতায় চলে আসতে হয় তাঁকে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম তখন

যুব বিদ্রোহে উত্তাল। চট্টগ্রামের স্কুল ছাত্র ও শিক্ষকরা সবাই তখন বৃটিশ সরকারের চোখে 'সম্ভাব্য বিপ্লবী'। সত্যপ্রিয় রায়ের কানুনগোপাড়া স্কুলের উপরও তখন বৃটিশদের নজর ছিল। একদিন একদল ইউরেশিয় সৈন্য স্কুল প্রাঙ্গণে বিনা অনুমতিতে তল্লাসী করার মানসে, প্রবেশ করলে, সত্যপ্রিয় রায় তার বলিষ্ঠ দেহ নিয়ে তাদের তাড়া করে, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বহিষ্কার করেন। এর ফলে বৃটিশের বিষদৃষ্টির শিকার হন তিনি।[১১]

এই রকম পরিস্থিতিতে তার সুহৃদবর্গের অনুরোধে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং দক্ষিণ কলকাতার কালিধন ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক পদে বৃত হন। মাত্র এক বছর বয়স হয়েছে তখন বিদ্যালয়টির। এই পরিস্থিতিতে সত্যপ্রিয় রায় স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিকে প্রভাবিত করে, কিছুদিনের মধ্যেই স্কুলের 'নিজস্ব ভবন' নির্মাণ করেন। একাজে তার সহযোগী হিসাবে স্কুলের সম্পাদক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ জিতেশ চন্দ্র গুহের সার্বিক সমর্থন লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। স্কুলের পরবর্তীকালের প্রধান শিক্ষক লক্ষ্মীনারায়ণ রায়-এর একটি লেখা থেকে একজন মাস্টার মশাই হিসাবে সত্যপ্রিয় রায়ের সদর্থক ভূমিকার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র আমরা পাই।[১২] লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু পুরনো বিদ্যালয় নোটিশ খাতা ও বিদ্যালয় পত্রিকা, 'বিকাশ' থেকে তথ্যসমূহ খুব সুন্দরভাবে সংগ্রহ করে—আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যেমন, ১৯৩৬-এর বিকাশ-এ লেখা হয়েছিল, 'জুলাই মাসে সর্বাপেক্ষা প্রীতিকর ও স্মরণীয় ঘটনা স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষকের যোগদান।.....ইনি কেবল মানসিক শিক্ষারই প্রধান শিক্ষক নন, শারীরিক শিক্ষারও প্রধান শিক্ষক।' এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত প্রধান শিক্ষক সত্যপ্রিয় রায়ের কলম থেকে আমরা জানতে পারি, 'শিক্ষার কোন নৈতিক বা মানসিক উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। তথাকথিত শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর বড় হইয়া উঠিতেছে।' সত্যপ্রিয় রায় আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন, ছাত্রদের চিন্তাভাবনাকে শুধু তাদের নির্দিষ্ট পাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে তারা ভালো ছাত্রের বিজ্ঞাপন পেতে পারে, কিন্তু কোনদিন সামাজিক মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। এই সামাজিক মানুষ হিসাবে ছাত্রদের গড়ে তোলার লক্ষ্যে, তিনি বিদ্যালয়ে হবি সেন্টার, কালীধন সাংস্কৃতিক সংঘ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, নাট্যানুষ্ঠান, বয়স্কাউট প্রভৃতির সৃষ্টি করেন। বাহির বিশ্বকে ছাত্ররা যাতে আপন করে নিতে পারে, সেই জন্য বিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তি খাতাতে গুরু নানকের জীবনীর অমর প্রেমের বাণী লিপিবদ্ধ করতেন তিনি, তেমনি আইনস্টাইনের মৃত্যু দিন বা মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনের পালনের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মহৎ জীবনের বাণীর সঙ্গে পরিচিত করাতেন।[১৩] জওহরলাল নেহরু পরিচালিত সরকারের বিরুদ্ধে সত্যপ্রিয় রায়ের সাংগঠনিক মতবিরোধ সত্ত্বেও, তার মৃত্যুতে ব্যথিত সত্যপ্রিয় রায় তাঁর প্রিয় ছাত্রদের নেহরুর সদর্থক দিকগুলি সম্বন্ধে পরিচিতিকরণের উদ্দেশ্যে 'বিজ্ঞপ্তি খাতায়' লিখেছিলেন, 'Indian savant whose flowless character, undaunted spirit and vast erudition will prove a source of perennial inspiration to us.'[১৪]

আর শিক্ষক হিসাবে কেমন ছিলেন ক্লাসঘরের সত্যপ্রিয় তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর প্রাক্তন ছাত্রদের স্মৃতিচারণায়। তাঁর অন্যতম প্রাক্তন ছাত্র ও পরবর্তীকালের বিখ্যাত চিকিৎসক

ডা. নারায়ণ সেনের উক্তি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ভাষায়, 'অত সুন্দর ইংরেজি পড়ানো জীবনে কোথাও দেখিনি.....সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজেও এমন শিক্ষক পাইনি।'[১৫] সত্যপ্রিয় রায়ের অতি প্রিয় ছাত্র ড. শুভঙ্কর চক্রবর্তী এক স্মৃতিচারণায় লিখেছিলেন, 'সত্যপ্রিয় রায় ক্লাস নিতেন। ইংরেজি ক্লাস.....ভাষায় দখল, সাহিত্যবোধের ওপর তিনি জোর দিতেন। প্রশ্ন করতে বলতেন। করলে খুশি হতেন। কতো কবির কথা শুনিয়েছেন। কবিতা কী গুণে মন জয় করে, বুঝিয়েছেন। স্যার সুন্দর সুন্দর বীজ ছড়িয়েছেন। অনেকের মতো আমার বুকেও কিছু ফসল হয়েছে।'[১৬] শিক্ষক আন্দোলনের ব্যস্ত নেতা হলেও, তিনি কোনও দিনও ক্লাস না নিয়ে, অপরাপর অনেক নেতাকর্মীর মতো বিদ্যালয় ত্যাগ করতেন না। এমনকি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিও যদি স্কুলে সাক্ষাৎ প্রার্থী হতেন, তাকেও সত্যপ্রিয় বাবুর শ্রেণিপাঠ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। প্রধান শিক্ষক হিসাবে, অন্য শিক্ষকদের কাজের ক্রমোন্নতি ঘটাতে সচেষ্ট ছিলেন তিনি। শিক্ষাদানের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি বিষয়ে তিনি 'পরিদর্শন খাতা'-য় একবার লিখেছিলেন, 'All my colleagues are requested to prepare detailed lesson notes on the subjects they respectivily teach in different classes....As systematic work is possible only in the case where a teacher has chalked out a definite plan before hand.'[১৭] বিজ্ঞপ্তির ভাষা ও ভঙ্গি লক্ষণীয়। প্রধান শিক্ষকের পরিচালন গত গাম্ভীর্য যেমন নোটিশটিতে বর্তমান, তেমনি সহকর্মীদের মর্যাদাকে আহত না করার প্রচেষ্টাও বিরাজমান নোটিশটিতে। শিক্ষকদের অনুপস্থিতি' যাতে কোন ভাবেই ছাত্রদের দৈনন্দিন পঠন-পাঠনের অন্তরায় না হয় এবং কিছু শিক্ষকের অনুপস্থিতি জনিত কারণে, উপস্থিত শিক্ষকদের যাতে কর্মভার বৃদ্ধি না পায়, সেই জন্যও তিনি শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ০৫/০৩/১৯৫৯ একটি বিজ্ঞপ্তিতে লিখেছিলেন, '....অনুপস্থিতি উপস্থিত শিক্ষকগণের উপর অত্যাচার—এই কথা আমি আমার সহকর্মীদের বিশেষ করিয়া স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।.....যথাসময়ে উপস্থিত না হইলে বিলম্বকারী শিক্ষক মহাশয়ের নাম ও উপস্থিতির সময় লাল কালিতে লিখিত হইবে'।[১৮]

বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যের অন্যতম অঙ্গ অভিভাবকেরা, তাঁদের সঙ্গে নিয়ত সংযোগ ছাড়া ছাত্রদের দুর্বল দিকগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করে, সংশোধন করা প্রায় অসম্ভব। সত্যপ্রিয় রায় তাই অভিভাবকদের সঙ্গে সর্বদা সরাসরি যোগাযোগ রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন। অভিভাবকেরাও তাই ছাত্র সংক্রান্ত যে কোন সমস্যায় সহজেই তাঁর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে সমর্থ হতেন। অভিভাবকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখার সদিচ্ছায় তাঁর বিদ্যালয়ে সমস্ত ছাত্রকে তাদের বাসস্থান অনুযায়ী বাইশটি অঞ্চলে বিভক্ত করে, প্রতি ভাগের দায়িত্ব নির্দিষ্ট একজন শিক্ষকের উপর ন্যস্ত করেছিলেন সত্যপ্রিয় বাবু। সেই সব শিক্ষক তাদের নির্দিষ্ট অঞ্চলভুক্ত অভিভাবকদের সঙ্গে ছাত্রদের সমস্যা—সংশোধন—সমাধান নিয়ে আলোচনা করে, বিদ্যালয়ে রিপোর্ট করতেন। সত্যপ্রিয় বাবু বলতেন, 'This is in connection with our scheme to establish closer contact with the boys and their guardians'।[১৯]

প্রধান শিক্ষক হিসাবে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী সত্যপ্রিয় রায়—শিক্ষকবৃন্দের কাছে ছিলেন বটবৃক্ষ সম, তাঁর সহকর্মীরা যে স্বল্প বেতন পেতেন, তা তাকে ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত করে

তুলতো। শুধুমাত্র জীবনমানের উন্নতিবিধানের জন্য নয়, দেহে মনে বজ্র কঠিন মানসিকতা ছাড়া যে আদর্শ শিক্ষক হওয়া যায় না—এই কথা আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করতেন তিনি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, 'দারিদ্র্য দোষা/গুণরাশিনাশা'। তাই আদর্শ শিক্ষকের অভাবজনিত ক্লান্তি ও হতাশা দূর করে, ছাত্রপ্রিয় আদর্শ শিক্ষকের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধির তাগিদেও, তিনি শিক্ষকদের আর্থিক উন্নয়নের কথা ভাবতেন। শিক্ষকদের প্রতি এই সহমর্মীতাই তাঁকে সংগঠিত শিক্ষক আন্দোলনের সংস্পর্শে এনেছিল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকেই আবেদন নিবেদনের কাঁচা রাস্তা ছেড়ে তার নেতৃত্বেই ভারত সভা হলে তুমুল আন্দোলনের পাকা রাস্তায় নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি প্রথম সংকুচিত পদার্পণ করেছিল। ওই বছরের ১লা সেপ্টেম্বর বিভিন্ন দাবিতে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছিলেন শিক্ষকেরা। উদারবাদী সত্যপ্রিয়ের তখনও 'ধর্মঘট' কথাটি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অনীহা ছিল। আন্দোলনের সমর্থনে পোস্টার দেবারও পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। পরে অবশ্য অনিলা দেবী সহ অন্যান্য সহকর্মীদের যুক্তির কাছে নতি স্বীকার করে, শুধুমাত্র বিশ্রাম কক্ষে আন্দোলনের দাবিদাওয়া নিয়ে পোস্টার লাগাতে রাজী হন তিনি।[২০] সেই যে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে আন্দোলনের রিলে রেসের ব্যাটনটি তিনি নিজে হাতে তুলে নিয়েছিলেন, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষামন্ত্রী হওয়া অবধি তাঁর হস্তচ্যুত হয়নি তা'।

আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সত্যপ্রিয় রায়, সমিতির পুরনো নেতৃত্বকে পরাভূত করে, ১৯৫০ থেকেই সমিতির নেতৃত্বদানকারী ভূমিকায় চলে আসেন। যোগ্য সাথী হিসাবে পান, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, অনিলা দেবী, সন্তোষ ভট্টাচার্য, গোলকপতি রায় প্রমুখ শিক্ষক আন্দোলনের প্রথম সারির যোদ্ধাদের।

যাইহোক আন্দোলন সংগ্রামের উর্মি তরঙ্গে আরোহণ করে সত্যপ্রিয় রায় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে সমিতির কার্যনির্বাহী সভাপতি নির্বাচিত হন। পরের বছরেই মাধ্যমিক শিক্ষকদের বার্ষিক সম্মেলনে, সমিতির সংগ্রামী অংশের সমর্থনের সুবাদে সমিতির সাধারণ সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেন তিনি। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে তার নেতৃত্বেই মাধ্যমিক শিক্ষকেরা বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে বিধানসভা অভিযান করেন। ১৯৫৩ এর চুঁচুড়া সম্মেলনকে আমরা মাধ্যমিক শিক্ষকদের সংগঠনের একটি বাঁক বা সন্ধিক্ষণ বলে মনে করতে পারি। ওই সম্মেলনেই সমিতির নতুন গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়। নতুন সাধারণ সম্পাদক সত্যপ্রিয় রায়ের পরিচালনায় সমিতি 'শিক্ষার দাবী জাতীয় দাবী' শ্লোগানকে সামনে রেখে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের পথে পদক্ষেপ করে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৫৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে শিক্ষকেরা ৩৫ টাকা মহার্ঘভাতা সহ বেতন বৃদ্ধির দাবিকে সামনে রেখে লাগাতার কর্মবিরতি শুরু করেন। কর্মবিরতি চলাকালীন তৎকালীন কংগ্রেস সরকার সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী সহ তিনশো জন শিক্ষককে গ্রেফ্‌তার করেছিল। এই প্রথম শিক্ষক আন্দোলনে সাধারণ শ্রমিক, মধ্যবিত্ত পেশাজীবীরা ও ছাত্র সমাজ এগিয়ে এলেন। সেদিনের ছাত্র ও পরবর্তীকালের গণ আন্দোলনের নেতা বিমান বসু এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, '.....১৯৫৪ সালের শিক্ষক আন্দোলন। তখন সবে আমি ১৪ বছরে পা দিয়েছি।.....তখন আমি ইস্কুলে পড়ি। তখন দেখি একটা কালো ভ্যানের মধ্যে একজন মাস্টার

মশাইয়ের জামার কলারটা ধরে প্রিজন ভ্যানে তোলা হচ্ছে। যাঁর নাম সত্যপ্রিয় রায়.....তখন আমার জানা ছিল না কে সত্যপ্রিয় রায়। আমি চিনি না, জানি না, কিন্তু দৃশ্যটা দেখে আমার ভাল লাগেনি।.....মাষ্টার মশাইয়ের গায়ে হাত দেওয়া আমার সহ্য হল না। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা ষ্ট্রাইক করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলাম।....কারণ হিসাবে জানালাম মাষ্টার মশাইদের প্রতি যে আচরণ করা হয়েছে, তার প্রতিবাদে আজ ইস্কুলে ধর্মঘট হবে।.....ধর্মঘট হয়ে গেল। আমাদের ইস্কুলের হেড মাষ্টার মশাই.....খবরটা শুনে আমাকে খুব বেত পেটা করেছিলেন। তিন-চার দিন গায়ে হাতে ব্যথা ছিল, গায়ে লাল লাল দাগ ফুটে উঠেছিল.....'।[২১] এই অভিজ্ঞতাকে শুধু বিমান বসুর ব্যক্তিগত মনোভাব ভাবলে ভুল করা হবে। সত্যপ্রিয় রায়কে আন্দোলনের 'আইকন' হিসাবে ধরে নিয়ে, সেই আন্দোলনের দিনগুলিতে শুধু ছাত্ররা নয়—শ্রমজীবী, মধ্যবিত্ত, পেশাজীবী, অধ্যাপকবৃন্দ, এমনকি নিজেদের জীবন সংগ্রামে নিয়ত লিপ্ত পূর্ববঙ্গাগত বাস্তুহারা-রাও দলে দলে শিক্ষকদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। সেদিনকার মাধ্যমিক শিক্ষকেরাও সত্যপ্রিয় রায়ের সান্নিধ্যে এসে 'সমিতির সাম্য ও ঐক্যে' বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। আন্দোলন হয়ে উঠেছিল সর্বাত্মক। বিধানসভার বাইরে ও ভিতরে দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী নির্বিশেষে, বিরোধী দলগুলি তো বটেই, এমনকি কংগ্রেসপন্থী কেউ কেউ সেদিন শিক্ষকদের দাবির সমর্থনে সোচ্চার হয়েছিলেন। আন্দোলন শেষে সব দাবি হয়তো শিক্ষকরা আদায় করতে পারেননি, কিন্তু আমাদের গুরুমহাশয়েরা সংঘবদ্ধ হলে যে অনৈতিক প্রশাসনের রথের রশি ছিঁড়ে পড়তে পারে এই বোধ প্রশাসনের অন্দরে চাড়িয়ে গিয়েছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত আমরা মূল প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। তাই এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আমরা জানি শিক্ষকদের প্রথম এই বড় আন্দোলনের জোয়ারে, সংগঠনের শীর্ষ সারথী সত্যপ্রিয় রায়, অনুধাবন করতে সক্ষম হন। সমাজের অন্যান্য অংশের শ্রমজীবী বা সংগ্রামশীল মধ্যবিত্তদের পাশে পেলেই, একমাত্র শিক্ষক সংগ্রাম সফল হতে পারে। তার ও অন্যান্য পেশাজীবী কর্মচারী নেতাদের উদ্যোগে তাই তৈরি হল, আন্দোলনের যৌথ মঞ্চ ১২ই জুলাই কমিটি। থ্রি মাসকেটিয়ার্স সত্যপ্রিয় রায়, অরবিন্দ ঘোষ ও কে. জি. ঘোষ হলেন এই যৌথ আন্দোলনের মূল স্থপতি।[২২] এর পরেই সাংগঠনিক ভাবে শিক্ষকদের তখনো পর্যন্ত একমেবাদ্বিতীয়ম সংগঠন এ. বি. টি. এ. ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের কাছে দাবিদাওয়ার পরিপূরণের জন্য অনুরোধ করলেন। সেই অনুরোধ বিফলে গেলে, ১৯৬৬ খ্রিস্টব্দে সমিতির বর্ধমান সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক স্বার্থরক্ষার আন্দোলনের আহ্বান জানানো হল। কিন্তু সেবারেও তৎকালীন কংগ্রেস সরকার শিক্ষকদের দাবির প্রতি কর্ণপাত না করার ফলে, তাঁরা আবার আন্দোলনমুখী হতে বাধ্য হন।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য শিক্ষকদের দাবিসমূহ অরণ্যরোদনে পর্যবসিত হল। আমাদের ক্ষুব্ধ গুরুকুল এর পরিপ্রেক্ষিতে ধ্বনি তুললেন, 'Oust this antipeople govt.'। এই সময় থেকেই সত্যপ্রিয় রায়ের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও একটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সেই সময় তিনি তাঁর পুরনো বুর্জোয়া উদারনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ক্রমশঃ সরে আসতে থাকলেন। অভিজ্ঞতার

আলোকে তিনি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে শিক্ষকদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে হলে রাজনীতির অঙ্গনে পা দিতেই হবে। যাইহোক, রাজ্যরাজনীতিতে নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস বিরোধী, প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু বেশীদিন টিকলো না সেই সরকার। অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও বাইরের চক্রান্ত, সাঁড়াশি হয়ে উপড়ে ফেলল এই সরকারকে। ১৯৬৯-এর মধ্যবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে আবার মানুষের রায়ে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। এই সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করবার জন্য ডাক পড়ল শিক্ষক আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা সত্যপ্রিয় রায়ের। মনে রাখতে হবে তখনো তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নন। যুক্তফ্রন্ট সরকার তাঁদের নির্বাচনী ইস্তাহারে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকরণের জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারই অনুরণন তুলে সত্যপ্রিয় রায় যুক্তফ্রন্টের সভায় শিক্ষা সংস্কারের ঘোষণা করলেন। মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ম্যানেজিং কমিটিগুলির ঘুঘুর বাসা ভাঙ্গবার জন্য প্রত্যয়দীপ্ত ভঙ্গিতে তিনি বলেছিলেন, 'The U.F. (যুক্তফ্রন্ট) was unanimous in its finding that many of the existing Managing Committees indulged in corruption and malpractices and developed into coteries of vested interest. If in view of this the Managing Committees of some 160 schools have been superseded, it was needed to implement the general U.F. policy of clean administration in public Institution'।[২৩] এছাড়া যুক্তফ্রন্টের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণি অবধি সর্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা চালু করার কথাও তিনি তাঁর বিবৃতিতে উল্লেখ করেছিলেন। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রচেষ্টাও করেছিলেন তিনি।

কিন্তু আমরা সকলেই জানি, এই দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারও প্রথমটির মতোই সরকারের বাইরের ও ভিতরের দুমুখো চক্রান্তের শিকার হয়ে খুব বেশীদিন চলতে পারেনি। তাই মন্ত্রীর চেয়ার থেকে আবার রাজপথের রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন সত্যপ্রিয় রায়। ইতিমধ্যে নকশাল আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। মন্ত্রী থাকাকালীনই সত্যপ্রিয় রায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে এই অতি বামপন্থীদের হাতে হেনস্থা হয়েছিলেন।[২৪] চারিদিকে তখন শ্রেণি শত্রুর রক্তে হাত রঞ্জিত' করার মহড়া চলছে। শিক্ষকরাও হচ্ছেন দৈহিক ভাবে লাঞ্ছিত, মানসিক ভাবে অপমানিত। সত্যপ্রিয় রায়ের উদার আদর্শ ও স্বতন্ত্র স্বাধীন শিক্ষক সংস্থা তখনকার পরিস্থিতিতে আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র। এদিকে সেই সময়েই নকশালদের হাতে খুন হলেন, এ. বি. টি. এ.-র প্রথম সারির নেতা সন্তোষ ভট্টাচার্য। এই পরিস্থিতিতে এতদিনকার ব্যক্তিগত ভাবে উদারনৈতিক স্বাধীন সত্তা এবং সাংগঠনিক ভাবে স্বতন্ত্র গণসংগঠনের পক্ষপাতী সত্যপ্রিয় রায়, পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যোগ দিলেন রাজ্যের তৎকালীন সর্ববৃহৎ বামদল—মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে। সত্যপ্রিয় বাবুর আদর্শের যারা বিরোধী ছিলেন তারা এই যোগদানকে স্বাভাবিক ভাবেই ভালো চোখে দেখেনি। তাদের মধ্যে একজন এই ঘটনা সম্বন্ধে বলেছেন, 'সত্যপ্রিয় বাবুর মত মুক্তমনা, নির্দল মানুষ যখন সংকীর্ণতার ও মন্ত্রবদ্ধতার কুহকী রাজনীতিতে ঢুকলো, তখন সত্যিই বিষণ্ণ বোধ করেছি।[২৫] বক্তা সতীন্দ্র নাথ অবশ্য নিজেই

একসময় গোঁড়া কমিউনিস্ট ছিলেন। পরে মতবিরোধের কারণে পার্টি থেকে সরে আসেন। আসলে বাস্তব পরিস্থিতিতে সমিতির অস্তিত্ব রক্ষা করণের চিন্তাই ছিল তার কাছে প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ। আমরা বিখ্যাত কৃষক নেতা আবদুল্লা রসুলের সত্যপ্রিয় সম্বন্ধে 'একটি জীবনের বিকাশ ধারা' নিবন্ধের লেখা থেকে জানতে পারি।' 'তাঁর (সত্যপ্রিয় রায়), নতুন চিন্তা ও নতুন অভিজ্ঞতা বুঝিয়ে দিল যে অন্যান্য গণসংগঠনের সঙ্গে মিলিতভাবে আন্দোলন করলেও,.....তাদের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক থাকলেও, তাঁরা বিভিন্ন নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত। তাই প্রয়োজন সবগুলির জন্য একটি মাত্র বিপ্লবী নেতৃত্ব, যার প্রতি সকলেরই আস্থা ও আনুগত্য থাকবে.....সে নেতৃত্ব দিতে পারে, এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী শ্রেণি,—শ্রমিক শ্রেণি, তার বিপ্লব সচেতন সংগঠিত অগ্রণী অংশ এবং (আমাদের দেশে) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী।'[২৬] এই বিবৃতিকে শুধুমাত্র পার্টিজান এক নেতার মতামত মনে না করে এর বাস্তবিক দিকটির সত্যতা অবশ্যই কিছু পরিমাণে ছিল। এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত ভাবে আমাদের মূল নিবন্ধে আলোচনা করেছি।

সত্যপ্রিয় রায়ের পার্টি সদস্য হবার পরে, ABTA-এর অংশভুক্ত অন্যান্য দলের সদস্যরাও তাদের পৃথক সংগঠন গড়তে মরিয়া হয়ে ওঠেন। ১৯৭০-এর চন্দননগরে শিক্ষক সমিতির সম্মেলনে এই বিভাজন পরিকল্পনা স্পষ্ট রূপ ধারণ করে।[২৭] হেড মাস্টার অ্যাসোসিয়েশন গঠনের মধ্য দিয়ে সর্বদলীয় শিক্ষক সংগ্রামে, যে ভাঙ্গনের সূচনা হয়েছিল অনেকটাই তা প্রসারিত হয়েছিল ১৯৫৪-এর আন্দোলন পরবর্তী বামনদাস মণ্ডলের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি বা WBTA গঠনের মধ্য দিয়ে। আর ৭০'এর চন্দননগরের সম্মেলনের পর ABTA-এর মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দল বিরোধী সদস্যরা, প্রথমে ABTEA পরে STEA এবং আরো পরে বিভিন্ন দলের গণসংগঠন হিসাবে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী সমিতি (BETA), সারা বাংলা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি ও মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে STEA-এর বিভাজন হয়। নতুন সংগঠনটির নাম হয় 'সাগাসিয়াস'।[২৮] এই ভাঙ্গনের ভালো মন্দ নিয়ে আমরা মূল নিবন্ধে আলোচনা করেছি—এখানে তার বিস্তার ঘটনা নিষ্প্রয়োজন। তবে এইটুকু বলা যেতেই পারে, এই বিভাজনগুলির পরেও মূল শিক্ষক সংগঠন এ. বি. টি. এ. তার অর্ন্তনিহিত সংগ্রামী সত্তাকে হারিয়ে ফেলেনি। অবশ্যই সত্যপ্রিয় রায় এই ভাঙ্গনের ফলে, শিক্ষকদের একমেবাদ্বিতীয়ম নেতা হিসাবে আর থাকলেন না—কিন্তু শিক্ষক সমাজের একটি বড় অংশের আস্থাভাজন তো থাকলেনই—তার বাইরেও মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের বিভিন্ন গণসংগঠনের সাহায্যে তাঁর সমিতি শক্তিশালীই হয়ে রইল। সে অন্যপ্রসঙ্গ, আমাদের আলোচনার সময়কালের বহির্ভূত। ১৯৭০ থেকে ৭৭-এর কালো দিনগুলি এবং তারপরে বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে সত্যপ্রিয় রায়কে যেমন আমরা আন্দোলনের মাঠে ময়দানে পেয়েছি, তেমনি মধ্যশিক্ষা পরিষদের সভাপতি হিসাবেও তাকে দেখেছি, ৭৭'-এর পরবর্তীকালে।[২৯]

উপসংহারে বলা যেতেই পারে, মোটামুটি ভাবে চারভাগে বিভক্ত করে, সত্যপ্রিয় রায়ের কর্মজীবনকে আমরা দেখব। শিক্ষাব্রতী হিসাবে সকলের জন্য এবং সমমানের শিক্ষা আন্দোলনের দিশারি হিসাবে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির শুধুমাত্র অস্তিত্ব রক্ষা নয়, তাকে আরো শক্তিশালী

ও সংগ্রামমুখর করা। শিক্ষাঙ্গনের গণতন্ত্রীকরণ ও ছাত্র-অভিভাবক-শিক্ষক ঐক্যকে শিক্ষাদানের স্বার্থেই সুদৃঢ় করা এবং তাঁর দল যখন সরকারি ক্ষমতায় এলো, তখন শিক্ষা ক্ষেত্রে গণটোকাটুকিকরণ বন্ধ করা ও নৈরাজ্যের অবসান ঘটানো হল তার লক্ষ্য। শিক্ষক নেতা প্রশান্ত ধরের স্মৃতিচারণের অনুরণন করে আমরা তাই বলতেই পারি, যে 'উপরোক্ত কাজগুলি, শুধুমাত্র তত্ত্বে নয়, শুধুমাত্র আবেগে নয়, শুধুমাত্র ঘোষণায় নয়, জীবনাচরণে এই সামর্থ্যগুলিকে বিকশিত করতে হবে।'[৩০] প্রথম জীবনে উদারনৈতিক গণতন্ত্রী ও পরবর্তীকালে মার্কসবাদের পথের পথিক সত্যপ্রিয় রায়ের এই 'শিক্ষা' শিক্ষকদের মনে রাখতেই হবে।

সূত্র নির্দেশ

১. কার, ই. এইচ—কাকে বলে ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃঃ ৫৯
২. দত্ত, সীমা (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা, কলকাতা, ২০২০, প্রবন্ধ ঃ নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির শতবর্ষ পালন ঃ এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ ও আমরা—সুকুমার পাইন, পৃঃ ৫৪৫
৩. তদেব, প্রবন্ধ ঃ শতবর্ষে শিক্ষা ও সাহিত্য—বেদব্যাস মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৩৭
৪. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ—নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, কলকাতা ১৯৭১, প্রবন্ধ ঃ নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সংগ্রামী জীবন ধারা—অনিলা দেবী, পৃঃ ০১-০২
৫. আচার্য, পরমেশ—বাঙালীর শিক্ষা চিন্তা, কলকাতা, ২০১১, প্রবন্ধ ঃ 'শিক্ষা চিন্তায় সাম্প্রদায়িক বিভাজন', পৃঃ ১২৩
৬. দত্ত, সীমা (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির শতবর্ষ সংখ্যা, কলকাতা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ২০২১, প্রবন্ধ ঃ নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির চলার পথে একুশ বছর—দু'চার কথা'—শান্তিরাম ভট্টাচার্য, পৃঃ ২৫৬
৭. মণ্ডল, বিকাশ (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, কলকাতা, আগষ্ট, ২০০৭, সাক্ষাৎকার—'আত্মজার দৃষ্টিতে সত্যপ্রিয় রায়, (সত্যপ্রিয় রায়ের কনিষ্ঠা কন্যা কৃষ্ণা সাহা), পৃঃ ৮৮৫
৮. মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ ও অন্যান্য (সং), সত্যপ্রিয় রায় ও উত্তরাধিকার, কলকাতা, ২০০৮, প্রবন্ধ ঃ এপার বাংলায় ওপার বাংলার শিক্ষায় নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিত্ব—সত্যপ্রিয় রায়—সুকুমার শীল, পৃঃ ৯৬
৯. তদেব, প্রবন্ধ ঃ 'শিক্ষা জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র সত্যপ্রিয় রায় স্মরণে, কান্তি বিশ্বাস, পৃঃ ৭৬
১০. তদেব, প্রবন্ধ ঃ এপার বাংলায় ওপার বাংলার....সত্যপ্রিয় রায়—সুকুমার শীল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৬
১১. মণ্ডল, বিকাশ (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, কলকাতা, মার্চ, ২০০৭, নেতৃত্বের শিকড় সন্ধান—লক্ষ্মী নারায়ণ রায়, পৃঃ ৩২৭
১২. মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ ও অন্যান্য (সং), সত্যপ্রিয় রায় ও উত্তরাধিকার, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ প্রধান শিক্ষক সত্যপ্রিয় রায়, লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, পৃঃ ১১৬
১৩. তদেব, প্রবন্ধ ঃ 'প্রধান শিক্ষক....', প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৮
১৪. তদেব, প্রবন্ধ, পৃঃ ১১৮

১৫. তদেব, প্রবন্ধ, পৃঃ ১১৯
১৬. দে, বন্দনা (সং), শিক্ষা দর্পণ (পঃ বঃ শিক্ষা বিভাগ সমূহের ত্রৈমাসিক মুখপত্র), কলকাতা, জুন, ২০০৫, প্রবন্ধ ঃ 'আমার শিক্ষক দেবকুমার চক্রবর্তী ও সত্যপ্রিয় রায়', শুভঙ্কর চক্রবর্তী, পৃঃ ০৫
১৭. রায়, সত্যপ্রিয় ও উত্তরাধিকার, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'প্রধান শিক্ষক সত্যপ্রিয় রায়', প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২০
১৮. তদেব, প্রবন্ধ ঃ 'প্রধান শিক্ষক সত্যপ্রিয় রায়', তদেব, পৃঃ ১২১
১৯. তদেব, প্রবন্ধ ঃ 'প্রধান শিক্ষক সত্যপ্রিয় রায়', তদেব, পৃঃ ১২১
২০. মণ্ডল, বিকাশ (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, সত্যপ্রিয় রায় জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা, কলকাতা, মার্চ, ২০০৭, প্রবন্ধ ঃ জন্ম শতবর্ষে আমাদের শপথ—চিরসাথি হোন সত্যপ্রিয় রায়—অমিতাভ সেন, পৃঃ ৩১২
২১. দত্ত, সীমা (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, শতবর্ষ সংখ্যা, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ২০২০, সাক্ষাৎকার ঃ শিক্ষা ও সাহিত্য পত্রিকার শতবর্ষ উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় জননেতা বিমান বসুর সাক্ষাৎকার, পৃঃ ৫৩৩-৩৪
২২. রায়, শিবশংকর (সং), সংগ্রামে-শপথে ১২ই জুলাই কমিটির পঞ্চাশ বছর, কলকাতা, ২০১৬, পৃঃ ২০
২৩. Roy, Satyapriya –Selected writings and speeches, Kolkata, Statement of Sri Satyapriya Roy, Education Minister, Govt of WB, at the U.F. meeting held on 20-11-1969, p. 189
২৪. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু—জোয়ার ভাটায় ষাট-সত্তর, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃঃ ১৯৮
২৫. ভট্টাচার্য, সূর্য্যাংশু (সং), পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি, সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, কলকাতা, ১৯৯৯, প্রবন্ধ ঃ 'স্মৃতিচারণ এবং শিক্ষক আন্দোলন প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন'—সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পৃঃ ২২
২৬. মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ ও অন্যান্য (সং), সত্যপ্রিয় রায় ও উত্তরাধিকার, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'একটি জীবনের বিকাশ ধারা'—মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, পৃঃ ২৫
২৭. মণ্ডল, বিকাশ (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, সত্যপ্রিয় রায় জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্বে সমিতির বহুমুখী কাজ—শৈলেন দাশ শর্মা, পৃঃ ৩২৪
২৮. মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ ও অন্যান্য (সং), সত্যপ্রিয় রায় ও উত্তরাধিকার, প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ ঃ 'কমরেড সত্যপ্রিয় রায়কে যেমন দেখেছি, বুঝেছি ও চিনেছি'—তুষার পঞ্চানন, পৃঃ ৮৫
২৯. রায়, পার্থ (সং), পর্ষদ বার্তা, শিক্ষাবিদ সত্যপ্রিয় রায় জন্ম শতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা, কলকাতা, ২০০৮, প্রবন্ধ ঃ 'উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে.....'—সুদিন চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২৬
৩০. রায়, পার্থ (সং), পর্ষদ বার্তা, তদেব, আলোচনা ঃ 'বর্তমান সহস্রাব্দের শিক্ষা ভাবনা, সত্যপ্রিয় রায়ের উত্তরাধিকার ও আমাদের করণীয়'—প্রশান্ত ধর, পৃঃ ১০৬

পরিশিষ্ট–২

অনিলা দেবী এবং মাধ্যমিক শিক্ষক আন্দোলন

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষকদের পেশাগত চাহিদার দাবি সংগঠিত করণের জন্য, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি বা A.B.T.A.-এর প্রতিষ্ঠা হয়। রায় সাহেব হেমদা কান্ত রায় চৌধুরী, ঈশান চন্দ্র ঘোষ, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রভৃতি স্বনামখ্যাত শিক্ষক প্রাথমিক পর্বে এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন। যদিও সমিতির মুখপত্র 'শিক্ষা ও সাহিত্যের' প্রথম সংখ্যাতেই শিক্ষকগণের আর্থিক উন্নতির উপায় কি?' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তবু প্রথম দিকে সরাসরি নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন বা বিদ্যালয়সমূহের ম্যানেজিং কমিটিগুলির দ্বারা নানাবিধ শোষণের বিরুদ্ধে শিক্ষক সমাজ পথে নামতে দ্বিধা বোধ করেছিলেন। শিক্ষকতার কাজ হচ্ছে 'ব্রত' কোন বৃত্তি নয়—এই মনভোলানো কথায় তখনও অধিকাংশ শিক্ষকের মন আচ্ছন্ন ছিল। তাই নিয়মতান্ত্রিক ও আবেদনমূলকভাবে ঔপনিবেশিক সরকার এবং ম্যানেজিং কমিটিগুলির কাছে দাবিপত্র পেশ করাই সংগঠনটির প্রধান কাজ ছিল।[১]

১৯৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দ থেকেই কিন্তু পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তনের সূচনা হল। সেই সময়কার ভয়াবহ মন্বন্তরে ক্ষুধার জ্বালায় নিম্নবিত্ত শিক্ষক সমাজকেও ভুগতে হয়েছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অনুবর্তন' উপন্যাসে এই সময়কার শিক্ষক সমাজের নিদারুণ দুর্দশার একটি জ্বলন্ত চিত্র অঙ্কিত আছে।[২] অবিভক্ত বাংলার পূর্বাঞ্চলেই দেশভাগের অব্যবহিত পূর্বে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বেশী ছিল। কিন্তু দেশভাগজনিত রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক কারণে শতশত শিক্ষক পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হন। এইসব শিক্ষকও অসহনীয় দুর্দশার সম্মুখীন হন—চল্লিশের দশকের শেষার্ধে। তবে পূর্ব বাংলার লড়াকু মানুষেরা খুব শীঘ্রই বিভিন্ন 'কলোনি'তে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করলে, এইসব পূর্ববঙ্গাগত শিক্ষকেরা আবার স্ব-বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে বহুলাংশে সক্ষম হন। তবে তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা পূর্ববৎ এমনকি তাঁর চেয়েও খারাপ হয়ে পড়ে।[৩] সাবেক পূর্ববঙ্গাগত শিক্ষকদের মতোই পশ্চিমবঙ্গের আদি অধিবাসী শিক্ষকেরা অর্থনৈতিকভাবে দারুণ বঞ্চিত ছিলেন। দেশ স্বাধীন হবার আগে মাধ্যমিক শিক্ষকদের মহার্ঘভাতা ছিল মাসিক পাঁচটাকা। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি সেই সময় এই ভাতা বৃদ্ধি করে দশ টাকা করার দাবি জানালেও স্বাধীন দেশের সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি।

এই রকম পরিস্থিতিতে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতার ভারত সভা প্রেক্ষাগৃহে সমিতি আহূত একটি সভায় সাধারণ শিক্ষকেরা সমবেতভাবে সমিতির এই আবেদনমূলক কার্যাবলীর সোচ্চার সমালোচনা করেন।[৪] এই র‍্যাডিক্যাল শিক্ষকদের নেতৃত্ব দেন সত্যপ্রিয় রায়, শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেণ রায় প্রমুখ শিক্ষক নেতারা। পুরনো নেতৃত্বের আপোষকামী মনোভাবের বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁরা। এই পর্বেই শিক্ষক আন্দোলনের নেতৃত্বে উঠে আসেন এক মহিলা নেত্রী, তিনিই হলেন আমাদের আজকের আলোচ্য অনিলা দেবী।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর পূর্ব বঙ্গের যশোহর জেলার এক প্রগতিশীল পরিবারে তাঁর জন্ম। মাত্র ষোল বছর বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। দুর্ভাগ্যের বিষয় বিয়ের পর মাত্র চার মাস পরে স্বামী চারুচন্দ্র মিত্রের অকাল মৃত্যু হলে তিনি নিজ গৃহে ফিরে আসেন। এরপর অসাধারণ মানসিক শক্তির সাহায্যে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি। এরপরে আই-এ, বি-এ এবং ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সফল হন অনিলা দেবী।[৫]

শিক্ষক আন্দোলনে যোগ দেবার পূর্বেই অনিলা দেবী যশোহরের তদানীন্তন 'যুব সংঘ' এর নেতা কৃষ্ণ বিনোদ রায় ও শান্তিময় ঘোষের সংস্পর্শে এসে 'দেশের কাজে' ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কোলকাতায় ছাত্রজীবনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয় বিখ্যাত বামপন্থী নেত্রী মণিকুন্তলা সেনের। তাঁর সংস্পর্শেই তিনি বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন।[৬] এদিকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে আন্দামানের বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তির দাবিতে সারা দেশ যখন উত্তাল হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেই সময়েই দেশের 'অর্ধেক আকাশ' নারীদের মুক্তির জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি নামে একটি নারীদের গণসংগঠন গঠিত হয়। এই সংগঠনের যশোহর জেলার অন্যতম নেত্রী ছিলেন অনিলা দেবীর মা গোলাপকামিনী রায় চৌধুরী। তাঁর নেতৃত্বে সেই সময়ে যশোহরে ছাত্রী ও মহিলাদের বহুসভা সংগঠিত হয়েছিল। যশোহরেরই বাসিন্দা পরবর্তীকালে বামপন্থী আন্দোলনের নেত্রী কণক দাশগুপ্ত (মুখার্জী) এবং অনিলাদেবী এইসব সভায় নিয়মিত যোগ দিতেন। এই আন্দোলন সংগ্রামের পথ ধরেই অনিলাদেবী ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ লাভ করেন। প্রথম জীবনে মূলতঃ মহিলা আন্দোলনের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন তিনি। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের মন্বন্তরে যখন সারা বাংলার মানুষ দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয়ে পড়েছিল, তখন কমিউনিস্ট ক্যাডাররা সাধ্যমতো জনগণের এই অসহনীয় দুর্দশা দূর করতে সচেষ্ট হয়েছিল। জ্যোতি বসু এই দিনগুলির কথা স্মরণ করে বলেছেন ''৪৩-এর মন্বন্তরের সময় আমাদের পার্টি তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলাদেশে ত্রাণের কাজ সংগঠিত করেছিল। জনরক্ষা সমিতি গড়া হয়েছিল আমাদের উদ্যোগে, বহু লঙ্গরখানা চালানো হয়েছিল। আমরা উদ্যোগ নিয়ে 'বেঙ্গল মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি' গঠন করি।''[৭]

যাইহোক অনিলাদেবী কোলকাতায় এই দুর্ভিক্ষ নিবারণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এই সময়ে তিনি অল্প সময় সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজে শিক্ষকতাও করেছিলেন। তারপরে শিক্ষিকা হিসাবে যোগ দেন বেলতলা গার্লস স্কুলে। সেই সময়েই শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়। তাঁর নিজেরই ভাষায়, ''.....সামনে ১৯৪৮ সাল, বোধহয় জুলাইয়ের শেষ দিক, মহিলা সমিতির কাজে কালিধন ইন্‌স্টিটিউশান-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে ডাক এল, ...আলোচনা চলছে ভারত সভা হলে আসন্ন শিক্ষক কনভেনশনের প্রস্তুতি নিয়ে। আলোচনার সূত্র ধরে ৮ই আগস্ট ভারত সভা হলেও উপস্থিত হতে হল.....চলার পথ নির্দিষ্ট হয়ে গেল—শিক্ষা আন্দোলনের পথ।[৮]

আগেই আমরা উল্লেখ করেছি, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির একদল নতুন কর্মী ও নেতা শিক্ষকদের ন্যায্য আর্থিক দাবী ও কাজের শর্ত বা Service Condition সংক্রান্ত দাবি আদায়ের

জন্য ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ভারত সভা হলের সমাবেশে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের দাবি জানায়। পুরনো আবেদন নিবেদনের পক্ষপাতী নেতৃত্ব এই নতুন পথের প্রতি সহমত না হয়ে উক্ত সভা বাতিল করলে, শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি পালটা সভা আহূত হয়। নবাগত নেতা সত্যপ্রিয় রায়, হীরেন রায় এই সভায় পাঁচটাকা মহার্ঘ্য ভাতার বদলে দশটাকা মহার্ঘ্য ভাতার দাবি সরকারের সামনে তুলে ধরার মানসে, একদিনের কর্মবিরতির পালনের সিদ্ধান্ত নেন।[৯] সমিতির মধ্যেই গড়ে ওঠে শিক্ষকদের একটি সংগ্রামী মঞ্চ—ডেমক্রেটিক টিচার্স ফ্রন্ট। এই কর্মসূচীতে অনিলাদেবী প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন। এ প্রসঙ্গে 'শিক্ষা ও সাহিত্য' নামে শিক্ষক সমিতির মুখপত্রের এককালীন সম্পাদক সেই সময়কার স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, 'মার্কসবাদী অনিলা দেবী তাঁর অগ্রণী চেতনায় যেমন ভাবে শিক্ষক আন্দোলনকে বুঝতেন, সত্যপ্রিয় রায় তখনও ঠিক সেইভাবে বুঝতেন না—শিক্ষক আন্দোলনের শীর্ষ নেতা সত্যপ্রিয় রায়ের আন্দোলনের চিন্তাভাবনাকে পাশে দাঁড়িয়ে ধৈর্য ও যত্নের সাথে জীবনমুখী করে তুলে ছিলেন কমরেড অনিলা দেবী।[১০]

এদিকে শিক্ষক আন্দোলনের তরঙ্গে ভীত তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল' আমেন্ডমেন্ট অনুসারে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে জঙ্গী শিক্ষক আন্দোলনের নেত্রী অনিলা দেবীকে গ্রেফতার করে। বন্দীদশাতেও রাজবন্দীদের বিভিন্ন দাবিদাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে তিনিও বাহান্ন দিন অনশন ধর্মঘট পালন করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে জনমতের চাপে, সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।[১১] ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নেতৃত্বের সামনের সারিতে চলে আসেন তিনি। সেই সময়কার আন্দোলনের দাবি ছিল '.....democratic governance of high schools and democrarization of education policy with an emphasis on introducing modern and scientific demands in curricula."[১২] আন্দোলনের এই দাবির মধ্য দিয়েই বোঝা যাচ্ছে যে, এ. বি. টি. এ বা নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি শিক্ষকদের আন্দোলনকে কক্ষনোই নিছক অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার মধ্যে আবদ্ধ রাখেনি। শিক্ষা ক্ষেত্রের গণতন্ত্রীকরণ তথা শিক্ষা পরিবেশে শিক্ষকদের যথাযথ ভূমিকা পালনের অধিকার, এমনকি ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানসম্মত পাঠদানের জন্য পাঠ্যসূচির সংস্কার সাধনেরও দাবি জানিয়েছিল সময়ান্তরে।

যাইহোক কারামুক্ত হয়ে অনিলা দেবী এ. বি. টি. এ.-এর ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক সম্মেলনে সমিতির মাসিক মুখপত্র 'শিক্ষা ও সাহিত্যের' সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরের বছর ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটির সম্পাদক হিসাবে তাঁকে নির্বাচিত করে তাঁর নেতৃত্বগুণেরই স্বীকৃতি দেন সমিতির তৎকালীন নেতৃত্ব। পত্রিকা পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর স্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা সর্বোপরি তাঁর সাহিত্য গুণ সম্পন্ন লেখনী পত্রিকাটির গুণগত মান উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। শুধুমাত্র দৈনন্দিন দাবিদাওয়ার কথা নয়—অনিলা দেবীর লেখনীতে পত্রিকার পাতায় রবীন্দ্র জীবনের ব্যাখ্যা আজো অনেকের স্মরণে আছে। উদাহরণ হিসাবে তাঁর লেখা 'মোর নাম এই বলে

খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক' শীর্ষক প্রবন্ধের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। শীর্ষ নামটিকে সামনে রেখে তিনি লিখেছিলেন—'রবীন্দ্রনাথের এ কামনা শূন্য হাতে যাচ্ঞা নয়। এর জন্য তিনি মানস দানের অর্ঘ্য সাজিয়ে সাধনা করেছিলেন অর্ধশতাব্দীরও বেশী সময়। শিশু মনের প্রভাতীকাকলী থেকে আরম্ভ করে, অধ্যাত্ম রাগ রঞ্জিত প্রৌঢ় বৈরাগ্যের বৈকালী সুর ধ্বনিত হয়েছে তাঁর কাব্য বীণায়। শতশত সাম্রাজ্যের ভগ্ন স্তূপ পরে যারা কাজ করে, মাটিতে ফসল ফলায় যারা, সেই অবজ্ঞাতদের পরিচয়ও তাঁর লেখনী মুখ এড়িয়ে যায়নি। বিশ্বজোড়া প্রাণের মাঝে তাই তো তাঁর স্থান।' এখানে অল্প কথায় রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শের ব্যাখ্যার পাশাপাশি অনিলাদেবীর ভাষা চয়নের দক্ষতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।[১৩]

এদিকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত 'মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ' নামে আলাদা একটি পরিচালন সংস্থা গঠিত হয়।[১৪] এই পর্ষৎ, পরিচালনার জন্য শিক্ষকদের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হন অনিলা দেবী। প্রথমেই এই নির্বাচিত পর্ষৎ একটি সুসমন্বিত শিক্ষা নীতি ও শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা ও সার্ভিস কন্ডিশন এর মানোন্নয়নের জন্য একটি খসড়া রচনা করতে অগ্রসর হয়। এই খসড়া প্রস্তাব রচনায় সাহায্য করতে গিয়ে অনিলা দেবী সুচিন্তিত মত প্রকাশ করে বলেছিলেন যে যেহেতু পাঠ্যক্রমের শেষে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রদের মূল্যায়ন করাই বোর্ডের অন্যতম প্রধান কাজ তাই প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষকদের সমস্ত রকম দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকার উপায় সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাঁর মতে অনেক সময়ই 'In appointment of all categories of examiners, qualification and experience were considered less important than the recommendations of a particular man or a group of men.'[১৫] তৎকালীন সরকার অবশ্য অনিলা দেবীর রাজনৈতিক অবস্থানের দিকে তাকিয়ে তাঁর এই সতর্কীকরণকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। খসড়াটিতে শিক্ষকদের যে আর্থিক উন্নতির দাবি তোলা হয়েছিল তাই পরবর্তীকালে ১৯৫৪-এর স্মরণীয় শিক্ষক আন্দোলন সম্পৃক্ত দাবিদাওয়ার ভিত্তি ভূমি রচনা করেছিল—এটা বলা যেতেই পারে।

এদিকে শিক্ষক সমিতির নেতৃত্ব নতুন ও পুরাতন নেতৃত্বের আন্দোলনের প্রকৃতি নিয়ে যে মতপার্থক্য চলছিল, ১৯৫৩তে সমিতির চুঁচুড়া সম্মেলনে তাঁর অনেকটাই নিষ্পত্তি হল। নানা আলোচনা, বিরোধী বক্তব্যের শেষে, কার্যকরী সভাপতি হিসাবে সংগ্রামী অংশের নেতা সত্যপ্রিয় রায় নির্বাচিত হলেন। ততদিনে সমিতির অভ্যন্তরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, তাদের ক্ষমতা বিস্তারে সচেষ্ট হতে শুরু করেছিল। ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের মদতে মূল সমিতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইতোমধ্যেই গড়ে উঠেছিল, 'পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির মতো সংস্থা। সত্যপ্রিয় রায় অবশ্য কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট, সমাজতন্ত্রী দল, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি রাজনৈতিক দলভুক্ত সমিতি সদস্যদের পূর্ণ সমর্থনে সমিতির উপরে সংগ্রামশীল নেতৃত্বের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১৬]

ইতোমধ্যে ১৯৫৪-এর ঐতিহাসিক শিক্ষক সংগ্রামের প্রস্তুতি পর্বে, ১৯৫৩-এর ২৪শে ফেব্রুয়ারি ঐক্যবদ্ধ শিক্ষক সমাবেশে, শিক্ষকদের বহুবিধ দাবির সপক্ষে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন

অনিলা দেবী। আন্দোলনের কর্মসূচির মূল প্রস্তাবক ছিলেন প্রবাদ প্রতীম শিক্ষক নেতা সত্যপ্রিয় রায়, আর সমর্থক ছিলেন অনিলা দেবী। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল 'এই সম্মেলন দৃঢ়ভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে যে, শিক্ষকদের দাবি অবিলম্বে গৃহীত না হইলে শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি সরকারি ঔদ্যাসীন্যের প্রতিবাদে মাধ্যমিক শিক্ষক সমাজ আগামী ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে যতদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষকবর্গকে, নির্দিষ্ট বেতন হার এবং ৩৫ টাকা দুর্মূল্য ভাতা দিবার সুপারিশকে কার্যকরী করা না হইবে, ততদিন পর্যন্ত শিক্ষাদান কার্য হইতে বিরত থাকিবেন।'[১৭] আসন্ন আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো গঠন করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে কর্ম পরিষদ গঠন, শিক্ষকদের সমর্থনে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, প্রত্যেক শিক্ষককে সংগ্রাম তহবিলে পাঁচটাকা চাঁদা দেবার আহ্বান এবং ১৯৫৩-এর তেসরা আগস্ট থেকে নয়ই আগষ্ট 'শিক্ষা সপ্তাহ' পালনের ডাক দেওয়া হয়।

এই শিক্ষা সপ্তাহ পালনের কর্মসূচি প্রস্তুত করতেও অনিলা দেবী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৫৩-এর ৯ই আগস্ট কোলকাতায় বড় সমাবেশের সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়াও, বিদ্যালয় সমূহে প্রদর্শন যোগ্য পোস্টার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারের জন্য একলক্ষ প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয়। ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারও বুঝেছিল, সত্যপ্রিয় রায় শিক্ষক সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা হলেও, সাংগঠনিক ক্ষেত্রে আসন্ন আন্দোলনকে সাজিয়ে নেওয়ার মূল কাণ্ডারী হলেন অনিলা দেবী। তাই আন্দোলনের শিরদাঁড়াকে প্রথমেই ভেঙ্গে দেবার তাগিদে ১৯৫৩-এর ২৭শে সেপ্টেম্বর সরকার তাঁকে গ্রেফতার করল।[১৮] প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠলেন সারা বাংলার শিক্ষক সমাজ, নেত্রীকে বন্দী করার প্রতিবাদ করে সত্যপ্রিয় রায় এক বিবৃতিতে বললেন, 'এই গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে সরকার সমগ্র শিক্ষক সমাজকেই অশোভনভাবে আক্রমণ করিয়াছেন।.....শিক্ষা ও শিক্ষকের এরূপ একজন সংগ্রামী প্রবক্তাকে গ্রেপ্তার করিলেই ক্রমবর্ধমান শিক্ষক আন্দোলনকে ধ্বংস করা যাইবে, তাহা হইলে তাহারা সম্পূর্ণ ভুল করিয়াছেন।'[১৯] এদিকে একজন ছাত্র/ছাত্রী প্রিয় শিক্ষিকার গ্রেফতারের প্রতিবাদে এই সময় ছাত্র সমাজও গর্জে উঠল। অনিলা দেবীর নিজের বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা প্রতিবাদে পথে নেমে এসেছিল এই সময়। এই সামগ্রিক প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মুখে সরকার শেষ পর্যন্ত তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হল। মুক্ত অনিলা দেবী এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'বিদ্যালয়ের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সম্প্রদায়কে এতদিন ধরে ভাবতে ও দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন বিভিন্ন স্তরের কর্মজীবী মানুষ। সংগ্রামের রাজপথে এসে বসা শিক্ষক শিক্ষকর্মীকে তাঁরা নতুন চোখে দেখলেন।[২০]

সেই সময়কার দোদণ্ড প্রতাপ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ও শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান চাপে শিক্ষকদের বেতন হারের কিছুটা পরিবর্তন করতে সম্মত হলেও, ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও মাসিক ৩৫ টাকা মহার্ঘভাতা দেবার দাবি কিছুতেই মেনে নিলেন না।[২১] শিক্ষকদের আর পিছু ফিরে যাবার উপায় ছিল না। সেই সময় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় প্রত্যেকদিনই শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার সমর্থনে সভা হতে শুরু করল। অক্লান্ত পরিশ্রমী অনিলা দেবী তখন অসংখ্য সভায় বক্তব্য রেখে আসন্ন আন্দোলনের রূপরেখা গঠন করতে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করেন। অবশেষে ৫৪' এর ১০ই ফেব্রুয়ারী শিক্ষকদের ঐতিহাসিক বারো দিনের কর্মবিরতির সূচনা হল। ১১ই ফেব্রুয়ারী শুরু হল মহাকরণের সামনে শিক্ষকদের অবস্থান। দীর্ঘ বারো দিনের আন্দোলন হয়তো বস্তুগতভাবে শিক্ষকদের পক্ষে খুব বেশি লাভজনক হয়নি—কিছু এই সংগ্রাম শিক্ষক সমাজের মর্যাদাকে জনগণের সামনে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর এই আন্দোলন তরঙ্গের শীর্ষেই অনিলা দেবী সংগঠনের অন্যতম শীর্ষ নেতৃত্বে পরিণত হয়েছিলেন।

ইতোমধ্যেই প্রবল আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি, বাংলায় শিক্ষকদের সর্ববৃহৎ সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। অনিলা দেবী শিক্ষক সমাজের ভোটে, তাদেরই প্রতিনিধি হিসাবে তৎকালীন রাজ্য বিধান পরিষদের (অধুনালুপ্ত উচ্চকক্ষ) সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। এবার তাঁর কাজ হয়ে দাঁড়ায় শিক্ষক ও শিক্ষা সংক্রান্ত দাবিদাওয়াগুলিকে আইন পরিষদে তুলে ধরে, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের পয়লা মার্চ বিধান পরিষদের অধিবেশনে তিনি তীব্র ভাষায় শিক্ষা খাতে সরকারি ব্যয় বরাদ্দ ছাঁটাই-এর নিন্দা করেছিলেন। সেই সমসময়ে 'স্পেশাল ক্যাডার' নামে নতুন ধরনের শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় বিধান পরিষদে তিনি বলেছিলেন, 'স্পেশাল ক্যাডার-এর অর্থ তো বুঝতে পারছি না। তাদের জন্য স্কুল কোথায়?.....আমরা দেখছি এই শিক্ষার নামে.....শুধু জনসাধারণকেই ভাঁওতা দেওয়া হচ্ছে না, যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গকে তিন বছরের জন্য নিয়োগ করা হচ্ছে, তাঁদের সামনেও দারুণ নৈরাশ্য ভবিষ্যৎ বহন করে আনা হচ্ছে।'[২২] আবার ১৯৫৬-এর ৬ই ফেব্রুয়ারী রাজ্যপালের শিক্ষকদের সম্পর্কীয় ভাষণের সমালোচনা করে অনিলা দেবী বলেছিলেন, 'মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় যদিও বলেছেন যে, শিক্ষকদের সার্ভিস কন্ডিশন ইম্প্রুভ করবার জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ করেছেন—কিন্তু সেই প্রসঙ্গে এটা স্বীকার করতে হচ্ছে যে, তাঁর বক্তৃতায় কোথায়ও শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই।'[২৩] এই ভাবেই বারে বারে অনিলা দেবী মাঠ ময়দানের শিক্ষক আন্দোলনের ঝড়কে বিধান পরিষদের সামনে তুলে ধরতেন।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ। চিন-ভারত সীমানা সংঘর্ষকে উপলক্ষ করে সারা দেশে এক উগ্রজাতীয়তাবাদের হাওয়া তোলা হয়েছে। যারাই এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান বা আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সমস্যা মিটাবার কথা বলছেন, তাঁদেরই 'দেশদ্রোহী' বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। বামপন্থীদের একাংশের উপর প্রচণ্ড দমন পীড়ন চালাচ্ছে তৎকালীন সরকার। এ. বি. টি. এ.-র উপর বামপন্থার একটা প্রভাব থাকলেও তখন তা ছিল সব অংশের শিক্ষকদের একটি মিলিত সংগ্রামের মঞ্চ। সেই অদলীয় সমিতির কার্যালয়ে এসে 'জাতীয়তাবাদী গুণ্ডারা' সত্যপ্রিয় রায় সহ অন্যান্য নেতাদের হুমকি দিচ্ছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে অনিলা দেবী তখন আইন পরিষদের সদস্য। তিনি তখন সঠিকভাবেই চিন-ভারত সীমানা সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এ. বি. টি. এ.-র ভূমিকাও দৃষ্টিভঙ্গীকে তুলে ধরলেন আইনসভার অঙ্গনে। ১৯৬২-এর ২১শে নভেম্বর 'উগ্রজাতীয়তাবাদীদের' মিথ্যা দেশাভিমানকে নিন্দা করে তাঁর কম্বুকণ্ঠে তিনি বলেছিলেন, 'কোনো চাপে পড়ে নয়, কোনো ভয়ে নয়, কোনো সমালোচনার জন্য নয়, তাঁরা (শিক্ষকেরা) বিশ্বাস করেন, দেশ তাদের সবচেয়ে বড়।.....অতীতে তাঁদের

জীবিকা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলা সরকারের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে।..... কিন্তু আজ যখন সমগ্র দেশের দাবী এক.....লক্ষ্য যখন মাতৃভূমির সমস্ত অমর্যাদা দূর করে পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা, তখন সরকারের লক্ষ্যের সঙ্গে শিক্ষক সমাজের লক্ষ্যের কোন সংঘাত নাই'।[২৪]

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে সরকার আইনসভায় 'মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বিল ১৯৬৩' পেশ করে। বোর্ডে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্থলে মনোনীত প্রতিনিধিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, স্ব-শাসিত বোর্ডকে নিজের তাঁবে আনতে চেয়েছিলেন সরকার। সরকারি এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধেও বিধান পরিষদে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন অনিলা দেবী। শিক্ষকদের সমবেত নির্বাচনের বদলে, শিক্ষক সংগঠন প্রতি একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে তিনি বলেন, 'এটা আমার কাছে অন্তত সবচেয়ে ইমপরট্যান্ট বলে মনে হয়েছে—টিচার্স রিপ্রেজেন্টিটিভ নেবার সিদ্ধান্ত করে তাঁরা একটি ধারা সংযোজিত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যে 'One representative of each of the Association.'-এর তীব্র বিরোধিতা করে তিনি বলেন যে 'এটা চালু হলে শিক্ষকদের অধিকার খর্ব হবে। কারণ অনেক শিক্ষকই কোন সংগঠনের সদস্য নন। আবার অনেক অ্যাসোসিয়েশন-এর নেতৃত্ব পদে মাধ্যমিক শিক্ষক না হয়েও, অনেকে আছেন তাঁরা এই আইনের ফাঁক গলে নির্বাচিত হলে, শিক্ষক স্বার্থই ক্ষুণ্ণ হবে।[২৫]

এতো গেল আইনসভার অভ্যন্তরে অনিলা দেবীর ভূমিকার কথা। তখন কিন্তু শিক্ষকেরা আইন সভার বাইরেও তৎকালীন সরকারের শিক্ষা ও শিক্ষক বিরোধী পদক্ষেপের প্রতিবাদে মাঠে ময়দানে ফুঁসছেন। ইতোমধ্যে অনিলা দেবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। তাঁর কার্যকালেই, বেতন বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে ১৯৬৬-এর ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে সারা রাজ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকারা নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন শুরু করেন। কোলকাতার রাজপথে শুরু হয় সমিতির সদস্য শিক্ষকদের অবস্থান। তাঁদের প্রধান দাবি ছিল, কেন্দ্রীয় বাজেটের দশ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয়, অষ্টম শ্রেণি অবধি অবৈতনিক শিক্ষা, মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষকদের অবসর ভাতা বা পেনসন চালু করা। বিধানসভায় বিরোধী দলগুলির নেতাদের অনুরোধে ১৯৬৬-এর তেসরা অক্টোবর সমিতির প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে দেখা করলেও, সরকার শিক্ষকদের কোনও দাবির প্রতিই বাস্তবে কর্ণপাত করেন নি।

ইতোমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যনীতির ফলস্বরূপ, রাজ্যে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দেয়। শিক্ষক সমিতির মুখপত্র 'শিক্ষা ও সাহিত্যের' ১৩৭২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় 'খাদ্য ও মূল্য-বৃদ্ধির সমস্যা' শিরোনামে প্রকাশিত বক্তব্যে সমিতি মত প্রকাশ করে, 'সাধারণতঃ আমরা শিক্ষা' শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সমস্যা লইয়াই আলোচনা করিয়া থাকি, কিন্তু মানুষের জীবনে এমন এক একটা সমস্যা আসিয়া হাজির হয়। যাহার মোকাবিলা শিক্ষকদেরও করিতে হয়। আমাদের রাজ্যে আজ খাদ্য সমস্যা ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সমস্যা এমন আকার ধারণ করিয়াছে যাহাতে সমস্ত জনজীবন আজ বিপর্যস্ত.....আমরা রাষ্ট্রনীতি বুঝি না—আমরা বুঝি এই অবস্থার অবসান প্রয়োজন'।[২৬] স্বাভাবিক ভাবেই এই খাদ্যসংকটের প্রভাব স্বল্প বেতনের শিক্ষকদের জীবন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনিত কারণে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল সেই সময়ে।

এদিকে খাদ্যের দাবিতে সারা রাজ্য জুড়ে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। আন্দোলন চলাকালীন ছাত্র নুরুল ইসলাম এবং আনন্দ হাইতের শহীদের মৃত্যু, কোমল প্রাণ শিক্ষকবৃন্দের মনে মৃত্যু শেলের আঘাত হানল। শিক্ষকেরা বুঝতে পারলেন, কোন একক সংগ্রাম নয়, সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের সমভাগী হয়ে যৌথ আন্দোলন অংশগ্রহণ করলেই কার্যে সিদ্ধিলাভ সম্ভবপর হবে। ইতোমধ্যে ৬৬'তে বর্ধমানে সমিতির রাজ্য সম্মেলন আহূত হল। এই সম্মেলন অনিলা দেবী একটি বিবৃতি দিয়ে জানালেন সরকার শিক্ষকদের ধাপ্পা দিয়েছে। সরকার কর্তৃক একটি বেতন কাঠামো ঘোষিত হলেও, তার শিক্ষকদের দাবির আশানুরূপ হয়নি। অনিলা দেবীর ভাষায় 'শোনা যাইতেছে ১৯৬৬-৬৭ সালের জন্য শিক্ষকদিগের ভাগ্যে জুটিবে পাঁচটাকা মহার্ঘ্যভাতা। এই অকিঞ্চিতকর মুষ্টি ভিক্ষা জুটিলেও শিক্ষকের বা বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মীদের এই দুর্মূল্যের দিনে ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটিবে না....ত্রিশ টাকার মহার্ঘ্যভাতার যে দাবী আমাদের ছিল, পেনশন যাহা ভারতবর্ষেরই আটটি রাজ্যে শিক্ষকগণকে দেওয়া হইতেছে, বাজেটে অর্থবরাদ্দ প্রয়োজন মত বৃদ্ধি করা না হইলে এই সমস্ত দাবী পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না'।[২৭]

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী, গোলকপতি রায় প্রমুখের নেতৃত্বে ১৯৬৬-এর ২০শে ফেব্রুয়ারী 'সারা ভারত শিক্ষা বাঁচাও' দিবসে কুড়ি হাজার মানুষের স্বাক্ষরিত দাবি পত্র নিয়ে সমিতি বিধানসভা অভিযান করল। সত্যপ্রিয় রায় গ্রেফতার হলেন 'ভারত-রক্ষা আইনে। সেই সময় যৌথ আন্দোলনের প্রয়োজনেই গড়ে উঠল শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষকবৃন্দের মঞ্চ' ১২ই জুলাই কমিটি।[২৮] ওই বছরেরই ২৬শে সেপ্টেম্বর সমস্ত কর্মজীবী মানুষেরা শিক্ষকসহ সমস্ত পেশাজীবীদের দাবির প্রতি ন্যূনতম গুরুত্ব না দেওয়ায়, পরিশেষে অনিলা দেবী, সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্বে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে A.B.T.A. শ্লোগান তুললেন, 'Oust this anti people Government' (কংগ্রেস সরকার)।

শিক্ষকদের দাবির সঙ্গে সহমত হয়ে ১৯৬৭-এর নির্বাচনে সাধারণ মানুষ পরপর বাম ঘেঁষা দুই যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পক্ষে রায় দিল। অবশ্য শাসক শ্রেণির ষড়যন্ত্র এবং আভ্যন্তরীণ কোন্দলে এই দুই সরকারই অল্প দিনের মধ্যেই অপসৃত হয়েছিল। পরবর্তী ১৯৭১-এর নির্বাচনে অনিলা দেবীর বামপ্রার্থী হিসাবে মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হলেন। আবার আইনসভায় উচ্চকিত হয়ে উঠল তাঁর তীব্র প্রতিবাদী কণ্ঠ। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা তুলে, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১১ই মে তিনি বিধানসভায় বলেছিলেন, 'স্বাধীনতার প্রারম্ভে পশ্চিম বাংলা শিক্ষায় ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে ছিল দ্বিতীয় স্থানে। কিন্তু ২২/২৩ বছরের একটানা কংগ্রেস শাসনের দৌলতে সেই স্থান গিয়ে দাঁড়াল নবমেতে।.....এই সময়ে ৫০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ অন্ততঃ হাজারটি শিক্ষায়তনের উপর সমাজ বিরোধীদের কোনো না কোনো ধ্বংসাত্মক আক্রমণ হয়েছে এবং যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিক্ষায়তনগুলো'।[২৯] রাজ্যের সচেতন মানুষ নিজ অভিজ্ঞতাতেই অনিলা দেবীর এই বক্তব্যের সারমর্ম অনুধাবন করতে পারছিলেন।

তারপরে এল সেই কালো দিনগুলো। ৭২-এর বিতর্কিত নির্বাচনে ক্ষমতায় আসলো কংগ্রেস। বিরোধী দলগুলির উপর আক্রমণ নেমে আসলো নানাভাবে। শিক্ষক আন্দোলনের বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে অনিলা দেবী বাইরের বামপন্থী আন্দোলনে আর বেশি করে জড়িয়ে পড়লেন। বাইরের গণআন্দোলন এতে ঋদ্ধ হলেও, শিক্ষক আন্দোলন এর ফলে কিছুটা রিক্ত হয়ে পড়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এল ৭৭ সাল। রাজ্যে স্থাপিত হল বামফ্রন্ট সরকার। নতুন সরকার অনিলা দেবীকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতির দায়িত্বভার দিল। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা—এই প্রবন্ধের পরিধির বাইরে। কেননা প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে মূলতঃ আমরা শিক্ষক সংগ্রামের নেত্রী অনিলা দেবীর কথাই তুলে ধরতে চেয়েছি—বিশেষ রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসাবে বা প্রশাসক হিসাবে তাঁর ভূমিকা এখানে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক তো বটেই। তবে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে দীর্ঘ বারো বছর কাজ করার সুবাদে সাধারণ শিক্ষা ও নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য তাঁর উদ্যোগে বহু মাধ্যমিক স্কুল, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নিত হয়েছিল, এ কথাটা বলাই যায়।

অনিলা দেবী শিক্ষা ও শিক্ষক স্বার্থে যেমন অতীতের কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করতেন, তেমনি শাসক দলের সদস্য হয়েও বাম সরকারের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্বন্ধেও ছিলেন সমান সজাগ। ৮০'-এর দশকে কমিশনের কিছু সুপারিশ নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে কিছু অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল। শিক্ষক সমিতির আহ্বানে বেতন কমিশনের এই অসঙ্গত সুপারিশের বিরুদ্ধে সভা ডাকা হয়েছিল। এই সমাবেশে অনিলা দেবী বলেছিলেন, 'বামফ্রন্ট সরকারকে আমরা বন্ধু সরকার বলেছি ঠিকই, কিন্তু বন্ধু যদি ভুল করে তাহলে সেই ভুল সত্বর সংশোধন করবার দাবি আমাদের থাকবে, আর যতক্ষণ না বন্ধু সরকার ভুল সংশোধন করছে, ততক্ষণ সমিতি আন্দোলন চালিয়ে যাবে'।[৩০] শিক্ষক আন্দোলনের চাপে, তাদের দাবিসমূহ অবশ্য শেষ পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে সত্তর দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে অনিলা দেবী সরকারি শিক্ষা প্রশাসন, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি, স্টুডেন্টস হেলথ হোম এবং সর্বোপরি যে বামপন্থী দলের তিনি সদস্য ছিলেন তাঁর রাজ্য কমিটির সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে শিক্ষক আন্দোলনের আত্মিক যোগাযোগ বজায় ছিল। সব পরিচয়ের ঊর্ধ্বে শিক্ষক আন্দোলনের নেত্রী হিসাবেই ইতিহাস তাঁকে মনে রাখবে। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী এই প্রবাদ প্রতীম শিক্ষক নেত্রী প্রয়াত হন।

সূত্র নির্দেশ

১. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার—চুয়ান্নর স্মরণীয় বারোদিন, কোলকাতা, ১৯৯১, পৃঃ ০৩
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ—বিভূতি রচনাবলী (৭ম খণ্ড), অণুবর্তন কোলকাতা-১৪০৪ (বঙ্গাব্দ) পৃঃ ১২০-১২১
৩. দত্ত, দেবব্রত—বিজয়গড় ঃ একটি উদ্বাস্তু উপনিবেশ, কোলকাতা-২০০১, পৃঃ ৩০-৩১
৪. অধিকারী, অশোক (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য—ভল্যুম XCII, নং-১১, কোলকাতা নভেঃ ২০১৩, পৃঃ ৯৬২

৫. ঐ — পৃঃ ৯৩৭
৬. সেন, মণিকুন্তলা—সেদিনের কথা কোলকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ২৪৯
৭. বসু, জ্যোতি—জনগণের সঙ্গে (১ম খণ্ড), কোলকাতা, ১৯৮৬, পৃঃ ২৪
৮. অধিকারী, অশোক (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮৪
৯. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩-১৪
১০. অধিকারী, অশোক—প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৪৪
১১. অধিকারী, অশোক—প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৭০-৯৭১
১২. অধিকারী, অশোক—প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৬২
১৩. অধিকারী, অশোক—প্রগুক্ত, পৃঃ ৯৯২
১৪. Dutta, Mrinal Kanti–The origin and development of the West Bengal Board of Secondary Education, Kolkata, 1988, p. 31
১৫. Dutta, Mrinal Kanti–প্রাগুক্ত, p. 203
১৬. বাগ, অজিত (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী সংখ্যা, ভল্যুম LXXV, নম্বর-৯, কোলকাতা, ১৯৯৬, পৃঃ ৬১৬
১৭. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯
১৮. লাহিড়ী, অমূল্য নাথ (সং) সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, এ. বি. টি. এ., কোলকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ৭৩
১৯. রায়, সত্যপ্রিয়—রাষ্ট্র, সমাজ ও শিক্ষা, কোলকাতা, ২০০৮, পৃঃ ২৭
২০. মজুমদার, শচীন্দ্র কুমার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯
২১. সেনগুপ্ত, নীলেন্দু—বিধানচন্দ্র ও সমকাল, কোলকাতা, ২০১০, পৃঃ ২৩৯
২২. অধিকারী, অশোক (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য—প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২৫
২৩. ঐ, পৃঃ ১০২৯
২৪. ঐ, পৃঃ ১০৩৩
২৫. ঐ, পৃঃ ১০৩৯
২৬. রায়, উৎপল (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, অক্টো-২০১৬, পৃঃ ৬১৮
২৭. রায়, উৎপল (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য, অক্টো-২০১৬, পৃঃ ৬১৯
২৮. রায়, শিবশঙ্কর (সং) সংগ্রামে শপথে ১২ই জুলাই কমিটির পঞ্চাশ বছর, কোলকাতা, ২০১৬, পৃঃ ২০
২৯. অধিকারী, অশোক (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য—প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪২
৩০. অধিকারী, অশোক (সং) শিক্ষা ও সাহিত্য—প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১৯

গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উপাদান ঃ অপ্রকাশিত তথ্যসমূহ

মহাফেজখানা

1. Home (Political Department, West Bengal State Archives (File no-235/29) confidential
   Subject–Teachers' associations & conferences in Bengal, Government of Bengal, Office of D.I.G. of Police, C.I. Department Intelligence Branch.
2. Do, File no-271/29,
   Subject–All India fedaration of Teachers (or Teacher's associations)
3. Do, File no-7/4869II-C Dated 20th June 1930, office of the Deputy Commissioner of police, 14 Lord Sinha Road, Park Street, C.I. Department special Branch Calcutta, Memorandum to J. F. Cowgill Esq. IP personal assistant ot the Director, Intelligence Bureau, Simla from Deputy Commissionar of Police, Special Branch, Calcutta.
4. Extract from I.B. weekly report, dated 11th September 1929, Confidential proccedings of the 10th session of the Dacca District Teachers Conference 17th August 1929 and 18th August 1929.
5. No. D. 1102/Poll GOI, Home Deptt (Pol) from S. N. Roy ICS Dupety Secretary GOI to the Chief Secretary, Govt. of Bengal
   Subject–The Educational Workers International.
6. File no–69.p/27, Extract from weekly C/R of the Supdt. of police, Rajshahi, 18th March 1927.
7. Do. Extract from Report on the Political situation and labour unrest for the week ending the 4th September 1926.
8. Do. No–69z/26 Extract from WCR for w/e 18th July 1926, Asansol.
9. Do. Extract from I.B. weekly report dated 26th July 1930.
10. Do. Extract from Bengal Police abstract of Intelligence dated Calcutta Wednesday 11th January 1928.
11. Do. File no–852/17 extract from translation of a letter in Bengali, from Taraknath Das New York to Prof. Binoy Kumar Sarkar.
12. Do. File no–69.I/22 Extract from weekly consolidated report of the Supdt of Police, Rangpur 9th September 1922.
13. File no–SL4, Home (Poll) Department 1954.
    Sub. : Application of Preventive Detention Act to deal with Teacher's Strike.

14. বিধানসভার কার্যবিবরণী ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা—আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৫৪, ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯৫৪, মার্চ ১৯৫৫, ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬, মার্চ ১৯৫৬, মার্চ ১৯৬২, নভেম্বর ১৯৬২, জানুয়ারি ১৯৬৩, জানুয়ারি ১৯৬৪, মে ১৯৭১।

প্রকাশিত দলিলসমূহ (সরকারি)—ইংরেজি

1. Report of the Secondary Education Commission (Oct. 1952–June 1953, 1st Edition Sept. 1953, 7th reprint Dec. 1972 Publication no–962, Ministry of Education GOI)
2. Education and National Development, Report of the Education Commission 1964-65, Vol-II, School Education, 1st edition 1966, reprint edition August 1970 (Ministry of Education GOI)
3. Suplimentary Report of the School Education Commettee West Bengal Office of the School Education Commettee The Deptt of School Education, Govt. of W.B., Kolkata)
4. Quinquennial Review on the Progress of Education In Bengal (1927-32, 1932-37, 1942-47) West Bengal Govt. Press, Kolkata, W.B.)
5. Quinquennial Review on the Progress of Education In West Bengal (1947-48 to 1951-52) Education Directorate Govt. of West Bengal.
6. The Encyclopaedia of the Indian National Congress Vol. 8 (1921-24) Chief editor A. M. Zaidi and S. G. Zaidi (S. Chand & Co) New Delhi 1980
7. Communism In India–unpublished Documents (1919-1924, 1925-1934, 1935-1945) Edited Subodh Roy (National Book Agency) 1997, 1998, 1999 respectively.
8. The Gazetter of Indis Vol-IV (Administration and Public Welfare Dec 1978, Ministry of Education and Social Welfare, Chap-VI (Education), Editor Dr. P. N. Chopra.
9. The Role of Government of India in Education, J. P. Naik Ministry of Education G. O. I.

প্রকাশিত দলিলসমূহ (অসরকারি)—বাংলা

১. অধ্যাপক সমিতির ইতিহাসের উপাদান (প্রথম খণ্ড), প্রধান সম্পাদক অনিল ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, কলকাতা, জুন ২০০২।
২. তদেব, (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রধান সম্পাদক অনিল ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, কলকাতা, জুন ২০০২।
৩. সংগ্রাম আন্দোলনে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (১৯০৫-২০০৫), প্রথম খণ্ড, মুখবন্ধ সুরঞ্জন দাস, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭।

৪. তদেব, (দ্বিতীয় খণ্ড), মুখবন্ধ সুরঞ্জন দাস, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮।
৫. তদেব, (তৃতীয় খণ্ড), মুখবন্ধ সুরঞ্জন দাস, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯।
৬. বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য (প্রথম খণ্ড) প্রধান সম্পাদক অনিল বিশ্বাস, কলকাতা আগস্ট ২০০২।
৭. তদেব, (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রধান সম্পাদক অনিল বিশ্বাস, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৩।
৮. তদেব, (তৃতীয় খণ্ড), প্রধান সম্পাদক অনিল বিশ্বাস, কলকাতা, আগস্ট ২০০৪।
৯. তদেব, (চতুর্থ খণ্ড), প্রধান সম্পাদক অনিল বিশ্বাস, কলকাতা, আগস্ট ২০০৫।
১০. তদেব, (পঞ্চম খণ্ড), প্রধান সম্পাদক বিমান বসু, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৬।
১১. বাংলায় গণ আন্দোলনের ছয় দশক (প্রথম খণ্ড) সংকলন ও সম্পাদনা কমল চৌধুরী, কলকাতা, ডিসেম্বর, ২০০৪।
১২. তদেব, (দ্বিতীয় খণ্ড), সংকলন ও সম্পাদনা কমল চৌধুরী, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৯।
১৩. লাল দীঘি, তিন দশক, উৎপল সেনগুপ্ত ও অন্যান্য, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯২।
১৪. বিধানসভায় জ্যোতিবসুর নির্বাচিত বক্তৃতাবলী (১৯৪৬-২০০১) সম্পাদনা হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, মার্চ ২০১১।
১৫. বামফ্রন্ট সরকার—৩৪ বছরের ইতিহাস সংকলন, দীপক মিত্র (সং), জুলাই ২০১৪।
১৬. সমাজ ও সংস্কার আন্দোলন ঃ নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ (বঙ্গ দর্শন ও মাসিক বসুমতী), সংকলন ও প্রধান সম্পাদক আবীর চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, জুন ২০০৪।
১৭. মিত্র কমিশন, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, গৌরদাস হালদার (ব্যানার্জী পাবলিশার্স), কলকাতা ১৯৯৫।
১৮. পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা চিত্র তখন ও এখন (পশ্চিমবঙ্গ সরকার), কলকাতা, মার্চ ১৯৯৬।

সংবাদপত্র (বাংলা)

১. আনন্দবাজার পত্রিকা— ০৬/১১/১৯৫২
১০/১১/১৯৫২
২০/১১/১৯৫২
২৫/০২/১৯৫৩
১০/০৮/১৯৫৩
১৬/০১/১৯৫৪
২৯/০১/১৯৫৪
০১/০২/১৯৫৪
০৩/০২/১৯৫৪
০৭/০২/১৯৫৪
১০/০২/১৯৫৪
১২/০২/১৯৫৪

১৬/০২/১৯৫৪
১৭/০২/১৯৫৪
২৬/০২/১৯৫৪

২. দৈনিক বসুমতী— ১১/০৬/১৯৫৩
১৭/০১/১৯৫৪
২৪/০১/১৯৫৪
৩১/০১/১৯৫৪
০৫/০২/১৯৫৪
১৭/০২/১৯৫৪
২০/০২/১৯৫৪

৩. বাংলার কথা— ১০/০৭/১৯২৮
১৬/০৭/১৯২৮
১৯/০৭/১৯২৮
৩১/০৭/১৯২৮
১৪/০৮/১৯২৮
১৫/০৮/১৯২৮
২৫/০৮/১৯২৮
২৬/০৮/১৯২৮
২৮/০৮/১৯২৮
৩০/০৮/১৯২৮

৪. যুগান্তর পত্রিকা— ০১/০২/১৯৫৪
০৬/০২/১৯৫৪
১০/০২/১৯৫৪
১১/০২/১৯৫৪
১৫/০২/১৯৫৪
১৭/০২/১৯৫৪
২০/০২/১৯৫৪
২৩/০২/১৯৫৪
২৪/০২/১৯৫৪

৫. স্বাধীনতা— ৩১/০৩/১৯৫৩
২৮/১১/১৯৫৩
২৩/০১/১৯৫৪
০৮/০২/১৯৫৪
১০/০২/১৯৫৪

১১/০২/১৯৫৪
১৩/০২/১৯৫৪
১৪/০২/১৯৫৪
১৯/০২/১৯৫৪
০১/০৩/১৯৫৪
২২/০৩/১৯৫৪

সংবাদপত্র (ইংরেজি)

1. Amrita Bazar Patrika– 02/08/1940
04/08/1940
26/08/1940
02/12/1940
04/12/1940
01/04/1952
10/04/1952
19/08/1952
23/02/1953
09/04/1954
11/02/1954
13/02/1954
17/02/1954
20/02/1954
2. Forward– 20/02/1926
3. The Hindusthan Times– 19/02/1954
4. The Stateman– 20/08/1948
23/08/1948
02/09/1948
07/02/1954
12/02/1954
16/02/1954
17/02/1954
18/02/1954
20/02/1954

গৌণ উপাদান

বাংলা জার্নাল

১. অধিকারী, অশোক (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, অনিলা দেবী শতবর্ষ পূর্তি সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৩

২. দত্ত, সীমা (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, গোলকপতি রায় জন্ম শতবার্ষিকী সংখ্যা, কলকাতা, জুলাই ২০১৯
৩. দত্ত, সীমা (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, শতবর্ষ সংখ্যা, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২০
৪. দত্ত, সীমা (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির শতবর্ষ সংখ্যা, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি/মার্চ ২০২১
৫. ধর, প্রশান্ত, শিক্ষা ও সাহিত্য, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৩
৬. ভট্টাচার্য, সূর্য্যাংশু, পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
৭. মণ্ডল, বিকাশ (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, সত্যপ্রিয় রায় জন্ম শতবর্ষ সংখ্যা, কলকাতা, মার্চ ২০০৭
৮. রায়, পার্থ (সং), পর্ষদ বার্তা শিক্ষাবিদ সত্যপ্রিয় রায় জন্ম শতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা, কলকাতা, নভেম্বর/ডিসেম্বর ২০০৮
৯. লাহিড়ী, অমূল্যনাথ (সং), এ. বি. টি. এ. সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা (১৯২১-১৯৭১), কলকাতা ১৯৭১
১০. বাগ, অজিত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী সংখ্যা, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬
১১. বাগ, অজিত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, স্বাধীনতা সংখ্যা, কলকাতা, আগস্ট ১৯৯৭
১২. বাগ, অজিত (সং), শিক্ষা ও সাহিত্য, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, মার্চ ১৯৯৬
১৩. শিক্ষা ও সাহিত্য—সাধারণ সংখ্যা (প্রকাশক নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি), সেপ্টেম্বর ১৯২১, জানুয়ারি ১৯২৩, জুন-আগস্টট ১৯২৬, মার্চ ১৯২৭, এপ্রিল ১৯২৮, জুলাই ১৯২৮, সেপ্টেম্বর ১৯২৮, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯২৮, ডিসেম্বর ১৯২৮, এপ্রিল-মে ১৯৩০, মে-জুন ১৯৩৩, অক্টোবর ১৯৩৫, মে-জুন ১৯৩৭, মার্চ ১৯৪০, মে-জুন ১৯৪০, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৪১, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৪২, ডিসেম্বর ১৯৪৩, মার্চ-এপ্রিল ১৯৪৪, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৪৫, অক্টোবর-নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৪৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭, ডিসেম্বর ১৯৪৮, নভেম্বর ১৯৪৯, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৫০, মার্চ ১৯৫১, ডিসেম্বর ১৯৫১, এপ্রিল-মে ১৯৫২, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৫৩, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ-এপ্রিল, অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৫৪, এপ্রিল-মে ১৯৫৫, এপ্রিল, জুলাই, সেপ্টেম্বর ১৯৬৫, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, মে, জুন, জুলাই, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৬৬, সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, ডিসেম্বর ১৯৯২, মে ২০০৫, জানুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, ডিসেম্বর ২০০৬, জানুয়ারি, জুলাই ২০০৮, আগস্ট, সেপ্টেম্বর ২০১০, নভেম্বর ২০১৫, জানুয়ারি, মার্চ, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ২০১৬

জার্নাল ঃ ইংরেজি

1. Devekanya Chakrvorty, Teacher Union : Who, Where and What They Think (Working paper no–236–Summer Research Internship 2010, Centre for Civil Society.
2. Prabal Sengupta, Review of Organization and Movement of Secondary School Teachers of Bengal in the pre-independence period (1921-46), Edulight (muttideisciplinary UGC approved Journal), May 1018, Ed Dr. Ajit Mondal.

প্রকাশিত পুস্তকসমূহ (বাংলা)

১. আচার্য, পরমেশ, 'বাংলার দেশজ শিক্ষার ধারা' (অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা ২০০৯)

২. আচার্য, পরমেশ, 'বাঙালির শিক্ষা চিন্তা' (দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ২০১১)

৩. আলি, সেখ রজব, 'ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোলকাতা মাদ্রাসা' (১৭৮০-১৮৮২) নক্ষত্র প্রকাশন, কলকাতা ২০১৩

৪. আচার্য, স্নেহাংশু, 'জেলখানার দিনলিপি' (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা ২০০০)

৫. আবদুল্লা রসুল, 'মহম্মদ কৃষক সভার ইতিহাস' (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা ১৯৯০)

৬. আলী, এম, এইচ., মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা (প্রভাত লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০০৫)

৭. কার, ই. এইচ., 'কাকে বলে ইতিহাস' (কে. পি. বাগচি, কলকাতা ১৯৯৯)

৮. কুমার, মদন মোহন, আলো জ্বেলে গেল যারা, (বুকস হেভেন পাবলিকেশন, কলকাতা ২০১৬)

৯. কর্মকার, মিহির, 'স্বাধীন ভারত এবং ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থা', (ছাত্র সংগ্রাম কমিটি, বর্ধমান ১৯৯৭)

১০. খান শাওয়াল, 'শিক্ষা জগৎ' (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯)

১১. গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রনাথ, 'বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা' (প্রথম খণ্ড), (জি. এ. ই. পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৯১)

১২. গোস্বামী, হরিসাধন, 'ভারতের শিক্ষা ইতিহাস' (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা ১৯৮৯)

১৩. গুপ্তু, সুপর্ণা (সং), 'ইতিহাসে নারী শিক্ষা (প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০০১)

১৪. গোস্বামী, সত্যশংকর, ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষার জাতীয় চেতনা (অর্চনা, কলকাতা ১৯৮৮)

১৫. ঘোষ, স্বাতী ও সরকার অশোক, 'কবির পাঠশালা' পাঠভবন ও শিক্ষাসত্রের ইতিহাস (সিগনেট প্রেস, কলকাতা ২০১৫)

১৬. ঘোষ, শংকর, 'মাষ্টারদা সূর্যসেন' (প্রমিথিউস পাবলিশিং, কলকাতা ২০১২)

১৭. ঘোষ, অতুল্য, 'কষ্টকল্পিত' (নবপর্যায়) আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৮৪

১৮. ঘোষ, সুকান্ত, '৭০-এর আপনজন' (উৎসব প্রকাশনা, কলকাতা ২০০৭)

১৯. ঘোষ, দীপেন (উপদেষ্টা) পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস (১৯৫৭-২০০৭), কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক কর্মচারী সমিতি সমূহের কো অর্ডিনেশন কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা ২০০৮

২০. ঘোষ, অতুল্য, কষ্ট কল্পিত (আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৮০)
২১. চৌধুরী, তেসলিম, 'ভারতের ইতিহাস' (৬০০-১৫৫৬) প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা ২০১৩
২২. চক্রবর্তী, নমিতা, 'বঙ্গদেশে শিক্ষা প্রসার' (প্রকাশকের নামহীন) কলকাতা ১৯৮০
২৩. চক্রবর্তী, মনোতোষ, হিন্দু কলেজ ও উনিশ শতকের বাংলার সমাজ (সুবর্ণরেখা পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৯৭)
২৪. চৌধুরী, ফকরুল (সং), গ্রামসি পরিচয় ও তৎপরতা (সংবেদ পাবলিকেশন, ঢাকা ২০১২)
২৫. চক্রবর্তী, শ্যামল, শিক্ষার শীর্ষ স্থপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, আগরতলা ২০১৪)
২৬. চন্দ্র, বিপান ও অন্যান্য, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৮৫৭-১৯৪৭) (কে. পি. বাগচী এণ্ড কোম্পানি, কলকাতা ১৯৯৪)
২৭. চন্দ্র, বিপান, 'আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতা' (কে. পি. বাগচী এণ্ড কোম্পানি, কলকাতা ১৯৯৮)
২৮. চট্টোপাধ্যায়, নরেন (প্রকাশক) বিপ্লবাচার্য অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ (সংকলন) হুগলি ২০০৯
২৯. চক্রবর্তী, প্রফুল্ল কুমার, 'প্রান্তিক মানব' (প্রতিক্ষণ পাবলিকেশানস্, কলকাতা ১৯৯৭)
৩০. চন্দ্র, বিপান, 'ভারতের জাতীয় আন্দোলন ঃ দীর্ঘমেয়াদী গতিসূত্র' (কে. পি. বাগচী এন্ড কোম্পানি) কলকাতা ১৯৯০
৩১. চৌধুরী, সলিল, 'জীবন উজ্জীবন এবং.....' (দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ২০২০)
৩২. চ্যাটার্জী, শুভেন্দু, শিক্ষক আন্দোলনের ধারা (একুশ শতক, কলকাতা ২০১৮)
৩৩. চৌধুরী, প্রমথ, আমাদের শিক্ষা (সহজ পাঠ, কলকাতা ২০১৩)
৩৪. চট্টোপাধ্যায়, সুনীল, শিক্ষা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা (আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৯৮)
৩৫. চক্রবর্তী, মধুসূদন, প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষা—মার্কসবাদীর দৃষ্টিতে (ন্যাশনাল পাবলিকেশন, কলকাতা ২০০৭)
৩৬. চৌধুরী, রাহমান, 'বাংলার চারশো বছরের প্রাথমিক শিক্ষা' (শ্রাবন প্রকাশনী, ঢাকা ২০১৪)
৩৭. চট্টোপাধ্যায়, সনৎকুমার, আকাদেমি ভাষণ সংকলন (পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ২০০৭)
৩৮. জোয়ারদার, মানস, 'শিক্ষা ও সমাজ—গতি এবং দুর্গতি' (এখন বি-সংবাদ, কলকাতা ২০০৭)
৩৯. জানা, ইমনকল্যাণ, 'শিক্ষার ভাবনা ভাবনার শিক্ষা' (কানন প্রকাশনী, কলকাতা ২০১৪)
৪০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি' (বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৪২১ বং)
৪১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'শিক্ষা' (বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৪১৭ বং)
৪২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'শিক্ষাচিন্তা' (নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি, কলকাতা ২০১২)
৪৩. ত্রিপাঠী, অমলেশ, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৩৯৭ বং)

৪৪. দে, অমলেন্দু, 'বাঙালি বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ' (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা ১৯৯১)
৪৫. দাস, বিশ্বনাথ, 'প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত' (থীমা, কলকাতা ২০১১)
৪৬. দে, রমাপ্রসাদ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎস সন্ধানে (বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, কলকাতা ২০১৮)
৪৭. দাশ, চিত্তরঞ্জন, দেশবন্ধু রচনাসমগ্র (তুলি-কলম, কলকাতা ১৩৮৪ বং)
৪৮. দত্ত, দেবব্রত, বিজয়গড় একটি উদ্বাস্তু উপনিবেশ (প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০০১)
৪৯. দাশগুপ্ত, হীরেন ও অধিকারী হরিনারায়ণ, ভারতীয় উপমহাদেশের ছাত্র আন্দোলন (র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা ২০০৮)
৫০. দাস, দিনেশ, শ্রেষ্ঠ কবিতা (দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯১)
৫১. দে, অসিতকৃষ্ণ (সং) পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলন (অতিথি, কলকাতা ২০০০)
৫২. দত্ত, সত্যব্রত, বাংলার সংসদীয় রাজনীতির ইতিবৃত্ত (প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০১৭)
৫৩. দত্ত, ভানুদেব (সং), সত্যানুসন্ধান (সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি (মনীষা, কলকাতা ২০১১)
৫৪. দাশগুপ্ত, অশীন, প্রবন্ধ সমগ্র (আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০০১)
৫৫. দাশগুপ্ত, বাসব, যুক্তফ্রন্ট সরকার ও পশ্চিমবাংলা (বাসব দাশগুপ্ত, প্রকাশক—লেখক, কলকাতা ১৯৭২)
৫৬. দত্ত, শিবাশিস (সং) সোমনাথ লাহিড়ী জন্মশতবর্ষ সংকলন (মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা ২০১০)
৫৭. দত্ত, বেবী, চৌধুরী কণিকা, গুহ দেবিকা, 'স্বাধীন ভারতে শিক্ষার বিকাশ' (প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০০৪)
৫৮. দাস, তপন কুমার (সং), 'শিক্ষা ভাবনার সেকাল একাল' (ই. আর. সি. পাবলিকেশন, কলকাতা ২০১৮)
৫৯. দত্ত, সত্যব্রত, 'বাংলার বিধানসভার একুশ বছর—রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র' (প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০০২)
৬০. দত্ত, জ্যোতিভূষণ, 'শিক্ষার তিন দশক এবং ভবেশ মৈত্র (পুনশ্চ, কলকাতা ২০১০)
৬১. দত্ত, বেবী, গুহ দেবিকা, 'শিক্ষা দর্শন ও দার্শনিকদের অবদান' (প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা ২০০৫)
৬২. দত্ত, বেবী, সেনগুপ্ত মধুমালা, গুহ দেবিকা, 'ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস' (প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা ২০০৬)
৬৩. দে, রমাপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, কলকাতা ২০১০)
৬৪. দেশাই, জিয়াউদ্দীন, 'ভারত মে ইস্‌লামি শিক্ষা কে কেন্দ্র (হিন্দি) প্রকাশন বিভাগ, সূচনা আউর প্রসারণ মন্ত্রালয়, ভারত সরকার, নিউ দিল্লি ১৯৮৪

৬৫. নাম্বুদিরিপাদ, ই. এম. এস., ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা ১৯৮৯।
৬৬. নাগ, অরুণ (সং), 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (সুবর্ণরেখা, কলকাতা ১৩৯৮ বং)
৬৭. প্লেখানভ, জি. ভি., 'শিল্প ও সমাজ জীবন' (মনীষা, কলকাতা ১৯৮৯)
৬৮. পণ্ডা, সৌগত, 'পঞ্চাশ' (ছাত্র সংগ্রাম প্রকাশনী, কলকাতা ২০১৫)
৬৯. ফ্রেইরি, পাউলো, 'মুক্তির জন্য সাংস্কৃতিক প্রয়াস (মন ফকিরা, কলকাতা ২০১৯)
৭০. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' (মর্ডান বুক এজেন্সী, কলকাতা ২০০৯)
৭১. বসু, রাজনারায়ণ, 'সেকাল আর একাল (সং), ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা ১৩৯৮ বং)
৭২. বাগচী, মণি, 'কেশবচন্দ্র' (জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস্, কলকাতা ১৩৬৬ বং)
৭৩. বাগচী, মণি, 'আচার্য যদুনাথ—জীবন ও সাধনা' (জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস্, কলকাতা ১৩৬৬ বং)
৭৪. বিবেকানন্দ, স্বামী, 'শিক্ষাপ্রসঙ্গ' (উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ১৯৯৯)
৭৫. বসু, অঞ্জন, বাংলায় বামেরা, রাজপথে ও রাজ্যপাটে (১৯২০-২০১১), দীপ প্রকাশন, কলকাতা ২০১৭
৭৬. ব্যানার্জী, সচ্চিদানন্দ, 'ফজলুল হক—জীবন ও রাজনীতি' (প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০০১)
৭৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, বিভূতি রচনাবলী (৭ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৪০৪ (বং)
৭৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী (৭ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৪২৫ (বং)
৭৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, উত্তরকালের গল্প সংগ্রহ (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা ১৯৮৮)
৮০. বসু, জ্যোতি, 'জনগণের সঙ্গে' (প্রথম খণ্ড), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা ১৯৮৬
৮১. বসু, জ্যোতি, 'যতদূর মনে পড়ে' (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা ২০০৬)
৮২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, 'রণক্ষেত্র রাজপথ' (প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০০২)
৮৩. বিশ্বাস, কান্তি, 'আমাদের শিক্ষা' (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা ২০০৬)
৮৪. বসু, প্রশান্ত ও চক্রবর্তী সমর, 'বজ্রশিখায় জ্বালো' (নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, কলকাতা ২০১১)
৮৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিত কুমার, 'শিক্ষা প্রসঙ্গ' (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা ১৯৮৪)
৮৬. বিল্লাহ, মাহুম, 'শিক্ষা এবং শিক্ষক' (মূর্ধণ্য, ঢাকা ২০১৩)
৮৭. বসু, সত্যেন্দ্রনাথ, রচনা সংকলন (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কলকাতা ১৩৯৯ বং)
৮৮. বিশ্বাস, অজিতকুমার, শ্রীমুকুন্দ কুলকার্নী (সা. ভা. শিক্ষক আন্দোলনের পুরোধা একটি জীবন), জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সংঘ, কলকাতা ২০১৮

৮৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, 'অন্য শিক্ষার সন্ধানে' (কারিগর, কলকাতা ২০১২)
৯০. ভট্টাচার্য, রামরমণ (সং), 'আচার্য কাহিনী' (নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি, কলকাতা ১৪১১)
৯১. ভট্টাচার্য, দেবদূত, 'সমকালীন বাঙালির দৃষ্টিতে সোভিয়েত দেশ (১৯১৭-১৯৪৭), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা ১৯৯৬
৯২. ভট্টাচার্য, সব্যসাচী, বাংলায় সন্ধিক্ষণ—ইতিহাসের ধারা (১৯২০-১৯৪৭), অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, নয়াদিল্লি ২০১৪)
৯৩. ভট্টাচার্য, সুকান্ত, সুকান্ত সমগ্র (সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা ১৩৮১ বং)
৯৪. ভট্টাচার্য, অনিল, শিক্ষা সমাজ ও সময় (প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা ২০১০)
৯৫. ভট্টাচার্য, সৌরীন্দ্রনাথ, 'শিক্ষা ভাবনা' (প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০০৩)
৯৬. মণ্ডল, অজিত ও চট্টোপাধ্যায় কৌশিক (সং), 'সমকালের ভাবনায় বিদ্যাসাগর' (পারুল প্রকাশনী, কলকাতা ২০২১)
৯৭. মল্লিক, সমরকুমার, আধুনিক ভারতের দেড়শ বছর (১৭০৭-১৮৫৭) ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা ২০১৫
৯৮. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, 'বাংলাদেশের ইতিহাস' (চতুর্থ খণ্ড), দিব্য প্রকাশ, ঢাকা ২০১৮
৯৯. মজুমদার, শচীন্দ্রকুমার, 'চুয়ান্নর স্মরণীয় বার দিন' (নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি, কলকাতা, সাল উল্লেখ নেই)
১০০. মুখোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ (ভূমিকা), 'চুয়ান্নর সংগ্রামী ঐতিহ্য ও তার উত্তরাধিকার' (নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি, কলকাতা ২০০৫)
১০১. মিশ্র, সুবিমল (সং), আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষাভাবনা (দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ২০১৩)
১০২. মণ্ডল, মৃত্যুঞ্জয়, বৃহত্তর পূর্বস্থলীর ইতিহাস (অনুপম প্রকাশনী, নবদ্বীপ ১৯৯৮)
১০৩. মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ ও অন্যান্য (সং), 'সত্যপ্রিয় রায় ও উত্তরাধিকার' (নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি, কলকাতা ২০০৮)
১০৪. মৈত্র, ভবেশ, 'প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষা ও সমাজ' (দীপ প্রকাশন, কলকাতা ২০০৭)
১০৫. মুখোপাধ্যায়, কণক, 'নারী মুক্তি আন্দোলন ও আমরা (একসাথে, কলকাতা ২০০৩)
১০৬. মজুমদার, অমিয়কুমার, 'শিক্ষক সমাজ ও সমাজ শিক্ষক' (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৪০৭ বং)
১০৭. মুখোপাধ্যায়, প্রবীর (সং), 'বাঙালির শিক্ষাচিন্তা' (প্রথম খণ্ড), দীপায়ন, কলকাতা ১৪০৩ (বং)
১০৮. মুখোপাধ্যায়, রঞ্জুগোপাল, 'শিক্ষার অধিকার অধিকারের শিক্ষা' (প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০০৭)
১০৯. মুখোপাধ্যায়, অমলকুমার, 'বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৪৭-১৯৯৭), এ মুখার্জী এন্ড কোম্পানি, কলকাতা ১৯৯৯
১১০. মুখোপাধ্যায়, আনন্দদেব (প্রকাশনা) 'সার্ধ-শতবর্ষে আচার্য সতীশচন্দ্র মুখার্জী (বক্তৃতামালা) বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, কলকাতা ২০১৭

১১১. মাকিগুচি, ৎস্যুনেসাবুরো, ‘সৃষ্টিশীল জীবন যাপনের জন্য শিক্ষা’ (এন. বি. টি., নয়াদিল্লি ২০০৮.)
১১২. রায়, নীহার রঞ্জন, ‘বাঙালির ইতিহাস (আদি পর্ব), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ফাল্গুন, ১৪১৬ (বং) ৭ম সংস্করণ
১১৩. রায়, বিজয়ভূষণ (সং ও সম্পাদক), ‘প্রসঙ্গ ঃ ডেভিড হেয়ার’ (এশিয়ান পাবলিকেশন, কলকাতা ২০১২
১১৪. রসুল, আবদুল্লা মুহম্মদ, ‘কৃষক সভার ইতিহাস’ (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা ১৯৯০)
১১৫. রায়, সত্যপ্রিয়, ‘রাষ্ট্র সমাজ ও শিক্ষা’ (নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি, কলকাতা ২০০৮)
১১৬. রায়, শিবশঙ্কর (আহ্বায়ক), সংগ্রামে শপথে ১২ই জুলাই কমিটির পঞ্চাশ বছর (শ্রমিক কর্মচারী শিক্ষক যুক্ত আন্দোলন কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা ২০১৬)
১১৭. রোকেয়া বেগম, ‘রোকেয়া রচনা সংগ্রহ’ (বিশ্বকোষ পরিষদ, কলকাতা ২০০৬)
১১৮. রায়, অন্নদাশংকর, ‘শিক্ষার সংকট’ (সাহিত্যলোক, কলকাতা ১৯৯১)
১১৯. রায়চৌধুরী, দীপাঞ্জন, ‘শিক্ষা কী আর কী নয়’ (ক্যাম্প, কলকাতা ২০১০)
১২০. রায়, সুবীর ও মজুমদার বিমলেন্দু, ‘চারুচন্দ্র সান্যাল স্মারক গ্রন্থ’ (চারুচন্দ্র সান্যাল স্মারক কমিটি, জলপাইগুড়ি, মে ১৯৮৫)
১২১. রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী, ‘নতুন ভারত গঠনে শিক্ষকদের ভূমিকা ও দায়িত্ব’ (উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ১৯৯১)
১২২. লুনাচারস্কি আনাতোলি, ‘শিক্ষা’ (প্রগতি প্রকাশন, মস্কো ১৯৮৬)
১২৩. শাস্ত্রী, শিবনাথ, ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’ (নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০০৭)
১২৪. শাহেদুল্লাহ সৈয়দ, ‘শিক্ষা ও শ্রেণি সম্পর্ক’ (নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা ১৯৭৩)
১২৫. শর্মা, এল পী, ‘মধ্যকালীন ভারত’ (লক্ষ্মীনারায়ণ আগরওয়াল, আগ্রা ২০১১)
১২৬. সরকার, সুমিত, ‘আধুনিক ভারত ১৮৮৫-১৯৪৭’ (কে. পি. বাগচী এণ্ড কোম্পানি, কলকাতা ১৯৯৩)
১২৭. সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর, ‘প্রসঙ্গ শিক্ষা ঃ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে (সাহিত্যশ্রী, কলকাতা ২০১৩)
১২৮. সিংহ, দীনেশচন্দ্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ১৯৯২)
১২৯. সিংহ, দীনেশচন্দ্র, ‘প্রসঙ্গ ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ২০০৭)
১৩০. সরকার, যদুনাথ, ‘যদুনাথ সরকার রচনা সম্ভার’ (এম. সি. সরকার এণ্ড সনস্, কলকাতা ২০১১)
১৩১. সেন, সুকোমল, ‘ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস’ (১৮৩০-২০০০) ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা ২০০৩

১৩২. সেন, মণিকুন্তলা, ‘সেদিনের কথা’ (নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা ১৯৮২)
১৩৩. সাহা, অপূর্ব (সং), ‘সেকালের শিক্ষা ঃ উজ্জ্বল উদ্ধার’ (আলাপ প্রকাশন, কলকাতা ২০১৩)
১৩৪. সেনগুপ্ত, প্রবাল, ‘চিত্তরঞ্জন দাশ ও বাংলার রাজনীতি—সমালোচনার আলোকে’ (টু ওয়ার্ডস ফ্রিডম, কলকাতা ২০১৮)
১৩৫. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু, ‘উত্তাল চল্লিশ ঃ অসমাপ্ত বিপ্লব’ (পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৮৯)
১৩৬. সেনগুপ্ত, নীলেন্দু, ‘বিধানচন্দ্র ও সমকাল (একুশ শতক, কলকাতা ২০১০)
১৩৭. সেনগুপ্ত, বরুণ, পালাবদলের পালা (আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৭১)
১৩৮. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু, জোয়ার ভাটায় ষাট-সত্তর (পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা ১৯৯৭)
১৩৯. সুখমলিন্স্কি ভাসিলি, ‘শিক্ষা আমার ব্রত’ (প্রগতি প্রকাশন, মস্কো ১৯৮২)
১৪০. সেনগুপ্ত, কণা, ‘শিক্ষাতত্ত্ব প্রসঙ্গে’ (জ্ঞানালোক প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ১৩৯৪ বং)
১৪১. হুসেন, জাকির, ভারতে শিক্ষার পুনর্গঠন (ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি ১৯৬৩)

প্রকাশিত পুস্তকসমূহ (ইংরেজি)

1. Bhattacharyya, Dwaipayan, 'Government as Practices–Democratic left in a Transforming India (Chambridge University Press, Delhi 2016)
2. Braun Robert J., 'Teachers and Power' (Simon and Schuster, New York 1972)
3. Bhatta, H. S. Ganesha, 'Secondary Education (APH Publishing, New Delhi 2012)
4. Bhattacharya, Anil, 'In Search of An Alternative Education (Ekush Shatak, Kolkata 2008)
5. Cook, Maria Larena, 'Organizing Dissent.....Teacher's Movement In Mexico (The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania 1996)
6. Chowdhury, Indira, Bhandari Siddhi, Guha (Writing Team) (The National Council of Education, Bengal, Kolkata 2018)
7. Chitkara, M. G., 'Education And Human Values (A. P. H. Publishing Corp, New Delhi 2012)
8. Chattopadhayay, and Gupta Chnanda (Ed.), 'Perspectives On Education (Jadavpur University', Kolkata 2009)
9. Chakravorti, K. M. (Pub.), 'Concept of National Education In India, Diamond Jubilee Seminar (N. C. Bengal, Kolkata 1967)
10. Dutta, Mrinalkanti, 'The Origin and Development of the West Bengal Board of Secondary Education' (Ratna Prakashan, Kolkata 1988)
11. Das, Suranjan and Bandhyopadhyay (Ed), 'Food Movement of 1959 (K. P. Bagchi & Company, Kolkata 2004)

12. Dhankar, Neerja, 'Education in Emerging Indian Society (A. P. H. Publishing, New Delhi 2011)
13. Elsbree, Willard S, 'The American Teacher' (American Book Company, New York 1939)
14. Freire, Paulo, 'Pedagogy of the Oppressed' (Penguin Books, New Delhi 1996)
15. Gupta, Atul Chandra (Ed.), 'Studies in the Bengal Renaissance' (National Council of Education, Kolkata 1977)
16. Ghosh, A., 'Nalanda' (Department of archaeology, G. O. I., New Delhi 1950)
17. Ghosh, Suresh Chandra, 'The History of Education In Modern India (1757-2012), (Orient Black Swan, New Delhi 2013)
18. Kandel, I. L., 'The New Era In Education' (George G. Harrep & Co, London 1954)
19. Luniya, B. N. 'Life and Culture in Ancient India (Laxshmi Narain Agarwal, Agra, 1978)
20. Mukherjee, Amitava, 'Fifty Years of National Education, (National Council of Education Bengal, Kolkata 1992)
21. Majumdar, R. C., 'Renascent India, (G. Bharadwaj & Co., Kolkata 1976)
22. Mallik, P. C. V. (Pub), 'The National Council of Education Bengal (1906-56), (Jadavpur University, Kolkata)
23. Mukherjee, Haridas and Uma, 'The Origins of National Education Movement (1905-10), (N. C. E. Bengal, Kolkata 1957)
24. Nurullah, Syed and Naik J. P., 'Student History of Education In India (1800-1965), (Macmillan & Co, Kolkata 1964)
25. Naik, J. P. 'The Education Commission And After (A. P. H. Publishing Corp, New Delhi 1997)
26. Purkit, Biswaranjan, 'Great Educators And their Philosophies (New Central Book Agency, Kolkat 1995)
27. Roy, Satyapriya, 'Selected Writings and speeches of Satyapriya Roy' (All Bengal Teacher's Association, Kolkata 1999)
28. Rai, V. K. 'Higher Education' (A. P. H. Publishing Corp, New Delhi 2010)
29. Ruhela, Satyapal (Ed.) Educational Challenges in Socialist India (Kalyani Publishers, Delhi 1975)
30. Sen, Khagendra N. 'Education and the Nation' (University of Kolkata, Kolkata 1970)
31. Seregny, Scott. J., 'Russion Teacher's And Peasant Revolution (Indiana University Press, Bloomington 1989)

32. Sharma, R. N., 'History and Problems of Education in India (Surjeet Publications, Delhi 1993)
33. Singh, Y. K. and Nath Ruchika, 'Education In Emerging Indian Society, (A. P. H. Publishing Corp, New Delhi 2012)
34. Suryanarayana, N. V. S., 'Teachers' And Job Satisfaciton' (A. P. H. Publishing Corp., New Delhi 2011)
35. Sarkar, S. N., 'Student Unrest' (India Book Exchange, Kolkata 1974)

প্রবন্ধ ঃ বাংলা

১. আচার্য, পরমেশ, ভাষণ ঃ শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, কলকাতা ২০০৭)
২. গোস্বামী, তৃষ্ণা, শিক্ষক সংস্কারে শিক্ষক বিদ্যাসাগর (সমকালের ভাবনায় বিদ্যাসাগর, কলকাতা ২০২১)
৩. চক্রবর্তী, রমেশ চন্দ্র, 'শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর' (কোরক, শিক্ষা-শিক্ষক-শিক্ষকতা সংখ্যা, কলকাতা ১৪১৯ বং)
৪. চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র, 'আমার অল্প বয়স' (গণশক্তি, শারদ ২০১৯)
৫. চক্রবর্তী, শুভঙ্কর, 'আমার শিক্ষক ঃ দেবকুমার চক্রবর্তী ও সত্যপ্রিয় রায়' (শিক্ষাদর্পণ, জুন ২০০৫)
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ', শিক্ষাচিন্তা (সংকলন), নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি, কলকাতা ২০১২)
৭. দাস, শ্রীকৃষ্ণভাবিনী, 'কার্যমূলক শিক্ষা ও জাতীয় উন্নতি (অনুষ্টুপ গ্রীষ্ম-বর্ষা সংখ্যা, কলকাতা ২০১৩)
৮. দাশগুপ্ত, বিপ্লব (সাক্ষাৎকার) ঃ জ্যোতিবাবুর সঙ্গে (নন্দন, কলকাতা, জুলাই ১৯৯২)
৯. দেবী, অনিলা, 'শিক্ষক আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ (গণশক্তি, শারদ ১৯৯৫)
১০. বসু, জ্যোতি, শিক্ষক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে (বিধানসভার অভিভাষণ, মার্চ ১৯৬৫) (শিক্ষাদর্পণ, জ্যোতি বসু স্মরণ সংখ্যা, কলকাতা, মার্চ-জুন ২০১০)
১১. মুখোপাধ্যায়, সমীর, পরিবর্তনশীল সামাজিক কাঠামোয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি (স্পন্দন, কলকাতা)
১২. রায়, অনিলকুমার, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—পুত্রের চোখে পিতা, (এবং এই সময়, কলকাতা ১৪১৯ বং)
১৩. রায়, উৎপল, 'ছেষট্টির ঐতিহাসিক সংগ্রামের পঞ্চাশ বছর' (শিক্ষা ও সাহিত্য, কলকাতা, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০১৬)
১৪. সেন, ধীরেন্দ্রমোহন, 'ভারতের শিক্ষাধারায় ডাঃ রায়' (দেশ, বিধানচন্দ্র রায় সংখ্যা, ৩০শে শ্রাবণ ১৩৮৮ বং)

১৫. সেন, সুলগ্না, 'ইস্কুল শিক্ষার হাল হকিকত' (অনুষ্টুপ, গ্রীষ্ম-বর্ষা সংখ্যা, কলকাতা ২০১৩)
১৬. সাহা, কৃষ্ণা (সত্যপ্রিয় রায়ের কনিষ্ঠা কন্যা) সাক্ষাৎকার ঃ আত্মজার দৃষ্টিতে সত্যপ্রিয় রায়' (শিক্ষা ও সাহিত্য, কলকাতা, আগস্ট ২০০৭)
১৭. সেনগুপ্ত, অন্বেষা, '১৯৫০-এর দশকে কলকাতায় গণ আন্দোলনের দুটি মুহূর্ত ঃ ট্রামভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন (১৯৫৩) ও শিক্ষক আন্দোলন (১৯৫৪), অনুষ্টুপ, তিন দশকের গণ আন্দোলন, বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা ২০১৭
১৮. সেনগুপ্ত, প্রবাল, 'শিক্ষক আন্দোলন এবং সত্যপ্রিয় রায়' (শিক্ষা দর্পণ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১০)
১৯. সেনগুপ্ত, প্রবাল, 'প্রসঙ্গ ঃ নকশালবাড়ী আন্দোলনের অর্ধ শতবর্ষ—বাঁকা চোখে' (সমকাল ও বিবৃতি, চুঁচুড়া ২০১৭)
২০. সেনগুপ্ত, প্রবাল, '১২৫ বছর-এ অ্যান্তনিও গ্রামসি ঃ জীবন ও শিক্ষা' (পূর্বভাস, আগরতলা, শারদ ২০১৬)
২১. সেনগুপ্ত, প্রবাল, 'বিদ্যানগর স্কুলের জন্মকথা' (নতুন চিঠি, বর্ধমান ২০১৯)
২২. সেনগুপ্ত, প্রবাল, 'সার্ধশতবর্ষে স্বদেশী শিক্ষাবিদ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়' (ছাত্র সংগ্রাম, শারদ, কলকাতা ২০১৫)
২৩. সেনগুপ্ত, প্রবাল, 'মাধ্যমিক শিক্ষা আন্দোলন—ধারাবাহিকতা ও রূপান্তর' (শিক্ষা ও সাহিত্য, কলকাতা, মার্চ ২০০৮)
২৪. সেনগুপ্ত, প্রবাল, 'দ্বিশতবর্ষে অক্ষয়কুমার দত্ত' (কালান্তর, শারদীয়, কলকাতা ২০১৯)
২৫. সেনগুপ্ত, প্রবাল, 'মধ্যযুগের ঐস্লামিক শিক্ষা—অন্ধকার নয়, আলোয় ফেরা (শিক্ষা ও সাহিত্য, সেপ্টেম্বর ২০০৮)
২৬. সেনগুপ্ত, প্রবাল, 'স্বদেশি যুগের জাতীয় শিক্ষা—একটি পর্যালোচনা' (একাডেমিক জার্নাল অব হুগলি মহসিন কলেজ, ডিসেম্বর ২০১৫)
২৭. সেনগুপ্ত, প্রবাল, 'ঔপনিবেশিক পর্বে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গঠনের চেষ্টা ও নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি' (ইন্টার ন্যাশনাল জার্নাল অব হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোস্যাল সাইন্স স্টাডিজ, করিমগঞ্জ, আসাম, মে ২০১৯)
২৮. সেনগুপ্ত, প্রবাল, 'বাংলায় মাধ্যমিক শিক্ষকদের সংগ্রাম ঃ প্রসঙ্গ অনিলা দেবী' (এডুলাইট, কল্যাণী, নভেম্বর ২০১৯)
২৯. সেনগুপ্ত, প্রবাল, 'ঔপনিবেশিক ভারতে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা ও ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ—একটি পর্যালোচনা' (ইতিহাস অনুসন্ধান-১২, কলকাতা ১৯৯৮)
৩০. সেনগুপ্ত, প্রবাল, 'সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে বাংলার কলেজ শিক্ষকদের সংগঠন ও আন্দোলনের পর্যালোচনা' (ইতিহাস অনুসন্ধান-২৭, কলকাতা ২০১৪)
৩১. সেনগুপ্ত, প্রবাল, 'বাংলার শিক্ষক আন্দোলনের আদি পর্ব' (১৯২১-৪৭) ইতিহাস অনুসন্ধান-২৮, কলকাতা ২০১৪

৩২. সেনগুপ্ত, প্রবাল, 'ঔপনিবেশিক যুগে বর্ধমান শহরে ইংরেজি শিক্ষা ঃ একটি অবলোকন' (নতুন চিঠি, শারদীয় ২০১৬)
৩৩. সেনগুপ্ত, প্রবাল, 'শিক্ষাবিদ ও ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার সার্ধশতবর্ষে ফিরে দেখা' (সমকাল ও বিবৃতি, চুঁচুড়া ২০২০)
৩৪. সেনগুপ্ত, প্রবাল, ' ঔপনিবেশিক যুগে বিভিন্ন কমিটি ও কমিশনের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষা' (শিক্ষা দর্পণ, জুন ০০৯)
৩৫. সেনগুপ্ত, প্রবাল, 'দুর্গাবাই দেশমুখ কমিটির পঞ্চাশ বছর ঃ স্বাধীন ভারতে নারী শিক্ষার হাল হিকিকৎ' (শিক্ষাদর্পণ, সেপ্টেম্বর ২০০৮)
৩৬. সেনগুপ্ত, প্রবাল, 'চিন্তানায়ক চিত্তরঞ্জনের শিক্ষাচিন্তা' (শিক্ষা ও সাহিত্য, জুলাই ২০১৪)
৩৭. সেনগুপ্ত, প্রবাল, 'দার্জিলিং ঃ শিক্ষায় নেপালি ভাষা' (শিক্ষাদর্পণ, আগস্ট ১৯৯৯)
৩৮. সেনগুপ্ত, প্রবাল, 'সোভিয়েত দেশের প্রাথমিক শিক্ষা—বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা' (শিক্ষাদর্পণ, মার্চ ২০০৭)
৩৯. সেনগুপ্ত, প্রবাল, 'চিনে শিক্ষার প্রবহমান ধারা' (শিক্ষা ও সাহিত্য, নভেম্বর ২০০৯)
৪০. সেনগুপ্ত, প্রবাল, 'শিক্ষক আন্দোলনের ত্রিধারা, সংগ্রামে সহমর্মিতা (১৯৪০-৫০-এর দশক) শিক্ষা ও সাহিত্য, জানুয়ারি ২০১২
৪১. সেনগুপ্ত, প্রবাল, 'ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক—আজ, কাল ও পরশু' (শিক্ষাবার্তা,আগস্ট ২০১৮)
৪২. সেনগুপ্ত, প্রবাল, 'সামাজিক প্রেক্ষাপটের বদল—শিক্ষার অভিমুখ কি অপরিবর্তনীয়', (শিক্ষাবার্তা, জুন ২০১৭)
৪৩. হোড়, ব্রততী, 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি ১৯৫৪ সাল, একটি পর্যালোচনা' (ইতিহাস অনুসন্ধান-৮, কলকাতা ২০১০)

প্রবন্ধ ঃ ইংরেজি

1. Sharma, S. N.–Team Teaching, (Dimensions of Indian Education, Ed. : R. P. Sinha & Shashiprava, 1994.
2. Saikia Siddheswar–New Trends in Education, (Do)
3. Rajput J. S.–Policy Perspective on Values in School Education, (Philosophy & Science of Value education in the context of Modern India, R. K. M. Instt. of Culture, 2006.
4. Sadgopal, Anil–Globalization and Education, The Zakir Husain Memorial Lectures, (1992–2004), 2007.
5. Majumdar, Tapas–Education : Uneven Progress, Difficult Choices (Independent India–The first fifty years) Ed. Hirnmay Karlekar, N. Delhi, 1998.